ভূমিকা

শ্রীম মডেল - গৃহস্থসন্ন্যাসের

১

ব্রহ্মশক্তি জগদম্বার নররূপ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি যুগাবতার। অবতারের মহাকার্যের ভিতর ধর্মসংস্থাপন অন্যতম। এই ধর্মসংস্থাপনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ একটি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি দুই শ্রেণীর ভক্ত সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এক শ্রেণী, ত্যাগী সন্ন্যাসী — অপর শ্রেণী, গৃহস্থ সন্ন্যাসী। প্রথম শ্রেণীর আদর্শ — বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ, অপর শ্রেণীর আদর্শ — জ্ঞানতপস্বী শ্রীম।

অন্তরঙ্গ ভক্তজনকে জগদম্বা শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ভাবে লইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার দিব্য উন্মাদের অবস্থায়। তখন এই ভক্তগণের অনেকেরই জন্ম হয় নাই। জগদম্বা শ্রীমকেও অবতারলীলা প্রকাশের পূর্বেই লইয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে এই সাদা চোখে চৈতন্যসংকীর্তনে দর্শন করিয়াছিলেন বটতলা ও বকুলতলা ঘাটের রাস্তায় ঠিক তেমনি, যেমনি সপার্ষদ্ চৈতন্য-নিত্যানন্দ হরিনামে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন — পাঁচ শত বৎসর পূর্বে। তাহার মধ্যে শ্রীমকেও দেখিয়াছিলেন।

এই দর্শনের প্রায় ২০/২২ বৎসর পর দেহধারী শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে উপনীত হন। দেখিয়াই তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। আনাগোনায় সে পরিচয় সুগভীর হয়।

মানবশরীরে এই দর্শনের পূর্বেই জগদম্বা ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, তোমার এই ভক্তটিকে গৃহস্থাশ্রমে রাখিবে লোকশিক্ষার জন্য। সংসারতপ্ত জনগণকে সে ভাগবত শুনাইবে। তাহাতে তাহারা শান্তিলাভ করিবে। আর তাহাদের মধ্যে তাহাদেরই মত শ্রীমকে থাকিতে দেখিয়া অথচ শ্রীম-র মন সংসারের ঊর্ধ্বে পরব্রহ্মে লীন — এই দৃশ্য দেখিয়া তাহারা

দেবমানবত্ব লাভ করিবে এই জীবনেই।

শ্রীম অল্প বয়সে সংসারতাপে জর্জরিত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২৭ বৎসর। কাব্যরসে সিঞ্চিত করিয়া বলিতেন, 'এ বাগানে সে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে শ্রীভগবানের দর্শন লাভ হয়েছিল।' কৃতজ্ঞতার বিনম্র বচনে কখন বলিতেন, 'কাঁচ কুড়োতে গিয়ে আমার লাভ হলো কৌস্তুভ!' প্রথম দর্শনেই শ্রীম-র মন হরণ করিয়াছিলেন ঠাকুর। শ্রীম বলিতেছেন — ঠাকুরকে দেখিয়া, শরীর চলিতেছে বরাহনগরের পথে — আর মন বাঁধা পড়িয়াছে পিছনে — শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণে — দক্ষিণেশ্বরের তপোবনে — রাণী রাসমণির ভবতারিণী মন্দিরে।

বিদেশাগত পুত্রের জননী যেরূপ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পুত্রকে বক্ষে ধারণ করে, ঠাকুর শ্রীমকে সেইরূপ আনন্দ ও স্নেহপীযূষপূর্ণ চিত্তে তাঁহার অভয় চরণ প্রান্তে স্থান দিয়াছিলেন। ঠাকুরকে দর্শনের সাত দিনের মধ্যে শ্রীমকে অভয় দিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'তোমার যে গুরু লাভ হয়েছে। অভাবনীয় অচিন্তনীয় স্বপ্নের অগোচর যে সমস্যা তা মায়ের কৃপায় মুহূর্তে দূর হয়ে যায়!'

ঠাকুরকে দেখিয়া অবধি শ্রীম ভাবিতেছিলেন, এই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করাই শান্তি সুখ ও আনন্দের পথ। আর অন্যদিকে ঠাকুর ভাবিতেছিলেন তাঁহাকে গৃহস্থ আশ্রমে রাখিয়া আদর্শ গৃহস্থ সন্ন্যাসী তৈয়ার করিবেন। এই দুইজন — গুরু শিষ্য, অবতার ও তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ্ — দুইটি আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ পথের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। সুযোগ পাইলেই শ্রীম সন্ন্যাসের কথা শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট কখনও সাক্ষাৎ ভাবে, কখনও ইঙ্গিতে প্রস্তাব করিতেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রথম হইতেই গৃহস্থ সন্ন্যাসীর জীবন আর সাধন শিক্ষা দিতেছিলেন।

একদিন আসিল যখন উভয়েই আপন আপন পরিকল্পনা ব্যক্ত করিলেন। গোপন করিয়া কতদিন আর রাখা যায়। একদিন না একদিন প্রকাশিত হইয়া পড়ে মনের ভাব।

শ্রীম-র ত্যাগী সন্ন্যাসীর আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়া একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ বাহ্যদৃষ্টিতে কঠোর ভাব ধারণ করিলেন। বলিলেন, জগদম্বা এক টুকরো খড়কুটো থেকে বড়ো বড়ো আচার্যের সৃষ্টি করেন। আরও বলিয়াছিলেন,

ইঞ্জিনীয়ারের অনেকগুলি জলের পাইপ থাকে। একটা পাইপ নষ্ট হয়ে গেলে, ঐ স্থলে আর একটা নূতন পাইপ সংযোজন করে। কেহ মনে না করে, আমি জগদম্বার কাজ না করলে তাঁর কাজ অসম্পূর্ণ থাকবে। এই কথা শুনিয়া শ্রীম চিরদিনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন — নিজের ইচ্ছা ও অনিচ্ছা দুই-ই বিসর্জন দিয়া। শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাই প্রবল হইল।

কথামৃতের পাঠক দেখিতে পাইবেন প্রথম হইতেই ঠাকুর শ্রীমকে ব্যক্তিগতভাবে গৃহস্থ-সন্ন্যাসের শিক্ষা দিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, জগদম্বা 'ভাগবতের পণ্ডিত'কে একটা 'পাশ' দিয়া সংসারে রাখেন লোকশিক্ষার জন্য, জগৎবাসীকে 'ভাগবত' শুনাইবার জন্য। শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারলীলার 'চাপরাস'ধারী অন্যতম প্রধান সেবক।

কয়েক মাসের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে বলিলেন, তুমি আর কোথাও যাইবে না — খালি এখানেই আসিবে।

ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য দৈবীমানুষ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ছিলেন শ্রীম-র আদর্শ — সাত আট বৎসর ধরিয়া। শ্রীরামকৃষ্ণের মিলনের পূর্বে শ্রীম বলিতেন, হেয়ার স্কুলে পড়িবার সময় হইতেই কেশব সেনের জন্য ব্যাকুল ছিলাম। তাঁহার দর্শন না পাইলে কাঁদিতাম। কেশব সেন অ্যালবার্ট হলের আফিসে দরজা বন্ধ করিয়া লেখাপড়া করিতেন। একদিন মন এমন ব্যাকুল হইল যে পিলারে আরোহণ করিয়া — যেমন লোক বৃক্ষে আরোহণ করে, ঠিক তেমনিভাবে গৃহের পার্টিশানের উপর দিয়া দেখিতেছিলাম, কেশববাবু বিলিতী চিঠি লিখিতেছিলেন।

কেশববাবুর সঙ্গে — ৭/৮ বৎসরের অভ্যাস শ্রীরামকৃষ্ণের এক কথায় — তুমি আর কোথাও যাইবে না — তৎক্ষণাৎ রুদ্ধ হইয়া গেল।

১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে ২৬শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার, শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রীম প্রথম দর্শন করেন বিকাল বেলায়। কয়েক মাসের মধ্যে দুর্গাপূজা আসিয়া পড়িল। শ্রীকেশব দুর্গাপূজার তিন দিন — সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে শ্রীদুর্গা সম্বন্ধে নূতন ঢঙের বক্তৃতা দিতেছিলেন। বলিতেছিলেন, দুর্গাকে যদি লাভ হয়, তবে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ — সকলই লাভ হয় — অর্থাৎ ধন-ঐশ্বর্য, বিদ্যা-ঐশ্বর্য, শক্তি-ঐশ্বর্য ও সিদ্ধির ঐশ্বর্য লাভ

হইবে। কারণ ইঁহারা সব মায়ের পার্শ্বদেবতা।

শ্রীম দুর্গাপূজার পর যখন ঠাকুরের কাছে গেলেন — এই তিন দিনের প্রবচন সংক্ষেপে শুনিয়াই ঠাকুর সস্নেহে, কিন্তু কঠোর স্বরে আদেশ করিলেন, 'তুমি আর কোথাও যাইবে না। খালি এখানে আসিবে।' এই ঘটনাটি অনুধাবন করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মন শ্রীম-র উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ৭।৮ বৎসর যাঁহাকে হৃদয়ে দেবতার আসন দিয়াছিলেন সেই কেশব সেনকে ছাড়িয়া দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে হৃদয়ে বসাইবার চেষ্টা করিলেন এবং পরে বসাইলেনও।

সাধকগণ বুঝিবেন ইহা কিরূপ কঠিন কার্য। ইহা সম্ভব হইয়াছিল শ্রীম-র জীবনে অতি সহজভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায়।

শ্রীম কি কেশববাবুকে ছাড়িয়া দিলেন? না, তাহা নয়। তাঁহাকে তাঁহার উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত করিলেন মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্যই হৃদয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান নির্দিষ্ট হইল। যে মন কেশবে নিবিষ্ট ছিল, সেই মন এখন শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণতলে!

শ্রীমকে যে গৃহস্থ-সন্ন্যাসী বানাইবার ইচ্ছা শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল, ইহা নিম্নলিখিত ঘটনাই প্রমাণ করে। শ্রীম-র দ্বিতীয় দর্শন হয় ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার, অর্থাৎ প্রথম দর্শনের দুইদিন পর সকাল বেলায়। প্রথম দর্শনে বিশেষ কিছু কথা হয় নাই। দ্বিতীয় দর্শনেই শ্রীম-র অজ্ঞাতে শ্রীম-র জীবনে গৃহস্থাশ্রমের গৃহস্থ-সন্ন্যাসের বীজ বপন করিয়াছিলেন ঠাকুর। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'গৃহে থাকতে হয় বড়লোকের ঘরের দাসীর মতন।' দাসী আপনাকে মনিবের ঘরের সঙ্গে বাহ্যদৃষ্টিতে এক করে দেয়। বলে, 'আমার রাম, আমার হরি। কিন্তু অন্তরে জানে আমার ঘর এখানে নয়, ঐ দূরে এক গ্রামে যেখানে আমার ছেলে মেয়ে আছে। তেমনি মন ঈশ্বরে সমর্পিত করে সংসারের কর্তব্য করতে হয়।'

অথবা, 'কচ্ছপের মতন সংসারে থাকতে হয়। কচ্ছপ থাকে জলে, কিন্তু ডিমপাড়ে আড়ায়। যেখানে ডিম সেখানে মন, শরীর জলে থাকলেও।'

বলিলেন, 'দাসী দিনরাত কাজ করে, কিন্তু তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় গৃহিণীর দেওয়া অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানে। তেমনি গৃহস্থ-সন্ন্যাসী দিবানিশি

কাজ করবে সংসারের, কিন্তু ভোগ নিবে না। যতটুকু না হলে শরীর ধারণ হয় না, ততটুকু নিবে।'

আবার বলিলেন, 'সংসারে পাঁচজনের সঙ্গে থাকবে, তাদের বাইরের ভালবাসা দেখাবে, ঈশ্বরবুদ্ধিতে সেবা করবে — অর্থাৎ এদের অন্তরে যে ঈশ্বর আছেন, তাঁর সেবা করবে। কিন্তু মনে জানবে, এরা আমার কেউ নয়, আমিও এদের কেউ নই। ঈশ্বরই এদের ও আমার আপনার। ঈশ্বরই মাতা পিতা ও বন্ধু সকলের।'

একদিন পারিবারিক কোনও বিষয়ের উল্লেখ করিতে গিয়া শ্রীম-র মুখ হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া গেল — 'আমার পুত্র'। ঠাকুর তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সাবধান করিয়া সস্নেহে বলিলেন, 'আমার পুত্র' বলতে নেই। মনে করতে হয় ভগবানের পুত্র। আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছেন সেবার জন্য। কেন? যদি কিছু হয়, যদি তার শরীর ঈশ্বর নিয়ে নেন, তখন মহা বিপদে পড়বে। শোকে অধীর হয়ে পড়বে!

আমরা দীর্ঘকাল ধরিয়া দেখিয়াছি, শ্রীম কখনও তাঁহার পুত্রকে 'আমার পুত্র' বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। যে পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর শ্রীমকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, সেই পুত্র বালক অবস্থাতে এই ঘটনার কিছুকাল পরে দেহত্যাগ করিয়াছিল। সে ছিল শ্রীম-র জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাহার শোকে পিতামাতা উভয়েই অধীর হইলেও শ্রীম সেই শোক সামলাইয়া লইলেন, কিন্তু মাতা সেই শোক সারা জীবন বহন করিয়াছিলেন। কখনও শোকাগ্নিতে উন্মাদবৎ আচরণ করিতেন।

এই ঘটনাও বলিয়া দেয়, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে মহর্ষি তৈয়ারী করিবেন, আচার্যরূপে জগদ্‌গুরুর পদে অভিষিক্ত করিবেন। লোককল্যাণে সারাজীবন ভগবৎসেবায় সমর্পণ করিবেন। সেইজন্য তিনি প্রথম হইতে তাঁহাকে অতি কঠোর সাধনের ভিতর দিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীম দীর্ঘদিন ধরিয়া ঠাকুরের পদপ্রান্তে বাস করিতেছিলেন। সেই সময় ঠাকুরও তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমের উপযোগী নানা কঠোর সাধনের ভিতর দিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। একদিন শ্রীম-র কলিকাতার বাড়ি হইতে একজন একটি পত্র শ্রীম-র হাতে দিল। ঠাকুর তৎক্ষণাৎ সর্পদর্শন-জনিত আতঙ্কে শ্রীমকে চিৎকার করিয়া বলিলেন, 'ফেলে দাও ফেলে

দাও।' শ্রীম উহা ফেলিয়া দিলেন। কেন এই আচরণ? শ্রীমকে যে ঠাকুর উজানপথে লইয়া যাইতেছেন! সে পথটি সংসারের ঠিক বিপরীত। নিবৃত্তির পথ। ব্রহ্মসত্যের পথ। জগৎমিথ্যার পথ। মিথ্যা হইতে সত্যে, পরব্রহ্মে যাইবার পথ। এই পথের সন্ধান না পাইলে, এই পথে ব্রহ্মসত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে কেহ জগদ্‌গুরুর আসনে আসীন হইতে পারে না। ঠাকুর তাই ঐ অদ্ভুত আচরণ করিলেন।

পুত্র ও গৃহপরিজন জগৎবাসীর কত আপনার ইহা সকলেই জানেন যারা গৃহস্থাশ্রমে থাকেন। ঠাকুর কি শ্রীমকে আপাতদৃষ্টিতে এই কঠোর নিষ্ঠুর আচরণ শিখাইলেন? না, তাহা নয়। এই শিক্ষা তিনি প্রথম দিনেই শ্রীমকে দিয়াছিলেন, ঈশ্বরই পুত্র-পরিজনের আপনার এবং তোমারও আপনার, সকলেরই চিরকালের আপনার। জগতের সম্পর্ক দুইদিনের জন্য। ঠাকুরের ঐ আচরণে শ্রীমকে তিনি ঈশ্বরে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। শ্রীমকে ব্রহ্মলীন তৈয়ার করিলেন। আত্মীয় কুটুম্ব পরিজনের ভিতরস্থিত অন্তর্যামী পরমপুরুষের উপর শ্রীম-র মন সংস্থাপিত করিলেন। তাহাদের দেহে নয়।

এই ঈশ্বরভাবে পরিজনকে দেখার দৃষ্টিটি শ্রীম-তে সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল। আমরা বহুকাল ধরিয়া তাহা দেখিয়াছি। ক্ষুদ্র বালক পৌত্রগণকেও শ্রীম শ্রদ্ধায় শ্রীভগবানের বিগ্রহরূপে দেখিতেন।

আর একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন — দেখ, আমার একটা কি ভাব হয়েছে। যারা হল আপনার তারা হল পর, আর যারা পর তারা হল আপনার। এই রাখাল বাবুরাম লাটু — এদের বলছি ওঠ্, হাত মুখ ধো, মার নাম কর। রামলাল হল পর। এরা কোথায় আছে, কি খাচ্ছে — তার খবর নেই।

এই কথার দ্বারাও শ্রীমকে গৃহস্থ-সন্ন্যাসের আর একটি শিক্ষা হৃদয়ে রোপণ করিতে বলিলেন — ভক্তগণই আপন জন।

ভক্তগণকে দেখিলে ভগবানের কথাই স্মরণ হয়। তাই শ্রীমকে প্রকারান্তরে বলিলেন, ভক্তগণের সঙ্গ ও সেবা করিবে সর্বদা। শ্রীম সারাজীবন এইটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। তিনি সর্বদা সাধু ও ভক্তগণে পরিবৃত হইয়া থাকিতেন। বলা যাইতে পারে, চব্বিশ ঘন্টার

মধ্যে তেইশ ঘন্টাই তিনি ভক্তসঙ্গে থাকিতেন। অসুখের সময়ও তিনি ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া থাকিতেন। ভক্তগণই তাঁহার সেবা করিতেন।

প্রথম দর্শনের পর কিছুদিনের মধ্যে শ্রীমকে সুস্পষ্ট ভাবে বলিলেন, কুটুম্বসেবা করিবে না। সাধু ভক্তের সেবা করিবে। এই কার্যটি কি প্রকার কঠিন ইহা সংসার-আশ্রমী জনগণ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন। শ্রীমকে দেখিয়াছি, এই দুঃসহ পরীক্ষাতেও তিনি উত্তীর্ণ, শ্রীগুরুর কৃপায়। আমরা তাঁহাকে কখনও কুটুম্বসেবা করিতে দেখি নাই। কিন্তু সাধু ও ভক্তের সেবায় তিনি মুক্তহস্ত।

শ্রীম যখন তিনটি স্কুলে একসঙ্গে হেডমাস্টারের কার্য করিতেন, তখন একটি স্কুলের উপার্জন ঠাকুরের শরীরত্যাগের পর বরাহনগর মঠে দিতেন। অপর একটির আয় শ্রীশ্রীমা ও ভক্তগণের সেবায় ব্যয়িত হইত। তৃতীয়টির আয় দ্বারা পরিবারের ভরণপোষণ হইত।

শ্রীম-র জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণকথিত গৃহস্থ-সন্ন্যাসীর অন্য পাঁচটি গুণও সম্যক্ প্রস্ফুটিত। ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, গৃহস্থ ভক্ত হইবে শান্ত ও নিরভিমান। কর্মক্ষেত্রে সিংহতুল্য, আবার রসরাজ রসিক। আবার সাধু ও ভক্তের কাছে দাসানুদাস। যে কেহই শ্রীমকে পাঁচ মিনিটের জন্য দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শ্রীম-র জীবনে এই গুণগুলি প্রকাশিত। শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণময়, যেমন হনুমান সীতারামময়। শ্রীম-র নিকট পাঁচ মিনিট বসিলে দর্শকের জগৎ ভুল হইয়া যাইত। ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য — এই মহাসত্য দর্শকের মন তাহার অজ্ঞাতসারে অধিকার করিয়া বসিত।

২

কেন শ্রীমকে গৃহস্থাশ্রমে রাখিয়াছিলেন? পূর্বেই বলা হইয়াছে, গৃহস্থাশ্রমের লোকদের শিক্ষার জন্য। এই গৃহস্থাশ্রম সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে ভারত উঠিবে না। আর ভারত না উঠিলে জগৎও উঠিবে না। কেন? ভারতীয় সমাজেরও তিনটি শরীর, মানুষমাত্রেরই তিনটি শরীর — স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হন, ভারত তখন অপরের পদানত।

তাঁহার অন্তরঙ্গগণ এই কথা ভক্তদের সর্বদা বলিতেন, ঠাকুর আসিয়াছেন, এইবার আর কেহ ভারতকে অধীনে রাখিতে পারিবে না। ভারত স্বাধীন হইবে। তাঁহার আগমনই এই জন্য। ভারত উঠিলে জগৎ উঠিবে। ভারতের কারণশরীরটি ব্রহ্মস্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের স্থূল, সূক্ষ্ম শরীর নানা কারণে দুর্বল হইয়া গেল, কিন্তু কারণশরীরটি অক্ষত, অব্যাহত। ভারতের সমাজশরীর এই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকায় অত ঝঞ্ঝাবাতের ভিতরও ভারত দাঁড়াইয়া আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। ভারতের স্থূল, সূক্ষ্ম শরীর নূতন করিয়া আবার ইহার চিরন্তন ব্রহ্মভিত্তির উপর গড়িয়া তুলিতে হইবে।

উপরোক্ত এইসব শিক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণ আপন অন্তরঙ্গগণকে দিতেন। অন্তরঙ্গগণ আমাদিগকে ঐ শিক্ষার কথা বলিতেন। আরও বলিতেন, ভারতের এই সমাজশরীর সংগঠিত করিতে হইলে ভগ্নপ্রায় গৃহস্থাশ্রমকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে। এইজন্য শ্রীমকে গৃহস্থাশ্রমে রাখিয়াছিলেন যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীম-র জীবনটি গৃহস্থাশ্রমীর আদর্শ। সারা জীবন একজোড়া বস্ত্র, একজোড়া পাঞ্জাবী, একজোড়া কালো বার্ণিস করা চটীজুতা, একটি চাদর — এই ছিল শ্রীম-র জীবনভোর পোশাক। কেন? না, তাঁহাকে যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ-ঘরে দাসীর মতন থাকিতে বলিয়াছিলেন, ঘরের মালিক যে ভগবান স্বয়ং!

গৃহস্থসন্ন্যাসীর কর্তব্যের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীমকে শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলিয়াছিলেন — পিতামাতার সেবা সারা জীবন করিতে হইবে। মায়ের সম্বন্ধে আরও বড় কথা বলিলেন — মাতা যদি অসতীও হয়, তথাপি সন্তান তাহার সেবা করিবে। কন্যাকে সৎপাত্রে সমর্পণ করিবে। পুত্রকে কার্যক্ষম করিয়া দিবে, যাহাতে সে আপন জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে। পুত্রের বিবাহ দেওয়া গৃহস্থ-সন্ন্যাসীর নৈতিক কর্ম নহে। শ্রীম অক্ষরে অক্ষরে ঠাকুরের এই বিধান পালন করিয়াছিলেন। শ্রীম-র একটি কন্যার বিবাহ শেষ হয় রাত্রি দুইটার সময়। ইহার পর শ্রীম ছাদের ঘরে বসিয়া ভোর ছয়টা পর্যন্ত লণ্ঠনের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতের ডায়েরী খুলিয়া ধ্যানমগ্ন হন। শ্রীম নিজগৃহে প্রবাসী। শ্রীম ধর্মশালার

পথিক। নিরাশ্রয় পথিকের ভাব আরোপ করিবার জন্য শ্রীম কখনও বাস্তুহারাদের সঙ্গে সিনেট হাউসের নিম্নে ফুটপাতে রাত্রিবাস করিতেন।

৩

নিম্নে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ইহাই সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিবে — শ্রীম আদর্শ গৃহাশ্রমী সন্ন্যাসী। শ্রীম 'মডেল' — ভারতীয় প্রাচীন ও নবীন গৃহাশ্রম-সন্ন্যাসের।

শ্রীম-র কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশিক্ষিত। শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিত। তিনি চিরকুমার। তাঁহার চরিত্রে একটি ব্যসন ছিল। তিনি horse race (ঘোড়দৌড়) দেখিতে যাইতেন, যেমন কলিকাতাবাসী বহু লোক যায়। গড়ের মাঠে ফুটবলাদি নানা ক্রীড়ায় যেমন হাজার হাজার ক্রীড়ারসিক লোক যাইয়া থাকে, তিনিও তেমনি যাইতেন।

প্রথমে খেলা দেখিতেই যাইতেন, কিন্তু ক্রমে উহা ব্যসনের রূপ ধারণ করে। খেলার অনুসঙ্গী gambling-এ (জুয়াখেলায়) তাঁহার মন আকৃষ্ট হয়। শ্রীম ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ঐ কর্ম করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু বারংবার বলা সত্ত্বেও পুত্র উহা গ্রাহ্য করিলেন না, যাইতেই থাকিলেন।

তখন একদিন প্রশান্তভাবে বন্ধুর ন্যায় পুত্রকে বলিলেন, তুমি এখন শিক্ষিত, উপার্জনক্ষম — যদি এই গৃহাস্থাশ্রমের নিয়ম উলঙ্ঘন করাই উচিত মনে কর, তবে নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া যাহা ভাল বুঝ তাহাই কর। তোমার কাজে এই আশ্রমবাসীগণ কুশিক্ষা প্রাপ্ত হইবে।

পুত্র ঘরের বাহির হইয়া গেলেন অভিমানে। শ্রীম অন্তরে কথঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেও আমরা বাহিরে কখনও দুঃখের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না।

পুত্র আশ্রয় লইলেন মাতুলগৃহে। সেই স্থানে প্রায় বিশ বৎসর রহিলেন। মাতুলগৃহ বিত্তশালী। মাতুলপত্নী পুত্রের মত সস্নেহে তাহাকে রক্ষা করেন। শ্রীম-র পুত্র কিন্তু পূর্ববৎ সানন্দে রেসখেলায় যাইতে লাগিলেন।

১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে গ্রীষ্মকালে মাতুলপত্নী শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ দর্শনে সদলবলে বাহির হইলেন। ফিরিবার পথে তাঁহার দেহত্যাগ হইল। এই

সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিলে অপুত্রক মৃত মাতুলের উত্তরাধিকারী ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তাঁহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। শ্রীম-র এই দ্বিতীয় পুত্র তখন আশ্রয়হীন ও অন্নবস্ত্রহীন হইয়া খুবই দুর্দশায় পতিত হইলেন।

একদিন অপরাহ্নে অন্তেবাসী 'কথামৃত' প্রকাশের ব্যাপারে প্রেসে যাইতেছিলেন, আমহার্স্ট স্ট্রীটস্থিত মর্টন স্কুলের সম্মুখের ফুটপাথ ধরিয়া। উত্তর দিকের সিটি কলেজের নিকট হইতে তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন একজন। তিনি দক্ষিণ দিকে যাইতেছিলেন। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া পুনরায় চলিতে লাগিলেন। পুনরায় ডাক। এবার স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। উত্তর দিকে চাহিয়া পরিচিত কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, তথাপি দাঁড়াইয়া রহিলেন। এইবার তিনি দেখিতে পাইলেন শ্রীম-র দ্বিতীয় পুত্র চারুবাবুকে। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া অন্তেবাসী বড়ই ব্যথিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চারুবাবু, আপনার কি কোনও কঠিন রোগ হয়েছে? আপনার চেহারা এরূপ কেন দেখাচ্ছে?'

তিনি ম্লান হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'না রোগ নাই, কিন্তু দুই দিন সম্পূর্ণ উপবাস। আমাকে আপনি ত্রিশটা টাকা দিন।' অন্তেবাসী একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। শ্রীমকে না জানাইয়া অন্তেবাসী নিজের টাকাও দিতে পারিবেন না। কিংবা তাঁহার নিকট সাধু ও ভক্তসেবার জন্য শ্রীম-র গচ্ছিত অর্থও দেওয়া সম্ভব নহে। উভয় সংকটে পড়িলেন অন্তেবাসী।

চারুবাবু বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, বাবাকে জিজ্ঞেস করুন।' চারুবাবু মর্টন স্কুলের অদূরে দক্ষিণ দিকের ফুটপাথে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অন্তেবাসী মর্টন স্কুলের দ্বিতলে উঠিয়া শ্রীমকে আফিসগৃহে দেখিতে পাইলেন, হেড ক্লার্কের আসনে। আরও দুইজন লোক একটু দূরে বসিয়া আছেন। শ্রীম-র কানে কানে অন্তেবাসী সকল কথা বলিলেন। শ্রীম কানে কানেই উত্তর দিলেন, 'দিয়ে দাও'।

অন্তেবাসী চার হাত দূরে চৌকাঠের কাছে আসিলে শ্রীম তাহাকে ডাকিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার কানে কানে বলিলেন, 'যদি একত্রিশ দিনের দিন ফিরিয়ে দেয়, তবে দাও'।

অন্তেবাসীর মনে তুমুল ঝড় উঠিল। শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ পার্ষদ

শ্রীম, তিনি মহাপুরুষ। মনে হইতে লাগিল, তাঁহার একি আচরণ! অনাহারে পুত্র মৃতপ্রায়। আর তিনি ত্রিশ টাকা ফিরাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি পাইলে তবে দিতে বলিলেন। এ কি নূতন বিপদ! কোন অপরিচিত লোকও বিপদগ্রস্ত হইয়া অর্থ চাহিলে, যে কোনও হৃদয়বান মানুষই তাহাকে ঐ অর্থ দান করে। কিন্তু মহাপুরুষ হইয়া এ কি বিপরীত আচরণ? একদিকে পিতা, অন্যদিকে পুত্র — তাঁহাদের এই কঠিন আচরণের ভিতর অন্তেবাসী বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

আজ লক্ষ্মণের অবস্থাটা অন্তেবাসী বুঝিতে পারিলেন। একদিকে রামাজ্ঞা, অন্যদিকে শিবাবতার মহর্ষি দুর্বাসা। দুর্বাসা আসিয়াছেন রামদর্শনে। প্রাসাদমধ্যে রাম বিশেষ রাজকার্যে ব্যাপৃত। লক্ষ্মণকে প্রহরী করিলেন। লক্ষ্মণ ভাবিলেন, যদি মহর্ষি দুর্বাসাকে ভিতরে যাইতে না দিই, তাহা হইলে তিনি অভিশাপ দিয়া সমগ্র কুল ধ্বংস করিবেন। অন্যপক্ষে রামের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিলে, আমাকে প্রাণদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। লক্ষ্মণ নিজের প্রাণ বিসর্জন দেওয়াই সমীচীন মনে করিয়াছিলেন।

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে দশ টাকার তিনটি নোট বাম হাতে লইয়া অতি অশান্ত চিত্তে চারুবাবুর কাছে গিয়া অন্তেবাসী তাহা তাঁহার হাতে ছুঁড়িয়া দিলেন। আর অসম্বদ্ধ বাক্যে উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, ‘এই নিন্, একত্রিশ দিনের দিন ফিরিয়ে দিতে হবে।’*

---

* অনুরূপ আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। পূর্বোক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে, শ্রীম-র এই দ্বিতীয় পুত্র চারুবাবু তাঁহার চতুর্থ ভ্রাতুষ্পুত্র বালক অনিলের হাতে একটি পত্র দিয়া বলিলেন, ‘যাও, এই পত্রটি বাবার কাছে দিয়ে এসো।’ অনিল এই পত্র শ্রীম-র কাছে লইয়া গেল এবং তাঁহার হাতে দিল। পত্রে লেখা ছিল, ‘বাবা, I am on the verge of starvation. Please give me some money' (বাবা, আমি অনাহারে মৃতপ্রায়। আমায় কিছু অর্থ দিন)’। শ্রীম পত্র পড়িয়া পিঠে লিখিয়া দিলেন, 'Yes, I will give you whatever you want, but you are to stop going to the horse race (হ্যাঁ, তুমি যা চাও আমি তোমায় দেব, কিন্তু ঘোড়দৌড়ে যাওয়া বন্ধ করতে হবে)। অনিল তাহার কাকার হাতে পত্র দিল। কাকা পড়িলেন, কিন্তু ঐ প্রতিশ্রুতি দিয়া অর্থ গ্রহণ করিলেন না। এ ঘটনাটিও সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করে যে, মহাপুরুষের হৃদয় সত্যের নিকট, ধ্রুব নীতির নিকট বজ্রসম কঠিন। কিন্তু ভক্তের নিকট, জীবনধারণের নিকট, দুঃখীজনের নিকট কুসুমের চেয়েও কোমল — ‘বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদুনি কুসুমানীব’।

চারুবাবু অর্থ লইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। ঠিক একত্রিশ দিনের দিন ঐ অর্থ অন্তেবাসীকে ফিরাইয়া দিলেন।*

পিতা-পুত্রের এই ঘটনায় পাঠক কি বুঝিলেন, তাহা পাঠকই ঠিক করুন। কিন্তু বহু চিন্তা ভাবনার এবং তপস্যার পর আমি বুঝিলাম — শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের দাস। গুরুর আজ্ঞায় দাসীভাবে ঘরে রহিয়াছেন। কাহাকেও কিছু দিবার অধিকার দাসীর নাই। তাই আপাতদৃষ্টিতে এই কঠোর আচরণ শ্রীম করিলেন। শ্রীম নিজ গৃহে দাসী। শ্রীম গৃহাশ্রমীর আদর্শ। শ্রীম মডেল। শ্রীম Idol (বিগ্রহ)।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় 'শ্রীম-দর্শন' মহাগ্রন্থমালার পরিসমাপ্তি হইতেছে এই পঞ্চদশ ভাগে। প্রথম ভাগের ভূমিকায় 'শ্রীম-দর্শন' লেখার প্রারম্ভিক কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই উপসংহার ভাগে 'শ্রীম-দর্শন' প্রকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংযোজনা করিবার প্রেরণা হৃদয়ে অনুভব করিতেছি। উহা নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

যৌবনের প্রারম্ভে এক অজনা শক্তির প্রেরণায় শ্রীম-দর্শনের প্রসূতি শ্রীম-র অমৃতময়ী বাক্যাবলী দৈনন্দিন ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রেরণা পাইয়াছিলাম। যৌবনের শেষাংশে ঐ ডায়েরীকে সৎসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে ফেলিয়া সর্বাঙ্গীন গ্রন্থ রচনা করিবার প্রেরণা পাই হিমালয়ে, গঙ্গাতীরে, ঋষিকেশে। প্রচণ্ড কষ্ট বরণ করিয়া এবং reference book (সম্বন্ধ গ্রন্থ) সংগ্রহের জন্য নানা স্থানে ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে যাতায়াত করিয়া ডায়েরী হইতে শ্রীম-দর্শনকে উদ্ধার করিতে তপস্বী ভিক্ষাজীবীর প্রায় বিশ বৎসর লাগে। তখন আমি ভগ্নস্বাস্থ্য। তাহার পর 'Press Copy' (পাণ্ডুলিপি) তৈয়ারীর পালা। ডায়েরী লেখা ছাড়াও সাহিত্যিক রীতিতে পুনঃরচনা এবং পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে আমাকে ন্যূনাধিক দশ হাজার পৃষ্ঠা লিখিতে হইয়াছে।

ডায়েরী হইতে শ্রীম-র কথামৃতকে সাহিত্যে রূপায়িত করিবার সময় তিনটি প্রার্থনা করিয়াছিলাম সর্বাগ্রে। প্রথম — ঠাকুর, আমি প্রাণপাত করিয়া লিখিব, কারণ তুমি প্রাণে প্রচুর প্রেরণা দিয়াছ। আর ঐ সঙ্গে অবসর বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি ও ইচ্ছারও সংযোজনা করিয়াছ। দ্বিতীয় — কিন্তু, এই মহাগ্রন্থ প্রচার ও প্রকাশ করিবার ভার তোমাকেই লইতে হইবে।

তোমার আপনার লোকের হৃদয়ে প্রেরণা দিয়া তাহা তুমি প্রকাশিত করিয়া লও ভক্তজনের কল্যাণের জন্য। আমার দ্বারা প্রকাশকার্য সম্ভব হইবে না। তৃতীয় — এই মহাগ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর কৃপা করিয়া আমার জীবনের শেষ দিকে একান্তে ও নিশ্চিন্ত মনে তোমার চিন্তা করিবার অবসর প্রদান করিও।

এই তৃতীয় প্রার্থনাটির পরিপূর্ণ সুযোগ প্রভুর কৃপায় এখন আসিয়াছে।

উপরোক্ত এই দ্বিতীয় প্রার্থনার বিষয়টির কিঞ্চিৎ আলোচনা এখন করিব — প্রকাশনের বিষয়।

গ্রন্থরচনা আরম্ভ হয় চতুর্থ দশকের প্রারম্ভে। প্রথম ভাগ 'শ্রীম-দর্শন' রচনার তেইশ বৎসর পর উহা প্রকাশিত হয়। প্রথম ভাগ রচনার পর বহু ভক্ত, বহু বন্ধু এবং বহু শিক্ষিত ব্যক্তিকে প্রকাশক হইবার জন্য অনুরোধ করি। কিন্তু এই ভার লইতে কেহই সম্মত হন নাই। যাহাকে দেখি তাহাকেই বলি — এ যেন এক উৎকণ্ঠা-রোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভূতের সঙ্গী খোঁজার অবস্থা!

একটা ভূত সঙ্গী খুজিতেছিল। যখনই কাহারও মৃত্যু হয় সে গিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু মৃত ব্যক্তি পুনর্জন্ম লাভ করে। সঙ্গী আর মিলে না। কারণ অপঘাত মৃত্যু হইলেই শুধু ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়। বহু কষ্টে শেষে একটি সঙ্গী জুটিল।

'শ্রীম-দর্শন' প্রকাশ করিবার যখন লোক পাইতেছি না, উৎকণ্ঠায় দিন অতিবাহিত হইতেছে, সেই সময় ঠাকুরের কৃপায় একজন প্রকাশককে পাইলাম। আমি যেরূপ সঙ্গীর জন্য ব্যাকুল, সেই প্রকাশকও ঠাকুরের 'শ্রীম-দর্শন' গ্রন্থাবলী প্রকাশনের জন্যও তদ্রূপ আগ্রহান্বিত।

ঘটনাটি এইরূপ। শ্রীমতী ঈশ্বরদেবী গুপ্তা নির্মম রোগে আক্রান্ত হইয়া অমৃতসর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। সুবিখ্যাত চিকিৎসক তাঁহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন। এমন সময় একদিন রাত্রিতে শ্রীশ্রী ঠাকুর স্বপ্নে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলেন বালগোপালের বেশে। ক্রীড়ারত আনন্দময় শিশু যেমন শায়িত মাতৃবক্ষে নানা কৌতুক ক্রীড়া করিয়া থাকে, প্রফুল্ল সরস ও আনন্দমণ্ডিত সেই শিশু বালগোপালও ঠিক সেইরূপ ক্রীড়ারত। এই স্বপ্নদৃশ্যে শ্রীমতী গুপ্তার হৃদয় যখন আনন্দে

উদ্বেল, ঠিক ঐ সময়েই অদৃশ্য এক দৈবী পুরুষের উজ্জ্বল দক্ষিণ হস্ত সেলাইয়ের অভিনয় করিতেছিল। তাহাতে আসন্ন মৃত্যুপথযাত্রী শ্রীমতীর হৃদয়ে জীবনের আশা সঞ্চারিত হইল। হৃদয়ে তিনি উপলব্ধি করিলেন, তাঁহার জীবনরক্ষা হইবে। মৃত্যুর কাল করাল ছায়া দূরীভূত হইয়া আশার ঊষার স্নিগ্ধ বিমল রশ্মিতে হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। চিকিৎসকগণ অকস্মাৎ তাঁহার এই বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। শ্রীমতী গুপ্তা কিন্তু এই সংবাদ কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। কেবলমাত্র নিকট আত্মীয় দুই একজনকে ইঙ্গিতে জানাইলেন, এ শরীর এখন যাইবে না। হৃদয়ে তাঁহার পূর্ব জন্মের সঞ্চিত শুভ সংস্কার ভগবানের কৃপায় জাগ্রত হইল। তিনি মনে মনে প্রভুর নিকট তাঁহার সকৃতজ্ঞ সঙ্কল্প নিবেদন করিলেন — অবশিষ্ট জীবন তাঁহারই সেবায় উৎসর্গিত হইবে, যিনি কৃপা করিয়া আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। ইহা ১৯৬০ সালের প্রারম্ভিক জানুয়ারী মাসের কথা।

শ্রীমতী গুপ্তা তাঁহার বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। তখনও শরীরের অবস্থা মৃতপ্রায়। অচলাবস্থায় সর্বক্ষণ শয্যায় শায়িত। শুধু ভাবিতে লাগিলেন, কি করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় এই শরীর মন লাগাইতে পারিবেন।

মুমুর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে যাইবার সময় দৈবযোগে একজন সাধুর শুভেচ্ছা লাভ করিয়াছিলেন শ্রীমতী গুপ্তা। সাধু তাঁহার কানে কানে বলিয়াছিলেন, আমি ভবিষ্যদবক্তা নই। কিন্তু আমার মন সুপ্রসন্ন। মনের ভিতর হইতে এই আশার বাণী নির্গত হইতেছে, আপনার শরীর যাইবে না, আপনাকে ঠাকুরের কাজ করিতে হইবে। হাসপাতাল হইতে বাড়িতে ফিরিয়া কখনও আশায়, কখনও নিরাশায় তিনি সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন। শয্যায় শয়ন করিয়া কখনও গৃহ, পতি, পুত্র, কন্যা ও আত্মীয়স্বজনের চিন্তাতরঙ্গ মনের উপর দিয়া সমুদ্রতরঙ্গের মত ভাসিয়া যাইতেছিল। কখনও বা স্বপ্নদৃষ্ট জীবনদাতা ঐ অলৌকিক আনন্দময় দেব-বালকের উজ্জ্বল স্মৃতি উজ্জ্বতর রূপ ধারণ করিতে লাগিল। কে এই দৈবী বালক? মঙ্গলময় কোন্ অদৃশ্য পুরুষের মঙ্গলহস্ত সেলাইয়ের সেই অভিনয় করিতেছিল? এইরূপ আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্বে দিন কাটিতেছিল।

সেই সময় পূর্বোল্লিখিত সাধুটি গৃহে আসিলেন শ্রীমতী গুপ্তাকে একবার দেখিবার জন্য। সময়োপযোগী যে সকল ভরসার বাণী তিনি শুনাইতেছিলেন, শ্রীমতী গুপ্তা অতি-ক্ষুধার্ত শিশুর মত সেগুলি যেন গলাধঃকরণ করিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সকল কথামৃত আপনি কোথায় পাইলেন? কোথায় ইহার উৎস? ইহা যে আমাকে এক উজ্জ্বলতর জগতে লইয়া যাইতেছে! নিরাশার দুঃসহ নীড় ধ্বংস করিয়া ইহা আমাকে আশায় উজ্জ্বল এক পবিত্র আলোকের রাজ্যে চালিত করিতেছে!

সাধুটি প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে বলিতেছিলেন, মনুষ্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন, অথবা নিজ স্বরূপের জ্ঞানলাভ করা। মানুষ অমৃতের পুত্র — ইহা বেদের কথা। নিজের স্বরূপের সন্ধান না পাইলে বৃথা জীবনধারণ।

বেদ বলেন, মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে মানুষের পূর্ব পূর্ব জন্মের দুঃখদৈন্যের কথা স্মরণ হয়। আর গর্ভবাসজনিত নিদারুণ কষ্টে জর্জরিত হয়। তাই ব্যাকুল হইয়া শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করে — 'যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যানি ধ্যায়ে ব্রহ্ম সনাতনম্' (গর্ভোপনিষদ্)। ব্যাকুল হইয়া তিনবার প্রার্থনা করে। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মহামায়ার প্রভাবে সব ভুলিয়া যায়। সেজন্য এই বেদের বিধানে মানুষ অন্ততঃ দিনে তিনবার ভগবানকে স্মরণ করিবে এবং প্রার্থনা করিবে যাহাতে মহামায়া ভুলাইয়া না দেন।

গায়ত্রী নির্ঘোষ করিতেছেন, "তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহী।" বিশেষ করিয়া এই কলিকালে সব ভুলাইয়া দেন মহামায়া। তাই নিত্য সাধুসঙ্গের দরকার। সাধুসঙ্গ ছাড়া এই সময় ধর্মলাভ হয় না। গৃহস্থাশ্রমে যাহারা থাকে তাহাদের আরও বেশী দরকার — নিত্য সাধুসঙ্গ, নিত্য প্রার্থনা, নিত্য সন্ধ্যাবন্দনা।

আমাদের এই পৃথিবীতে জন্ম যেন প্রবাস। এখানে কর্ম করিতে আসা। কর্ম ফুরাইলেই 'নিজ নিকেতনে' চলিয়া যাইতে হয়, অর্থাৎ ভগবানের কাছে। সংসারে থাকিতে হয় বড়ঘরের দাসীর মত। দাসী সারাদিন মনিবের ঘরে কাজ করে। কিন্তু, মন থাকে নিজের গ্রামে,

যেখানে তাহার পুত্র কন্যা আছে। কচ্ছপের মত থাকিতে হয় সংসারে। কচ্ছপ থাকে জলে, কিন্তু ডিম পাড়ে আড়ায়। যেখানে নিজ জন, সেখানেই মন।

পরিজনের সকলকে ঈশ্বরবুদ্ধিতে সেবা করিতে হয়। তাহাদিগকে ভালবাসা দেখাইতে হয় — কিন্তু, মনে করিতে হয়, ইহারা আমার কেহ নয়, আমিও ইহাদের কেহ নহি। ঈশ্বরই সকলের আপনার।

শ্রীমতী গুপ্তা এইসকল কথা অতি ব্যাকুলভাবে শুনিতেছিলেন আর সান্ত্বনা লাভ করিতেছিলেন। ভরসার নূতন আলোক হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইতেছিল। তিনি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সকল কথা আপনি কোথায় পাইলেন? সাধু বলিলেন, এই সব কথার উৎস যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব। আমি এই সব কথা শুনিয়াছি তাঁহার অতি বিশিষ্ট গৃহস্থ-সন্ন্যাসী ও অন্তরঙ্গ ভক্ত, মনীষী মহর্ষি শ্রীম-র নিকট। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমে রাখিয়াছিলেন সংসারতপ্ত জীবের শান্তিসুখের জন্য। শ্রীম বহুবার সর্বত্যাগী সন্ন্যাস প্রার্থনা করিলেও জগদম্বা ব্রহ্মশক্তির আদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবশিবের সেবার জন্য তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমেই থাকিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে পূর্ণ সন্ন্যাস। তাঁহার কৃপায় কয়েকশত যুবক সর্বত্যাগরূপ সন্ন্যাস লইতে সমর্থ হইয়াছিল। আর সহস্র গৃহস্থাশ্রমী গৃহস্থ-সন্ন্যাসের ছবি তাঁহার জীবনে প্রতিফলিত দেখিত। সংসারের সব কাজ তিনি করিতেছেন, অথচ মনটি সদা ব্রহ্মলীন। ইহা দেখিয়া তাহারা উদ্দীপিত হইত।

৪

শ্রীমতী গুপ্তা তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি লিপিবদ্ধ আছে? সাধু বলিলেন হাঁ। 'শ্রীম-দর্শন' নামে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। আর দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি আমার সঙ্গে আছে। তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছায় সাধু বাংলা পাণ্ডুলিপি হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন। তিনি শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন। এই অর্ধমৃতাবস্থায় নূতন এক উন্নততর আনন্দময় সুখময় জীবনপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইলেন। সাধুর কাছে অনুরোধ করিলেন, এই পাণ্ডুলিপি আমায় দিন। আমি ইহা প্রকাশ করিব।

বারংবার অনুরোধে সাধু সম্মত হইলেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপি রচিত বাংলায়। শ্রীমতী গুপ্তা সঙ্কল্প করিলেন, বাংলা শিখিবেন। সাধু তাঁহার ইচ্ছা জানিয়া কলিকাতা হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত দুই ভাগ 'বর্ণপরিচয়' আনাইয়া দিলেন। আর ইনিও পিতার নিকট হইতে বাংলা ইংলিশ টিচার চাহিয়া লইলেন। সাধু চলিয়া গেলেন।

এই রোগশয্যায় থাকিয়া দুই মাসের মধ্যেই তিনি নিজের চেষ্টায় বাংলা শিখিয়া লইলেন। আর প্রথম ভাগ 'শ্রীম-দর্শন'-এর হিন্দী অনুবাদ শুইয়া শুইয়াই আরম্ভ করিলেন। অন্যদিকে বাংলা শ্রীম-দর্শনের প্রকাশের ভার লইলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, আমি যেমন ব্যাকুল হইয়া এই ভার লইবার মতো লোকের অন্বেষণ করিতেছিলাম কিন্তু কেহই ভার লইলেন না — তেমনি তিনি এই ভার তাঁহাকে দিবার জন্য বারম্বার ব্যাকুল চিত্তে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সেই প্রারম্ভের পরিণতি শ্রীম-দর্শনের পঞ্চদশ খণ্ডের প্রকাশ।

শ্রীমতী গুপ্তার অনূদিত প্রথম দুই খণ্ড হিন্দী 'শ্রীম-দর্শন' ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। আরও দুই খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত। শ্রীমতী গুপ্তার হিন্দী অনুবাদ হইতে তাঁহার স্বামী প্রিন্সিপ্যাল ধর্মপাল গুপ্তা দুই খণ্ড 'শ্রীম-দর্শন' ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন, 'M. the Apostle and the Evangelist' নামে। কিন্তু সব পুস্তকেরই প্রকাশিকা শ্রীমতী ঈশ্বরদেবী গুপ্তা। তাঁহার এই মহাকার্য দেখিয়া সত্যই মনে হইতেছে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের কাজ নিজেই করাইয়া লন ভক্তগণের দ্বারা, হৃদয়ে প্রেরণা দিয়া। কি আশ্চর্য! রোগাক্রান্তা, অর্ধজীবিতা, অবাঙ্গালী পাঞ্জাবের অধিবাসিনীকে যন্ত্র করিয়া প্রভু কি অদ্ভুত কাজ করিয়াছেন! কৃতজ্ঞতায় তাঁহার চরণে অসংখ্য সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাইতেছি।

ঠাকুরের এই সেবা যেন শ্রীমতী গুপ্তার জীবনের আর মনের মহৌষধ। বিগত চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া ঠাকুরের এই সেবারূপী মহৌষধে তিনি জ্ঞানভক্তিতে উজ্জীবিতা। ইতিহাস আর হিন্দীতে তাঁহার যুগল এম.এ. পড়া সার্থক!

শ্রীমতী গুপ্তার নিকট আমি চিরঋণে আবদ্ধ। মর্মে মর্মে বুঝিতেছি, ভগবানের কৃপা কেবল 'মূকং করোতি বাচালম্, পঙ্গুম্ লঙ্ঘয়তে গিরিম্'

নহে। পরন্তু, মৃতকে সঞ্জীবিত করে, নগন্য তৃণকে আচার্যের রূপ প্রদান করে। সেই কৃপাতেই অলেখক সুলেখক হয়।

মহাগ্রন্থ রচনায় আর প্রকাশনে যে সকল ভক্ত বন্ধুগণ যে কোন ভাবে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট এই লেখকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপিত হইতেছে।

উপসংহারে প্রিন্সিপাল ধর্মপাল গুপ্তাকেও আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বিগত দ্বাদশ বর্ষ তাঁহাদের আবাসস্থল আমার বাসস্থান এবং সেবাকেন্দ্র। তাঁহার মহানুভবতার জন্য আমি ঋণী।

আর একজন ভক্ত বন্ধুর কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস। বাংলা শ্রীম-দর্শনের প্রুফ দেখা হইতে গ্রন্থের অঙ্গরাগাদি যাবতীয় কর্ম করিবার জন্য আমি তাঁহার নিকটও কৃতজ্ঞ। তাঁহার ভিতরও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবেশ করিয়া রোগক্লিষ্ট ভগ্নস্বাস্থ্যেও এইসকল কার্য করাইয়া লইতেছেন।

ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।

এখানে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ইহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়াই মনে করি। ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ১৬ তারিখে হঠাৎ আমি ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হই হোসিয়ারপুরে। সমগ্র মুখের ভিতর — গলা পর্যন্ত, বড় বড় ফোড়া হইতে রক্ত নির্গত হইতেছিল। শরীরের তাপমাত্রা ১০৫°। শিরে নিদারুণ বেদনা। সমগ্র শরীরে যেন অগ্নি জ্বলিতেছিল। বাহ্যচেতনা কখনও একেবারে লুপ্ত, কখনও বা প্রায়-বিলুপ্ত। বিকারগ্রস্ত, মুখে জলবিন্দুও প্রবেশ করে না। জোর করিয়া দিলে মৃত্যুযন্ত্রণা। ডাক্তার ভীত হইলেন।

রাত্রিতে একা। হতচেতন অবস্থা। এক দৈবী স্বপ্ন দেখিলাম, শ্রীশ্রীমা (Holy Mother) তাঁহার বৃদ্ধাবস্থার ছবি নিয়া আমার বিছানার নিকটে পাকা মেঝের উপর দাঁড়াইয়া আছেন উত্তরমুখী। পরনে লাল নরুনপেড়ে ধুতি। মাথায় তাঁহার স্বাভাবিক ঘোমটা। তাঁহার বামদিকে আরও তিনজন সঙ্গিনী ভক্ত মহিলা। আমার শিয়র পূর্বদিকে। শিয়রের উপরের দরজা ছিটকিনীতে আবদ্ধ। স্বপ্নেই মাকে দেখিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম — মা,

তুমি কি করে ঘরে ঢুকলে? আমি যে দরজা বন্ধ করে শুয়েছি। তিনি মৃদু হাস্যে ইঙ্গিতে বলিলেন, (এক) খুব ভুগবে। (দুই) সব ব্যবস্থা হবে। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। স্মৃতিতে রহিল কেবল মায়ের ছবি আর চতুর্থ ভক্ত মহিলা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবি আজ পর্যন্ত স্মৃতিপথে আনিতে পারি নাই। ঐ অবচেতন অবস্থায়ই মনের ভিতর বিচার চলিতেছে — এ কি দৃশ্য? এ কি কেবলমাত্র স্বপ্ন? না, ইহা সত্য? স্বপ্ন তো স্বপ্নই বটে — সে তো মিথ্যা!

রাত্রি প্রভাত হইলে ডাক্তার আসিলেন সকাল বেলায়। পরীক্ষা করিয়া চিন্তিত হইলেন। অনুমান করিলেন, দাঁতের ইনফেকশন! আরও কয়েকজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লইলেন — দন্ত চিকিৎসকেরও। পরামর্শে নিশ্চিত হইলেন, শরীররক্ষা অসম্ভব। চিকিৎসকগণ স্থির করিলেন, এই অবস্থার একমাত্র ঔষধ নব আবিষ্কৃত মাইসিনের প্রয়োগ। ইনজেকশন চলিতে লাগিল।

অপরাহ্ন চারিটায় ডাক্তার পরীক্ষা করিতেছেন। আমার অল্পমাত্র জ্ঞান আছে। চক্ষু মুদ্রিত। শরীর ও মস্তকে দারুণ জ্বালা। ঐ সময়ে একটি হাত আমার কপালে স্থাপিত হইল। শান্তি অনুভব করিলাম। অল্পমাত্র চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম অস্পষ্ট ভাবে, ইহা শ্রীমতী ঈশ্বরদেবী গুপ্তার হস্ত। ঐ যন্ত্রণার ভিতর বিস্মিত হইলাম আমি — এ কি ঘটিল! ইনি যে মায়ের সহচারিণী স্বপ্নদৃষ্টা চতুর্থ ভক্ত মহিলা! শ্রীমতী গুপ্তা আমার অবস্থা দেখিয়া ঐ ঘরেই অপর একটি বিছানায় আসন করিলেন। তিনিও সম্যক্ সুস্থ নহেন। বাইশ দিন সেখানে, সেই ঘরেই অবস্থান করিলেন। অন্য কোথাও না গিয়া আমার সেবায় নিযুক্তা। আহা, কি সেবা! যেন মায়েরই আর একটি রূপ। বাঁচিবার সম্ভাবনা আমার ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। শ্রীমতী গুপ্তা ডাক্তারকে বলিলেন, পেটে কিছু দিন, কেবল ঔষধে শরীর থাকিবে না। এদিকে কণ্ঠে জলবিন্দু প্রবেশ করিলে মৃত্যুযন্ত্রণা বোধ করি। পুনরায় ডাক্তারকে বলিলেন, আপনার হাসপাতালে যেসব এনেস্থেসিয়া আছে সেগুলি আমায় দিন।

তৎক্ষণাৎ উহা আসিল। আমার চিৎকারে কর্ণপাত না করিয়া আঙ্গুলে তুলা জড়াইয়া আমার জিহ্বার উপর তিনবার তিন রকমের এনেস্থেসিয়া

প্রয়োগ করিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষুদ্র একটি বাটিতে প্রচুর ঘৃতাক্ত খিচুড়ী চামচ দিয়া মুখে ঢালিয়া দিলেন। আমার চিৎকারে তিনি বধির। ডাক্তার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্ত ও বন্ধুদের মধ্যেও কেহ কেহ উপস্থিত।

দুই একদিন পরে আবার শরীরের যায় যায় অবস্থা। সেদিনও ডাক্তার ও ভক্তগণ কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। শরীর আর থাকে না। পেট ময়লায় পরিপূর্ণ, দম প্রায় বন্ধ। যন্ত্রণায় চিৎকার করিতেছিলাম। শ্রীমতী গুপ্তা ডাক্তারকে বলিলেন, ডুস্ দিয়া পেট সাফ করুন। ডাক্তার তাহা করিতে রাজী নন্। কারণ, মাইসিনের রোগীর পেট খারাপ হইলে মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু শ্রীমতী গুপ্তা বলিতেছেন, শরীর তো যাবার মুখে — আপনি ডুস্ দিন। শরীর যায়, যাবে।

ডুস্ দেওয়া হইল, প্রথমে কাজ হইল না। তিনি বলিলেন, ক্যাথিডার দিন। দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক সপ্তাহের জমা ময়লা বাহির হইয়া গেল, আমিও তৎক্ষণাৎ সুস্থ বোধ করিলাম। পেটও খারাপ হইল না। বাঁচিয়া গেলাম। কিন্তু শ্রীমতী গুপ্তা অসুস্থ হইয়া শয্যাশায়িনী হইলেন। এইরূপে আরও দুইবার অমৃতসরে ও সোলনে দুষ্ট রোগবৃদ্ধিতে তিনি দূরবর্তী স্থান হইতে (রোহতক ও চণ্ডীগড়) দৈবী প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া আমার শয্যাপাশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এ সবই মায়ের কৃপা। বুঝিলাম, মা আমার শরীররক্ষার জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি মায়ের যন্ত্র। আমি আরও বুঝিলাম যে, আমার কাজের জন্য ঠাকুর শ্রীমতী গুপ্তাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। আর মা তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন আমার শরীর রক্ষার জন্য। মনে জাগ্রত হইল পূজ্যপাদ শ্রীম-র শেষ প্রবোধ — 'বাপমাওয়ালা ছেলের মত থাকবে আনন্দে নিশ্চিন্তে। কি ভাবনা?' আর শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের অভয় বাণী — 'বিশ্বাস করিও, ঠাকুর সর্বদা আপন ভক্তের সঙ্গে থাকেন।' দৈবী কৃপার খেলা বিচিত্র!

শ্রীম দর্শনের পঞ্চদশ ভাগ শ্রীম-র জীবনের বিস্ময়কর বাণী ও তাঁহার অতিমানবীয় আচরণের কথা বহন করে। আর যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ এবং ব্রহ্মশক্তি মা সারদা (Holy Mother), স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ত্যাগী সন্ন্যাসীগণের এবং গৃহস্থ সন্ন্যাসীগণের জীবন-কথাও বহন করে। আর

বহন করে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ-কথামৃতের সরস সুললিত ও সুগভীর ভাষ্য, 'কথামৃতে'র লেখকের দ্বারা। উপনিষদ্ গীতা প্রভৃতি ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্র, এবং বাইবেল কোরাণাদি নবীন ধর্ম্মমতের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের উদার সজীব ও রসময় ভাবসম্মত মনোহর ব্যাখ্যাও ইহা বহন করে। অধিকন্তু, ঠাকুরের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহান ও সুযোগ্য দ্বিতীয় অধ্যক্ষ ব্রহ্মলীন শ্রীশ্রীমহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের দিব্য ও অমূল্য বাণী ও জীবনবেদও হৃদয়ে ধারণ করে এই পঞ্চদশ খণ্ড।

এই পঞ্চদশ খণ্ডের 'প্রেস কপি' তৈরী হয় শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট (শ্রীম ট্রাস্ট) ৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি, চণ্ডীগড় (579, Sector 18-B, Chandigarh) কার্য্যালয়ে।

শ্রীম-দর্শনের পঞ্চদশ কুসুমে গ্রথিত এই মহাগ্রন্থমালা পাঠ করিয়া পাঠকগণ পরমানন্দ, শান্তি ও মহাসুখ লাভ করুন — গ্রন্থকারের এই ঐকান্তিক প্রার্থনা।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশনে যে যে-কোন ভাবে সহায়তা করিয়াছেন, গ্রন্থকার তাঁহাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। অবশেষে একটি সূচনা নিবেদন করিতেছি। শ্রীম ও শ্রীমহাপুরুষের কথার পাণ্ডুলিপির কতকাংশ অপ্রকাশিত রহিয়া গেল স্থানাভাবে। ভবিষ্যতে ঐ সব কথা পূর্বপ্রকাশিত চতুর্দশ খণ্ডের সঙ্গে সংযোজনা করিয়া দিবার ইচ্ছা রহিল। আর একটি বাসনাও অপূর্ণ রহিয়া গেল। সেইটি এই — 'শ্রীম-দর্শন' পঞ্চদশ খণ্ড ও 'কথামৃত' পাঁচ খণ্ড অবলম্বনে শ্রীম-র জীবনচরিত রচনা। উহা ভগবৎ কৃপাসাপেক্ষ।

বিনীত

গ্রন্থকার

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (তুলসী মঠ)।
৩৮, হরিদ্বার রোড, ঋষিকেশ, হিমালয়।
দেবীপক্ষ, ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ।

প্রথম অধ্যায়

দোষে গুণে মানুষ, তবুও সাধু প্রণম্য

মর্টন স্কুল। শীতকাল। এখন সন্ধ্যা সাতটা। শ্রীম চারতলার নিজের ঘরে বসিয়া আছেন বিছানার উপর পশ্চিমাস্য। ছোট নলিনী, বড় অমূল্য ও জগবন্ধু ঐ গৃহে প্রবেশ করিলেন। শ্রীম সস্নেহে বলিলেন, এই নিন। আপনারা এটা খান, শরবতী লেবু। তিনজনে ভাগ করিয়া প্রসাদ পাইলেন। একটি ভক্ত নিচে গিয়া বাটিটা ধুইয়া আনিলেন। এবার শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কি বললেন বক্তৃতায়?

বড় অমূল্য — ভক্তির সম্বন্ধেই বললেন। কিন্তু জ্ঞানযোগের কথায় সন্ন্যাসকে আক্রমণ করেছেন আর সন্ন্যাসী সাধুদের নিন্দা করেছেন। বললেন, কলিতে সন্ন্যাস চলে না। আজকালকার সন্ন্যাসীর আদর্শ নীচু হয়ে গেছে। ভাল ভাল কম্বলের স্তূপের উপর বসে থাকে। উত্তম সোয়েটার গায়ে পরে। এর চাইতে ভক্তিযোগ নিয়ে গৃহস্থাশ্রমে থাকা ভাল। ইত্যাদি।

থিয়জফিক্যাল সোসাইটি। রাধাবিনোদন গোস্বামীর বক্তৃতা। বিষয় ভক্তিযোগ। বড় অমূল্য ও জগবন্ধু ঐ বক্তৃতা শুনিয়া ফিরিয়াছেন।

শ্রীম সন্ন্যাস ও সাধুর উপর আক্রমণ হইয়াছে শুনিয়া উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছেন। বলিতেছেন, বলে কি? কোথায় সাধু আর কোথায় গৃহস্থ! শুনে গা জ্বালা করছে। কোথায় সুমেরু পর্বত আর কোথায় সরষেদানা। কিংবা, যেন সাগর আর গোস্পদে জল। এইটুকুন মাত্র difference (পার্থক্য) — সাধু আর গৃহস্থে। নিন্দে না করে যদি তাঁদের সুখ্যাতি করতেন, কত উপকার হত লোকের। সাধুদের উপর যদি ভক্তি না হয় তা হলে ছাই হবে। সংসারী লোক উপদেশ দিতে গেলেই এই গোল করে। হক কথা বলবার উপায় নাই। তাহলে হয়তো কেউ আসবে না। যদি বলো এ-ও করো, ও-ও করো, তাহলে বেশ।

উনি সাধুদের গুণ দেখতে পেলেন না। এই যে কামিনীকাঞ্চন ছেড়ে

দাঁড়িয়েছেন, এর কি কোনই মূল্য নাই? যে কামিনীকাঞ্চনের কথায় মুখে লাল পড়ে, সাধুরা তা থেকে দুরে সরে দাঁড়িয়েছেন। এতে যে কতো শক্তি তা দেখতে পেলেন না। দেখলেন, কম্বল আর সোয়েটার। শরীরধারণ করতে হবে না? শীতে বস্ত্র দরকার। এ পরলেই সাধুত্ব চলে গেল? বিলাসিতা আর আবশ্যকতা — দু'টি জিনিস। কম্বল সোয়েটার আবশ্যক শরীরধারণের জন্য। তা ছাড়া সকলেই তো অবধূত সাধু নন। তা'তেও স্তর আছে! পোশাক দেখেই বিচার করা চলে কি? তাঁর ভিতরে কত গুণ তা দেখা উচিত।

পিতা-মাতা আত্মীয়-কুটুম্ব সব ছেড়ে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা কি সংসারে থাকতে পারতেন না! তাঁরা কি সংসারকে ফাঁকি দিয়ে এসেছেন! পারে কেউ করতে তা? করুক দেখি সংসারত্যাগ! এক বছর থাকুক দেখি তাদের মতই কম্বল সোয়েটার গায়ে দিয়ে! দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে। মোহে আচ্ছন্ন হয়ে আছে নিজে। অপরের দোষ দেখা? একদিন স্ত্রীপুত্র কন্যা চোখের সামনে না দেখতে পেলে অস্থির হয়ে যায় যে লোক, সেই লোকের মুখে সাধুর নিন্দা! থাক দেখি ভিক্ষা করে এক বছর। দেখবো কেমন বীর! এক পদ খাওয়া কম হলে বাড়িশুদ্ধ তোলপাড়। এইসব লোক যায় সাধুনিন্দা করতে! নিজে কলঙ্কসাগরে ডুবে আছে, আর অপরের কলঙ্ক দেখা। তাইতো ক্রাইস্ট বলেছিলেন, Why doest thou see the mote that is in thy neighbour's eye and seest not the beam that is in thy own eye — অপরের চোখে একটা তুচ্ছ কণামাত্র দেখছ, নিজের চোখের কড়িকাঠ দেখতে পাও না! চালুনি বলে ছুঁচকে, তোর কেন ছেঁদা!

সাধুরা যে সংসারের সুখ নিতে refuse (অস্বীকার) করেছেন এটা কি তাদের গুণ নয়? এর উপরের সুখ চাইছেন, ব্রহ্মানন্দ! সাধু হলেন বলে কি শরীরের needs (আবশ্যক দ্রব্য) নেবেন না? Minimum (সামান্যতম) নিচ্ছেন। তা'তে হয়ে গেল দোষ! ঈশ্বরের জন্য যে সর্বস্ব ছেড়েছেন, সেটা কি গুণ নয়? তার কি benefit (সুবিধা) society (সমাজ) পাচ্ছে না? একটি সাধুকে দেখলে কি মনে হয় না, ইনি ভগবানের জন্য সব ছেড়ে তাঁকে লাভ করবার জন্য প্রস্তুত? ধীরে ধীরে goal (লক্ষ্যে) পৌঁছুবেন। একজন্মে কি সকলের হয় — 'অনেক

জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিং’ (গীতা ৬:৪৫)।

ঠাকুর বলতেন, দু’রকম মাছি আছে। এক রকম গুয়েতে বসে, আবার ফুলেতেও কখনও বসে। আর এক রকম কেবল ফুলেতে বসে। সাধুরা এই শেষ থাকের লোক — মৌমাছি। ফুলের মধু, অর্থাৎ ভগবানের আনন্দরস পান করেন। সংসারী লোক অপর থাকের মাছি। ঠাকুর পায়রার দৃষ্টান্তও দিতেন। সাধুরা পুরুষ পায়রা। ঠোঁটে ঠোঁট লাগালে টেনে নেবে। কিছুতেই ছুঁতে দিবে না। আর এক রকম আছে ঠোঁট লাগালেই একেবারে নেতিয়ে পড়ে। সংসারী লোক এইরকমের লোক। বেদে আছে নচিকেতার উপাখ্যান। কিছুরই বশ নয়। টাকাকড়ি, সুবর্ণ, অশ্বরথ, রাজ্য, সুন্দরী স্ত্রী, কিছুই নেবে না। কেবল চায় ব্রহ্মানন্দ। সাধুদের আদর্শ নচিকেতা — uncompromising (অদম্য) একেবারে uncompromising। যদি বল সাধুরা সকলে তো নচিকেতা নন্, বা শুকদেব। তার উত্তর — গৃহস্থেরাই কি সকলে জনক?

দুই রকম আছে, গুণগ্রাহী আর দোষগ্রাহী। হাঁস গুণগ্রাহী। জলে-দুধে মিশান আছে, দুধ নেবে জল ছেড়ে। আবার শূকর। পাঁচ রকম উত্তম জিনিস রেখে দাও সামনে — পলুয়া হালুয়া ক্ষীর রাবড়ী সন্দেশ — ও সব নেবে না। ঐখানে একটা লোক হাগছে, সে তাই খাবে, গু খাবে। ঐ ব্যক্তি অত খুঁজে তাঁদের গুণ পেল না। সবই দোষ। সংসারী লোক ধর্মবক্তা হলে ঐ রকম হয়। ছি ছি, ও রকম বলতে আছে? সংসারী লোক দাঁড়ায় কোথায়, সাধুর নিন্দা করলে? ঠাকুর বলতেন, নিত্য সাধুসঙ্গ দরকার। সাধুদের ঘড়ি right (ঠিক), সংসারীদের ঘড়ি wrong (ভুল)। তাই নিত্য wrong (ভুল) ঘড়ি right (ঠিক) ঘড়ির সঙ্গে মিলানো দরকার। তবে হুঁশ থাকে, কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। নইলে মনে হয়, আমার হয়ে গেছে। তার আর উন্নতি হবে কি? সর্বত্যাগের আদর্শকে মানতেই হবে, মর্যাদা দিতেই হবে। নইলে বুঝতে হবে নিচে পড়ে গেছে। তা নইলে ঈশ্বর কেন করলেন এই একটি স্বতন্ত্র থাক্? ছি ছি, সাধুর নিন্দা! রাম রাম, এসব লোকের কথা শুনে মানুষ কি লাভ করবে? অনিষ্ট হবে। তার অপকার হবে।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা

৩০শে জানুয়ারী ১৯২৬ খ্রীঃ, ১৬ই মাঘ, ১৩৩২ সাল, শনিবার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৃত্যু পালিয়ে যায় তাঁর দোহাইয়ে

১

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। এখন অপরাহ্ণ চারিটা। একটি সাধু বেলুড় মঠ হইতে আসিয়াছেন। আজ ১২ই নভেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার। শ্রীম বসা চেয়ারে উত্তরাস্য। করজোড়ে প্রণাম করিয়া সাধু বসিলেন সামনে, শতরঞ্জী পাতা জোড়া বেঞ্চির উপর। তিনি প্রথমেই মহাপুরুষ মহারাজের সংবাদ লইতে লাগিলেন।

শ্রীম — হাঁ জগবন্ধু মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ আজকাল কি সব কথা ক'ন? তুমি কি নোট করছ?

সাধু — আজ্ঞে হাঁ। আমি ডায়েরীতে লিখে রাখি।

শ্রীম — কই, তোমার সঙ্গে ডায়েরী আছে?

সাধু — আজ্ঞে হাঁ, আমি আপনাকে শুনাবো বলে এনেছি।

শ্রীম — পড়ুন তো।*

সাধু ডায়েরী পড়িতেছেন।

বেলুড় মঠ। ১৮ই অক্টোবর ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। রাত্রি দুইটা হইতে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত একটি সাধু শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে attend (দেখাশোনা) করেন। কি যন্ত্রণা! নিশ্বাস ফেলিতে যেন প্রাণ যায়। আর্তনাদের স্বর — হুঁ হুঁ হুঁ। সাধুটি ভাবিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরও দুঃখ কষ্টের হাত থেকে পালাবার জো নাই।

শ্রীম — তা আর বলতে। ঠাকুর নিজে বলছেন, 'আমি অবতার'। কিন্তু কি ভোগটিই ভুগলেন প্রায় একবছর (ক্যান্সার)। ঘটি ঘটি রক্ত যাচ্ছে। খেতে পারছেন না কিছু। শুকিয়ে শরীর অস্থিচর্মসার হয়েছে।

কেন তাঁর এই ভোগ? তাঁর কি কর্মফলের ভোগ? নিজে বলেছেন

*সাধারণতঃ শ্রীম 'আপনি' প্রয়োগ করেন। অন্তর্মুখ অবস্থায় 'আপনি' 'তুমি' ভেদ লুপ্ত হয়।

আমি অবতার। সচ্চিদানন্দ এ শরীরে এসেছেন। তাঁর তো জন্ম কর্মফলে হয় নাই। দেখুন না, অবতার নিজে বলছেন। এত ভোগের ভিতরেও 'মা, মা' — অহর্নিশ এই বাণী কণ্ঠে। ভক্তদের অভয় দিয়ে বলছেন, 'তোদের বেশী কিছু করতে হবে না। কেবল আমি কে, আর তোরা কে, এই জানলেই হবে। আমাকে ধ্যান করলেই হবে।' বলেছিলেন, 'মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে — যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। আমার ঐশ্বর্য — জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য শান্তি সুখ ভাব মহাভাব প্রেম সমাধি।'

আর একটা কথা। তবে তাঁর এ ভোগ কেন? এর উত্তর — ভক্তদের কল্যাণের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য। যদি তাই হয় তবে একেও ক্রুসিফিকশান্ (Crucifixion) বলা চলে। ক্রাইস্ট তো এই জন্য, ভক্তের কল্যাণের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য ক্রুসবিদ্ধ হয়েছিলেন। এতে আমরা কি শিক্ষা লাভ করতে পারি? না, এই শরীর থাকলে সুখ দুঃখ থাকবেই। অবতারও বাদ পড়েন না। কিন্তু এরই ভেতর পরম সুখের, ভগবানদর্শনের চেষ্টা করতে হবে। এই শিক্ষা দেবার জন্য পলে পলে তিলে তিলে নিজে একদিকে যেমন ভুগলেন, অন্যদিকে তেমনি মুহুর্মুহু সমাধি। এ দু'টি extreme (চরম সীমা) — অত্যন্ত ভোগ ও অত্যন্ত ভোগনিবৃত্তি বস্তু কি, তা দেখালেন। তবে তো ভক্তগণ সুখদুঃখের আবর্তে উদ্বেলিত হয়েও পরমসুখ যে ভগবান, তাঁকে ধরে থাকতে চেষ্টা করবে।

ডায়েরীর পাঠ চলিতেছে।

তার পরদিন ১৯শে অক্টোবর ১৯২৯, শনিবার। সকাল সাড়ে ছয়টা। গত রাত্রে অত কষ্ট, কিন্তু সকালে প্রণামের সময় সোজা হইয়া বসিয়া কথা কহিতেছেন হাসিমুখে — যেন কিছুই হয় নাই। সাধুরা একে একে আসিয়া প্রণাম করিতেছেন। মহাপুরুষ মহারাজ সকলেরই কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন সহাস্যে। সাধুটি ভাবিতেছেন, বাবা, এ যেন বহুরূপীর জাত — ব্রহ্মজ্ঞগণ। গতরাত্রে কত যন্ত্রণা — সকালে যেন কিছুই হয় নাই ভাব। একেই বুঝি বিদেহী বলে।

শ্রীম — তাই তো ঈশ্বরের শক্তি না হলে প্রচারকার্য চলে না। অবতারে যেমন দু'টি ভাব — অত্যন্ত দুঃখ ও অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি —

প্রায় একই সময়, তাঁর পার্ষদদেরও প্রায় তদ্রূপ। তাই ঈশ্বরশক্তির অবতরণ জগতে — balance (সমতা) রাখবার জন্য।

(পাঠকের প্রতি) — হ্যাঁ, পড়ুন তো।

পাঠক ডায়েরী পড়িতেছেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দ আসিয়াছেন মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করিতে সারগাছি আশ্রম হইতে। তিনিও ঠাকুরের অন্যতম অন্তরঙ্গ ভক্ত। তাঁহার সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হইতেছে। পাশে সাধুটি দাঁড়ান। মহাপুরুষ মহারাজ (সাধুকে লক্ষ্য করিয়া) বলিলেন, এ আগে মাস্টার মশায়ের কাছে ছিল। তারপর মাদ্রাজে পাঠান হয়েছিল। অনেকদিন ছিল। আবার উটিতেও ছিল। ওরা এনেছে — ঢাকায়, না কোথায় পাঠাবে। (সাধুর প্রতি) কোথায়? সাধু বলিলেন, লক্ষ্ণৌ। মহাপুরুষ বুঝিতে পারিলেন না। আবার সাধু জোরে বলিলেন, লক্ষ্ণৌ। মহাপুরুষ বলিলেন, ঢাকায় না? সাধু বলিলেন, আজ্ঞে না, লক্ষ্ণৌ।

পাঠ চলিতেছে।

আজ ২১শে অক্টোবর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ। সকাল সাড়ে ছয়টা। বেলুড় মঠ। উপরের বারান্দা। শ্রীমহাপুরুষ বসিয়া আছেন চেয়ারে, ছোট ঘরের দরজার পাশে। সামনে গঙ্গা। ডান হাতে স্বামীজীর ঘর। স্বামীজীর ঘরের উত্তরের দরজা দিয়া ও দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়া নিচে চন্দন গাছ দেখা যাইতেছে। মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া সাধুরা চলিয়া যাইতেছেন। স্বামী শাশ্বতানন্দ, আমেরিকান প্রশান্ত ও জগবন্ধু দাঁড়াইয়া আছেন পাশে। মহাপুরুষ সহাস্যে বলিতেছেন, কতকগুলি butterfly (প্রজাপতি) ওখানে বেড়াচ্ছে — ভারি romantic (ভাবপ্রবণ) — ঐ চন্দনগাছে। ওরা যেখানে ভাল গন্ধ, যেখানে যা ভাল দেখবে সেখানেই যাবে। চন্দনের ফুল ভারি সুগন্ধ। তাই ওখান থেকে নড়বে না (হাস্য)। এই বলিয়া মহাপুরুষ মহারাজ তাহাদের কথায় খুব আনন্দ করিতে লাগিলেন।

শ্রীম — এই রকম মানুষ সংসারে আবদ্ধ হয় বিষয়ে — স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ধন, নামযশ — এ সবে। কিন্তু তাঁকে ধরে সংসার করলে ভয় নেই ততটা, ঠাকুর বলতেন। কিন্তু মহামায়া সব ভুলিয়া দেয়। তাই ঠাকুর উপায়ও বলে গেছেন, নিত্য সাধুসঙ্গ চাই। ভক্তি লাভ করে সংসার করলেই অনেকটা রক্ষে।

২

সাধু আবার ডায়েরী-পাঠ করিতেছেন।

২২শে অক্টোবর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার। বিকাল তিনটা। শ্রীমহাপুরুষ নিজের ঘরে বসিয়াছেন দোরগোড়ায় ইজি-চেয়ারে। সামনে মেঝেতে বসা দেরাদুনের স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, দাড়িওয়ালা বাইরের একজন ভক্ত সাধু আর একজন লোকও আছে। একটি সাধু সিঁড়ির পাশে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ অপর লোকদের বলিতেছেন, তিনি অন্তরাত্মা। তাঁর যদি একই আভাস হৃদয়ে হয়ে যায় তবে জ্ঞান ভক্তি সব আপনিই আসে। একটি লোক বলিতেছে, একটি ছাব্বিশ বছরের যুবকের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন — বা, তা হলেই তো হলো।

পরদিন বুধবার, ২৩শে অক্টোবর। সকাল ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ আজ নিজের খাটে বসা উত্তর দিকে, পশ্চিমাস্য। গায়ে গেঞ্জি। তাহার উপর লাল জরিদার মাদ্রাজী গেরুয়া চাদর জড়ান। সামনে গড়গড়া, সোনালী নল দিয়া তামাক খাইতেছেন। মন অন্তর্মুখীন। সেবক পাশে দাঁড়ান। কয়েকবার হুঁকায় টান দিয়া বলিতেছেন আপন মনে, শ্রীগুরু শ্রীগুরু শ্রীগুরু। খানিক বাদে আবার বলিতেছেন, সচ্চিদানন্দ। মন কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। যন্ত্রের মত হুঁকার নলে মুখ লগ্ন। একটি সাধু মেঝেতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীমহাপুরুষের মন নিচে নামিয়া আসিল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ভাল আছ? কি করুণামাখা স্বর! মনটি বুঝি ঐ সচ্চিদানন্দ-রসে রসালো। তাই কি এই মাধুর্য, এই করুণা? কথা তো দুইটি — কিন্তু ঐ দুইটি কথাই যেন ভাসিয়া আসিতেছে রসসাগরের ভিতর হইতে।

শ্রীম — তা আর বলতে!

পাঠ চলিতেছে।

আজ ২৪শে অক্টোবর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। সকাল সওয়া ছয়টা। বেলুড় মঠের উপরের বারান্দা। শ্রীমহাপুরুষ টলিতে টলিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন মধ্যখানে। রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিয়া গঙ্গাদর্শন করিতেছেন। পতিতপাবনী সম্মুখে প্রবাহিতা। মহাপুরুষের গায়ে বুককাটা গেঞ্জি। চারটি বোতাম লাগান। গলায় জড়ান লাল জরিদার মাদ্রাজী গেরুয়া চাদর। একটি সাধু গঙ্গা স্পর্শ করিয়া উপরে উঠিতেছেন। সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া দর্শন

করিলেন মহাপুরুষ মহারাজকে। স্বামী ওঁকারানন্দ দাঁতন করিতেছেন পোস্তায় দাঁড়াইয়া।

এখন সাড়ে ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষের নিজের ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন ইজি-চেয়ারে দরজার পাশে। মহাপুরুষের পিছনে বন্ধ দরজা অন্য ঘরের। উত্তরে খাট। মহাপুরুষের ঘরে দক্ষিণে একটি বড় ট্রাঙ্ক। তাহার উপরে কাপড়চোপড়, সব নূতন। ট্রাঙ্কের পশ্চিমে, ঘরে প্রবেশের দরজা। দরজার পশ্চিম পাশেও ট্রাঙ্কের উপর কাপড়চোপড়। তাহার পশ্চিমে টেবিল। তাহার উপর একটি স্টোভ, কয়েকটা ডালিম ও খাদ্য দ্রব্য, ঔষধাদি রহিয়াছে। সাধুরা সব প্রণাম করিতে আসিতেছেন। স্বামী ওঁকারানন্দ আসিয়া প্রণাম করিয়া প্রবেশ-দরজার পূর্বপাশে দাঁড়াইলেন, মহাপুরুষ মহারাজের বাঁ হাতে। স্বামী গঙ্গেশানন্দ শ্রীমহাপুরুষের সেক্রেটারী। তিনি দাঁড়াইয়াছেন ঘরের ভিতর দক্ষিণ-পশ্চিম জানালার সামনে। একটি সাধু আসিয়া হঠাৎ প্রণাম করিতেছেন ভূমিষ্ঠ হইয়া। মহাপুরুষ মহারাজ প্রথমে তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? ওঁকারানন্দ বলিলেন, আনন্দ। সাধু প্রণাম করিয়া উঠিতেই সহাস্যে বলিতেছেন, ওর মাথাটার formation (আকৃতি) একটু অন্য রকম। স্বামী ওঁকারানন্দ বলিলেন, আজ্ঞে হাঁ। এতক্ষণে সাধু উঠিয়া গিয়া দরজার বাহিরে পশ্চিম দিকে দাঁড়াইলেন, ওঁকারানন্দের বিপরীত দিকে। মহাপুরুষ আবার বলিলেন, আমরা বলি 'তে-এইটে'। সকলে নীরব।

সাধুটি কি ভাবিলেন, হয়তো খারাপ লক্ষণ। আবার কি ভাবিলেন, তা হলেই বা, তাঁর ছেলে বটে তো। আর তাঁর পরম-মঙ্গলময় দৃষ্টি পড়েছে তো। ছেলেকে তো বাবা ছাড়তে পারবেন না। আর যখন দৃষ্টি পড়েছে তখন সকল অমঙ্গল দূর হল। সাধুটি কি এইরূপ ভাবিতেছেন? শ্রীমহাপুরুষ সস্নেহে বলিলেন — বাবা, ভাল আছ? কথায় যেন অমৃত ঝরে। সাধুর হৃদয় প্রেমপূর্ণ। সাধুর মনে কষ্ট না হয় তাই-বুঝি এই অমৃতবর্ষণ।

স্বামী শর্বানন্দ ও নির্বাণানন্দ আসিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহারা গিয়া দাঁড়াইলেন ঘরের ভিতর। তাঁহাদের পিছনে দেয়াল। শর্বানন্দ বলিলেন, বরানগর অরফানেজে ক্লাস হবে worker-দের (কর্মীদের) ভিতর। অদ্বৈতের পশুপতি (স্বামী বিজয়ানন্দ) নেবে জেনারেল ক্লাস। আর মাদ্রাজের

সুরেশ (স্বামী শাশ্বতানন্দ) নেবে শাঙ্কর ভাষ্য গীতা।

শ্রীমহাপুরুষ — শঙ্করভাষ্য কে বুঝবে? তবে মূলটা পড়লে ভক্তি, কর্ম, এগুলি clear (স্পষ্ট) হয়।

শর্বানন্দ — আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীমহাপুরুষ — এই controversy (বাদানুবাদ) পড়ে কি হয়?

খানিক নীরবতার পর মহাপুরুষ আবার কথা কহিতেছেন, বেদান্তভাষ্য দিল্লীকা লাড্ডু। ছেলেবেলা মনে করতুম, বুঝি না পড়লে নয়। পড়া গেল। এখন দেখছি ধোঁকার টাটি।

একশ' ভাষ্য-টীকাতেও যা clear (স্পষ্ট) না হয়েছে তা তাঁর (ঠাকুরের) এক একটা কথায় হয়ে গেছে। (খানিক নীরবতার পর) 'সব এঁটো হয়েছে, ব্রহ্ম এঁটো হয় নাই', এই একটি কথা — কি সুন্দর!

শর্বানন্দ — একটা intellectual (জ্ঞানের) বাসনা থাকে। শাস্ত্র পড়ায় এটা শেষ হয়ে যায়। বৃহদারণ্যকে আছে — 'পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্বিদ্য বাল্যে তিষ্ঠাসীৎ', পড়ে শুনে শেষে বালক হয়ে যায়।

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ, সব সময় তো আর (চোখ বুজার অভিনয় করিয়া) চোখ বুজে থাকতে পারে না। কিই বা করে?

স্বামী ওঁকারানন্দের গায়ে একটা ছেঁড়া পাঞ্জাবী। তাই শ্রীমহাপুরুষ তাঁহাকে একটা নূতন জামা করিতে বলিতেছেন। স্নেহভরে বলিতেছেন, জামাটা ছিঁড়ে গেছে। আর একটা নূতন জামা করিয়ে ন্যাও। এখান থেকেই খরচা দেওয়া হবে।

স্বামী শর্বানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন — মহারাজ, আপনার শরীর কিরূপ? শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, ভালয় মন্দয় চলে যাচ্ছে। কার্তিক মাসের হিম বড় খারাপ। কিছুদিন পর একটু পাকলে তখন এতো অসুখ করবে না। এখন যে হিম লাগাবে ধড়াস ধড়াস করে পড়ে যাবে। এখনকার রোদ তত খারাপ নয়, হেমন্তের রোদ।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের জলখাবার আসায় সকলে বাহির হইয়া গেলেন।

অপরাহ্ন পৌনে ছয়টা।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ পাশের ছোট ঘরে স্বামী গঙ্গেশানন্দের খাটে বসিয়া জলযোগ করিতেছেন।

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

আজ ২৫শে অক্টোবর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। গঙ্গার দিকের উপরের বারান্দা। স্বামী অখণ্ডানন্দ ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন স্বামীজীর ঘরের পাশে উত্তরাস্য। স্বামী নির্বাণানন্দ ইজি-চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামী শর্বানন্দ গঙ্গার দিকের রেলিং-এ পিছন দিয়া পশ্চিমাস্য দাঁড়ান। জগবন্ধু প্যাসেজের (পথের) মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। ইনি স্বামীজীর ঘরের সেবক। শ্রীমহাপুরুষ বারান্দায় উত্তর-দক্ষিণে বেড়াইতেছেন টলিতে টলিতে। কখনও ইজি-চেয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলিতেছেন। গায়ে কটা রঙ্গের ফ্লানেলের জামা। পরিব্রাজক অবস্থায় যেরূপ কথাবার্তা হইত ঐরূপ কথা দুই চারিটা হইতেছে। আর উভয়ে হাসিতেছেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ বলিতেছেন, আমাদের মধ্যে ইনি — দাদাই, বেশ ভাল হিন্দী বলতে পারতেন।

ডায়েরী পাঠ আজের মত শেষ হইল। সাধু মিষ্টিমুখের পর শ্রীমকে প্রণাম করিয়া বেলুড় মঠে চলিয়া গেলেন।

৩

মর্টন স্কুল। চারতলা, সিঁড়ির ঘর। ১৩ই নভেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার। শ্রীম চেয়ারে উত্তরাস্য বসা। এখন রাত্রি সাতটা, সম্মুখে যুগ্ম বেঞ্চিতে বসা সীতাপতি মহারাজ ও জগবন্ধু মহারাজ। জগবন্ধু মহারাজ বেলুড় মঠ হইতে আসিয়াছেন। অনেক ভক্তের সমাগম হইয়াছে, দুর্গাপদ মিত্রও (হিলিং বাম) আসিয়াছেন। ঈশ্বরীয় কথা চলিতেছে।

একজন ভক্ত (শ্রীম-র প্রতি) — ঠাকুর বলেছেন, নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করবে। আমরা দশজন নিয়ে থাকি। শহরে নির্জনতা পাব কোথায়?

শ্রীম (সহাস্যে) — হ্যাঁ। স্বামীজী তাঁর 'প্রলয় সমাধি'তে বলেছেন, 'ধীরে ধীরে ছায়াদল মহালয়ে প্রবেশিল'। তখন বহে মাত্র 'আমি আমি'। তারপর বলছেন, 'সে ধারাও বদ্ধ হলো, শূন্যে শূন্য মিশাইল — অবাংমনসোগোচরং বোঝে প্রাণ, বোঝে যার।' সত্যিকার নির্জনতা ঐ জায়গায় - প্রলয় সমাধিতে। এর পূর্বে ঠিক ঠিক নির্জনতা নাই। তবে ঐ

নির্জনতার অধিকারী ক'জন? Relative (আপেক্ষিক) নির্জনতার কথাই ঠাকুর বলছেন। রাত দু'টোর সময় তো নির্জন! তখন করে না কেন? তখন কেবল ভোঁস ভোঁস করে ঘুমায়। বাবুরা complain (অভিযোগ) করে কি করে? আশ্চর্য! ঢিমে তেতালার কাজ নয়। সশস্ত্র সৈনিকের মত হবে। সর্বদা সঙ্গীন চড়িয়ে আছে — কখন শত্রু আসে কোন দিক থেকে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রাত কাটান, আর আবোল তাবোল করে দিন কাটান। তা করলে হবে কি করে? এরই ভেতর সব করতে হবে। একটা life-এ (জীবনে) দশটা life-এর (জীবনের) কাজ করতে হবে। তবে হয়। লক্ষ্মণ বার বছর ঘুমোন নাই, ফলমূল আহার আর অটুট ব্রহ্মচর্য! তবে অত বড় কাজ হয়েছে মেঘনাদবধ, রাবণবধ। ভক্তদের আবার অবসরের অভাব কোথায়? সারা দিন রাত পড়ে আছে। রাত্রিটার utilize (সদ্ব্যবহার) করতে পারে। ঠাকুর ভক্তদের বলে দিতেন, রাত তিনটায় উঠে ধ্যান করবে। দিনে কাজ করতে হয় কি না! Be up and doing (উঠে পড়ে লাগো)। Warfield-এ (রণাঙ্গনে) দাঁড়িয়ে আছে। এ সময় অবসর কোথায় ঘুমুবার? চার দিকে শত্রু। অন্তরে বাইরে শত্রু। ঘোর নিষ্ঠুর রিপু শিয়রে দাঁড়িয়ে। ওঠ, ওঠ, তাঁর দোহাই দিয়ে অস্ত্রধারণ কর। তবে শত্রু পালাবে। মৃত্যু পর্যন্ত পালিয়ে যায় তাঁর দোহাই দিলে! প্রার্থনা আর শরণাগতি — এই উপায়। খালি কেঁদে কেঁদে বল — মা রক্ষা কর, রক্ষা কর মা!

সীতাপতি মহারাজ — দিনে কাজ, রাতে ভজন — মানুষ তবে ঘুমোয় কখন?

শ্রীম — (সহাস্য) — হ্যাঁ, ঐ একটা puzzling question (গোলমেলে প্রশ্ন) বটে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একটু ভাগবত পাঠ করলে হয়। রাসের দুই একদিন বাকী আছে। রাসপঞ্চাধ্যায় পড়া হোক।

একজন ভক্ত পড়িতেছেন। প্রথম তিনটা অধ্যায় পড়া হইতেছে (২৯:৩১)। পাঠক অধ্যায়ের নাম পড়েন নাই এবং শেষও পড়েন নাই। তাই শ্রীম বলছেন — ও পড়বে। ওগুলি হলো mile stone (ধারাবাহিক ধাপ)। একত্রিশ অধ্যায়, গোপীগীতা। তাহার পাঠ চলিতেছে। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান হইলে তাঁহার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া গুণকীর্তন

করিতেছেন। পাঠক পড়িতেছেন —

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।

শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভুরিদা জনাঃ॥

শ্রীম একেবারে স্থির। নয়ন অপলক, মুখমণ্ডল আরক্তিম, নয়নকোণ বহিয়া প্রেমাশ্রু নির্গত হইতেছে।

ভগবানের কথামৃত যে সংসারতপ্ত জীবগণের প্রাণদাতা, ইহা শ্রীম-র নিজের অনুভব। নিজে নূতন জীবন লাভ করিয়াছেন ঠাকুরের কথামৃত শ্রবণে। সারাজীবন ধরিয়া অপরকেও এই কথামৃত তিনি বর্ষণ করিয়াছেন অকাতরে। তাই স্বরচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে'র প্রারম্ভেই এই মহামন্ত্র পাঠের বিধি করিয়াছেন।

উপস্থিত শ্রোতাগণের ভিতর একজন বয়োবৃদ্ধ সমালোচক আছেন। গোপীগণের আচরণ সমাজধর্ম বিগর্হিত—পাছে ভক্তের মনে এই ভাব উদয় হয়, তাই শ্রীম নিজেই ঐ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধান করিতেছেন।

শ্রীম ঐ ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন অতি মধুর কণ্ঠে, ওতে criticise (সমালোচনা) করা চলবে না — যেকালে আমাদের superior-রা (গুরুগণ) বলে গেছেন উহা সত্য — চৈতন্যদেব, ঠাকুর এঁরা। চৈতন্যদেবের life-টিই (জীবনটিই) হলো রাসলীলার key (ভাষ্য)। অনন্ত প্রেমসমুদ্রের কতকগুলি বৃহৎ বুদবুদ্ গোপীগণ। শ্রীরাধা তাঁদের ভিতর বড়। দেহবুদ্ধি থাকলে এ লীলা বোঝা যায় না। চৈতন্যদেব শ্রীরাধার ভাবে শেষ বার বছর কাটিয়েছেন — মহাভাবে। ঠাকুরের এই মহাভাব মুহুর্মুহুঃ হত। ব্রাহ্মণী প্রথম উহা ধরেন। তাই সভা করে প্রচার করেন, ঠাকুর অবতার। গোপীদের নাম হলেই ঠাকুর মাথা নিচু করে প্রণাম করতেন। বলতেন, গোপীগণের প্রেমের এককণা কারো হলে হেউ ঢেউ হয়ে যায়। উপনিষদে আছে, দণ্ডকারণ্যের ঋষিগণই গোপী হয়েছিলেন। এসব প্রেমলীলা বোঝা বাবুদের কর্ম নয়। ভগবানের কৃপায় যদি মনটি একেবারে শুদ্ধ পবিত্র হয়, সম্পূর্ণরূপ কামগন্ধহীন হয়, তবে এর আভাস পাওয়া যায়।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।

১৩ই নভেম্বর ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার।

তৃতীয় অধ্যায়

ঠাকুর জীবন্ত, সত্যই জীবন্ত

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। এখন অপরাহ্ন পাঁচটা। আজ ২৯শে নভেম্বর, ১৯২৯ ক্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। ভক্তরা ছাদে বসিয়া আছেন। শ্রীম ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া ধ্যান করিতেছেন। বেলুড় মঠ হইতে জগবন্ধু মহারাজ আসিয়াছেন। তিনিও শ্রীম-র জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। পৌনে ছয়টায় শ্রীম ছাদে আসিলেন। কিছুক্ষণ কথা কহিয়া আবার গৃহে প্রবেশ করিয়া ধ্যান করিতেছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে। সাড়ে ছয়টায় আবার বাহিরে আসিলেন। সিঁড়ির ঘরে বসিয়াছেন। শরীর তত ভাল নয়। চেয়ারে উত্তরাস্য বসিয়াই কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (তর্জনী দিয়া গোল করিয়া বৃত্ত আঁকিয়া) — wonderful (চমৎকার) এই সৃষ্টিটা।

বালিশ ভাসছে সমুদ্রে। ভিতরেও নোনা জল, বাইরেও!

কিন্তু, এই dunghill (গোবরের গাদা) থেকেই lotus flower (পদ্মফুল) ফোটে।

আজ আর বেশী কথা কহিলেন না। বলিলেন, অধ্যাত্ম (রামায়ণ) পড়া হোক। উত্তর কাণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায় পাঠ হইল।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি) — ডায়েরী এনেছেন?

জগবন্ধু — আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীম — পড়ুন তো গত দিনের বিবরণ।

জগবন্ধু পড়িতেছেন।

বেলুড় মঠ। সকাল সাতটা। আজ রাসপূর্ণিমা ১৬ই নভেম্বর ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার। ৩০শে কার্তিক, ১৩৩৫ সাল।

মঠাধ্যক্ষ মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ আপন দ্বিতল কক্ষ হইতে দক্ষিণ দরজা দিয়া বাহির হইলেন। দীর্ঘাকৃতি পুরুষ, মুণ্ডিত মস্তক। গায়ে একটা

লম্বাহাতা গরম গেঞ্জি। বয়স পঁচাত্তর। ইদানীং কিছুকাল হইতে একটু হাঁফানির ভাব দেখা দিয়াছে। চলিবার সময় শরীরটা সম্মুখে একটু হেলিয়া পড়ে। লাল ভেলভেটের চটি পায়ে — ছেঁচড়াইয়া চলিতেছেন। বাম হাতে খোকামহারাজের ঘর। ডান হাতে সিঁড়ির গায়ের রেলিং।

সিঁড়ির দক্ষিণের ঘর হইতে বাহির হইলেন মঠের উপাধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দ। ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছি আশ্রমে থাকেন। ইনিই উহার প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি দীর্ঘকাল ওখানে রহিয়াছেন। মাঝে মাঝে মঠ ও কলিকাতায় আসেন। এখন কয়দিন মঠে আছেন, মঠগৃহের দক্ষিণের কক্ষে বাস করিতেছেন। ইনি আপন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন 'দাদা' মহাপুরুষ ধীরে ধীরে এদিকে আসিতেছেন। তাই সিঁড়ির উপরের চাতালে গঙ্গার দিকের বারান্দায় সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। উভয় গুরুভ্রাতারই সহাস্য বদন।

শ্রীমহাপুরুষ সহাস্যে আনন্দের সহিত বলিলেন, ওঁ নমো নারায়ণায় — বালস্বামী নমো নারায়ণায়। স্বামী অখণ্ডানন্দ বয়সে কনিষ্ঠ। তিনি যুক্তকরে মৌন প্রতি-নমস্কার করিলেন। গুরুভ্রাতাগণ স্বামী অখণ্ডানন্দকে বয়স কম বলিয়া যৌবনাবস্থা হইতেই আহ্লাদ করিয়া 'বালস্বামী' বলিতেন। ইনি আবার বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও পরিব্রাজকজীবনে সকল গুরুভ্রাতার জ্যেষ্ঠ। অতি অল্প বয়সে ইনি তিব্বত ভ্রমণ করেন।

শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, আজ গোবিন্দের রাস। স্বামী অখণ্ডানন্দ বলিলেন, তা হলে আজ যাব না। শ্রীমহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায়? স্বামী অখণ্ডানন্দ উত্তর করিলেন, কলকাতায় জামার মাপ দিতে।

দুই গুরুভ্রাতা শ্রীমহাপুরুষের ঘরে উপবিষ্ট। ঘরটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বমান। তিনটি দরজা। পূর্বের দরজা দিয়া গেলে 'শ্রীমহারাজে'র (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) ঘরে যাওয়া যায়। তারপর গঙ্গার সামনেই বারান্দা — সম্মুখে পতিতপাবনী জাহ্নবী। উত্তরের দরজা দিয়া ছাদে যায়। আজ দক্ষিণের দরজা দিয়াই সকলে গৃহে প্রবেশ করেন। ঘরটি উত্তর-পশ্চিম কোণে। দক্ষিণের দরজার পশ্চিম দিকে একটি জানালা। তাহার সামনে একটি টেবিল। তাহাতে থাকে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি। পশ্চিমের দেয়ালে আছে দুইটি জানালা। উত্তরের জানালাটি দিয়া শ্রীমহাপুরুষ শ্রীশ্রী ঠাকুরঘর

দর্শন করেন বিছানায় বসিয়া। দুই জানালার মাঝে দেয়ালের গায়ে একটি টেবিল আছে। তাহাতে পুস্তক, চিঠিপত্র লিখিবার সরঞ্জাম থাকে। উত্তর দেয়ালের গায়ে আলমারী। তাহাতেও পুস্তক, কাপড় চোপড়। লিখিবার টেবিলের সামনে একটি চেয়ার। তাহাতে মহাপুরুষ বসেন দক্ষিণাস্য। কেহ আসিলে এখানে বসিয়া কথা বলেন। এই চেয়ারের বাম দিকে পূর্ব দেয়াল। তাহার পশ্চিম পাশে শয়নখাট। তাহাতে মশারী খাটাইবার জন্য চারিটি ডাণ্ডা লাগান। ডাণ্ডার মাথায় চারিটি কাষ্ঠের একটি সংযুক্ত ফ্রেম। মহাপুরুষের ঘরের উত্তর দিকে একটি কাঠের ছোট সিঁড়ি আছে — দুই ফুট হইবে। উহা বাহিয়া ছাদে যান। ছাদের উত্তর পার্শ্বে বাথরুম। দক্ষিণের দরজার বাম পাশে একটি ইজি চেয়ার। তাহাতে কালো কুশান। দরজার বাইরে ডান হাতে একটি মিটসেফ। তাহাতে মিষ্টান্নাদি থকে। কেহ আসিলে প্রসাদ দেওয়া হয়। তাহার পাশেই হুঁকা কলিকা চিমটা প্রভৃতি তামাকের সরঞ্জাম। শ্রীমহাপুরুষ তামাক সেবন করেন।

গৃহমধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দ ইজি-চেয়ারে বসা, পশ্চিমাস্য। আর শ্রীমহাপুরুষ বসিয়া আছেন টেবিলের সামনে চেয়ারে, দক্ষিণাস্য। সাধুরা কেহ ঘরে, কেহ বা বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামী ধ্রুবেশ্বরানন্দ মহাপুরুষের খাটের ডাণ্ডা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন উত্তর দিকে। স্বামী অখণ্ডানন্দ মহাপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া স্বামী ধ্রুবেশ্বরানন্দের সহিত কথা কহিতেছেন।

অখণ্ডানন্দ — চল, তুমি হোমিওপ্যাথিক জান। কত কাজ হবে। তা যেতে চায় না। ধরি মাছ না ছুঁই পানি — এই ভাব। মঠে রয়েছে, যতদিন ভাল লাগে থাকবে। নয়তো চলে যাবে। আরে, ও-ও তপস্যা। স্বামীজী বলেছেন, 'জলে ঝাঁপ দেবে, আগুনে পুড়বে।' মানুষের শরীর ধরে ভগবান আসেন। মানুষে তাঁর বেশী প্রকাশ। মানুষেই এবার তাঁর পূজা হবে ভাল।

মন না বসলেই ঘোরে। গুরুবাক্যও মানতে চায় না। মহিমানন্দও আর একজন আছে। হরি মহারাজের দেহ যাবার সময় দেখলাম পঞ্চক্রোশ কাশী ছেড়ে কোথাও যাবে না, যদি হয়ে যায়।

মহাপুরুষ — এবার এসেছিল। তা সেই ভাব অনেকটা কমেছে। এখন অনেক wide view (উদার ভাব) হয়েছে। ঠাকুরের ওপর যাদের

বিশ্বাস ভক্তি হয়েছে, তাদের আবার সঙ্কীর্ণতা কেন? যেখানেই থাকুক তারা নিশ্চিন্ত।

আজ শ্রীকৃষ্ণের রাস। 'জয় গোবিন্দ, জয় ব্রজবন্ধু' বলিয়া সুর করিয়া হাততালি দিয়া গান গাহিতে লাগিলেন।

শ্রীম স্থির হইয়া ডায়েরী পাঠ শুনিতেছেন। আর মাঝে মাঝে বলিতেছেন, আহা কি অমৃত পরিবেশন করলেন আপনি! সব যেন বৈকুণ্ঠের সংবাদ।

২

পাঠক ডায়েরী পাঠ করিতেছেন।

আজ ২১শে নভেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার।

বেলুড় মঠ। এখন সন্ধ্যা পৌনে ছয়টা। দোতলার বারান্দা। শ্রীমহাপুরুষ, স্বামী শিবানন্দ চেয়ারে বসিয়া আছেন। গঙ্গা দর্শন করিতেছেন। অল্প শীত পড়িয়াছে। শরীর একটি র‍্যাপারে ঢাকা। অন্তর্মুখীন ভাব। একজন সাধু সেবক একটা গামছা দিয়া মাঝে মাঝে মশা তাড়াইতেছেন। বেশ প্রশান্ত গম্ভীর দর্শন। মুখমণ্ডলে করুণার ছাপ।

খোকা মহারাজের ঘরের বাহিরে দক্ষিণ দিকে বসা। তাহার দক্ষিণে বারান্দায় আসিবার রাস্তা। তাহার দক্ষিণে স্বামীজীর ঘর।

একটি যুবক ভক্তের প্রবেশ। ভক্ত প্রণাম করিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছেন। আর করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছেন, আপনি আশীর্বাদ করুন — আমার জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস লাভ হোক, বিবেক বৈরাগ্য লাভ হোক। স্বামীজী যেমন মা'র কাছে অন্য কিছু চাইতে পারলেন না, আমিও তেমনি অন্য কিছু চাই না।

একজন সাধু স্বামীজীর ঘরে বসিয়া এই দৃশ্য দর্শন করিতেছেন। তিনি স্বামীজীর টেবিলের পূর্ব-উত্তর কোণে বসা। তাহার পিছনে পূর্ব দেয়াল। তাঁহাকে বারান্দা হইতে দেখা যায় না। ইনি স্বামীজীর ঘরের সেবক। যুবকের মুখে স্বামীজীর প্রার্থনার কথা শুনিয়া সাধুর একটু উপহাসের ভাব আসিয়াছিল। কিন্তু শ্রীমহাপুরুষের করুণামাখা স্বর শুনিয়া, আর যুবকের কথায় বালকের মত সহজ সহানুভূতির ভাব দেখিয়া, নিজে দুঃখিত

হইলেন উপহাসের জন্য।

শ্রীমহাপুরুষ করুণা ও সহানুভূতির সহিত উত্তর করিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাইতো চাইতে হয় — জ্ঞানভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য। এই সবই তাঁর মায়া — আমার বাড়িঘর, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার পরিবার। আমার মঠ — এও মায়া। এ সবই মায়া। সব তোমার, আমার নয় — এই জ্ঞান।

যেখানে অনেক লোক একত্র হয়ে একটা কাজ করছে (সম্ভবত মঠ ও মিশন লক্ষ্য করে বলছেন) তা তাঁর মহামায়াতেই করছে।

এই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট, একজন যাচ্ছে তো অন্য জন আসছে। কর্ম চলে যাচ্ছে। তার এক গভর্নমেন্ট চলে গেলে আর একটা আসবে। এই অনন্ত প্রবাহ চলছে।

ভক্ত — যেমন নদীর স্রোত! নদী দেখতে একই, কিন্তু প্রত্যেক মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে।

মহাপুরুষ — হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই। এই অনন্ত প্রবাহ লোককে ভুলিয়ে দিচ্ছে। মানুষের স্বতন্ত্র একটা ভাব আছে, সকলেরই। ভগবানকে যে ডাকতে হবে — এই উদ্দেশ্য থেকে সবাইকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। এই তাঁর মায়া।

স্বামীজীর ঘরে বসিয়া সাধু ধ্যান করিতেছেন এই চিত্রটি।

মহাপুরুষ — অনন্ত সংসারপ্রবাহ। বাড়িঘর মানুষ জীবজন্তু জন্মাচ্ছে। দু'দিন খেলছে আবার মরছে। পাহাড় পর্বত বন নদী সাগর — হচ্ছে, আর যাচ্ছে। যেখানে পাহাড়, সেখানে হচ্ছে সাগর। আবার সাগর হচ্ছে সাহারা মরু। সব আসছে যাচ্ছে, যেন বায়োস্কোপের চিত্র।

এই প্রবাহ চলছে চিরকাল। কেউ এর গতি রোধ করতে পারছে না। ভগবান যখন মানুষরূপে অবতীর্ণ হন, তখনই কেবল কতকগুলি লোক ব্যাকুল হয় এই প্রবাহের উল্টো দিকে যেতে, আর চেষ্টা করে।

আমাদের মিশনও ঐ কর্মস্রোতে চলেছে। আমিও চলছি। কিন্তু প্রাণ কেঁদে উঠছে এই ভেবে — অত শুনলুম দেখলুম, এই সব কি এমনি যাবে!

আবার দেখছি, অনেকে এই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে। তাদের হয়তো ঈশ্বর দেখবেন। হয়তো তাদের বিশ্বাস বেশী।

আবার বিশ্বাস না করেও যারা গড্ডলিকা প্রবাহের মত গা ভাসিয়ে দিয়েছে তাদেরও তিনিই দেখবেন। কেন না, স্বামীজী বলেছেন, সব মহৎ লোক এখানে এসেছে।

আমি তবে কি প্রবাহ (মিশনের) থেকে সরে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে চলবো? তখন আবার আসে ভয়। মনে হয় — পারবো কি একা যেতে? বুঝলাম তো, উদ্দেশ্য — তাঁর দিকে এগিয়ে যাওয়া। একবার চেষ্টা করে তো পারি নাই। ভিতর থেকে কাজ করবার আদেশ হয়েছে। আর ভরসাও তো পেয়েছি — কোলের ছেলে কোলে যাবেই তো। বাপের একটু কাজ কর। বাপ—ঠাকুর তো দেখছেনই।

স্রোতে গা ভাসিয়ে অর্থাৎ কর্মে ডুবে মাঝে মাঝে তাঁকে স্মরণ করা, এও তো কেমন অস্বস্তি আর চঞ্চলতা।

আবার balance (সমতা), কাজের ও তাঁকে স্মরণ রাখার, তা-ও তো সব সময় হয় না। কাজের ভিড়ে সব তলিয়ে যায়। তবে যদি নিজের ধাত মত কাজ হয় তবে তাঁকে ভোলার chance (সুযোগ) কম। করা কি?

এই চিত্তবিক্ষেপে অধীর হইয়া সাধু অসহায়ের মতো প্রার্থনা করিতেছেন — 'প্রভো, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় ভুলিও না। কর্ম কমিয়ে দাও। শরণাগত।'

শ্রীম — আহা, কি সুন্দর করে অন্তরের চিত্রটি এঁকেছেন উনি। ভিতরের সংগ্রামই জীবন্ত ধর্মজীবনের চিহ্ন। যারা ডায়েরী রাখে তাদের সংগ্রামের ছবিগুলি অপরের খুব উপকার করে। সাধকের ভিতরের সংগ্রামের ছবি খুব কম লোক রাখে। বেশীর ভাগ শাস্ত্রই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ। এই ডায়েরীতে সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে।

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। ২২শে নভেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। আরতি শেষ হইয়াছে। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ দোতলার বারান্দায় বসিয়া আছেন। সম্মুখে গঙ্গা। ওপারের বিদ্যুতের আলো মালার মত ঝুলিতেছে। মহাপুরুষ মহারাজের পাদমূলে বসিয়া আছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। ইনি দেরাদুনের নিকটবর্তী রাজপুরে থাকিয়া সাধন ভজন করেন। সাধুর

মাথায় লম্বা চুল, মুখে দাড়ি। ইনি শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের কৃপা লাভ করিয়াছেন কাশীতে কিছুকাল পূর্বে। ইদানীং দর্শনমানসে কয়েকদিন হইল মঠে আছেন।

আলো আঁধারে শ্রীমহাপুরুষ উপবিষ্ট! কি প্রশান্ত মুখমণ্ডল! দরজার উত্তর পাশে তিনি বসিয়া আছেন। তাঁহার ডান দিকে স্বামীজীর ঘরের উত্তর দেয়ালের কাছে একটি সাধু মহারাজকে দর্শন করিতেছেন। ঠাকুরঘরে আরতির সম্মিলিত ধ্বনি মহাপুরুষ মহারাজের মন টানিয়া রাখিয়াছে। বুঝি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মসাগরে মগ্ন। এই প্রশান্ত আনন্দময় ভাব সাধুর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে যেন অভিভূত করিয়াছে। তিনি ভাবিতেছেন, কি ভাগ্য আমার! সম্মুখে এই বেদপুরুষকে দর্শন করিতেছি। তিনি যুগাবতারের অন্তরঙ্গ পার্ষদ — ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। আমার গুরু, ঈশ্বর। মাদ্রাজ মঠে নিবাসকালে সাধুর মনে যে ভাব উঠিয়াছিল — ইনিই এখন রামকৃষ্ণময় শ্রীরামকৃষ্ণ । আজও যেন তাহার পুনরাবির্ভাব হইতেছে।

সকলেই নীরব, নির্জনতা যেন জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। শ্রীমহাপুরুষ সেই নির্জনতা ভঙ্গ করিয়া শ্রদ্ধানন্দকে বলিতেছেন, তুমি অমরনাথ গিয়েছ? তিনি উত্তর করিলেন, আজ্ঞে না। আমার ঘুরতে ইচ্ছা হয় না। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, বেশ বেশ, খুব ভাল। ঘুরলে ঘুর-বাই হয়ে যায়। যারা আধ্যাত্মিক উন্নতি চায়, যারা যথার্থ জ্ঞান চায়, তারা ঘুরবে না।

(দক্ষিণেশ্বর দেখাইয়া) ঐ দেখ, আমাদের অমরনাথ। ভগবান মানুষশরীর নিয়ে ঐ স্থানে প্রায় ত্রিশ বৎসর লীলা প্রকাশ করেন। কত সমাধি, কত দর্শন, কত আলাপন মায়ের সঙ্গে হয়েছে। মা-ই পরব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। দক্ষিণেশ্বর আমাদের জীবন্ত অমরনাথ!

আবার কিছুকাল নীরব। কতক্ষণ পর ভক্ত নৃপেন সাহা আসিলেন। হাতে একটা বড় পাত্র। শ্রীমহাপুরুষকে বলিলেন, এতে ছানাবড়া আছে। মহাপুরুষ বালকের ন্যায় আনন্দে উত্তর করিলেন, বা, বা। সব ঠাকুরকে দেওয়া হউক। কাল সকালে এই পাত্র করে প্রসাদ নিয়ে যাবে। নৃপেন প্রায় রোজ সকালে মঠ দর্শন করিতে আসেন কলিকাতা হইতে।

পাত্রের মুখ খুলিয়া ছানাবড়া শ্রীমহাপুরুষকে দেখাইলেন। অনেক ও অতি উত্তম জিনিস। মহাপুরুষের আনন্দ ধরে না। ‘অতি সুন্দর মিষ্টি!

ঠাকুরকে খাওয়াতে বল আজই।' — এমন স্বাভাবিক ভক্তিভরে বলিলেন এই কথাটি, ঠাকুর যেন তাঁহার কাছে জীবন্ত।

৩

শ্রীম — তা বই কি! ঠাকুর অন্তরঙ্গদের কাছে জীবন্ত, সত্যই জীবন্ত! শশীমহারাজ এক একখানা লুচি ভাজিয়ে ঠাকুরকে দিতেন — দেখতেন, সামনে বসে খেতেন। তখন ঠাকুরের স্থূল শরীর চলে গেছে! শুনেছি, ঘরে কিছুই নাই। কি ভোগ দেবেন। অভিমানে সমুদ্রের বালি আনতে যাবেন। ফটকের সামনে এক ভক্ত দশ টাকা দেন। সমুদ্রে না গিয়ে বাজারে গেলেন। সব কিনে রেঁধে ভোগ দেন।

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

আজ ২৩শে নভেম্বর ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। সকাল সাতটা, একটি সাধু ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষ খাটের উত্তর প্রান্তে উপবিষ্ট। সাধুটি উঠিতেই মহাপুরুষ বলিতে লাগিলেন, সচ্চিদানন্দ শিব, সচ্চিদানন্দ শিব। প্রণাম করার পর কাহাকেও কাহাকেও কখন এইরূপ মহামন্ত্র শ্রবণ করান তিনি।

বেলা সাড়ে দশটা। শ্রীমহাপুরুষ দোতলার দক্ষিণের ঘরে গিয়া বসিলেন খাটে, দক্ষিণপূর্ব কোণে। একজন গাইয়ে ভক্ত যুক্তকরে বলিতেছেন, মহারাজ আমার কিছু হ'ল না। ভজন সাধন করতে পারি না। কাঁদি কেবল তাঁর কাছে এই বলে। শ্রীমহাপুরুষ উত্তর করিলেন অতি স্নেহভরে ভরসা দিয়া — যদি 'মা মা' বলে কাঁদতে পার, তা হলে তো সব হয়ে গেল। তোমার আর কিছু দরকার হবে না। একটি সাধু পুষ্পপাত্র লইয়া স্বামীজীর ঘরে যাইতে যাইতে এই মহাবাণী শুনিলেন। তিনি মনে মনে প্রফুল্ল হইয়া ভাবিলেন, কি সহজ পথ বলে দিলেন — কাঁদ মার কাছে। ঠাকুরও এই সহজ ও নূতন পথ দেখাইয়া বলিয়াছেন, নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কাঁদ। তিনি অবশ্যই শুনবেনই শুনবেন — দেখা দেবেন।

খানিকবাদে মহাপুরুষ দোতলার বারান্দায় একা একা বেড়াইতেছেন। মাঝে মাঝে উচ্চারণ করিতেছেন, "শম্ভু শিব শম্ভু শিব।" একটি সাধু স্বামীজীর ঘরে বসিয়া জপ করিতেছিলেন। তিনি উহা বন্ধ করিয়া

শ্রীমহাপুরুষকে দর্শন করিতেছেন — যেন একাকী সিংহ বেড়াইতেছেন।

সন্ধ্যার একটু বাকী আছে। গঙ্গার ধারের বারান্দায় দোতলায় শ্রীমহাপুরুষ প্যাসেজের পাশে চেয়ারে বসা। রাজপুরের স্বামী শ্রদ্ধানন্দ পাদমূলে বসিয়া আছেন। আর কেহ কেহ এদিকে ওদিকে দাঁড়াইয়া আছেন।

নারায়ণবাবু আসিয়াছেন। বরানগরের মঠে ইনি খুব যাতায়াত করিতেন। ইনি ঠাকুরের কৃপালাভে ধন্য। নারায়ণবাবু প্রণাম করিয়া বসিয়াছেন। তিনি আনন্দের সহিত শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে বলিতেছেন, আপনার মুখে বরাহনগর মঠে ঐ গানটি শুনে আমার বড় আনন্দ হয়েছিল। মনে হচ্ছে আজও সেই স্বর শুনছি। কোনটা? — মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন। ‘হরিসে লাগী রহ রে মন, তেরা বনৎ বনৎ বনি জাঈ’ — নারায়ণবাবু উত্তর করিলেন আনন্দে। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন — হ্যাঁ। কিন্তু ঠাকুর ওটা ভালবাসতেন না। তিনি বলতেন, সে কি, একবার মায়ের নাম করেছি এক্ষুনি হবে। ‘বনৎ বনৎ’ কি? এক্ষুনি চাই। ডাকাত পড়া ভাব। এমনি বিশ্বাস ভক্তি!

শ্রীম — আহা কি কথা — ‘যদি মা মা বলে কাঁদতে পার তা হলে তো সব হয়ে গেল।’ ঠাকুর না এলে, তার সাধুদের মুখে এ সহজ পথ কে বের করতেন? তিনিই এঁদের ভিতর বসে জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ লোকদের এই অমৃত বাণী শুনাচ্ছেন।

আবার ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

আজ ২৪শে নভেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার। বেলুড় মঠ। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। সকল ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ নিজের বিছানার উত্তরাংশে বসিয়া আছেন। একে একে সাধুরা সকলে প্রণাম করিতে আসিতেছেন। স্বামী শর্বানন্দ প্রণাম করিয়া পশ্চিমের জানালার সামনে দাঁড়াইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, আজ কলকাতা যাব একজনকে (হোমিওপ্যাথিক) ঔষধ দিতে হবে। মহাপুরুষ হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন — বাবা, ওষুধ-দেওয়া সাধু হয়ো না।

স্বামী প্রণবানন্দ বলিলেন, আমাদের বেলুড়ের গ্রামে অনেকের অসুখ বিসুখ হচ্ছে। শ্রীমহাপুরুষ উত্তর করিলেন, পাড়ার লোকদের খবর নেওয়া

সে খুব ভাল কাজ। নেওয়া উচিত।

রাত্রি প্রায় নয়টা। মহাপুরুষের ডান হাঁটুতে ব্যথা। সেবক শঙ্করমহারাজ নুনের পুঁটলি গরম করিয়া দিতেছেন, আর মতি মহারাজ সেঁক দিতেছেন। উমেশ মহারাজ রাত্রিতে পাখা দিয়া মশা তাড়াইতেন। আজ তাঁহার অসুখ। একজন সাধু আগুনের মালসায় পাখা করিতেছেন খাটের উত্তর পাশে দাঁড়াইয়া। এই সাধুটি উঁচু হইয়া মহাপুরুষের পায়ের একজিমা দেখিতেছেন। পা-খানি একটি ছোট স্টুলের উপর রাখা। মহাপুরুষ হাসিয়া সাধুকে বলিলেন, ও তোমায় দেখতে হবে না। শৈলেশ মহারাজও পাশেই বসিয়া আছেন।

এই সাধুটি আর একদিন সকালে প্রণাম করার সময় জিজ্ঞাসা করেন, রাত্রে আপনার ঘুম হয়েছিল কি? শ্রীমহাপুরুষ হাসিয়া বলিলেন, কেন বল দেখি? সাধু বলিলেন, প্রায়ই ঘুম হয় না শুনতে পাই, তাই। সাধুটি রোগা। তিনি বুঝিলেন, ওঁর শরীরের খবর নেওয়ার আমার অধিকার নাই। আমার নিজের ভাবনা করাই উচিত!

শ্রীম — রোগা হলোই বা। কাছে থাকা, সব দেখা ও শোনা, সাধ্যমত সেবা করা — এই-ই তো তপস্যা! এঁদের কাছে থাকলে হাজার বছরের তপস্যা হয়ে যায়। কোথায় পাবে এ তাজা মাল? জীবন্ত ধর্ম এঁদের জীবন। অবতার এলেই এই জীবন্ত ধর্ম দেখা যায়। ধর্মের ছড়াছড়ি এখন। এখন ড্যাঙ্গায়ও এক বাঁশ জল।

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

আজ ২৭শে নভেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার। সন্ধ্যা। আরতি শেষ হইয়াছে। শ্রীমহাপুরুষ দক্ষিণের অফিস ঘরে বসিয়া আছেন খাটের উপর। এই ঘরের পূর্ব গায়ে শ্রীস্বামীজীর ঘর। সেবক মতিমহারাজ পাশে দাঁড়াইয়া আছেন, আর স্বামী বিজয়ানন্দ মেঝেতে বসিয়া আছেন। ঘরে বিজলী বাতি জ্বলিতেছে। একটু পর উহা নিভাইয়া দিয়া একটি নীল বাল্ব জ্বালা হইল। অতি ক্ষীণ আলো। একথা সেকথা হইতেছে।

শ্রীমহাপুরুষ — খোকা (সতীশ মুখার্জি) আসে না বসুমতীর?

স্বামী বিজয়ানন্দ — না। সকলে কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন।

শ্রীমহাপুরুষ — 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্ হৃদ্দেশে অর্জ্জুনস্তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্

সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥ কি করবে মানুষ! তিনিই মহামায়াতে এরূপ করাচ্ছেন। (গীতা ১৮:৬১)।

স্বামী বিজয়ানন্দ — 'বলাদাকৃষ্য', চণ্ডীতে আছে।

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ।

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥ (চণ্ডী১.৫৫)

জ্ঞানীদেরও এই অবস্থা।

রাত্রি ৭।১৫ মিনিট। হিমাংশুর প্রবেশ। যুবক, ২২।২৩ বছর বয়স। স্বামী প্রেমানন্দের ভ্রাতা তুলসীরামবাবুর দৌহিত্র। কলিকাতায় বাড়ি। মাস্টারমহাশয়ের ওখানে যাতায়াত করেন। হিমাংশু প্রণাম করিয়া সামনে দাঁড়াইয়া আছেন।

শ্রীমহাপুরুষ — কি রে কেমন আছিস্, ভাল তো?

হিমাংশু — আজ্ঞে না। মন খারাপ।

শ্রীমহাপুরুষ — কেন মন খারাপ? তোর বাপ মা সকলেই ঠাকুরের আশ্রিত। তুই আমাদের আশ্রিত। মন খারাপ কেন হবে? মঠে আসবি, আর মাস্টারমশায়ের ওখানে যাস্। আর কোথাও যাস্ না। এমনি করবি। কোথায় বসিস্ জপ ধ্যান করতে? জানিস্ তো ঠাকুরের গান — 'আপনাতে আপনি থেকো মন যেয়ো না কারো ঘরে। যা চাইবি তা বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥' ভিতরেই সব।

শ্রীমহাপুরুষ উঠিয়া নিজের ঘরে যাইতেছেন নিজের মনে গাহিতে গাহিতে — 'যা চা'বি তা বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।'

শ্রীম — বেশ কথা। 'যা চা'বি তা বসে পাবি — খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।' ঠাকুর যখন গাইতেন, তখন মনে হতো যেন সব পাওয়া হয়ে গেছে। তিনি ঈশ্বর নরকলেবরে — সামনে দেখছে ভক্তরা। তাই মনপ্রাণ সব পূর্ণ আনন্দে, অজ্ঞাত আনন্দে। কে চায় তখন অন্য জিনিস? অন্য নাই তখন। তখন সব এক।

পাঠ চলিতেছে।

আজ ২৮শে নভেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। মঠের দোতলার দক্ষিণের ঘর। এখানে ওয়ার্কিং কমিটি বসে। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। পূর্ব-

দক্ষিণ কোণে একখানা খাট পাতা। তাহার উপর বিছানা। ইহাতে আজকাল স্বামী নিখিলানন্দ শো'ন। শ্রীমহাপুরুষ ঐ বিছানায় বসিলেন লেপের উপর, পূর্বাস্য। নীল বাল্‌ব জ্বলিতেছে।

নিচে মেঝেতে বসিয়া আছেন ইটালীর (ইন্টালী) দুইজন ভক্ত। একজনের নাম সুন্দর, তিনি যুবক। তাঁহাদের সঙ্গে কথা হইতেছে। স্বামী রাঘবানন্দ আজকাল ইটালীতে রহিয়াছেন। 'কেনোপনিষদ্'-এর প্রবচন করিতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, ওতে দেবীর আবির্ভাবের কথা আছে। দেবাসুর যুদ্ধের পর দেবতাদের অহংকার হয়েছিল। তা ভাঙবার জন্য দেবী এলেন। ওঁরা চিনতে পারলেন না।

যক্ষরূপ ধারণ করে এসেছিলেন। ইন্দ্র অগ্নিকে পাঠিয়ে দিলেন খবর করতে, কে এসেছেন। অগ্নি গেলে যক্ষরূপী দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? উনি উত্তর করলেন, আমি অগ্নিদেব। তোমার শক্তি সামর্থ কতদূর? — দেবী জিজ্ঞাসা করলেন। আমি সকল পৃথিবী দগ্ধ করে ফেলতে পারি — অগ্নি উত্তর করলেন। বেশ, এই তৃণটি দগ্ধ কর দিকিন, দেবী বললেন। অগ্নি পোড়াতে পারলেন না যথাসাধ্য চেষ্টা করেও। ইনি ফিরে গেলেন। তারপর এলেন পবনদেব। তিনিও ঐ তৃণটিকে নড়াতে পারলেন না। এই কথা শুনে ইন্দ্রের মনে সন্দেহ হয়েছে, দেবী ব্রহ্মশক্তি নিশ্চয় এসেছেন। ইন্দ্র তাই নিজে এসেছেন। দেবী তখন আকাশে উমা হৈমবতীরূপে বিরাজমানা। ইন্দ্র তাঁকে সর্বাগ্রে চিনেছিলেন বলেই তিনি দেবরাজ।

মা না চিনালে কেউ চিনাতে পারে না তাঁকে। ঠাকুর তাই সর্বদা প্রার্থনা করতেন, 'তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না, মা।' দেখছেন কিনা, সর্বদা ভুলিয়ে দিচ্ছেন। গীতাতেও আছে —

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্ হৃদ্দেশে অর্জ্জুনস্তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারুঢ়াণি মায়য়া।। (গীতা ১৮:৬১)

তাঁর মহামায়াতে সবাইকে চালাচ্ছেন। শোন নি ঠাকুরের গল্পটি? পুতুল নাচছে (হাতে দেখিয়ে), এদিকে হেলছে ওদিকে হেলছে। বালকগণ মনে করে পুতুল আপনিই নাচছে। কিন্তু নাচাচ্ছে আর একজন ধরে। তেমনি মানুষ মনে করে, আমরা সব করছি। অজ্ঞানে দেখতে পায় না

তাঁর হাত।

একজন ভক্ত — অহংকার থেকে হয় এটা?

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ। অহংকার না থাকলে আবার কাজও হয় না, ছোট বড় যত। তবে 'আমি তাঁর ভক্ত, আমি তাঁর সন্তান, আমি তাঁর দাস' — এই ভাব নিয়ে কাজ করতে হয়। তা হলে মা বাঁধেন না, ছেড়ে দেন। শরণাগত হয়ে থাকা আর কি। মা শরণাগত, মা শরণাগত — সদা এই প্রার্থনা করতে হয়।

শ্রীম এতক্ষণ চক্ষু মুদিয়া ধ্যানস্থ হইয়া ডায়েরীপাঠ শ্রবণ করিতে-ছিলেন। এবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (সাধুর প্রতি) — হাঁ, তাঁর মহামায়াতে সবাইকে চালাচ্ছেন। আলুপটল নাচছে। আগুন সরিয়ে নিলে, তক্ষুনি নাচ বন্ধ। মানুষ অজ্ঞানেতে দেখতে পায় না তাঁর হাত।

সাধু মিষ্টিমুখ করিয়া প্রণামান্তে বিদায় লইলেন।

বেলুড় মঠ।
২৯শে নভেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার।

চতুর্থ অধ্যায়

চিত্রপুঞ্জ

১

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। শ্রীম চেয়ারে দোরগোড়ায় একাকী, দক্ষিণাস্য। এখন অপরাহ্ন চারিটা।

আজ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার।

বেলুড় মঠ হইতে একটি সাধু আসিয়াছেন। সাধুকে সিঁড়িতে উঠিতে দেখিয়াই আনন্দে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, এই যে জগবন্ধু, আসুন আসুন। বসতে আজ্ঞা হউক।

সাধু প্রণাম করিয়া শতরঞ্জিপাতা জোড়া বেঞ্চিতে বসিলেন। কুশল প্রশ্নাদি হইতেছে।

শ্রীম (সস্নেহে) — কেমন করে এলেন? সংবাদ পেয়েছিলাম, আপনার শরীরটা ভাল ছিল না।

সাধু — এখন একটু ভাল বোধ করছিলাম। তাই ভাবলাম আপনার কাছে একবার হয়ে আসি। ডাক্তারের কাছে যেতে হয়েছিল।

শ্রীম — তুমি তো দেখছি ডায়েরী এনেছ। শোনাতে পারবে? কষ্ট হবে না তো?

সাধু — আজ্ঞে না, কোনই কষ্ট হবে না। বরং আনন্দ হবে। এই ভেবেই তো সঙ্গে ডায়েরী এনেছি।

শ্রীম — আচ্ছা, পড়ে শোনাও।

সাধু ডায়েরী পাঠ করিতেছেন।

বেলুড় মঠ। ৩০শে নভেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার।

শ্রীমহাপুরুষ অসুস্থ। ডক্টর অমর মুখার্জির হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইতেছে। এখন অপরাহ্ন চারটা। অমরবাবু দেখিতে আসিয়াছেন। মহাপুরুষ নিজের ঘরে চেয়ারে বসা, দক্ষিণাস্য। ডাক্তার উত্তরাস্য একটা বেতের

মোড়াতে বসিয়াছেন।

একটি সাধু আসিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইয়াছেন। মহাপুরুষ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, এ ব্যক্তি কেন? দেখাবে না কি ডাক্তারকে? সাধু লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেলেন।

পাঠ চলিতেছে।

আজ ৬ই ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। সকালে আটটার সময় মহাপুরুষ গঙ্গার ধারের বারান্দায় খোকা মহারাজের ঘরের উত্তর পাশে চেয়ারের সামনে দাঁড়াইয়া জামা পরিতেছিলেন। পাশে সেবক উমেশ মহারাজ। অন্তেবাসী স্বামীজীর ঘরের সেবক। তিনি সিঁড়ি ঝাঁট দিয়া ঝাঁটা রাখিতে ছাদে যাইতেছেন। মহাপুরুষ মৃদুভাবে বলিলেন, তুমি এটা (গঙ্গার দিকে বারান্দা) ঝাঁট দেও না? অন্তেবাসী প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। ছাদ হইতে ফিরিবার সময় আবার বলিলেন, তুমি এটা ঝাঁট দাও না? উনি উত্তর করিলেন, আজ্ঞে দিই। কাল দিয়েছি। মহাপুরুষ প্রসন্নভাবে বলিলেন, হাঁ বাবা দিও, স্বামীজীর ঘরের সামনেটা ঝাঁট দিও।

অপরাহ্ন সাড়ে চারিটা। বেলুড় মঠ। খোকা মহারাজের ঘরে শ্রীমহাপুরুষ খাটে বসিয়া আছেন। ঢাকার একটি ভক্ত মহিলা আসিয়াছেন। প্রণাম করিয়া জোড়হাতে পায়ের নিচে মেঝেতে বসিয়া আছেন। বলিতেছেন, আমার মন যেন স্থির হয় ঠাকুরের পায়ে, আশীর্বাদ করুন। মেয়েটি যুবতী স্ত্রী, মহাপুরুষের কৃপাপ্রাপ্তা। খুব ভক্তিমতী আর তাঁহার বিশেষ স্নেহপাত্রী।

শ্রীমহাপুরুষ সস্নেহে উত্তর করিলেন, জপ করিস্ তো রোজ? আর প্রার্থনা করবি ঠাকুরের কাছে সর্বদা — যাতে সৎসঙ্গে রাখেন। আর তাঁকে না ভুলি।

সেবক শঙ্কর মহারাজ মহাপুরুষের জলখাবার নিয়া আসিলেন, ফল ও সন্দেশ। কাশি বলিয়া ফল খাইলেন না। কেবল একটি সন্দেশ খাইলেন।

সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা। শীত পড়িয়াছে। মহাপুরুষ মহারাজ নিত্যকার স্থানে বারান্দায় বসিয়া আছেন চেয়ারে, খোকা মহারাজের ঘরের পাশে। সম্মুখে গঙ্গা। গরম গেঞ্জি গায়ে, তাহার উপর একটি কোট। গরম র‍্যাপারে শরীর ঢাকা। মাথায় কানঢাকা টুপি। একমনে কি ভাবিতেছেন। বাহ্যদৃষ্টি গঙ্গার দিকে।

শৈলেশ মহারাজ উত্তর পাশে দাঁড়ান। দক্ষিণ দিকে স্বামীজীর ঘরের সামনে দুইটি ভক্ত যুবক। প্যাসেজে দাঁড়ান অন্তেবাসী। সেবক শঙ্কর ও মতি মহারাজ যাওয়া আসা করিতেছেন।

খানিক পর শ্রীমহাপুরুষ শৈলেশের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রী মহাপুরুষ (শৈলেশের প্রতি) — বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ কৃত) দেখলাম। তোমার পড়া হয়েছে?

শৈলেশ — আজ্ঞে, ঢাকায় একবার দেখেছিলাম। আপনি পড়বেন না?

মহাপুরুষ (বালকের ন্যায় সহাস্যে) — হাঁ। আর কি হবে ঐসব পড়ে? এখন সব চাই realisation (অনুভূতি)। ইতিহাস পড়ে কি হবে?

ঠাকুর যা বলে গেছেন সেই ঠিক — 'তিনিই তাঁর। তিনিই তাঁর, তিনিই তাঁর।' কতবার শুনেছি। তিনি 'আমি' 'আমার' বলতে পারতেন না। তিনি বলতেন, এই জগৎও তিনি। আর বলতেন, 'তিনিই তাঁর, তিনিই তাঁর, তিনিই তাঁর।'

মন অন্তর্মুখীন, কি স্মরণ করিতেছেন। এবার কথা বলিতেছেন।

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ, 'ঈশ্বর মায়া জীবজগৎ', 'ঈশ্বর মায়া জীবজগৎ' — কতবার শুনেছি একথা তাঁকে বলতে। এ সবই তিনি।

এখন আবার কবে চলে যেতে হবে তার ঠিক নাই। এখন আর এসব কেন? এখন কেবল realisation (উপলব্ধি)।

দশজনের উপকার হবে — তা আমার কি হলো তাতে!

শৈলেশ — আপনার তো সব হয়েই রয়েছে।

মহাপুরুষ — হাঁ, তিনি সব বুঝিয়ে দিয়েছেন।

গঙ্গার অপর পারে 'কুঠিঘাট' স্টীমার-ঘাট। হঠাৎ ঘাটের বৈদ্যুতিক আলোগুলি মালার আকারে জ্বলিয়া উঠিল। উহা দেখিয়া মহাপুরুষ বালকের ন্যায় আনন্দ করিতে লাগিলেন। বলিলেন বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। তবে এরা খামখেয়ালী লোক। আজ এত আগেই আলো জ্বেলে দিয়েছে। সন্ধ্যা এখনও হয় নাই। কাল অনেক পরে জ্বালিয়েছিল। (একটু হেসে) তা দিলেই বা। আলো দেওয়ার তো কথা — তা একটু আগেই দিল বা।

নিচে লনে স্বামী নিখিলানন্দ পায়চারি করিতেছেন। ঠাকুরঘরে আরতির ঘন্টা বাজিয়া উঠিল। সাধুরা সকলে সেখানে গিয়াছেন। আরতি শেষ হইল সাড়ে ছয়টায়। কেহ কেহ ফিরিয়া আসিয়াছেন মহাপুরুষ মহারাজের কাছে।

অন্তেবাসী স্বামীজীর ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন, ঘর খুলিবেন। মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, আরতি হয়ে গেছে? মতি মহারাজ মশা তাড়াইতেছিলেন, উত্তর করিলেন, আজ্ঞে হাঁ। অন্তেবাসীও প্যাসেজ হইতে বলিলেন একসঙ্গেই — আজ্ঞে হাঁ, এইমাত্র হল। আমরা এই এলাম। ‘এইমাত্র হলো’ — বলিতে বলিতে মহাপুরুষ মহারাজ উঠিয়া প্যাসেজ দিয়া স্বামীজীর ঘরের দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অন্তেবাসী আবার বলিলেন, আজ্ঞে, এই ফিরে এসে দরজা খুলছি। মহাপুরুষ বলিলেন, আমি ভাবছি এখনও চলছে — ‘তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো’। এখনও কানে এই কথা বাজছে (বালকের ন্যায় হাস্য)।

প্যাসেজ দিয়া আবার নিজের ঘরে ঢুকিলেন। অন্তেবাসী খোকা মহারাজের ঘরে দাঁড়াইয়া শুনিতেছেন মহাপুরুষ বলিতেছেন, ‘কৃপা হি কেবলম্, কৃপা হি কেবলম্’।

এবার আসিয়া আফিস ঘরে বসিলেন খাটের উপর। ঘরে নীল রঙের আলো জ্বলিতেছে। সামনেটা একটা নীল কাগজে ঢাকা। মতি পায়ের নিচে বসিয়া মশা তাড়াইতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ ধ্যানস্থ।

শ্রীম — দেখ, বললেন সাধুসঙ্গ নিত্য করবে। সব ভুলিয়ে দেন কিনা তাঁর মায়া। সাধুসঙ্গে থাকলে ভুলটা সংশোধন হয়। সাধুকেও ভুলিয়ে দেন। কিন্তু সাধু শীঘ্র নিজের ভুল ভাঙ্গতে পারে। সংসারের লোকের পক্ষে বড় কঠিন। তাই সদা সাধুসঙ্গ চাই। দেখ না মহাপুরুষকে — সর্বদা কাঁটা উত্তর দিকে, অত অসুখ বিসুখেও।

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। আজ ৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, ২০শে অগ্রহায়ণ, শনিবার। এখন সকাল সাতটা। মহাপুরুষ নিজের খাটে বসিয়া আছেন। সাধুরা প্রণাম করিতে আসিতেছেন। মহাপুরুষের গায়ে গরম জামা — বৃন্দাবনী তুলার জামা, খয়েরী রং এর।

একটি সাধু ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। মহাপুরুষ গম্ভীর আনন্দময় ভাবে উচ্চারণ করিতেছেন, 'জগবন্ধু, জগবন্ধু, জগবন্ধু'। (প্রণত সাধুকে দেখিয়া) 'সেই আসল জগবন্ধুর কথা মনে হল। জয় জগবন্ধু, জয় জগবন্ধু।'

ঘরে কয়েকজন সাধু আছেন দাঁড়াইয়া। স্বামী বিজয়ানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'মুখে বলে লোকে। কিন্তু, যদি তাঁর কৃপায় ভিতরে একটু feel (অনুভব) ক'রে বলে তবে বড়ই আনন্দ হয়।'

কিয়ৎকাল অন্তর্মুখীন ভাবে নীরব। আবার মৃদু হাস্যে বলিলেন, "তবে ভাল কথার খারাপও ভাল, লোকে বলে।

চিরঞ্জীব শর্মা ছিলেন কেশববাবুর দলে। উনি ন'দের দিকে tour (ভ্রমণ) করতে গিছিলেন, তখন তাঁকে নিয়ে আসেন। চিরঞ্জীববাবু খুব সুন্দর গান বাঁধতে পারতেন। ঠাকুর....। কেশববাবু সারমন দিতেন। তাঁর উপর গান বাঁধতেন।"

স্বামী বিজয়ানন্দ — 'ঠাকুর'-এর কি কথা বলতে যাচ্ছিলেন?

মহাপুরুষ — হাঁ। এমন সুন্দর ভাব গানের, দেখে ঠাকুর কখনও বুঝতে পেরে উঠতেন না — ঠিক ঠিক ভাব থেকে বেঁধেছেন গান, না শুধু কবিত্ব? উনি বলতেন, একেবারে কিছু না বুঝলে কি আর বাঁধতে পারি? কিছু কিছু বোঝা যাচ্ছে।

ঠাকুরের ভাব — শুধু কবিত্ব ভাল নয়। একটু ভাব ভক্তি থাকে তো বেশ।

আজ বেলা আটটার সময় মিসেস ভন কেলার (Von Keller) শ্রীমহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া হাঁটু গাড়িয়া রহিয়াছেন। মহাপুরুষ কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ধীরভাবে মিসেস ভন কেলার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'the same soul has form and is formless — is it so?' (একই অন্তরাত্মা সাকার আবার নিরাকার — এই কি?)

মহাপুরুষ খাটে বসা নিজের ঘরে — মাথা নিচু করিয়া মিসেস ভন কেলারের কানের কাছে মুখ করিয়া প্রশান্তভাবে বলিতেছেন, yes (হাঁ)। জোরে না বলিলে ভক্তটি শুনিতে পান না। তারপর অতি আর্তির সহিত ভক্ত মহিলাটি বলিতেছেন, I wish to come to you often. I can

not come here so often. People come here always. It is crowded. (আমি প্রায়ই আসতে চাই আপনার কাছে। কিন্তু কৃতকার্য হই না। লোক সর্বদা আপনার কাছে আসে। তাতেই ভীড় হয়ে যায়)।

২

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ প্রতিদিনের মত গঙ্গার দিকের বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া আছেন। পাশে কেহ কেহ দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামী নিখিলানন্দ খ্রীস্টান মিশনারিদের কথা বলিতেছেন। তাহারা সেবার কাজ করে বটে, কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য এদেশের লোককে খ্রীস্টান করা।

শ্রীমহাপুরুষ — এদেশের ভদ্রলোক, শিক্ষিত লোক — এরা সব তো ক্রাইস্টকে নিয়েছে। মিশনারিদের করা উচিত — তোমাদের যা আছে দাও, আমাদের যা আছে নাও। মিশনারিরা খালি দেয়, নেয় না। তাই তারা বিশেষ কিছু লাভবান হতে পারে না। এদেশ থেকে তারা ধর্মতত্ত্ব নিতে নারাজ। গোঁড়ামি। কিন্তু এতে ঠকে যাচ্ছে। স্কুল কলেজ হাসপাতাল — এসব কাজ বেশ করছে।

নিখিলানন্দ — মুসলমানরা ওদের মতই গোঁড়া। নিতে নারাজ।

মহাপুরুষ — ওদের কি ধর্ম — খালি সামাজিক ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করে। কে কোথায় কি করলো, মসজিদের সামনে কে বাজনা বাজালো — এই সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কেবল কলহ করে। মহম্মদের প্রেম ভক্তির উপর নজর নাই! তবে ভাল লোক সকলের মধ্যেই আছে।

মিসেস ক্লার্ক (Clarke) খুব ভাল লোক, খুব বিদুষী। অমনি দেখে বোঝা যায় না — চুপচাপ থাকেন। লেখা দেখে মনে হল, মহৎ লোক। কলকাতায় একটানা আট মাস ছিলেন। এখানে আসতেন। ঠাকুরঘরে গিয়ে ধ্যানজপ করতেন। আর আমার সঙ্গে দু'পাঁচ মিনিট কথা। ব্যস, আর কিছুতেই নাই।

যারা উদারতা চায় তাদের এখানে আসতেই হবে। আর যারা এসেছে, বুঝতে হবে ঠাকুরের উদার ধর্ম তারা নিতে এসেছে।

স্বামী নিখিলানন্দ — রবিবাবুর অস্ট্রেলিয়ার ট্যুরে একটা সুন্দর ঘটনা ঘটেছিল। সন্ধ্যার সময় জাহাজে ধূপের গন্ধ এলো। রবিবাবুর সঙ্গীরা মনে

করলেন, নিশ্চয়ই এখানে অন্য ভারতবাসী রয়েছে। নইলে ধূপের গন্ধ এলো কি করে। একজন গন্ধ ধরে একটা কেবিনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভিতরে একজন সাহেব। উনি বললেন, আসুন ভিতরে আসুন। রবিবাবুর সঙ্গী ভিতরে গিয়ে দেখলেন, ঠাকুর ও স্বামীজীর বড় বড় ছবি দেয়ালে টাঙ্গানো রয়েছে। সাহেব বললেন, আমি এঁদের কথা শুনে অবধি এঁদেরই ধর্মজীবনে গুরু ও ইষ্টরূপে গ্রহণ করেছি। সাহেবের বাড়ি ইংলণ্ডে। তাঁর কাছে কেউ প্রচার করে নাই এঁদের, তবুও নিয়েছে।

শ্রীমহাপুরুষ (অন্তর্দৃষ্টির সহিত) — বাঃ, দেখ ঠাকুরের নাম কি ভাবে তিনি নিজেই প্রচার করছেন! এতে রবিবাবুরও আক্কেল হবে।

স্বামী নিখিলানন্দ — মিসেস ভন কেলার (Von Keller) বলেছেন, এ-ও বাহাদুরী রবিবাবুর।

শ্রীম — ঠাকুরের মহাবাণী রয়েছে — আন্তরিক যে ভগবানকে ডাকবে তাঁকে এখানে আসতে হবে। এই দেখ না, কেমন আসছে। মানে হল এই, তিনি তো অন্তরাত্মা সকলের। সেখান থেকে সব দেখেন। যে সরল, তাকে পাঠিয়ে দেন তাঁর ভাবের কাছে। এই যেমন, মঠে বা কোনও ভক্তের কাছে — যারা ঠাকুরকে ধরে রয়েছে।

পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। ৮ই ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। শীতকাল। সকাল সাতটা। সাধুরা দলে দলে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। এইবার একটি সাধু ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ সকরুণভাবে উচ্চারণ করিতেছেন, 'জগবন্ধু, জগবন্ধু, জগবন্ধু'। আর একটি ব্রহ্মচারী প্রণাম করিতেছেন — নাম নাঞ্জাপ্পা (নারায়ণ চৈতন্য)। ঐ করুণামাখা স্বরে পুনরায় উচ্চারণ করিলেন — মা মা, শিব শিব।

মঠে ঠাকুরের সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন রাত্রি সাড়ে ছয়টা। আজ রবিবার বলিয়া অনেক ভক্তসমাগম হইয়াছে। আরতির পর অনেকে আসিয়া বসিয়াছেন দোতলার দক্ষিণের ঘরে। শ্রীমহাপুরুষ বারান্দা হইতে আসিয়া এই ঘরেই বসিয়াছেন, খাটের উপর, পূর্বাস্য। ভক্তরা সব মেঝেতে, পশ্চিমাস্য। কেহ কেহ এদিক ওদিক দাঁড়াইয়া আছেন। একটি

সাধু দরজায় বসা।

আজ অপরাহ্নে মঠের লনে ভক্তদের মধ্যে বিচার হইয়াছিল — প্রারব্ধ ও ঈশ্বরেচ্ছা — কোন্‌টা বড়। সেই সব কথা তুলিয়াছেন মণিবাবু, স্বামী বাসুদেবানন্দের ভাই। ইনি সরকারী কর্মচারী।

মণি — মহারাজ, আজ আমাদের বিচার হচ্ছিল, প্রারব্ধ বড় কি ঈশ্বরেচ্ছা বড়। মানুষ চালিত হয় কোনটায়?

শ্রীমহাপুরুষ — আমায় যদি জিজ্ঞাসা কর বাবা, আমি এই বুঝেছি বুড়ো হয়ে — সবই ঈশ্বর-ইচ্ছায় চলছে। তাঁর স্বভাব ঠিক বালকের ন্যায়। ঠাকুরের কথা শুন নাই, তিনি বলতেন ঈশ্বর বালকস্বভাব? একটি বালক অনেক টাকাকড়ি পাশে নিয়ে বসেছে। লোকেরা চাইছে, দাও। সে কাউকেও দিচ্ছে না। কিন্তু হঠাৎ, চায় নাই একজন, তাকে ডেকে দিয়ে দিলে, ন্যাও। যারা চাইলো তাদের দিলে না, যে চাইলো না তাকে দিল। এইরূপ স্বভাব ঈশ্বরের।

মণি — স্বামীজীর লেক্‌চারগুলোর ভিতর কি সুন্দর সব কথা আছে। একস্থানে বলেছেন, যে মানুষের উপর নির্ভর করবে, সে ঈশ্বর থেকে তত দূর হয়ে যাবে।

শ্রীমহাপুরুষ — ঠিক কথা। ঠাকুর বলতেন, হাওড়া থেকে যত কাশীর দিকে যাবে, হাওড়া থেকে তত দূর হয়ে যাবে।

(সহাস্যে) আর একটি গল্প বলেছিলেন। কৈলাসে একদিন শিব ও গৌরী বসে আছেন। একটি ব্রাহ্মণের বড় দুঃখ। মা তাই শিবকে বললেন, এ তোমার ভক্ত। কেন একে এত দুঃখ দিচ্ছ, তোমার দয়া হয় না? শিব বললেন, দেখবে? আচ্ছা। এই বলে কতকগুলি টাকাকড়ি মণি-মাণিক্য রাস্তায় রাখিয়ে দিলেন। ঐ পথে ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণ চলছিল। ঐ ধনের কাঁড়ির একটু দূর থেকে ব্রাহ্মণের মনে উঠলো, আচ্ছা অন্ধ কিরূপে চলে রাস্তায় দেখবো। বলেই চোখ বুজে চলতে লাগলো। ঐ ধনের স্তূপ পার হয়ে গেল ঐরূপে। তখন শিব বললেন মাকে, দেখলে! ওর কপালে দুঃখ আছে। রাখতে পারবে না দিলেও।

পণ্ডিতরা আর শাস্ত্র বলে, এটাই কর্মফল। আমরা বাবা জানি, সবই তাঁর ইচ্ছাতে হচ্ছে।

শ্রীম — এই প্রারব্ধও বদলে যায় ঈশ্বরের কৃপা হলে — ঠাকুর বলতেন। ঐ গানটি গাইতেন,

'কপালে লিখেছে বিধি, তাই বলবান যদি,
তবে ও মা তোর দুর্গানাম কে নেবে?'

আবার আছে —

'দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শংকরী॥'

ঠাকুর সব পারেন। পাঠ চলিতেছে।

আজ ৯ই ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার। সন্ধ্যারতির পর দোতলায় আফিস ঘরে শ্রীমহাপুরুষ বসা খাটে। সাধুরা কেহ কেহ আসিয়াছেন — স্বামী ওঁকারানন্দ, গঙ্গেশানন্দ প্রভৃতি। অবতারের আসার প্রয়োজনীয়তার কথা চলিতেছে। স্বামী ওঁকারানন্দ বলিলেন, অবতার না হলে ঈশ্বরকে বোঝা যায় না। শ্রীমহাপুরুষ উত্তর করিলেন, এটা আমার সুদৃঢ় ধারণা, অবতার না এলে ঈশ্বরকে বোঝা যায়ই না। তোমাদের সঙ্গে কথা হ'লে কতবার এই কথা বলেছি, শোন নাই? এ আমার খুব দৃঢ় বিশ্বাস।

শ্রীম — ঠিক কথা। অবতার না এলে ঈশ্বরকে বোঝা যায় না। ঠাকুর বলেছিলেন — মাঠের মাঝে একটা দেয়াল। তাতে একটা গোল বৃহৎ ছিদ্র আছে। এ দিয়ে ওপারের জমি, বাড়ি, বাগান, সব দেখা যায়। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বল তো সেটা কি? আমরা উত্তর করলাম, ওটা অবতার — আপনি। খুব খুশি হলেন শুনে। অবতার আসেনই ধর্ম সজীব করতে।

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। দোতলার গঙ্গার দিকের বারান্দায় ছোট ঘরের দেয়ালের গায়ে শ্রীমহাপুরুষ চেয়ারে উপবিষ্ট। শীত পড়িয়াছে, তাই গরম বস্ত্র পরিয়াছেন। মাথায় কানঢাকা টুপি। গরম র‍্যাপারে শরীর আবৃত। শীতকাল বলিয়া গঙ্গায়ও লোকচলাচল কম।

এখন পৌনে ছয়টা। ঠাকুরঘরে আরতির ঘণ্টা বাজিতেছে। একটি মারোয়াড়ী ভক্ত আসিয়া মহাপুরুষকে প্রণাম করিলেন, 'ওঁ নমো নারায়ণায়'

বলিয়া। ভক্তটির বয়স প্রায় পঞ্চাশ। প্রণাম করিয়া পায়ের কাছে বসিলেন। কখনও কখনও আসেন দর্শন করিতে।

ভক্ত — মহারাজ, মন্‌মে শান্তি স্থায়ী নেহীঁ হোতী হ্যায়।

মহাপুরুষ — সুবহ শাম, দোবার ভগবান সে, সত্যনারায়ণ সে প্রার্থনা করো কি প্রভো অপনে পাদপদ্মোঁ মেঁ ভক্তি দো। ম্যায় মূর্খ হুঁ, মূঢ় হুঁ। ম্যায় সংসার-সাগরমে গির গয়া হুঁ। মুঝকো অপনে চরণকমলোঁ মেঁ ভক্তি দো।

ও হী ভক্তি হী সার হ্যায়। আউর তো সব দো দিন কে লিয়ে হ্যায়। দো দিন বাদ সব চলা জায়েগা। ভগবানকে পাদপদ্মোঁ কী ভক্তি নেহীঁ জায়েগী। বালবাচ্চা, ঘরবাড়ি, স্ত্রী, সংসার কী দৌলত — ইয়ে সব চীজেঁ চলী জায়েংগী। সুবহ শাম দো মিনিট পাঁচ মিনিট এ হী প্রার্থনা করনা।

ভক্ত — আপকো কষ্ট হোতা হ্যায়, ইস্‌লিয়ে পূছতাছ করনে কী ইচ্ছা নেহীঁ হোতী।

মহাপুরুষ — নেহীঁ। থোড়ী বাত অচ্ছি হ্যায়। অধিক নেহীঁ বোল সকতা। সারা দিন চুপচাপ বৈঠা রহতা হুঁ। আওর কভী কভী এ্যাইসী হী সার বাত বোলতা হুঁ। গুরু মহারাজ, সত্যনারায়ণ সব মঙ্গল কর দেংগে।

ভক্ত — মহারাজ, বড়ী শান্তি হোতী হ্যায় য়হাঁ আনেসে।

মহাপুরুষ — উধর ঊপর দো মঞ্জিলেঁ পর ঠাকুরঘরমেঁ জানা চাহিয়ে। জাও, একদফে জানা জরুর চাহিয়ে। ও আচ্ছা হ্যায়। দর্শন প্রণাম করনা চাহিয়ে — অউর প্রসাদ লেনা।

স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দের প্রবেশ। ইনি মঠের ম্যানেজার।

মহাপুরুষ — ইনি ও বাড়িটা কিনবেন (মঠের দক্ষিণ দিকের)। কে একজন মুসলমান খরিদ্দারও রয়েছে। এঁকে নিয়ে যাও ঠাকুর ঘরে, দর্শন করে আসুন। আর প্রসাদ দিও। সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে।

মারোয়াড়ী ভক্তটি ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া উঠিলেন। যাইবার পূর্বে পকেট হইতে কয়েকটা এলাচদানা বাহির করিলেন। মহাপুরুষ হাত পাতিয়া লইলেন। আর সবগুলিই একসঙ্গে মুখে ফেলিয়া দিলেন — শ্রদ্ধার দান, তাই সময় ও স্বাস্থ্যের বাধা না মানিয়া।

শ্রীম — ভক্তিতে সব শুদ্ধ হয়। এই একটি থাকলে সব আছে। এটার অভাবে সব নষ্ট। ভক্তের কাছে ভগবান বাঁধা পড়েন।

পাঠ চলিতেছে।

৩

বেলুড় মঠ। খোকা মহারাজের ঘর। আজ ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি, ১৩৩৫ সাল। শ্রীমহাপুরুষ খাটে বসিয়া আছেন দক্ষিণাস্য। এখন এগারটা। একটি ভক্ত স্ত্রীলোক আসিয়া প্রণাম করিলেন। ইনি মহাপুরুষের মন্ত্রশিষ্যা। কুশল প্রশ্নাদির পর ভক্তটি অতিশয় ভক্তিভরে নিজের আর্তি নিবেদন করিতেছেন।

ভক্তমহিলা — গুরুদেব, আমার কি হবে? অনেক খুঁজে আপনাকে পেয়েছি। আমার কি ভগবানদর্শন হবে?

মহাপুরুষ — হাঁ মা, হবে। বলছি, হবে হবে হবে।

ভক্ত মহিলা (অধিকতর আর্তির সহিত) — বলুন, গুরুদেব হবে কি না? তাঁকে পাব, তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হবে?

মহাপুরুষ — হবে মা হবে। বলছি তো হবে। একশ’ বার কি বলতে হয় মা? হবে। তোমার কিছু ভাবনা নাই।

ভক্ত মহিলা (কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া) — আমরা গেরস্থ লোক, সর্বদা ঘরে কোলাহল। জপধ্যান যেরূপ করা উচিত সেরূপ হয়ে উঠে না। আচ্ছা, যেখানে সুবিধা সেখান জপ করতে পারি কি? (ঠাকুরের ছবির সামনে জপ না করিলে কি কোনও দোষ হইবে — এই অভিপ্রায় ভক্তটির)।

মহাপুরুষ — হাঁ। সকাল সন্ধ্যায় একটু দেখে প্রণাম করবে।

ভক্ত মহিলা — ছাদের উপর, কি কোনও নির্জন স্থানে বসতে পারি কি? সংসারীদের শত অসুবিধা।

মহাপুরুষ — তারই মধ্যে একটু —। হাঁ, ছাদে বসবে।

স্বামীজীর ঘরের কোণে একটি সাধু বসিয়া এই কথোপকথন শুনিতেছেন। ভক্তিমতীর সরল ও অকপট প্রার্থনা শুনিয়া সাধুটি ক্রন্দন করিতেছেন। এই ভক্ত মহিলার সকরুণ আর্তি দেখিয়া তিনি বাইবেলোক্ত মার্থার ভগিনী মেরীর কথা হৃদয়ে স্মরণ করিতেছেন। ভাবিতেছেন — এঁর ঈশ্বরে ভালবাসা হয়েছে মেরীর মত। 'Mary has chosen the good part, which shall not be taken away from her. (Luke 10/42) (মেরী যে দুর্লভ জিনিসটি বরণ করেছেন, সেটি কখনও

তাঁর নিকট থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না)।

যে 'one thing needful' (যে পদার্থটি অত্যাবশ্যক) প্রেম — এ ভক্তটির তাহা লাভ হইয়াছে। সাধুটি ক্রন্দন করিতেছেন আধ ঘন্টার উপর। আর ঠাকুরকে প্রার্থনা করিতেছেন, ঠাকুর আমায় দেখা দাও। তোমায় পেলেই দুর্বল মন সবল হয়। কুটিলতাময় এই সংসারে তোমায় ছেড়ে ক্ষণকাল থাকলেও মন কুটিলতায় বিজড়িত হয়ে পড়ে। আমি সংসারের পক্ষে নেহাৎ অনুপযুক্ত। আমায় দর্শন দিয়ে আমার মনকে শক্ত সবল করে দাও। এখন তো শক্ত নয়। কার জোরে সবল করবো? তোমার কৃপাশক্তি ছাড়া সংসারের কোনও বস্তুতেই মন সবল হয় না। বাপ, দেখা দাও তোমার অবোধ সন্তানকে।

অপরাহ্ন পাঁচটার সময় শ্রীমহাপুরুষ ঐ ছোটঘরের খাটের উপর বসা। নিচে মেঝেতে কয়েকজন ভক্ত বসিয়াছেন। দুইটি ভক্ত স্ত্রীলোক ও একজন পুরুষ আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। লোকের ভীড় হওয়ায় মহাপুরুষের কষ্ট হয়। তিনি উঠিয়া বারান্দায় ধীরে ধীরে পা টানিয়া টানিয়া বেড়াইতেছেন উত্তর-দক্ষিণ। চলিবার সময় অসুস্থতায় একটু সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন।

ভক্ত স্ত্রীলোক দুইটি যুক্তকরে অতিশয় ভক্তিভরে শ্রীমহাপুরুষকে দর্শন করিতেছেন। তাঁহাদের মুখমণ্ডল দেখিয়া মনে হয়, যেন মন প্রাণ শান্তি ও আনন্দে ভরপুর হইয়া আছে। এক দৃষ্টিতে কেবল দর্শনই করিতেছেন। প্রশ্নও নাই, উত্তরও নাই। কিন্তু এই মৌন ব্যবহারে সকলের হৃদয় পরিপূর্ণ। অবতারাদির এই অপার্থিব দৈবী সম্পদ যাহারা উপভোগ করিতে পারে ক্ষণকালের জন্যও, সত্যই তাহারা ধন্য। প্রায় ভগবানদর্শনের আনন্দে ক্ষণকালের জন্য জগৎ ভুলিয়া এই ভক্তগণ উন্মনা, সমাধিগ্রস্ত। ব্যক্তিত্বের কি আশ্চর্য প্রভাব!

সকালে যে ভক্ত মহিলাটি শ্রীমহাপুরুষকে দর্শন করিয়া ভগবান-দর্শনের আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন তিনি আবার আসিলেন। আজ সারাদিনই মঠবাস করিতেছেন। এখন ঘরে ফিরিয়া যাইবেন। তাই ছোট ঘরের ভিতর দরজার কাছে দাঁড়াইলেন।

ভক্ত মহিলা (অতি বিনীতভাবে প্রার্থনার স্বরে) — বাবা, আমার

দর্শন হবে কি? এবার আমি বাড়ি যাবো।

মহাপুরুষ বেড়াইতেছিলেন, দাঁড়াইয়া চক্ষু বুজিয়া প্রার্থনা করিতেছেন — আর ঐ ভক্তটি পাদমূলে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিতেছেন। ভক্তটি বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

আজ আবার পূর্ণিমা। এখন রাত্রি সাড়ে ছয়টা। আরতি হইয়া গিয়াছে। আকাশ সুনির্মল। গঙ্গায় কুয়াশা নাই। জোয়ার আসিয়াছে। শীতও অতি সামান্য আজ। পূর্ণিমা লাগিবে আটটায়। গঙ্গার ধারের বারান্দায় আজ মহাপুরুষ মহারাজ নৈশ আসর পাতিয়া বসিয়াছেন চেয়ারে, পূর্বাস্য। অনেকগুলি সাধু ও ভক্ত সমাগত। কেহ সম্মুখে বসিয়া আছেন, কেহ এদিক-ওদিক দাঁড়াইয়া আছেন। কোনও কথা নাই, কিন্তু কি এক নির্বাক আনন্দে আজ সকলের হৃদয় পরিপূর্ণ।

পূর্বাকাশ আলো করিয়া ঐ চন্দ্রিমার উদয় হইতেছে। গঙ্গার জল ঝক্মক্ করিতেছে। আজ সাধু ও ভক্তের হৃদয়কমল বুঝি ব্রহ্মচ্ছটায় উদ্ভাসিত।

শ্রীমহাপুরুষ (একজন ভক্তের প্রতি) — ঠাকুর ঘরে গিয়ে বসা ভাল। পূজা, আরতি, পাঠ, সাধুদের ধ্যানজপ — এসব দর্শনে উদ্দীপন হয়। আগে লোকেরা ঠাকুরবাড়ির কাছে এসে থাকতো দূর থেকে বাড়ি উঠিয়ে এনে — সর্বদা দর্শনাদি হবে বলে। যে পরিবেশে থাকে, তারই রং লাগে মনে। ব্রহ্মানন্দের আভাস পাওয়া যায় হৃদয়ে অজানাভাবে। ভগবানের বিশেষ আবির্ভাব রয়েছে মন্দিরে। তিনিই সংসারতপ্ত জীবগণের জন্য তীর্থ, মন্দির ও দেবালয়ে প্রকাশিত।

শ্রীম স্থির হইয়া বসিয়া চক্ষু বুজিয়া একাগ্রচিত্তে ডায়েরী পাঠ শ্রবণ করিতেছেন।

শ্রীম — এ কি আর বলতে! এ কি শ্রীমহাপুরুষ বলছেন? ঠাকুরই এঁদের মুখ দিয়ে কথা কইছেন। (সাধুর প্রতি) — আর আছে কি?

সাধু — আজ্ঞে হাঁ।

সাধু আবার পাঠ করিতে লাগিলেন।

বেলুড় মঠ। ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার। সকাল সাড়ে পাঁচটা। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ নিজের ঘরে খাটের উপর বসিয়া আছেন।

খুব উচ্চস্বরে বলিতেছেন — ওঁ নমো শিবায়, ওঁ নমো শিবায়, ওঁ নমো শিবায়। মাঝে কিছুক্ষণ বিরাম। আবার বলিতেছেন — ওঁ নমো শিবায়, ওঁ নমো শিবায়, ওঁ নমো শিবায়। বারবার এরূপ করিতেছেন। খুব উদ্দীপনাময়ী বাণী।

একটি সাধু স্বামীজীর ঘরে টেবিলের উত্তর দিকে বসিয়া জপ করিতেছেন। ঐ শিবধ্বনি শুনিয়া তিনি প্যাসেজে দাঁড়াইয়া শ্রীমহাপুরুষকে দর্শন করিতেছেন। বেশ জোরে বলিতেছেন। আজ যেন শিবময় হইয়া গিয়াছেন — হয়তো শিবদর্শন করিয়াছেন।

সাধু পৌনে সাতটায় শ্রীমহাপুরুষকে প্রণাম করিতে ঘরে ঢুকিলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন আর মহাপুরুষ উচ্চ স্বরে ঐ ধ্বনি করিতেছেন, ওঁ নমো শিবায়, ওঁ নমো শিবায়, ওঁ নমো শিবায়। আজ কি সব শিব দেখিতেছেন? মাঝে মাঝে এক একবার বলিতেছেন — ওঁ নমো অনন্তায়।

স্বামী নিখিলানন্দ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। আবার বলিতেছেন — ওঁ নমো নিখিলানন্দায়, ওঁ নমো নিখিলানন্দায়।

আজ শিবময় জগৎ দেখিতেছেন বুঝি! একটি অদ্ভুত সরস আনন্দময় ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে আজ।

৪

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। আজ ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার। পৌষ মাস। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। মহাপুরুষ খাটে বসা। মাঝে মাঝে হুঁকার নলটায় এক আধবার টান দিতেছেন। এখন সকাল সওয়া সাতটা। সাধুরা প্রণাম করিতে আসিতেছেন। ঘরে আছেন স্বামী ধ্রুবেশ্বরানন্দ, ওঁকারানন্দ, বিশ্বাত্মানন্দ প্রভৃতি। খুব আনন্দময় ভাব মহাপুরুষ মহারাজের।

শ্রীমহাপুরুষ (আহ্লাদের সহিত স্বামী ওঁকারানন্দের প্রতি) — আজ সকাল থেকেই কেবলই মনে হচ্ছিল মা'র কথা। বিশেষ করে এই ঘটনাটি।

দেশ থেকে বাপের সঙ্গে আসছেন গঙ্গাস্নানে। রাস্তায় জ্বর হল, বেহুঁশ। রাত্রে একটি কালো মেয়ে এসে বললে, আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে

এসেছি।

গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। আর সব অসুখ আরাম হয়ে গেল। এইটি কি অদ্ভুত, আশ্চর্য ব্যাপার! বোঝবার যো নাই, এ কি mystery (রহস্য)! কি বলবে একে বাংলায়?

ওঁকারানন্দ — অলৌকিক।

মহাপুরুষ (সমর্থন করিয়া) — হাঁ, অলৌকিক আর কি। এ অদ্ভুত রহস্য বোঝবার যো নাই।

শ্রীম — এ সবই অবতারলীলার সমর্থক। ভগবান মানুষ হয়ে যখন আসেন তখনই এসব দৈবলীলা প্রকট হয়।

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, বড়দিন। বেলা পৌনে আটটা। গঙ্গার দিকের বারান্দায় মহাপুরুষ বেড়াইতেছেন। বম্বে হইতে একটি ভক্ত আসিয়াছেন, স্বামী বিশ্বানন্দ পাঠাইয়াছেন। মহাপুরুষ তাঁহাকে স্বামীজীর ঘর দেখাইয়া বলিতেছেন, 'In this room Swamiji lived and died. We do not use the word 'die'. We say, 'gave up the body'. He lived here, practised here, taught here and gave up his body here. So, It is so holy to us – a sanctuary. we have preserved it. (এই ঘরে স্বামীজী বাস করেছেন। এই ঘরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আমরা ‘মৃত্যু’ শব্দটি ব্যবহার করি না। বলি, শরীর ত্যাগ করেছেন। তিনি এই ঘরে বাস করেছেন। সাধন করেছেন এখানে। ধর্ম প্রচার করেছেনও এখানে। আবার শরীরত্যাগও এখানেই করেছেন। তাই এ ঘরটি আমাদের কাছে অতি পবিত্র — এটি মন্দির। আমরা এই ঘরটি মন্দিরের মতই রেখেছি।

মহাপুরুষের গায়ে খয়েরী রং-এর একটি জামা। মাথায় কানঢাকা টুপি। পায়ে মখমলের চটি।

খোকা মহারাজের ছোট ঘর দ্বিতলের। এখন প্রায় সন্ধ্যা ছয়টা। মহাপুরুষ খাটের উপর বসিয়া আছেন। নিচে মেঝেতে বসা সুন্দর বসু। ইটালীতে বাড়ি, যুবক। নামেও সুন্দর, চেহারাতেও সুন্দর। ‘লক্ষ্মী বিলাস’-তৈলবিক্রেতাদের দৌহিত্র। নববুবক। সাধু হইবার অল্পস্বল্প ইচ্ছা আছে।

স্বামীজীর ঘরের পাপোশে দাঁড়াইয়া একটি সাধু কথোপকথন শুনিতেছেন।

শ্রীমহাপুরুষ (সুন্দরের প্রতি) — বাবা, বাহ্য সন্ন্যাস সন্ন্যাসই নয়। ভিতরের সন্ন্যাসই ঠিক সন্ন্যাস। তাঁর ধ্যান জপ চিন্তাতে ডুবে যাও, সমাধি হয়ে যাক — সেই সন্ন্যাস! ও বাইরের সন্ন্যাস কিছুই নয়।

গেরুয়া পরে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করে খাওয়া — এ কিছু নয়। এ তো অনেক আছে। এর সংখ্যা যত কমে ততই ভাল। তোমার তো কিছুর অভাব নাই। তোমার ঠাকুরদাদা কি সব রেখে গেছেন তোমার জন্য।

সুন্দর — দিদিমা রেখে গেছেন।

শ্রীমহাপুরুষ (সংশোধন করিয়া) — হাঁ দিদিমা। দু'টি দু'টি খাও আর তাঁর চিন্তাতে ডুবে যাও। আর সৎগ্রন্থ পড়বে। দয়ার কাজ করবে। এই তো সন্ন্যাস! ঐ বাইরের সন্ন্যাস কিছুই নয়।*

আগামী কাল শ্রীমহাপুরুষের জন্মোৎসব।

শ্রীম (নীরবতা ভাঙ্গিয়া) — সত্যই তো বলেছেন। বাহিরের সন্ন্যাস তো মাত্র সাইন বোর্ড। মনও সঙ্গে সঙ্গে রাঙ্গান চাই। ঠাকুর বলতেন, কথাটা হচ্ছে সচ্চিদানন্দে প্রেম।

সাধু আবার ডায়েরী পাঠ করিতে লাগিলেন।

বেলুড় মঠ। ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার। শ্রীমহাপুরুষ নিজ কক্ষে খাটের উপর বসিয়া আছেন, পশ্চিমাস্য। সামনে একটি স্টুলের উপর হুঁকা। তাহাতে একটা কাঠের লম্বা নল। মুখের কাছে নলটা। ঘরে সাধুরা কেহ আছেন। হীরেন মহারাজ জানালার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন।

এখন সকাল সাতটা। সাধুরা প্রণাম করিতে আসিতেছেন।

শ্রীমহাপুরুষ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছেন। শেষের পদটি অতি আন্তরিকভাবে আবৃত্তি করিতেছেন বারংবার —

'ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।'

**এই যুবক পরে ত্যাগজীবন যাপনের জন্য দেওঘর বিদ্যাপীঠ গিয়াছিল। কিন্তু থাকিতে পারিল না। মহাপুরুষ অহেতুক কৃপাসিন্ধু। তিনি পূর্বেই তাহাকে পথ দেখাইয়া দিলেন, গৃহে থাকিয়া ধর্ম কর!*

এক একবার বলিতেছেন, 'সচ্চিদানন্দ গোবিন্দ'।

মহাপুরুষের মনটি যেন কোন সুন্দর সুখময় দেশে বিচরণ করিতেছে। মুখমণ্ডল প্রসন্ন ও আনন্দময়! হঠাৎ নিজ মনে হাস্য করিতেছেন আর চক্ষু মেলিয়া বলিতেছেন, ঠাকুর রাত তিনটা থেকে উঠে এই রকম নাম করতেন প্রায় এই সময় পর্যন্ত। তিনটায় উঠে হাতমুখ ধুয়ে চারটা থেকে — এখন ক'টা?

একজন — সাতটা।

মহাপুরুষ — হাঁ, এ সময় পর্যন্ত নাম করতেন।

একজন সাধু — এক নামই রোজ করতেন?

মহাপুরুষ — না। যখন যে ভাবে থাকতেন সেইটাকে নিয়ে নানা রকম নাম করতেন সেই ভাবের। যখন যে ভাব আসতো ছাড়তেন না।

মহাপুরুষ পুনরায় অন্তর্মুখ, নীরব। আবার বলিতেছেন।

মহাপুরুষ — তখন তাঁর কাছে অন্য লোক থাকতো না। মহারাজ পরে কিছুদিন ছিলেন। রামলালদাদা এক একবার এসে দেখে যেতেন। উনি মন্দিরের কাজে ব্যস্ত থাকতেন।

সকাল সাড়ে সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। মহাপুরুষ ঘর হইতে উঠিয়া আসিয়া গঙ্গার ধারের বারান্দায় বসিলেন চেয়ারে, ছোট ঘরের পাশে। কাছে শৈলেশ।

একটি সাধু বারান্দা ঝাড়ু দিয়া ঝাঁটা রাখিতে যাইতেছেন ছাদে। তিনি শুনিলেন মহাপুরুষ বলিতেছেন, তুলসীদাসের রামায়ণ ভারি মধুর (হাস্য)।

একবার মা, যোগেন স্বামী এঁরা কৈলোরে শোন নদীর উপর রয়েছেন। আমি যাচ্ছি ওঁদের কাছে। পথে এক জায়গায় রাত্রিবাস করছি। দু'টি কুলী, কি এই রকম সামান্য লোক, আমাকে রামায়ণ পড়তে বললো। ওরা পড়তে জানে না। আমি পড়লাম। তা কত ভক্তিভরে শুনলো। চলে যাবার সময় একটি টাকা দিতে চাইলে আমি নিই নাই, মনে হয়। ভারি মধুর বই। আর ওদের বড় বিশ্বাস!

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। মহাপুরুষ দোতলার অফিস ঘরে বসিয়া আছেন দক্ষিণের জানালার সামনে চেয়ারে, উত্তরাস্য। গায়ে গরম কোট। তাহার উপর ফ্ল্যানেলের র‍্যাপার জড়ান। মাথায় কানঢাকা সাধুর টুপি। পা দুইটি

একটি গরম র‍্যাপারে ঢাকা। সোজা হইয়া বসিয়াছেন, পিঠটা চেয়ারে লগ্ন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সুর করিয়া গায়ত্রীর আবাহন করিতেছেন —

'আয়াহি বরদে দেবী ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী।
গায়ত্রী ছন্দসাম্ মাতঃ ব্রহ্মজ্যোতিঃ নমস্তুতে॥'

খানিকটা নীরব ধ্যান। আবার গাহিতেছেন —

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণং উদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।'

সেবক শঙ্কর দরজার গোড়ায় মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অপর সেবক মতি দরজার বাহিরে। সাধুরাও কেহ কেহ এদিক ওদিক দাঁড়ান। সকলে এই নির্বাক আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। শ্রীমহাপুরুষের মস্তকোপরি একটি ক্ষীণজ্যোতি নীল রং-এর বালব জ্বলিতেছে। কি প্রশান্ত ভাব!

শ্রীম (গম্ভীরভাবে) — ঠাকুরের ভাবের প্রতিমূর্তিই তো তিনি। পড়ুন তারপর।

সাধু আবার ডায়েরী পাঠ করিতে লাগিলেন।

বেলুড় মঠ। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ। মঙ্গলবার। সকাল সাতটা। মহাপুরুষের ঘর। মহাপুরুষ খাটে বসা। একটি সাধু তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মহাপুরুষ সাধুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

মহাপুরুষ — কোন্ ডাক্তারের কাছে গিছলে?

সাধু — শ্যামাপদবাবুর opinion (পরামর্শ) নিয়ে অমরবাবুর কাছে গিছলাম।

মহাপুরুষ — কি বললেন ওঁরা?

সাধু — অমরবাবু বলেন এটা nervous pain (স্নায়বিক ব্যথা)। শ্যামাপদবাবু বলেন fermentative dyspepsia (অজীর্ণ রোগ)। ওতে পেটে গ্যাস হয়। সেই গ্যাস ওপরে ওঠে। তখন বুকে-পিঠে pain (বেদনা) হয়। আর তখন বসতে পারি না, শুয়ে পড়তে হয়।

মহাপুরুষ — ও বাবা! অমরবাবু আর কি বললেন?

সাধু — আমায় আর কিছু বললেন না। বললেন, ওঁদের (মঠের

বড়দের) বলবো।

মহাপুরুষ — তাই ভাল। এ বেশ।

শ্রীম — এ ডায়েরী পড়ে কত ভক্তদের উপকার হবে। ঠাকুরের ভাব তাঁর সন্তানের ভিতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত জগতে। আরও পড়বে। দেখো না কথামৃতই কেমন করে রাখালেন! এ কি মানুষের কাজ! উনিই যন্ত্র বানিয়ে লেখালেন, জীবনে আনালেন, আর আপন কাজ করালেন।

দেখছি, এ ডায়েরী দিয়ে প্রভূত উপকার হবে ভক্তদের। ঠাকুরের ছেলেরা কি কম! তাঁরই অংশ!

সাধু মিষ্টিমুখ করিয়া প্রণামান্তে বিদায় লইলেন। উনি বেলুড় মঠে যাইবেন। যাইবার সময় শ্রীম বলিলেন, শ্রীমহাপুরুষকে আমার প্রীতি নমস্কার জানিও।

বেলুড় মঠ।
৩১শে ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার।

পঞ্চম অধ্যায়

কি দেবদৃশ্য সন্ন্যাস

১

মর্টন স্কুল, ৫০ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীট। চারতলায় শ্রীম নিজকক্ষে খাটে বসা। এখন সকাল নয়টা। আজ ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ সাল, শুক্রবার।

বেলুড় মঠ হইতে আনন্দ আসিয়াছেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীম অতি স্নেহভরে আদর করিয়া তাঁহাকে পাশে একটি চেয়ারে বসিতে বলিলেন। আনন্দ চেয়ার টানিয়া শ্রীম-র কাছেই বসিলেন।

শ্রীম মঠের সংবাদ লইলেন। কুশলপ্রশ্নাদির পর শ্রীমকে আনন্দ ডায়েরী পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন। শ্রীমর-ই আদেশে এই সাধু নিত্য ডায়েরী লেখেন। তিনি বলেন, মঠের সংবাদ মানে অমৃতত্ত্বের সংবাদ।

ডায়েরীপাঠ সুরু হইল।

বেলুড় মঠ। ১লা জানুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার। ১৭ই পৌষ, ১৩৩৬ সাল। আজ মঠে কল্পতরু উপলক্ষ্যে অনেক সাধু, ভক্তের সমাগম হইয়াছে। ঠাকুরঘর প্রচুর পরিমাণে পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত হইবে। আজ মহাপুরুষ মহারাজের একটি অপরূপ ভাব। আনন্দ স্বামীজীর ঘর হইতে প্যাসেজে আসিয়া শুনিলেন, শ্রীমহাপুরুষ উচ্চস্বরে বলিতেছেন, 'ওঁ নমো রামকৃষ্ণায়... জয় রামকৃষ্ণ, জয় ঠাকুর কল্পতরু... সচ্চিদানন্দ রামকৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রামকৃষ্ণ ... অহেতুক কৃপাসিন্ধু গুরুদেব।' আনন্দ ভাবিতেছেন, আজ বুঝি উনি রামকৃষ্ণময়।

শ্রীমহাপুরুষ ঘরে খাটে বসিয়া আছেন। এখন পৌনে আটটা। তিনি বলিতেছেন, একবার এই সময় এলাহাবাদে রয়েছি এক মাড়োয়ারীর বাড়িতে। গঙ্গার উপর বাড়ি। খুব উঁচু ঘর। ওরা একটা গান গাইতো — 'রাম সুধারে...।' ওরা খুব ভক্ত লোক। সাধুসেবা করে।

বেলুড় মঠ। সন্ধ্যা পৌনে ছয়টা। আজ ৩রা জানুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ,

শুক্রবার, ১৯শে পৌষ, ১৩৩৬ সাল। শীতকাল।

স্বামীজীর ঘরের প্যাসেজ।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ আফিস ঘর হইতে বাহির হইয়া প্যাসেজে ঢুকিতেছেন। সামনে দাঁড়ানো একজন সাধু। তাঁহাকে দেখিয়াই বলিতেছেন, কি আনন্দ, কেমন আছ? সাধু প্রসন্নভাবে উত্তর করিলেন, ভাল আছি মহারাজ। মহাপুরুষ বলিলেন — আহা, ভাল থাক। তাঁর কৃপায় ভাল থাক।

শ্রীমহাপুরুষ দ্বিতলের গঙ্গার দিকের বারান্দায় যাইতেছেন। গায়ে ফিকে গেরুয়া র‍্যাপার জড়ান। মাথায় কানঢাকা গরম টুপি। পায়ে মোজা ও কার্পেটের চটি। টলিতে টলিতে চলিতেছেন। পশ্চাতে সাধু। বলিতেছেন, চলতে পারছি না। সাধু বলিলেন, অসুখ — আবার বুড়ো শরীর, তাই। মহাপুরুষ উত্তর করিলেন বালকের মত নিজের কষ্ট প্রকাশ করিয়া — না, বুক খারাপ তাই টলতে হয়।

একটি অসুস্থ সাধুর মনের রূপরেখা শ্রীম শুনিতেছেন।

এই সাধুটির শরীর খারাপ। ডাক্তারদের কথা শুনিয়া মনও খারাপ হইয়াছে। তিনি বিগত কিছুদিন হইতে তাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তিনি ভাবিতেছেন, এ সময় চারদিক চেয়ে সংসারে কাউকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না যার ছায়ায় দাঁড়ান যায়। সঙ্ঘের আশ্রয় গুরুদেব। তিনিও বার্ধক্যে ও রোগে বালকস্বভাব হয়ে গেছেন। তিনি অপরের সেবার অধীন। কয়দিনই মনে হয়েছে, মহাপুরুষ মহারাজকে বলি ঠাকুরকে বলতে, যাতে আমার মনে জোর দেন, শক্তি দেন। আমার বেশী বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত করেন। আর যাতে ঠাকুরের শরণাগত হয়ে থাকতে পারি তাই করে দেন।

শরীর তো পড়েই গিয়েছে। তবে একেবারে invalid (অকর্মণ্য) না হয়ে যতটুকু পারা যায় তাঁর সেবা করা। অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলে কত কষ্ট। কয়েকজন সাধুকে দেখেছি এই কষ্ট ভোগ করতে। আবার ঝোঁকের মাথায় বেশী খেটে খেটে অসুখ করার জন্য দোষী নিজেকেই হতে হয়। ইহাও আমার নিজের ব্যাপারেই দেখেছি। এখন দাঁড়াই কোথায় — midway (মধ্যপন্থা) কোথায় — অত্যধিক খাটা ও একেবারে না খাটার? নিজের বুদ্ধিতে এই মিডওয়ে খুঁজে পাচ্ছি না। তবে এটা বুঝেছি, পথ —

তাঁর শরণাগত হওয়া।

ঠাকুর বলতেন, দোষেগুণে মানুষ। তেমনি সঙ্ঘ। সঙ্ঘে থাকতে গেলে সকলে সকলের কষ্ট বোঝে না। আবার বাইরে গেলেও তো কত কষ্ট! কত বিষয়ী লোকের সঙ্গে থাকতে হয়। অপরের কাছে হাত পাততে হয়।

তা ছাড়া শরীর যতদিন আছে ততদিন প্রকৃতির বশেই কাজ কিছু করতেই হবে, যেখানেই থাকি না কেন? তবে সঙ্ঘের আশ্রয়ে থেকে কাজ করাই ভাল। যা হয় হবে।

প্রথমে আমার অন্তরের ভাব বুঝতে না পেরে অল্প কাজের জন্য সমালোচনা করলেও পরে ক্রমে সকলে আমার ভাব জানতে পারলে আর কিছু বলবেন না।

সাধুজীবন যে উত্তম জীবন এতে কিছুমাত্র ভুল নাই। তাই নিয়েই জীবনধারণ করতে হবে। রোগ থাকে থাকুক। এরই মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখপানে চেয়ে থাকতে হবে। সাধুজীবন ও শরণাগতি এই দুই-ই আশ্রয়।

শ্রীম — হাঁ, পথ তো একই, তাঁর শরণাগত হওয়া। অন্য পথ নাই। 'নান্যপন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়' — এটি ঋষিদের কথা। বেদের অতি প্রাচীন সিদ্ধান্ত। বেশ বিচারটি ধরেছ। দেখলে, ঠাকুর কেমন ভক্তের সঙ্গে সর্বদা থাকেন। তিনিই তো তোমার মনে প্রবেশ করে এই সদ্‌বুদ্ধি দিয়েছেন। তিনি সর্বমঙ্গলময়। এটা বুঝে সংসারে থাকা, এতেই অর্ধজীবন্মুক্ত।

পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার। সকাল সাতটা। মহাপুরুষের ঘর। মহাপুরুষ খাটে বসিয়া আছেন। মাথায় টুপি, গায়ে র‍্যাপার জড়ান। সামনে একটি স্টুলের উপর হুঁকা, নলটা মুখের কাছে, এক একটা টান দিতেছেন। আর প্রণামরত সাধু ব্রহ্মচারীদের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন — ভাল আছ?

স্বামী শর্বানন্দ, স্বামী নির্বাণানন্দ, স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ ও অপর একটি সাধু মহাপুরুষের ঘরে প্রণামের পর দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামী শর্বানন্দ পশ্চিম-দক্ষিণের জানালারা কাছে। স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ তাহার উত্তরে টেবিলের গায়ে, স্বামী নির্বাণানন্দ খাটের দক্ষিণে। আর একটি সাধু দরজার কাছে দাঁড়ান।

মঠের কতিপয় সাধু স্বতন্ত্র একটি সঙ্ঘ করিয়াছেন কলিকাতায়। তাহার কথা হইতেছে। ঠাকুরের একজন সন্তান উহার প্রধান।

শ্রীমহাপুরুষ তাচ্ছিল্যের সহিত হাসিয়া বলিলেন — দল করেছে — হেঁ হেঁ হেঁ। বুড়ো বয়সে কত কি করছে। মহামায়ার লীলা বোঝা যায় না।

একজন সাধু — অমুক অমুক তার মেম্বার হয়েছেন।

মহাপুরুষ — হোক না, কত লোক তো কত কি করছে। তবে তোমরা ঠাকুর, স্বামীজী, মা, মহারাজ — এঁদের সূত্র ধরে ধরে যাও — নিজের কর্তব্য করতে করতে যাও। করুক না — কতো লোক তো কত করছে।

স্বামী শর্বানন্দ — অমুক অত mean (হীনবৃত্তি) নন। নিজের ভাবে আছেন। কিন্তু ইনি দেখছি revenge (প্রতিশোধ) নিচ্ছেন।

মহাপুরুষ (উত্তেজিত হইয়া) — আরে এ কি করছে? মহামায়া, মহামায়া। বুড়ো বয়সে এতো রস গজগজ করছে।

স্বামী শর্বানন্দ — অমুক ওতে যোগদান করেন নাই।

মহাপুরুষ — সে বুদ্ধিমান ছোকরা। ও যায় নাই, ওর মন নাই। আরে রাম, ও তো সংসারীদের কাজ। সাধন নাই, ভজন নাই, ত্যাগ তপস্যা নাই। এ তো সংসারীদের কাজ।

স্বামী নির্বানানন্দ — অমুক মহারাজ অনেকটা ভাল। ক্রমে ক্রমে বুঝছেন।

মহাপুরুষ — তাই ভাল। ও বুঝে শুনে সব কাজ করে। বুদ্ধিমান ছোকরা।

সন্ধ্যার আরতি হইয়া গিয়াছে। এখন সাড়ে ছয়টা।

শ্রীমহাপুরুষ দোতলার ছোট ঘরে বসিয়া আছেন খাটের উপর, পশ্চিমাস্য। স্বামী শংকরানন্দ নিচে বসা। তিনি বিকালে কলিকাতা হইতে মঠে আসিয়াছেন। এখন চলিয়া যাইবেন।

স্বামী শংকরানন্দ (দীনভাবে) — মহারাজ, আশীর্বাদ করুন যেন তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হয়। আর মনটা যেন ভাল থাকে, স্থির থাকে।

মহাপুরুষ — হ্যাঁ বাবা, প্রাণ থেকে এই বলছি ঠাকুরকে — ঠাকুর, মন ভাল করে দাও, অচলা ভক্তি দাও। হিমালয়ের ন্যায় ভক্তি হয়। দৃঢ়া ভক্তি হোক। ঠাকুর, মনটা ভাল করে দাও, শরীরটা ভাল করে দাও।

একটি সাধু এই দৈবী আশীর্বাণী শুনিতেছেন প্যাসেজে দাঁড়াইয়া, স্বামীজীর ঘরের সম্মুখে। তিনি ভাবিতেছেন, আহা, কি প্রাণখোলা প্রার্থনা, কি কৃপা! সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে কল্যাণচিন্তা করছেন, সমগ্র মনপ্রাণে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছেন।

২

পরের দিন সকাল সাতটা। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। মহাপুরুষ খাটে উপবিষ্ট, গরম র‍্যাপার জড়ান। আনমনে হুঁকার নলটা টানিতেছেন। মন অন্তর্মুখীন। শান্তিপাঠ করিতেছেন —

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তি।

ঘরের ভিতরে আছেন বড় হীরেন মহারাজ, নাঞ্জাপ্পা ও আর একজন সাধু।

একটি সাধু ভূমিষ্ঠ প্রণাম ও পাদুকা স্পর্শ করিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিতেছেন — গুরুদেব, মনটা ভাল করে দাও, শক্তিশালী করে দাও।

পাঠ চলিতেছে।

মঠের পুরাতন বিল্ডিং-এর দ্বিতলের বারান্দা — সম্মুখে গঙ্গা। অপরাহ্ন তিনটা। মঠের সাধুদের মিটিং বসিয়াছে। আজের মিটিং-এর উদ্দেশ্য, মঠের সাধুদের শ্রীমহাপুরুষ বলেন, তাঁহারা যেন ওয়ার্কিং কমিটির কথা মান্য করেন সকলে। তুরীয়ানন্দ মহারাজের জীবন মোটেই আলোচনা হয় নাই, যদিও ইহা উপলক্ষ করিয়াই সকলে সমবেত হইয়াছেন। আজ ১২ই জানুয়ারী ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, পৌষের শুক্লা চতুর্দশী।

শ্রীমহাপুরুষ ইজি-চেয়ারে বসা। পিছনে স্বামীজীর ঘরের বারান্দার দরজা। বাম হাতে প্যাসেজ। সাধুরা মেঝেতে সতরঞ্জির উপর বসিয়াছেন। কেহ খোকা মহারাজের ঘরে। কেহ বা রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পিছনে গঙ্গা।

উপস্থিত — স্বামী শংকরানন্দ, শর্বানন্দ, মাধবানন্দ, ওঁকারানন্দ, শাশ্বতানন্দ, নিখিলানন্দ, দেবেশানন্দ, ঈশানানন্দ, নিত্যাত্মানন্দ প্রভৃতি

সাধুগণ।

একজন সাধু বক্তৃতার নোট লইতেছেন। উহা প্রকাশিত হয় উদ্বোধন, প্রবুদ্ধ ভারত ও বেদান্ত কেশরীতে। প্রকাশিত হইলে দেখা যায় উহাতে কিছু বাদ পড়িয়া গিয়াছে। তাই আর একজন সাধুর ডায়েরী হইতে নিম্নে ঐ অংশ সংযোজন করা হইল।

শ্রীমহাপুরুষ — হরি মহারাজকে শ্রীমহারাজ বলতেন শুকদেবতুল্য। সারা জীবন তপস্যা করেছেন। শেষে তবুও লোকের উপকার হলো (অসুখে সেবার সময়)।

স্বামী মাধবানন্দ (শ্রীমহাপুরুষের প্রতি) — কাজ করতে চায় না কেউ, ধ্যান করতে চায়। কাজ করতে গেলে লোকের সঙ্গে মিশতে হয়। তাই কাজে যেতে চায় না।

শ্রীমহাপুরুষ (করুণামাখা স্বরে, অনুরোধের ভাবে) — তাদের বলতে হয় একটু তলিয়ে দেখতে। এ কাজ আরম্ভ হয় তাঁর (ঠাকুরের) শরীর থাকতে, কাশীপুর বাগানে। সেখানেই কাজের আরম্ভ — তাঁর সেবায়।

এখানে যারা এয়েছে সকলেই জ্ঞানী। তাদের বেশী কিছু বলতে হয় না। আমার তো এই ধারণা। আমরা দেখেছিও তাই। তা আমি তো তাঁর চরণতলে পড়ে রয়েছি। যদি আমাকে বলতে বল, আমিও বলতে পারি।

শ্রীমহাপুরুষ (প্রশ্নের উত্তরে) — প্রথমে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে কাজ করতে হয়। শেষে নিজেই বুঝতে পারে যে কাজেতেও তাঁর সেবা হয়।

কিন্তু বাবা, সাধন ভজন চাই। সাধন ভজন ছেড়ে দিলে কি কাজ করবে? দিনে দুই তিনবার অন্ততঃ এই বিচার করবে, আমি আর তিনি (ঠাকুর), ঈশ্বর আছেন। শেষে আমিও নাই — কেবল তিনি। ঐ সময় মঠফট, কাজকর্ম সব উড়িয়ে দিবে।

স্বামী শর্বানন্দ — কাজে ধ্যান জপের কাজ হয় না? কাজ থেকে ধ্যান জপ বড় কি?

স্বামী ওঁকারানন্দ — নিশ্চিত। সমাধিলাভের অব্যবহিত কারণ যখন ধ্যান, তখন ধ্যান বড় বই কি? বস্তা টেনে টেনে কে কখন সমাধিলাভ করেছে?

স্বামী মাধবানন্দ — হাঁ, অন্তরঙ্গ সাধন আর বহিরঙ্গ সাধন।

শ্রীমহাপুরুষ পূর্বোক্ত কথোপকথন শুনিয়াই উল্লিখিত রূপ উপদেশ দেন।

স্বামী নিখিলানন্দ — মহারাজ, সঙ্ঘের কথা ঠাকুরের আদেশ। সঙ্ঘ তো, যাঁরা ওয়ার্কিং কমিটিতে আছেন, কিম্বা যাঁরা ট্রাস্টি — তারাই তো?

শ্রীমহাপুরুষ (ইহার স্পষ্ট উত্তর না দিয়া) — হাঁ, কাজ করতে হলে একজনের কথা তো শুনতে হয়। না হলে কাজ হয় না।

আমায় যদি বল তো আমি এ্যাপিল করে বলবো। আমি দেখেছি, বুঝিয়ে বললে কেউ কখনও অবাধ্য হয় না। সকলেই জ্ঞানী।

স্বামী শংকরানন্দ — মহারাজ পুরীতে থাকার সময়, কেদারবাবাকে ধ্যান জপের কথায় খুব encourage (উৎসাহিত) করতেন।

পরদিন সকাল। মহাপুরুষের ঘর। স্বামী শর্বানন্দ ও নির্বাণানন্দের প্রবেশ। তাঁহারা প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন। কথাবার্তা হইতেছে।

মহাপুরুষ (স্বামী শর্বানন্দের প্রতি) — অমুক কাল এসেছিল।

স্বামী শর্বানন্দ — হাঁ, আলাপ হয়েছিল।

নির্বাণানন্দ — অনেক toned down (নরম) হয়েছেন।

মহাপুরুষ — মা অবস্থার ভিতর ফেলে শিক্ষা দেন। অবস্থার ভিতর দিয়ে শিক্ষা দেন।

বেলুড় মঠ। ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। এখন অপরাহ্ন সাড়ে তিনটা। মহাপুরুষ দক্ষিণের দরজার গোড়ায় ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন। শীতকাল, তাই পা দুইটি একটা গরম র‍্যাপারে ঢাকা। ডান দিকে একটি ছোট স্টুলের উপর চিঠির রাশি, উনি পড়িতেছেন। সাধু ও ভক্তরা সংসারজ্বালায় জর্জরিত হইয়া দুঃখকষ্ট নিবেদন করেন চিঠিতে। তিনি পড়িয়া যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়া থাকেন। সাধুরা সাধন ভজন ও কর্মসম্বন্ধে নানা উপদেশ প্রার্থনা করেন।

স্বামী নিখিলানন্দ একটি মেমসাহেবকে সঙ্গে নিয়া গৃহের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। ভদ্রমহিলা স্বামী অভেদানন্দের ভক্ত। মহাপুরুষ ঘরে আসিতে বলিলেন। মেমটি চেয়ারে বসিয়া আছেন খাটের পশ্চিমে দক্ষিণাস্য, মহাপুরুষের ডান হাতে। প্রণাম করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন মেমসাহেব।

Lady Disciple — What are the troubles?

Mahapurusha — Old age — it's about eighty! Then asthma, blood pressure, weak heart — these are the troubles, these are the complaints!

Lady Disciple — Who suffers — the body or the soul?

Mahapurusha — Certainly the body.

Lady Disciple — Who takes birth and who dies?

Mahapurusha — The body! The soul never suffers, nor dies.

No, I never suffer. I have no birth, no death!

This body has come. It has lived. It must go — not me. I am ever-living.*

একটি সাধু স্বামীজীর ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া এই কথোপকথন শুনিতেছেন। তিনি সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াইয়া একবার এই দেবদৃশ্য দেখিলেন। আর ভাবিতেছেন, একেই বলে অবতারের পার্ষদ! ঈশ্বর দর্শন হলে সকলেই জীবন্মুক্ত। কিন্তু মনে হয়, অবতারের পার্ষদদের শক্তি বেশী। তাঁরা জীবন্মুক্ত তো বটেই — আবার নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। অত অসুখের ভিতরও মহাপুরুষ মহারাজ বলছেন — শরীর ভুগছে, আমি নই। আমি অজর অমর নিত্য সনাতন।

একটি সাধু মহাপুরুষ মহারাজের কথোপকথন শুনিয়া ভাবিতেছেন

---

* ভক্ত মহিলা — কি অসুখ?

মহাপুরুষ — বার্ধক্য, বয়স প্রায় আশি। তার উপর হাঁপানী, রক্তচাপ, হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা — এই সব রোগ, এই সব উপসর্গ।

ভক্ত মহিলা — কে ভুগছে — শরীর, কি আত্মা?

মহাপুরুষ — নিশ্চয়, শরীরেরই এই ভোগ।

ভক্তমহিলা — কার জন্ম, — কারই বা মৃত্যু?

মহাপুরুষ — শরীরের। আত্মার জন্ম-মরণ নাই। আত্মা অজ (জন্ম নাই যার) অজর অমর — নিত্য শাশ্বত। নিশ্চয়, আমি আত্মা। আমার জন্মমরণ নাই।

এই শরীরেরই জন্ম। শরীরটাই এত দিন বেঁচে আছে। এরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, আমার নয়। আমি অজ নিত্য শাশ্বত।

— এই তো দেববাণী। আমি আত্মা, আমার সুখদুঃখ নাই, জন্মমরণ নাই ঠাকুর শ্রীগুরুর মুখ দিয়া এই মহাবাণী শুনাইলেন আমারই জন্য, আমার দুর্বল মনকে সবল করিতে। মনরোগের এই মহৌষধ — আমি আত্মা — অজর অমর অভয়।

ডায়েরী পাঠ শুনিয়া শ্রীম বলিতেছেন।

শ্রীম — হাঁ, এই তো আসল কথা — আমি অজর অমর অভয়। এই ভাবটি ধরেই সংসারের প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। যাঁর ধারণা যত সুদৃঢ় তাঁরই শান্তি সুখ আনন্দ তত অবিচলিত। এক কথায়, এটাই জীবের অমৃতত্বলাভ। এটাই ভারতের সনাতন সংস্কৃতি।

৩

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। সকাল সাড়ে সাতটা। মহাপুরুষ খাটে বসা পশ্চিমাস্য। অনেক সাধু প্রণাম করিতে আসিতেছেন। ঘরে স্বামী শাশ্বতানন্দ, আরাবিয়ার মতি মহারাজ, ব্রহ্মদাস, বামদেবানন্দ, আনন্দ প্রভৃতি দাঁড়াইয়া আছেন। আজ ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার।

সোনারগাঁয়ের আশ্রমের একটি সাধু প্রণাম করিয়া হাঁটু গাড়িয়া মহাপুরুষের কাছে সন্ন্যাসসংস্কার প্রার্থনা করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি উদ্দীপনার সহিত ধর্মোপদেশ দিতেছেন।

শ্রীমহাপুরুষ (সাধুদের প্রতি) — আজকাল দেখছি, ছোকরাদের মধ্যে একটা ভাব উঠেছে সন্ন্যাস নেওয়া। যেন সন্ন্যাস নিলেই সব হলো।

আরে, ঠাকুরের আশ্রয় যারা নিয়েছে তারা ও-রকম হবে কেন? তিনি অন্তর্যামী। তাঁর উপর ভক্তি বিশ্বাস হবে, জ্ঞান হোক, সমাধি হয়ে যাক্। এই তো ঠাকুরের ছেলেদের হওয়া উচিত।

ও তো আছেই। সন্ন্যাসী কত তো রয়েছে। মন্ত্র আওড়ালে, আর সন্ন্যাস হয়ে গেল?

নিয়ম আছে, বিরজা হোম রোজ করতে হয়। জিনিসপত্র না দিয়েও হয় মনে মনে। তা করে কই? একটু মন্ত্র পড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেল। ও কি ঢং উঠেছে? তাঁর ধ্যান জপ পাঠপূজা — এতে মন ডুবে যাক। ওই

তো কাজ। তাঁ'তে ভক্তি হোক, এই চাই।

ঠাকুর তো ঐ সন্ন্যাসের কথা কখনও আমাদের বলতেন না। সন্ন্যাসের মত ভিতর তিনি ঠিক করে দিয়েছিলেন কৃপা করে। বলেছিলেন, 'ধ্যান জপের সময় গেরুয়া পরে করো। অন্য সময় তুলে রেখে দিও।'

তিনি এমন সন্ন্যাসের কথা আমাদের একবারও বলেন নাই। স্বামীজী এই সব করেছেন — এই আমাদের বাইরের সন্ন্যাস।

ঠাকুর-ভক্ত যারা তাদের এ সবের দরকার নাই। তাঁর উপর ভক্তি বিশ্বাস কিসে হয়, কিসে ভালবাসা হয় এই হলো আসল জিনিস।

তাঁর আশ্রিত যাঁরা, তাঁদের আশ্রয়ে থেকে এ সব কি ভাব! কোথায় ভক্তি বিশ্বাস হবে, তাঁর জন্য ব্যাকুল হবে, দিবানিশি প্রার্থনা করবে — তা না, এই সন্ন্যাস চাই।

গেরুয়া — ভিক্ষার জন্য এর দরকার হয়। তা পরলেই হলো। অনেকে তো পরছে।

স্বামী গঙ্গেশানন্দের প্রবেশ। ইনি মহাপুরুষের সেক্রেটারী।

মহাপুরুষ (স্বামী গঙ্গেশানন্দের প্রতি) — ইনি সন্ন্যাস চাইছেন। সংস্কৃত জানে না, অর্থ বোঝে না, লেখাপড়া জানে না, কি হবে এতে!

স্বামী গঙ্গেশানন্দ কিছু উত্তর করিলেন না। মহাপুরুষও নীরব। আর একজন সাধু সন্ন্যাস প্রার্থনা করিবেন আজই। কেন না দুই দিন পরই স্বামীজীর জন্মোৎসব। তখন সন্ন্যাসসংস্কার হইবে। এই সাধুকে এক বৎসর পূর্বে শ্রীমহাপুরুষ লিখিয়াছিলেন, তুমি এদিকে আসিলেই সন্ন্যাস দিব। তিনি মাদ্রাজে ঠাকুরের সেবাকার্য করিতেন তখন। এখন তিনি মঠে আসিয়াছেন। কিন্তু শরীরটি খারাপ করিয়া আসিয়াছেন মাদ্রাজ হইতে। ডাক্তারের চিকিৎসাধীন। তাই তিনি ইতস্ততঃ করিতেছেন সন্ন্যাসের প্রার্থনা করিবেন কি না।

ইতস্ততঃ করিবার তাঁহার আরও এক কারণ আছে। তিনি মনে মনে বিচার করিতেছেন, শ্রীমহাপুরুষ তো আমার গুরু, ঈশ্বর অন্তর্যামী। তিনি স্বেচ্ছায়ই লিখিয়াছিলেন সন্ন্যাস দিবেন। এখন তিনি স্বেচ্ছায়ই তো বলিবেন নিজেই, আমার সন্ন্যাস লইবার প্রয়োজন থাকিলে। তাই তাঁহার সঙ্কোচ হইতেছে সন্ন্যাস চাহিতে। তিনি ভাবিতেছেন, যিনি ভালবাসেন, যিনি

অতি আপনার জন, তাঁহার কাছে চাহিব কি করিয়া? আমার যাহাতে কল্যাণ হইবে তাহা তো তিনি নিজেই ডাকিয়া দিবেন।

মহাপুরুষ মহারাজের করুণার শেষ নাই। বাবুরাম মহারাজের শরীর ত্যাগের পর উনি যখন মঠের ব্যবস্থাপক হন তখন হইতেই তাঁহার করুণার বহু নিদর্শন পাইয়াছি। পড়ার সময় কিছু দিন মঠে না আসিলে লোক পাঠাইয়া সংবাদ লইতেন, আর মঠে আসিতে বলিতেন। তখন মনে হইত, তিনি কত বড়, কত মহান! সামান্য লোক আমি, তাহারই জন্য কত ভাবনা। অহেতুক কৃপা। তিনি সত্যকার আপনার লোক।

এক সময় প্রস্তাব করিলেন, ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস লইয়া গিয়া ওখানে (শ্রীম-র কাছে) থাক না। সেই দিনে আইনকানুনের অত কড়াকড়ি ছিল না।

এই কয় বছর পূর্বেও, তখন মঠে ছিলাম তিন মাস ধরে। দেখা হইলেই বলিতেন, 'Get ready for Gerua...' (গেরুয়া নিবার জন্য প্রস্তুত হও)। কিন্তু আমি রাজী হই নাই। তাই বলি, তাঁহার কাছে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন কি? তিনি যে আপনার জন — গুরু, পিতামাতা সব। যা কল্যাণকর তাহা তো নিজেই করেন। তাঁহার অযাচিত কত কৃপা।

একদিকে এই সব বিচার। অপর দিকে সাধু ভাবিতেছেন, বেদের কথা, শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্যের নিকট সন্ন্যাস ভিক্ষা করার কথা। শাস্ত্রে আছে, ‘উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।’

সাধুর আরও ভয় হইতেছে, শরীর এই আছে, এই নাই। তাহাতে আবার রোগের আক্রমণ হইয়াছে। যদি চলিয়া যায় শরীর। কিংবা আরও অসমর্থ হইয়া পড়ে — তাহা হইলে তো আমার আর সন্ন্যাস হইল না।

সন্ন্যাস চাওয়া কি, না চাওয়া — এই দ্বন্দ্ব সাধুর ভিতর চলিতেছে। স্বামীজীর উৎসবের দিনটি যতই নিকটবর্তী হইতেছে ততই মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছে। সাধু নিশ্চয় করিলেন — সন্ন্যাস প্রার্থনা করিবেন আজই।

সাধু আরও বিচার করিলেন, সংসারী মানুষ পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের নিকট সাংসারিক ভোগৈশ্বর্য প্রার্থনা করে। আমি প্রার্থনা করিতেছি, আমার পরমার্থ পিতার নিকট সন্ন্যাসভিক্ষা। ত্যাগ চাহিতেছি, সংসারভোগ

নহে — ত্যাগ! তিনি সন্ন্যাসী, আমি তাঁহার সন্তান। আমি তাঁহার পবিত্র ঐশ্বর্য চাহিতেছি — ছিন্নবস্ত্র কৌপীন। ইহাতে সঙ্কোচের কোনও কারণ নাই। এখন আমার শরীর অসুস্থ বলিয়া তিনি প্রার্থনা পূর্ণ না-ও করিতে পারেন। হয়তো অসুস্থ শরীরে চাহিলে বিরক্ত হইবেন, তিরস্কার করিবেন। কিন্তু তাহাতেই বা কি? পিতামাতা পুত্রকে তিরস্কার করিলে তো পরম কল্যাণ সাধিত হয়। সাধু দৃঢ়নিশ্চয় করিলেন, সন্ন্যাস চাহিবেন। আর চাহিলে মহাপুরুষ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না, ইহাও নিশ্চয় করিয়া বুঝিলেন। সাধু এই স্থির করিয়া গুরুভাইদের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন।

একজন বলিলেন, বেশ তো চেষ্টা করে দেখুন না। আর একজন বলিলেন রহস্য করিয়া, কৈকেয়ীর মত এ সময়ে চেয়ে বসুন 'সত্যরক্ষা'। (মহাপুরুষ পূর্বে বলিয়াছিলেন নিজেই চিঠিতে, সন্ন্যাস দিবেন এদিকে আসিলে)। আর একজন বলিলেন, হাঁ, তিনি তো লিখেছিলেন, দিবেন। এখন তো সামনাসামনি এসেছেন। চেয়ে দেখুন না। আর একজন বলিলেন, শরীর যদি আরও খারাপ হয়, কিংবা চলে যায়? এখনই চান।

তাঁহার নিজের সিদ্ধান্ত বন্ধুগণের উপদেশের সহিত একমত হওয়ায় সাধু স্থির করিলেন, আজই রাত্রিতে সন্ন্যাস প্রার্থনা করিব। মহাপুরুষ যখন আহারান্তে ঘরে বসিয়া থাকেন সেই সময়ই শুভক্ষণ।

সন্ধ্যার আরতি হইয়া গেল। মহাপুরুষ বারান্দা হইতে প্রথম আফিস ঘরে গেলেন। তারপর নিজকক্ষে। নৈশ আহার সমাপ্ত হইয়াছে। এখন খাটে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। রাত্রি পৌনে দশটা। সেবক রমেন খাটের উত্তরে দাঁড়াইয়া আছেন। আর স্বামী দেশিকানন্দ আপন কথা নিবেদন করিতে আসিয়া মহাপুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

একজন সাধু মহাপুরুষের ঘরের বাহিরে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সব দর্শন করিতেছেন। এইবার 'দুর্গা' বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। আর খাটের দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইলেন। মহাপুরুষ শির নিচু করিয়া কি ভাবিতেছিলেন। মুখ তুলিতেই সাধু নিবেদন করিলেন, স্বামীজীর জন্মোৎসবে আমার সন্ন্যাস নিবার ইচ্ছা হইয়াছে। আপনি কৃপা করিয়া উহা প্রদান করুন। এই আমার ভিক্ষা।

মহাপুরুষ বলিলেন, এখন শরীরটা খারাপ। ঔষধ খাচ্ছ। পরে নিলেই

হবে। শরীরটা একটু ভাল হয়ে যাক।

সাধু নিজের আসনে চলিয়া গেলেন। স্বামীজীর ঘরের নিচের ঘরে তাঁহার আসন। আসনে বসিয়া সাধু ভাবিতেছেন, মহাপুরুষ অন্তরে নিশ্চয় সুপ্রসন্ন। শরীর অসুস্থ, তাই ভাবনা। সন্ন্যাসের উপবাসাদিতে রোগ বাড়িয়া না যায়, এই চিন্তা। সাধুর মন প্রশান্ত। তিনি প্রসন্ন।

শ্রীম (ডায়েরী পাঠ শুনিতে শুনিতে) — It is a sight for the gods to see — কি দেবদৃশ্য! আহা, এ আদর্শ কোথায় আছে সংসারে অমন সমুজ্জ্বলরূপে! সর্বত্যাগের সম্মান সমগ্র জগতের মধ্যে এ দেশে, এই ভারতে অদ্বিতীয়। 'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ত্বমানশুঃ' (কৈবল্য উপঃ ১:২) — বেদের কথা। জগৎ যখন ভোগে ডুবে ছিল, ভারতীয় ঋষিগণ তখন এই মহাসত্য আবিষ্কার করেছিলেন।

সংসারভোগ ত্যাগের পর ঈশ্বর। ঠাকুর বলতেন আগে ঈশ্বর, পরে সব। ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য।

এই ত্যাগব্রতের জন্য এক থাক্ লোক ব্যাকুল। তাই তো গুরুর নিকট চাইছেন সন্ন্যাস এই সাধু। চাইছেন সর্বত্যাগব্রত। অসুস্থ শরীর, কিন্তু গ্রাহ্য নাই। সংকল্প — শরীর যায় যাক্, সন্ন্যাস চাই। কেহ ভোগের জন্য পাগল, কেহ ত্যাগের জন্য পাগল! যেমন এই সাধুটি, যেমন নচিকেতা।

ঠাকুর আসায় এই ত্যাগব্রত আরও অধিক সমুজ্জ্বল হয়েছে। ঠাকুর ত্যাগীর শিরোমণি। মাটির একটা ক্ষুদ্র ঢেলাও একস্থান থেকে উঠিয়ে অন্যস্থানে তিনি নিতে পারেন নাই। টাকা ছুঁলে হাত আড়ষ্ট হয়ে যেত, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতো। কোথায় আছে এ আদর্শ, এই দেবদৃশ্য!

তাই তো ভক্তদের বলি, নিত্য মঠে যেতে। ওখানে যে ত্যাগের খনি! ওখানে এলে গেলে তবে ধাত ঠিক থাকবে।

৪

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তীর পূর্ব দিন। ২০শে জানুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার। মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ঘর। মহাপুরুষ নিজের খাটে বসা। এখন সকাল সাতটা। একটি সাধু

আসিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উঠিতেই মহাপুরুষ তাঁহার সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন।

মহাপুরুষ (সাধুর প্রতি) — কেমন আছ, বাবা?

সাধু — আজ্ঞে, ভাল আছি মহারাজ।

মহাপুরুষ (আশীর্বাদ করিয়া) — ভাল থাক বাবা, ভাল থাক। এই ভাল থাকার জন্যই সব ছেড়ে এসেছ এখানে। আনন্দে থাক, খুব আনন্দে থাক। সংসারে এ আনন্দ নাই। এ আনন্দের মূল ঠাকুর, শ্রীভগবান। নরকলেবরে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। তোমরা আমরা সকলে তাঁর সন্তান, তাঁর দাস, তাঁর সেবক। স্বামীজী তাঁর প্রধান সেবক। আজ স্বামীজীর জন্মোৎসব। জয় প্রভু, জয় প্রভু।

বেলা নয়টা। মহাপুরুষ মহারাজ মঠের দ্বিতলের বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন। আনন্দময় ভাব। মাঝে মাঝে স্বামীজীর ঘরে উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন, যুক্ত করে। বলিতেছেন, "জয় স্বামীজী, জয় দয়াময়। প্রণাম প্রণাম।"

স্বামীজীর ঘরের সেবককে দেখিয়া বলিলেন, সন্ন্যাস তো তোমায় কয় বছর পূর্বেই দিয়েছি এই মঠেই, ঠাকুরঘরে in spirit (সত্যিকার)। আসল সন্ন্যাস ঐ। আন্তরিক সন্ন্যাসই যথার্থ সন্ন্যাস। ঠাকুর ভক্তদের ঐ সন্ন্যাস দিতেন। ভিতর ফাঁক করে দিতেন। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সব সন্ন্যাসী — তা গৃহেই থাকুক, বা গৃহত্যাগ করুক। তাঁদের ভিতর সব লাল করে দিতেন। একদিন ঠাকুর বলেছিলেন, এখানে যারা আসে আন্তরিক, তারাই আপনারজন। এই অন্তরঙ্গগণ সবই সন্ন্যাসী — সংসারী কেউ নয়।

মহাপুরুষ টলিতে টলিতে একটু বেড়াইতেছেন উত্তর-দক্ষিণ। পুনরায় স্বামীজীর ঘরের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই ঘরের সেবকের সঙ্গে আবার কথা কহিতেছেন।

মহাপুরুষ — তোমায় তো লিখেছিলাম যখন দক্ষিণে ছিলে — 'তোমার ভিতরে সন্ন্যাস হয়ে গেছে। বাইরের সন্ন্যাসও হয়ে যাবে যখন এদিকে আসবে।' এখন তোমার শরীরটা খারাপ যাচ্ছে, ঔষধ খাচ্ছ। উপবাসাদির অত্যাচারে আরও খারাপ না হয়ে যায়, তাই ভাবনা হচ্ছে।

মহাপুরুষ — আচ্ছা, এখন কেমন আছ?

সেবক — অনেকটা ভাল।

মহাপুরুষ — কেন হঠাৎ অত অসুখ হলো?

সেবক — কাজের অতিরিক্ত পরিশ্রম। তার উপর আবার pox (বসন্ত) তাতেই কাবু করে ফেলেছে।

মহাপুরুষ — আচ্ছা, হয়ে যাক্ বাইরেরটাও। একবার হয়ে গেলেই হলো। এটা তো বাইরের পরিচয় মাত্র। আসল সন্ন্যাস আন্তরিক সন্ন্যাস। ওটাতো আগেই হয়ে গেছে। আচ্ছা, এটাও হয়ে যাবে কালই।

হাঁ বাবা, তোমার ভিতরে জ্ঞান ভক্তি খুব বেড়ে যাক্ — আমি এই আশীর্বাদ করছি। ঠাকুরের চিন্তায় ডুবে যাও। ঠাকুরই সচ্চিদানন্দ, ঠাকুরই পরমাত্মা, ঠাকুরই পরমব্রহ্ম — যা সন্ন্যাসের সার। এসব তাঁর নিজের মুখের কথা, আমাদের কথা নয়। তাঁর জীবনও তাই। সর্বদা পরমব্রহ্মে লীন হয়ে থাকতেন। তাঁর জীবনের এদিকটার চিন্তায় ডুবে যাও। এটাই সত্যিকার সন্ন্যাস।

সাধু সম্প্রদায়ের প্রাচীন প্রথা, সন্ন্যাসাদি শুভকর্মের পূর্বে মহাত্মাগণের শুভেচ্ছা প্রার্থনা করা। একজন মহাত্মা বলিলেন, খুব আনন্দের কথা, সন্ন্যাস হবে। এ বিষয়ে গুরুর শুভেচ্ছাই প্রধান। তুরীয় আশ্রমে গুরুশিষ্য সম্পর্কই সার। (রহস্য করিয়া) তবে শরীর অসুস্থ। অসুখ বেড়ে গেলে কিন্তু গঙ্গায় ফেলে দেব। এই বলিয়া আনন্দে বালকের ন্যায় হাসিতে লাগিলেন।

অপর সাধুগণও কেহ কেহ শুভেচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, শুভকার্য শীঘ্র হয়ে যাক। সন্ন্যাসে গুরুর আশীর্বাদই প্রধান। এটা গুরুশিষ্যের ব্যাপার।

একজন আইনকানুন-রসিক বলিলেন, নিজের দায়িত্বে নিতে পারেন। প্রেসিডেন্টের prerogative (অতিরিক্ত অধিকার) রয়েছে। উনি ইচ্ছা করলে দিতে পারেন। সন্ন্যাস তো automatic-ই (আপনা আপনিই) হয়ে যায়।

আর একজন সাধু এই কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, কি অদ্ভুত কথা! সন্ন্যাস আবার অপরের দায়িত্বে হয় নাকি? ঈশ্বরের কৃপা, গুরুর

আশীর্বাদ, আর যে সন্ন্যাস নিবে তার আন্তরিক ইচ্ছা — এইগুলিই তো সন্ন্যাসের মুখ্য উপকরণ!

Automatic (আপনা আপনি) সন্ন্যাস আবার কিরূপ? সন্ন্যাসী কি মেশিনে (যন্ত্রে) তৈয়ার হয়? একজনের আন্তরিক ইচ্ছা না থাকলে কি অপরের ইচ্ছায় সন্ন্যাস নেওয়া যায়? নিলেও সে সন্ন্যাস স্থায়ী হবে কেন? যে নিবে তার ইচ্ছাই প্রধান। সারা জীবনের জন্য একটা উচ্চ আদর্শে ব্রতী হওয়া। সে অপরের ইচ্ছায় কি করে হতে পারে? ব্রতীর স্বেচ্ছাই মুখ্য উপকরণ সন্ন্যাসে।

অপর কয়েকজন সাধুও এই মত সমর্থন করিলেন। আর অতি আনন্দে সকলে শুভেচ্ছা প্রদান করিলেন। বলিলেন, 'শুভস্য শীঘ্রম্'। আর একজন সাধু সামবেদীয় শান্তিপাঠের এক চরণ আবৃত্তি করিয়া বলিলেন —

"তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥"

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি মহোৎসব। ২১শে জানুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার, পৌষের কৃষ্ণা সপ্তমী। বেলুড় মঠে নানা মঠ ও আশ্রম হইতে সাধুরা আসিয়াছেন। সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল। বিরাট ভোগ ও দরিদ্র-নারায়ণসেবার আয়োজন চলিতেছে একদিকে। আর একদিকে পূজা হোম ও সন্ন্যাসের আয়োজন। ছয় জন আজ সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিবেন। ব্রতীগণ মঠের কাজ হইতে তিনদিনের জন্য ছুটি লইয়াছেন। স্বামীজীর ঘরের কাজের ভার লইয়াছেন স্বামী গোপালানন্দ।

ব্রতীগণ সারাদিন উপবাসী। মধ্যাহ্নে তাঁহাদের শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে মঠের উত্তর পার্শ্বস্থিত ই. আই. রেলের পাম্পিং স্টেশনে। একজন পুরোহিত যথাযোগ্য সকল কার্য করিয়াছেন। মুণ্ডিতমস্তক ব্রতীগণ নিজের পায়ে নিজের পিণ্ড দান করিলেন। পূর্ব পুরুষগণের পিণ্ডদান করিলেন আগে। আজ হইতে ইঁহারা কোনও বৈদিক কর্মের অধিকারী হইতে পারিবেন না। তাঁহারা অত্যাশ্রমী-ব্রত গ্রহণ করিবেন।

মঠে বহুলোক সমাগত। দর্শক, ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ। মধ্যাহ্ন ভোগের পর কয়েক হাজার লোক বসিয়া আনন্দে পরিতোষপূর্বক প্রসাদ গ্রহণ

করিলেন।

সন্ন্যাসের যাবতীয় ব্যবস্থার ভার লইলেন একজন। আর একজন মঠের বাঁশঝাড় হইতে কঞ্চির দণ্ড কাটিয়া দিলেন।

একজন সাধুর শরীর অসুস্থ। তিনিও সন্ন্যাস লইবেন আজ। শ্রীমহাপুরুষের সকল দিকে লক্ষ্য। তিনি সেবককে বলিলেন, তাকে বলে এসো কিছু ফল মিষ্টি দুধ খেতে। ইনি রাত্রে সাড়ে আটটায় স্বামীজীর ঘরের কিছু ফল মিষ্টি গ্রহণ করিলেন।

ব্রতীগণ বিশ্রাম করিতেছেন, নিদ্রা নাই। ভাবিতেছেন, আজ শরীর, মন, আত্মা শ্রীশ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে সমর্পিত। সংসারে আমার কেহ নাই, একমাত্র ভগবান ছাড়া। সত্যকার সন্ন্যাস সমাধিস্থ, পরমব্রহ্মে লীন হইয়া থাকা। সে অবস্থায় জগৎ নাই — কেন না স্বতন্ত্র 'আমি' নাই। 'আমি' থাকিলে জগৎও আছে। ক্ষুদ্র 'আমি' লবণপুত্তলিকাটি নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিয়া প্রকৃত-স্থল পরমব্রহ্ম-সমুদ্রে বিলীন। সকলের এ অবস্থা লাভ হয় না — এই উচ্চ অনুভূতি। নির্বিকল্প সমাধিলাভ সকলের জন্য নয়। লোকোত্তর মহাপুরুষ ঈশ্বরকোটি অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের মত মহামানবেই সম্ভব। ইহা দুর্লভ। সাধারণ লোকের পক্ষে ঐ উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বুদ্ধিবৃত্তিসহায়ে সঙ্কল্প গ্রহণ করা ঐ অবস্থা লাভের জন্য ক্রমে ক্রমে — নিত্য স্মরণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা পরমজ্যোতিঃরূপ পরমব্রহ্মের চিন্তা দ্বারা — ইহাই অভ্যাসযোগ। এ পথে ক্রমে এক জন্মে বা বহু জন্মে ঐ বিকল্পবিহীন সমাধিলাভ হয় শ্রীভগবানের কৃপায়। আর এক উপায়েও ঐ অবস্থা লাভ হয় — উহা সর্বস্বত্যাগের পথ। শরীর মন আত্মা দ্বারা যাহা কিছু কার্য হয় তৎসমুদয়ই শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া নিজেকে যথাসম্ভব যন্ত্রবৎ কল্পনা করিয়া 'যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগী ইত্যুচ্যতে।' 'সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ' (গীতা ৫:২)।

রাত্রি তিনটা। বেলুড় মঠের ধ্যানঘর, উহা দ্বিতলের মন্দিরের পশ্চিমাংশে। মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে চারিদিকে বসিয়া আছেন। মধ্যস্থলে বিরজা হোমের আয়োজন করা হইতেছে। পূজারী হইয়াছেন একজন সন্ন্যাসী। তন্ত্রধারক অপর একজন সন্ন্যাসী। পূজারী বসিয়াছেন পূর্বমুখী। সম্মুখে হোমপাত্রে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা। উহার

তিনদিক ঘেরিয়া বসা ব্রতীগণ। পূজারী পাঠ করিতেছেন এক একটি বৈদিক আহুতিমন্ত্র, আর ব্রতীগণ উহাই উচ্চারণ করিয়া এক একটি ঘৃতাক্ত বিল্বপত্র জ্বলন্ত অগ্নিতে আহুতি দিতেছেন — 'স্বাহা' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া। এই সকল বৈদিক মন্ত্রের দুইটি উদ্দেশ্য। একটিতে সমগ্র বিশ্বকে অর্চনা করা নিজের স্বরূপ বলিয়া। অপরটিতে নিজের নিরাকার নির্গুণ অজর অমর অভয় পরমব্রহ্মের জ্যোতির্ময়রূপের ধ্যান।

যথাবিহিত রপে হোম সমাপ্ত হইল। এইবার গুরুর নিকট হইতে, শিখাকর্তন, মহামন্ত্র, মহাবাক্য ও বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। শ্রীমহাপুরুষ অসুস্থ বলিয়া নিজ কক্ষে খাটের উপর বসিয়া আছেন। সকলে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। এখন ভোর সাড়ে পাঁচটা। সাধুরা গঙ্গাস্নান করিয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন। পূর্বাকাশে প্রভাত-সূর্য উঠিতেছে।

শ্রীমহাপুরুষ মহাবাক্য শুনাইয়া বলিলেন, এই যে সন্ন্যাস — এ কিছুই নয়। এটা বাইরের সন্ন্যাস। আসল সন্ন্যাস ভিতরে। ও না হলে এ কিছুই না — এ অতি তুচ্ছ। কিছুই নাই এতে।

ঠাকুর সকলের অন্তরাত্মা। তাঁর চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকা — এটা হল আসল সন্ন্যাস।

নবীন সন্ন্যাসীগণ তিনদিন আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসীর রীতি গ্রহণ করিলেন। অগ্নি স্পর্শ করিলেন না। গ্রামে ভিক্ষা করিয়া আহার করিলেন। প্রথম দিন শ্রীমহাপুরুষ একজন সাধুর ভিক্ষার ঝুলি হইতে এক কণা মাধুকরী অন্ন গ্রহণ করিলেন। একদিন একজন সাধু পঙ্গদে সকলকে অল্প-অল্প মাধুকরী বিতরণ করিলেন। নূতন সন্ন্যাসীদের ভোজন-স্থান স্বামীজীর বিল্বতল, বাগান ও গঙ্গার ঘাট।

সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মরূপতা-প্রাপ্তি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যলাভের জন্য অভ্যাসরূপ ব্রত গ্রহণ করাই সন্ন্যাস। সন্ন্যাসীমাত্রেই দুইটি কার্য করেন — একটিতে স্বরূপের প্রাপ্তি বা সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্তি। অপরটিতে জগতের কল্যাণ। আজ হইতে সমগ্র বিশ্ব তাঁহার স্বজন, পরিবার।

শ্রীম সন্ন্যাসব্রতের এই দেবদুর্লভ বিবরণ শুনিয়া আনন্দে বিভোর হইলেন। আর আবেগভরে মধুর কণ্ঠে কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীম — ভারতীয় সংস্কৃতিতে সন্ন্যাসী জগৎগুরু। তাই সর্বজন পূজ্য!

ঈশ্বরদর্শন মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। এই আদর্শটি সমাজের চক্ষুর সম্মুখে রেখে ভারতসভ্যতার নির্মাতা ঋষিগণ সকল সামাজিক নিয়ম প্রণয়ন করেন। এইটি তাঁদের আদি আবিষ্কার। এইজন্যই অত উঠাপড়ার ভিতরও ভারতের উন্নতশির। সন্ন্যাসীগণ এই সনাতন আদর্শকে ধরে রেখেছেন। সন্ন্যাস ভারতের হৃদয়মণি।

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। মাঘ মাস। আজ ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার।

এখন সকাল সাতটা। মহাপুরুষ খাটে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। সামনে একটি স্টুলে গড়গড়াটি রাখা হইয়াছে। একটি লম্বা কাঠের নল মুখে সংলগ্ন। আনমনে টানিতেছেন।

মঠের ভাণ্ডারী স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ আসিয়াছেন। তিনি আজ ভোগে কি কি যাইবে তাহা মহাপুরুষ মহারাজকে বলিলেন। কলিকার আগুন হাওয়ায় উড়িতেছে দেখিয়া তিনি ঢাকনি দিয়া ঢাকিয়া দিলেন।

একটি সাধু মহাপুরুষকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিতেছেন। লাল ভেলভেটের পাদুকা স্পর্শ করিয়া তিনি মনে মনে প্রার্থনা করিতেছেন, 'গুরু, প্রভু, বাবা, আমায় সদ্‌বুদ্ধি দাও।'

সাধু মাথা তুলিতেই মহাপুরুষ বলিতেছেন, ভাল আছ? সাধু উত্তর করিলেন — আজ্ঞে হাঁ, ভাল আছি।

মহাপুরুষ আবার বলিলেন — যাক্, সন্ন্যাস হয়ে গেল। অনেক দিনের বাসনা ছিল, এবার হয়ে গেল। শরীরটা ভাল থাক্। এখন তাঁর স্মরণ মননে ডুবে যাও। একেবারে সেই ব্রহ্মের চিন্তায় ডুবে যাও।

(একটু হাসিয়া) ঠাকুরই ব্রহ্ম, স্বামীজী ব্রহ্ম। স্বামীজী ঠাকুরের ডান হাত। ঋষিকল্প পুরুষ। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। এমন ভক্তিপূর্ণ পুরুষ বিরল, এই যাঁর সেবা তুমি করছো।

একটি সাধু স্বগত ভাবিতেছেন। কি সৌভাগ্য আমাদের! সাক্ষাৎ ধর্ম কথা কহিতেছেন। জীবন্ত ধর্মমূর্তি শ্রীগুরু সম্মুখে। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। অবতারের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। অশীতি-বর্ষ বয়স প্রায়। আবার পবিত্র সুরধুনী (গঙ্গা) তীর। যাঁরা অতি সৌভাগ্যবান তাঁরাই এঁদের একটু চিনতে পারেন।

তাঁরা দেখতে পান, বৈদিক উপনিষদ্ যুগের ছবি আমাদের সম্মুখে প্রকটিত — ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি সম্মুখে বসে আছেন।

এখন সকাল আটটা। দোতলার বারান্দায় একটু সূর্যকিরণ আসিয়াছে। শ্রীমহাপুরুষ গরম র‍্যাপার মুড়ি দিয়া বসিয়াছেন চেয়ারে, সবুজ রং-এর কুশানের উপর ছোটঘরের উত্তরদিকে পূর্ব-দক্ষিণাস্য। পাশে দাঁড়াইয়া আছেন সেবক উমেশ ও শৈলেশ।

স্বামীজীর ঘরের সেবক নিচ হইতে ডাবর ধুইয়া আনিয়াছেন। প্যাসেজে দাঁড়াইয়া শুনিলেন, শ্রীমহাপুরুষ কথা কহিতেছেন।

শ্রীমহাপুরুষ — আমি তাঁর সন্তান, তাঁর দাস, আমার আবার যমের ভয় কি? — এই ভাব থাকলে ভয় কি?

শৈলেশ — আশীর্বাদ করুন, যেন এই ভাব আসে।

মহাপুরুষ — আসছে, আসবে, এসেছে — ক্রমে আসছে।

শৈলেশ — আচ্ছা, ঠাকুরের যে ভাব, তাঁর শরীর চলে যাওয়ার পর তা আপনাদের ভিতর দিয়ে কাজ করছে আবার আপনাদের যে ভাব তা আমাদের ভিতর দিয়ে কাজ করবে কি?

মহাপুরুষ — কাজ করছেই দেখতে পাচ্ছি। হাঁ, স্থূল চলে গেলেও তিনি সূক্ষ্মে সেই সব কাজ করছেন। অবতার আসার বিশেষত্বই তো এই!

শৈলেশ — জপ ধ্যানের সময় ভাবি — ঠাকুরের যেসব ভক্ত, যেমন মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) শরীর ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁরা তো আর স্থূল শরীরে জপ ধ্যান পূজা করতে পারেন না। তাই আমাদের ভিতর দিয়ে এঁরা এইসব করাচ্ছেন।

মহাপুরুষ — এ-ও ভাল, এ-ও একরকম ভাব।

শৈলেশ — যদি wrong (ভুল) হয় করবো না।

মহাপুরুষ — না, তাঁরা সহায় হোন্। যে সব ভক্তরা শরীর ছেড়ে চলে গেছেন, স্পিরিটে সূক্ষ্মে আছেন, তাঁরা সহায়তা করুন।

ডায়েরী পাঠ শেষ হইল। এবার শ্রীম কথাবার্তা করিতেছেন।

শ্রীম — হাঁ, ঠিকই তো! তাঁরই স্পিরিট এখনও ঐভাবে কাজ করছে ঠাকুরের সর্বত্যাগী ও গৃহী ভক্ত ছেলেদের ভিতর দিয়ে। কেন না, ঠাকুর নিজেই বলেছেন — 'মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার

ঐশ্বর্য লাভ করবে যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। আমার ঐশ্বর্য — বিবেক বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি, সুখ শান্তি, ভাব মহাভাব, প্রেমসমাধি।' আরও বলেছিলেন, 'আমি কে, আর তোরা কে এটা জানতে পারলেই হবে।' বলেছিলেন, 'আমার ধ্যান করলেই হবে, তোদের আর কিছু করতে হবে না।'

এই যে তোমরাও ঠাকুরকে ধরেছ, তাঁর ধ্যান নাম গুণকীর্তন ও চিন্তন নিয়ে আছ, তাঁর কাজ করছ, সব ছেড়ে দিয়ে তাঁর শরণাগত হয়েছো — ঠাকুরের স্পিরিটই তো তোমাদের ভিতর দিয়ে কাজ করছে!

শ্রীম আনন্দে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — আহা, কি বিবরণ চোখের সামনে, যেন মঠকে ধরে এনেছেন। আমরা বুড়ো হয়েছি, সর্বদা মঠে যেতে পারি না। তাই ঠাকুর কৃপা করে আপনাদের পাঠিয়ে দেন। মঠ সর্বত্যাগীর স্থান। মঠের কথা শোনা মানে সর্বস্ব ত্যাগের সংবাদ শোনা। এই ত্যাগের চিত্রটি সম্মুখে রেখে চলা। তবেই মানুষ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন, বা আত্মদর্শন হৃদয়ে সদা জাগ্রত থাকবে। ত্যাগের সংবাদ থাকায় সংসার দেবভূমি।

শ্রীমকে প্রণাম করিয়া আনন্দ উঠিলেন। স্বামী দেশিকানন্দকে সঙ্গে লইয়া তিনি ডেন্টিস্টের নিকট যাইবেন। এখন সকাল সাড়ে দশটা।

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। এখন অপরাহ্ন পৌনে ছয়টা। শ্রীম চেয়ারে দক্ষিণাস্য দোরগোড়ায় বসা। স্বামী শ্রীবাসানন্দ শ্রীম-র বাঁ হাতে বেঞ্চিতে। ইনি অনেকক্ষণ পূর্বে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। শ্রীম ঘরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে শুকলাল, পূর্ণেন্দু প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

স্বামী দেশিকানন্দ ও স্বামী নিত্যাত্মানন্দ আসিয়াছেন। শ্রীম তাঁহাদের আদর করিয়া পাশে বসাইলেন। তাঁহারা সকালেও আসিয়াছিলেন। ধর্মতলায় একজন ডেন্টিস্টের কাছে গিয়াছিলেন। এখনও সেখান হইতে শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

শ্রীম-র লিখিত 'গস্‌পেল অব্ শ্রীরামকৃষ্ণ' (Gospel of Sri Ramakrishna) -এর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের সমালোচনা বাহির হইয়াছে

‘মডার্ণ রিভিউ’-তে। মহেশ ঘোষ সমালোচক। শ্রীম ভালমন্দ-মিশ্রিত সমালোচনার ভাল অংশগুলি পড়িয়া সাধুদের শুনাইতেছেন। এক এক জায়গায় বলিতেছেন ‘এই শুনুন — এই একটা assertion, স্বীকার-উক্তি। ঠাকুরকে মানছেন তা হলে অবতার বলে!’ মন্দগুলি পড়িলেন না। বলিলেন, ‘ঐগুলি with a pinch of salt (একটু ভেবে চিন্তে) নেওয়া উচিত।’

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ বলিলেন, অতগুলি বই ঠাকুরের সম্বন্ধে পড়ে লিখেছেন — তাই লাভ। শ্রীম সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, তাই বই কি, তাই লাভ। গোড়ায় রোমাঁ রোলাঁর বই।

স্বামী শ্রীবাসানন্দ ও দেশিকানন্দ চলিয়া গেলেন মঠে।

শ্রীম, বিনয়, অমূল্য, জগবন্ধু, পূর্ণেন্দু ও বলাইকে লইয়া গেলেন ট্যাক্সিতে বায়স্কোপে The Pearl-এ (পার্ল), কুম্ভমেলার ছবি দেখিতে। ডাক্তার বক্সীও আসিয়াছেন। ডাক্তারের ঘোড়ার গাড়ীতে বিনয় ও জগবন্ধু মঠে গেলেন বাগবাজার হইতে শেষ স্টীমারে।

বেলুড় মঠ।
১৪ফেব্রুয়ারী ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বালক তো ষোল আনা বালক

১

মর্টন স্কুল। ৫০ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীট। চারতলার ছাদ। ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০। এখন চারটা বাজিয়া গিয়াছে, প্রায় সন্ধ্যা। দুইজন সন্ন্যাসী — স্বামী দেশিকানন্দ ও স্বামী নিত্যাত্মানন্দ শ্রীম-র অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। তাঁহারা বেলুড় মঠ হইতে ধর্মতলায় দাঁতের ডাক্তারের নিকট গিয়াছিলেন, সেখান হইতে শ্রীম-র কাছে আসিয়াছেন দেখা করিতে।

একটু পরেই শ্রীম ছাদে আসিলেন। এতক্ষণ নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেছিলেন। সাধুরা শ্রীমকে প্রণাম করিলেন। তিনি পূর্ণেন্দুকে বলিলেন, সতরঞ্জি পেতে দিন। সাধুরা তাহার উপর বসিলেন। শ্রীম বসা মধ্যছাদে চেয়ারে, উত্তরাস্য। সাধুরা বসা শ্রীম-র সামনে বাম হাতে। কথাবার্তা হইতেছে কুশলপ্রশ্নাদির পর।

শ্রীম (জনৈক সাধুর প্রতি) — আর শ্রীমহাপুরুষের কথা আছে শোনাবার? তাঁদের কথা ঠাকুরেরই কথা। প্রাণ শীতল হয় এতে। শোনান, শোনান ঠাকুরের জীবন্ত বাণী।

সাধু দৈনন্দিনী খুলিয়া পাঠ করিতেছেন।

বেলুড় মঠ। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। শীতকাল, সাড়ে সাতটা। আজ ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার। মহাপুরুষ গেরুয়া রংয়ের একটা গরম র‍্যাপার জড়াইয়া খাটের উপর বসিয়া আছেন উত্তর প্রান্তে, পশ্চিমাস্য। ঘরে কয়েকজন দক্ষিণদেশীয় সাধু রহিয়াছেন — ভজহরি মহারাজ, রামনাথ মহারাজ, ব্রহ্মচারী নারায়ণ চৈতন্য (নাঞ্জাপ্পা), কেশব প্রভৃতি। ইঁহারা প্রণাম করিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামী নির্বাণানন্দ প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন খাটের দক্ষিণ পাশে। স্বামী নিত্যাত্মানন্দ প্রণামান্তে গিয়া দাঁড়াইলেন দক্ষিণ দরজার পশ্চিম পাশে, উত্তরাস্য।

একটি বাহিরের সাধু আসিয়া শ্রীমহাপুরুষকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। গেরুয়া পরা, তাঁহার লম্বা কতক পক্ক কেশ ও শ্মশ্রু। বয়স পঞ্চাশের উপর। বরাহনগরে বাড়ি। বাড়িতে কালীমাতা প্রতিষ্ঠিতা। এই সাধুর পিতা 'ঠাকুরদাদা' ঠাকুরের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকেই বলিয়াছিলেন, মনের অশান্তির কথা বলায় — 'ও বুঝেছি। দাঁতে দাঁত পড়ছে না। এখানে এসো এক একবার। টিপে লাগিয়ে দিব!'

সাধু প্রণাম করিয়া করজোড়ে মহাপুরুষ মহারাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিবেদন করিতেছেন — 'মহারাজ, আমায় সন্ন্যাস দিন।'

মহাপুরুষ — না, বাবা আমরা অমন সন্ন্যাস দি'না।

সাধু (বারংবার সকাতর মিনতির সহিত) — আচ্ছা, সন্ন্যাস না দিন পর্ণাভিষেক দিন।

মহাপুরুষ — না, তা হবে না। ওসব কিছুই হবে না। তোমার তো হয়ে গেছে। এতদিন যাবৎ যা করছো তাই কর।

সাধু (অধিকতর পীড়াপীড়ির সহিত) — দীক্ষা, বা ব্রহ্মচর্য দিন।

মহাপুরুষ — যা করছো তাই কর। তবে তাঁর নাম ক'রে কর। তিনিই নানাভাবে রয়েছেন। তোমার মা (কালী) যিনি, তিনিই ঠাকুর হয়ে এসেছেন। তিনি যুগাবতার। যা করছো তাই তাঁকে আশ্রয় ক'রে করো। আর কি বলব। যা বলছি তাই কর।

সাধু (আরও, অধিকতর পীড়াপীড়ির সহিত) — না মহারাজ, আমায় কৃপা করুন।

মহাপুরুষ — তুমি বুড়ো হয়েছো, চুল পাকিয়েছো। আর এসব কি বলছো? এতদিন সাধুগিরি করে এসে এখন ওসব কথা কি জন্য? বলছি তো, যা করছো তাই করো!

সাধু (অতিশয় আর্তির সহিত) — বাবা, আমার কিছুই হয় নাই। আমি সব ভুলে গেছি। আপনি সেই মন্ত্র আবার দিন। আমার কোন কিছুই হয় নাই, কিছুই বুঝি নাই।

মহাপুরুষ — তাই যা বলছি তাই করো। এখানে কিছুই হবে না।

মহাপুরুষের সেক্রেটারী স্বামী গঙ্গেশানন্দের প্রবেশ।

মহাপুরুষ (স্বামী গঙ্গেশানন্দের প্রতি, বালকের ন্যায় নিরুপায় হইয়া) — কি বলছে শোন — এতদিন সাধুগিরি করে...। (সাধুর প্রতি) দীক্ষা দু'বার হয় না। যা পেয়েছ তাই ঠাকুরকে আশ্রয় ক'রে কর।

স্বামী গঙ্গেশানন্দ (বড় পাঁউরুটি ও ছুরি হাতে) — ওঁর ইচ্ছা এখানে থাকা।

মহাপুরুষ — না, এখানে থাকা হবে না — এখানে হবে না। যা বলছি কর। ওখানে থাক। আর সাধন ভজন করো। আর বরানগর orphanage-এ (অনাথাশ্রমে) একটু কাজ করো। একটু কাজ থাকা ভাল। ছেলেকে রেখেছ, নিজেও একটু কাজ করো।

স্বামী গঙ্গেশানন্দ (সাধুর প্রতি) — আপনি ওঁকে বকাবেন না। এতে ওঁর মাথা গরম হয়। চলে আসুন। আমরা আপনাকে বলবো। যদি এমন করেন, তা হলে ওপরে উঠতে দিব না।

সাধুর প্রস্থান।

অপরাহ্ন সাড়ে তিনটা। শীতকাল, গায়ে গরম কোট পরিয়া শ্রীমহাপুরুষ আপন কক্ষে বসিয়া আছেন দরজার পাশে ইজি-চেয়ারে, পশ্চিমাস্য। একখানা প্রবুদ্ধ ভারতের পাতা উল্টাইতেছেন। আজ শনিবার বলিয়া আফিসের ফেরৎ ভক্তরা কেহ কেহ কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। ভোলানাথ মুখার্জী (ভবরানী) প্রভৃতি দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন প্রণাম করিয়া। একজন কিছুদিন পূর্বে মঠে সাধু হইয়াছিলেন। যুবক চৈতন্যভক্ত। এখন 'লিবার্টি'-তে কাজ করেন। মহাপুরুষ তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন অতি প্রসন্নভাবে। কথায় কোনও গোঁড়ামি নাই — যে যে-ভাবে ভগবানকে ডাকে তাই উত্তম — সম্পূর্ণ নির্দোষ দৃষ্টি। উদার সহানুভূতিতে কথাগুলি পরিপূর্ণ।

মহাপুরুষ (যুবকের প্রতি) — তোমার ভিতর ভক্তিভাব রয়েছে। তোমাদের বংশের রক্তে ঐ ভাব রয়েছে। বাইরে কোন চিহ্ন না থাকুক, মালাতিলক ইত্যাদি। কিন্তু, ভক্তি রয়েছে রক্তে। চৈতন্যদেব কৃপা করবেন। চৈতন্যদেবই ঠাকুর হয়ে এসেছেন। বৈষ্ণবরা জপ করেন 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ' — এই মন্ত্র।

যুবক — ওঁদের মন্ত্র আরো ছোট।

মহাপুরুষ — না, ঐটাকেই ছোট করে বলেন।

সন্ধ্যার পর, এখন প্রায় সাতটা। মহাপুরুষ গঙ্গার দিকের বারান্দায় চেয়ারে পূর্বাস্য, ছোট ঘরের পাশে। সম্মুখেই নিচে গঙ্গা। ওপারের স্টীমার ঘাটের বিজলীর মালা দেখা যাইতেছে। ঐ আলো জলে পড়ায় জল চক্‌চক্ করিতেছে।

শীতকাল, পায়ে মোজা। মাথায় কানঢাকা টুপি। গায়ে গরম কোটের উপর র‍্যাপার জড়ান। পায়ের উপর একখানা গরম শাল দুই ভাঁজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে — শীত না লাগে আর মশা না কামড়ায়। সেবক মতি পাশে দাঁড়াইয়া।

মহাপুরুষের পায়ের নিচে মেঝেতে কয়েকজন ভক্ত মহিলা বসিয়া আছেন। সঙ্গে একটি ছোট ছেলে। আরতি দর্শন করিয়া তাঁহারা বাড়ি ফিরিবেন এইবার। অল্প কথাবার্তা চলিতেছে।

মহাপুরুষ (একজন মহিলার প্রতি) — গীতা পড়ছো?

ভক্ত মহিলা — আজ্ঞে হাঁ, বেশ লাগে।

মহাপুরুষ — (বালকের ন্যায় আনন্দে) —এই সবই ঠাকুরের (কথা)।

ভক্ত মহিলা — মহারাজ, ধ্যানজপের সময় সংসারের নানা কথা ওঠে মনে — কি করবো!

মহাপুরুষ (সস্নেহে করুণামাখা স্বরে বালকের ন্যায়) — ওসব আসবেই মা। তবে স্থান দিবে না। বিচার করবে — মনকে বলবে, মন এখন বিরক্ত করো না। এখন তাঁকে ডাকছি, তুমি বিরক্ত করো না। আর প্রার্থনা করবে — হে প্রভো, জপ, ধ্যান, সাধন, ভজন দিয়ে তোমাকে পাবার শক্তি আমার নাই। তুমি দয়া করে আমায় দেখা দাও, শান্তি দাও। আর বালকের মত কাঁদবে। কাঁদলেই শান্তি।

(একটু নীরব থাকিয়া) বালকের মত কাঁদা সহজ নয়। কাঁদলে কিন্তু শান্তি।

(স্বগত) গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।।' (গীতা ৯:১৮)

'আমিই গতি, আমিই ভর্তা, আমিই প্রভু, আমিই সাক্ষী, আমিই নিবাসস্থান, আমিই রক্ষক, আমিই সুহৃদ, আমিই প্রভব (স্রষ্টা), আমিই

প্রলয় (সংহর্তা), আমিই স্থান, আমিই নিধান (লয়স্থান)। আর আমিই অবিনাশী বীজস্বরূপ।’

আবার আছে, তুমি সাকার, তুমিই নিরাকার, তুমিই আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত।

এইসব প্রার্থনা ক’রে, ব’লে — তুমি ধ্যানজপ করতে বসো।

একজন সাধু স্বামীজীর ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া এই দেবদৃশ্য দর্শন করিতেছেন, এই জীবন্ত মর্মবাণী শুনিতেছেন।

মহিলা ভক্তগণের প্রস্থান। একজন পুরুষ ভক্তের প্রবেশ।

এখন রাত্রি সওয়া সাতটা প্রায়। স্টীমার সাড়ে সাতটায়। তাই সেবক মতি বলিলেন, ঐ স্টীমার আসছে। প্রণাম করে ঘাটে গিয়ে বসুন।

মহাপুরুষও বলিলেন — হাঁ, স্টীমারঘাটে গিয়ে বসা ভাল।

মঠের ম্যানেজার স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দের প্রবেশ। মহাপুরুষ তাঁহাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন — কি, প্রিয়নাথ কি? উনি উত্তর করিলেন কিছুই না। এমনি এসেছি।

ইনি মহাপুরুষের সামনে দাঁড়াইলেন একটু বাঁ হাতে। পিছনে রেলিং, তাহার পিছনে গঙ্গা।

স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ — মঠে কি সরস্বতী পূজা হবে?

মহাপুরুষ — কোথায় হবে?

স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ — ঠাকুরঘরের পূর্বের বারান্দায়ও অনেক দিন হয়েছে।

মহাপুরুষ — ধ্যানঘরেও হয়েছে। নূতন বাড়িতেও হয়েছে। অনেকখানেই হয়েছে। একটি ছোট প্রতিমা আনা। ভোগ, খিচুড়ী আর পায়েস। পায়েস তো ঘরে আছেই।

মতি — অনেক ভাজা করতে হয়।

মহাপুরুষ — হাঁ, কি আছে করতে হয়। আমি বাবা সাকার পূজা বিশ্বাস করি না — না, আমি সাকার বিশ্বাস করি না। তবে যারা করতে চায় তাদের বাধাও দি’ না — করুক।

শ্রীম — আমার প্রথম দর্শনের দিনই ঠাকুর বলেছিলেন, তিনি সাকার নিরাকার — আরো কত কি। পড়ুন পড়ুন।

তাঁর রূপের ইতি নাই। বলতে গেলে নিরাকারও একটা রূপ। এই স্বরূপের ঝগড়া মেটাতেই ঠাকুরের অবতরণ। মতবাদের গোঁড়ামী ভাঙ্গাই ঠাকুরের অন্যতম প্রধান কাজ। বললেন, মত পথ।

২

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। দোতলা। এখন সন্ধ্যা পৌনে ছয়টা। কয়দিন একটু গরম ভাব ছিল। আজ বেশ শীত পড়িয়াছে। অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে। আজ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার।

শ্রীমহাপুরুষ নিত্য গঙ্গার দিকের বারান্দায় বসিয়া গঙ্গাদর্শন করেন। আজ শীত পড়ায় আর যান নাই। ঠাণ্ডা হাওয়াও বহিতেছে। সব দরজা জানালা বন্ধ — প্যাসেজের, স্বামীজীর ঘরের, খোকা মহারাজের ঘরের, আফিস ঘরের, মহারাজের ঘরের ও মহাপুরুষের ঘরের।

মহাপুরুষের গায়ে বৃন্দাবনী খয়েরী রং-এর পিরান। মাথায় কানঢাকা টুপি। পায়ে ভেলভেটের চটি। একটু সামনে ঝুঁকিয়া বেড়াইতেছেন — নিজের ঘরের দরজা হইতে প্যাসেজের দরজা পর্যন্ত একাকী, যেন আনন্দময় বালক। মুখমণ্ডলে মৃদু হাসির ঝলক। কিছুই চিন্তা ভাবনা নাই — সংসারের, এমন কি নিজের শরীরের কথাও যেন মনে নাই, এমনি নির্মুক্ত নিশ্চিন্ত আনন্দময় ভাব — ইহাই বুঝি পরমহংস অবস্থা!

শ্রীমহাপুরুষ নিজের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া আছেন, দক্ষিণাস্য। একটি সাধু গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সেদিন বলেছিলেন স্বামীজীর ঘরের সারসি খোলা রাখতে। আজ শীত পড়েছে, বন্ধ করবো কি? শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন — হাঁ, যেমনটি নিজের ভাল লাগবে তেমনটি করবে। এতো শীত পড়েছে আজ। আত্মভাবে সেবা।

সাধু স্বামীজীর ঘরের সেবক। তিনি স্বামীজীর ঘরে চলিয়া আসিলেন। মহাপুরুষও পিছনে পিছনে আসিতেছেন। সাধু স্বামীজীর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইলেন, ঘরের ভিতর। মহাপুরুষ দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, ধূপ দিয়েছো? সাধু বলিলেন — আজ্ঞে না, এইবার দেব। মহাপুরুষ বলিলেন, দাও, এই তো সময়। এখনই দিতে হয়।

সাধু ধূপ জ্বালাইয়া সমস্ত ঘরে দেখাইতেছেন। তারপর টেবিলে রাখা শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবিকে প্রণাম করিতেছেন। মহাপুরুষ দরজার রেলিং ঠেলিয়া ঘরের ভিতর দেখিতেছেন — যেন স্বামীজীকে দর্শন করিতেছেন। ছলছল উন্নত চক্ষু, মুখমণ্ডলে এক দৈবী জ্যোতি প্রস্ফুটিত, হৃদয় মন প্রেমানন্দে ঢলঢল — এক অপার্থিব বালক পরমহংস।

শ্রীম — বালক তো ষোলআনা বালক। এটি একটি অবিস্মরণীয় চিত্র — পরমহংস অবস্থা।

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। আজ ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। সকাল সওয়া সাতটা। মহাপুরুষ খাটে নিত্যকার মত বসিয়া আছেন। সাধুরা প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। সকলের সঙ্গে কথা ক'ন — সকলকে জিজ্ঞাসা করেন, ভাল আছ? শব্দ দুইটি, কিন্তু তাহাতেই সাধুদের মনপ্রাণ আনন্দে ভরিয়া যায়।

এই সময় একেবারে আচার্য ভাব। সাধুরা সর্বস্ব ছাড়িয়া ঠাকুরের আশ্রয়ে আসিয়াছেন। তাঁহাদের দেখাশোনার ভার যেন ঠাকুর দিয়াছেন মহাপুরুষের উপর।

একটি সাধু ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া মনে মনে ঠাকুরকে ও তাঁহার নিজের ছবি চিন্তা করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, ঠাকুর আমায় সদ্‌বুদ্ধি দাও। সাধু মাথা তুলিতেই দেখিলেন, মহাপুরুষ ধ্যানমুদ্রায় বলিতেছেন, "নমঃ শিবায়"।

সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল আছ? আজ্ঞে, ভাল আছি — সাধু উত্তর করিলেন। সাধু আরও নিবেদন করিলেন, স্বামী যতীশ্বরানন্দ মাদ্রাজ থেকে আমার পত্রে আপনাকে প্রণাম জানিয়েছেন। মহাপুরুষ বলিলেন — হাঁ আমাকেও লিখেছে। সে এখন কয়ম্বতুর, ত্রিচুর গেছে।

স্বামী সারদেশ্বরানন্দের প্রবেশ। ডাক নাম নলিনী। গত রাত্রিতে ফিরিয়াছেন। এলাহবাদ কুম্ভদর্শনান্তে কাশী নালন্দা রাজগীর প্রভৃতি দর্শন করিয়া ফিরিয়াছেন। ইনি প্রণাম করিয়া উঠিতেই মহাপুরুষ মহারাজ বালকের ন্যায় আনন্দে বলিতেছেন, — "নলিনীদলগত জলমতিতরলং, তদবৎ জীবনং অতিশয়ং চপলম্, ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং

মূঢ়মতে।”

একটি সাধু স্বগত ভাবিতেছেন, আমাদের সকলকে রহস্যচ্ছলে বুঝি বলিতেছেন — ‘ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।’

নালন্দা রাজগীরের কথায় বলিতেছেন, কি আর দূর? এই তো এইখানে পাটনা। গেলেই হয়। ওরাই সেখান থেকে যোগাড় করে পাঠিয়ে দেবে। তিনচার টাকা লাগে। চার পাঁচদিনে হয় — তা-ও লাগে না।

একুট সাধু ভাবিতেছেন, এইসব ভাইদের কি সুন্দর বাসনা। আমার এসব আর এখন হয় না। পূর্বে হ’তো পড়ার সময়। সাধু হয়ে আর হয় না। এখন মনে হয়, কি হবে বাসনায় ঘুরে ঘুরে ফিরে? শরীর ভগ্ন। এই তো জীবন — আজ আছে কাল নাই! এখনও তো ভগবানদর্শন হলো না। জন্ম নেওয়া কি দুঃখ, শুনেছি শাস্ত্রে। অবতারও জন্ম নেন — কিন্তু, তিনি তো জ্ঞানস্বরূপ। তাই ঘুরতে ইচ্ছা হয় না। আর আমার স্বভাব ঘুরে ঘুরে না বেড়ান। তবে আজকাল মনে এইসব হয় — একটি সুন্দর স্থানে একটি আশ্রম হবে। সাধুরা সব সাধনভজনশীল, পরস্পর সহানুভূতি ও প্রেমসম্পন্ন। আহারের মোটামুটি ব্যবস্থা থাকবে। আর কর্মের ঝঞ্ঝাট কম।

স্বামী অক্ষয়ানন্দের প্রবেশ। মহাপুরুষকে প্রণাম করিতেই বলিতেছেন, কেশব মাধব দীনদয়াল। ভিতরে তীব্র উদ্দীপন হওয়ায় কোমর টান করিয়া বসিয়াছেন। শ্রীমহাপুরুষ এখন যেন যুবক, কি তেজোময় ভাব! আনন্দে হাততালি দিয়া গাহিতেছেন, হা ব্রজনাথ, হা দীনদয়াল।

একটি সাধু ঘর হইতে বাহির হইয়া স্বামীজীর ঘরে যাইতেছেন। ভাবিতেছেন, সব জিনিসেই কি আনন্দ, কি শুদ্ধ পবিত্র ভাব। পূর্বের ন্যায় গভীর ধ্যান না হলেও কথায়, কীর্তনে যেন আনন্দ বর্ষণ হচ্ছে। আমাদের এই অবস্থা লাভ হবে?

সন্ধ্যা ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ দোতলার বারান্দায় চেয়ারে উপবিষ্ট সম্মুখে গঙ্গা। পাশে সেবক ক্ষিতীন্দ্র ও মতি, প্যাসেজের দরজা ভেজান। স্বামীজীর ঘরে আলো ও ধূপ দেখাইতেছেন একজন সাধু।

টাঙ্গাইলের একজন ভক্ত আসিয়াছেন। বয়স ত্রিশ। মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া এ-কথা সে-কথার পর বলিতেছেন — মহারাজ, এই গত ঠাকুরের উৎসবে আমার ভাই স্বপ্নে আপনার কাছে দীক্ষা পেয়েছে। সে সেভেন্থ

ক্লাসে পড়ে।

মহাপুরুষ বলিলেন, আমি বাবা কিছু জানি না। ঠাকুরই দিয়েছেন। তবে যে মন্ত্রটি পেয়েছে ঐ সঙ্গে ঠাকুরের নামটিও চাই —'রামকৃষ্ণ' নাম।

প্যাসেজে দাঁড়াইয়া একজন শুনিলেন এই মহাবাক্য — 'রামকৃষ্ণ' নাম চাই।

শ্রীম — তাই তো সত্য — রামকৃষ্ণ বই কি কিছু আছে? মা-ই সব হ'য়ে রয়েছেন। ঠাকুর দেখিয়েছিলেন এইটে — মা-ই ঘরবাড়ি সব। রামকৃষ্ণ তা-ও মা-ই।

পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। আজ ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। সেবক সাধু স্বামীজীর ঘর খুলিতেছেন। আলো দিবেন। শ্রীমহাপুরুষ পাশের প্যাসেজ দিয়া গঙ্গার বারান্দায় যাইতেছেন টলিতে টলিতে। একখানা মুগার বস্ত্র পরিধানে, গায়ে গরম কোট। শরীর অসুস্থ, তাহাতে বার্ধক্য। মুখমণ্ডল সুপ্রসন্ন। মুখের জ্যোতির্ময় ভাব দেখিলে মনে হয় না শরীরে ব্যাধি।

সেবক সাধু ভাবিতেছেন, কি অদ্ভুত কল করিয়াছেন ভগবান। এই ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ সম্মুখ দিয়া যাইতেছেন — তাঁহার অন্তরাত্মা ব্রহ্ম — এই জ্ঞান থাকাসত্ত্বেও শরীরের দুঃখকষ্ট হইতে নিষ্কৃতিলাভ নাই। বিচিত্র সৃষ্টি!

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে। রাম কেঁদেছেন, কৃষ্ণ কেঁদেছেন, ক্রাইস্ট কেঁদেছেন। সব কাঁদছেন।

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। আজ ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। মহাপুরুষ খাটে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। সামনে একটি স্টুলে গড়গড়া হুঁকা। একটি লম্বা কাঠের নল মুখসংলগ্ন। মাঝে মাঝে এক একবার টানিতেছেন। আবার অন্তর্মুখ, কি ভাবেন। আবার প্রণামরত সাধুদের সঙ্গে কথাও ক'ন। কখন ফষ্টিনষ্টি — কখনও গম্ভীর ভাব।

এখন সকাল সাতটা। স্বামী শ্রীবাসানন্দ মহাপুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া

আছেন। পূর্বাশ্রমে থাকার সময় ইনি বাঙ্গালোর মঠ স্থাপনের জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত দক্ষিণ ভারতের কথা দুই একটা হইতেছে। ব্রহ্মচারী কেশব ও প্রতুলও দাঁড়াইয়া আছেন।

একজন সাধু ঘরের ভিতরে দক্ষিণ দিকের টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া আছেন — পিছনে পশ্চিমের জানালা। তিনি একদৃষ্টিতে মহাপুরুষকে দর্শন করিতেছেন — এক 'আশ্চর্য বক্তা'কে।

স্বামী গঙ্গেশানন্দ গৃহে প্রবেশ করিতেই আনন্দে বলিতেছেন, 'নমঃ গঙ্গেশানন্দায় নমঃ', (হাস্য)।

নিচে চায়ের ঘন্টা পড়িয়াছে। সাধুরা একে একে যাইতেছেন। প্রতুল চলিয়াছে। মহাপুরুষ বলিলেন, চা খাও প্রতুল? না মহারাজ, প্রতুল উত্তর করিল।

আর একজন সাধুও ঘরের বাহির হইতেছেন। তাঁহাকেও মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, চা খাও আনন্দ? সাধু বলিলেন, আজ্ঞে না। মহাপুরুষ হাতে বারণ করিয়া বলিলেন, 'না' — অর্থাৎ চা না খাওয়াই ভাল।

অপরাহ্নে মাদ্রাজের বিখ্যাত টি.বি. চিকিৎসক ডাক্তার কেশব পাই আসিয়াছেন। সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের এক পার্টি। মহাপুরুষের ঘরে তাঁহারা বসিয়াছেন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া। নানা কথা হইতেছে ওদেশের।

ডাক্তার পাই শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপুরুষ বলিলেন, He has given me this knowledge that this body is nothing (ভগবান ঠাকুর আমাকে কৃপা করে এই জ্ঞান দিয়েছেন — এই শরীর কিছু নয়, নাশবান বস্তু)। কিন্তু আত্মা অবিনাশী। আমি সেই আত্মা — শরীর নয়।

সকাল সাড়ে সাতটা। একটি সাধু সিঁড়ি ঝাঁট দিতেছেন। তিনি শুনিতেছেন ঘরে মহাপুরুষ মহারাজ কি পাঠ করিতেছেন। কিন্তু, বুঝা যাইতেছে না। কৌতূহলী হইয়া তিনি দরজার কাছে উঁকি মারিলেন। পরদা ফেলা। কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

শুনিলেন চণ্ডীপাঠ করিতেছেন।

'কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ কিঞ্চাতিবীর্যমসুরক্ষয়করি ভূবি।
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতি যানি সর্বেষু দেব্যসুরদেবগণাদিকেষু॥

সাধুর তৃপ্তি হইল না। পাঠরত মহাপুরুষকে দর্শন করা চাই। তাই ছাদে ঝাঁটা রাখিয়া উত্তরের দরজার সারসির ফাঁক দিয়া দর্শন করিলেন। মহাপুরুষ খাটে বসা, ছোট চণ্ডীর পাতা উল্টাইতেছেন। ঘরে হীরেন মহারাজ দাঁড়ান।

তাহাতেও মনে তৃপ্তি আসিল না। ভাল করিয়া দর্শন করিতে হইবে। সাধুর হাতে স্বামীজীর ঘরের ডাবর। গঙ্গায় ধুইতে হইবে। সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া দেখিলেন, তাঁতশালার শচীন ঘরে ঢুকিতেছে। আর স্বামী সারদেশ্বরানন্দ বাহিরে আসিতেছেন। তখন দেখিলেন, মহাপুরুষ খাটে বসা।

গঙ্গা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ডাবর রাখিয়া আবার আসিলেন সাধু। দেখিলেন, এবার দরজা একেবারে খোলা। অনেক সাধু ঘরে। সেবক ক্ষিতীন্দ্র ও মতি, আর স্বামী ভাস্বরানন্দ প্রভৃতি সকলে দাঁড়াইয়া আছেন।

মহাপুরুষ খাটে বসা। হাতে ছোট চণ্ডী, পাতা উল্টাইয়া পড়িতেছেন। সামনে খাবার টেবিল। হুঁকা সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। সাধু দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। ভাবিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ শাস্ত্র পড়িতেছেন। প্রতিটি শব্দ যেন জীবন্ত, তেজোময়।

শ্রীম — অবতারের জীবন্ত তেজোময় শক্তি কিভাবে তাঁর পার্ষদদের ভিতর থেকে আসছে। ভক্ত ভাগবত ভগবান এক — ঠাকুর বলতেন।

৩

পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। সকাল সওয়া সাতটা। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। শীতকাল, মাঘ মাস। আজ ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার। ২৭শে মাঘ, ১৩৩৬। শুক্ল পক্ষ।

মহাপুরুষ খাটে বসিয়া তামাক খাইতেছেন, পশ্চিমাস্য। সামনে ছোট স্টুলে গড়গড়া। কাঠের লম্বা নলটা মুখে সংলগ্ন। এক একবার দুই-একটা টান দিতেছেন। মন অন্তর্মুখ, দৃষ্টি ভিতরে।

মঠের ম্যানেজার স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ আসিয়া প্রণাম করিতেই মহাপুরুষ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিতেছেন — কি হলো, কি হলো? ম্যানেজার

উত্তর করিলেন, ঐ জায়গা নিয়ে গোলমাল আছে মুসলমানদের সঙ্গে।

মঠ, ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল স্কুলের জন্য জমি খরিদ করিয়াছেন একজন মুসলমান প্রজার নিকট হইতে। পাশে একটা ছোট গ্রাম্য মসজিদ। কেহ কেহ ঐ জমি মসজিদের জন্য নিতে চায়।

শ্রীমহাপুরুষ উত্তেজিত হইয়া বলিতেছেন, সে কি, আমরা কিনেছি। আমরা কেন ছেড়ে দেব?

ম্যানেজার বলিলেন, হয়তো এ নিয়ে শেষে কোর্টে যেতে হবে।

মহাপুরুষের চক্ষু দুইটি বড় হইয়া উঠিল। অধিকতর উত্তেজনার সহিত বলিতেছেন, আমরা টাকা দিয়েছি, ইস্কুল হয়েছে। আর এখন কে এসে বলছে, উঠে যাও। যাক্ না, যে বেচেছে আমাদের কাছে, তার কাছে এইভাবে।

আজ অপরাহ্নে বৃষ্টি হইতেছে। জোরে হাওয়া বহিতেছে। এখন পাঁচটা। মঠের উপরের সকল ঘরের বাহিরের জানালা-দরজা সব বন্ধ। মঠের সেবক রজনীবাবু বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া উপস্থিত। মহাপুরুষ তাঁহাকে দেখিয়াই নিজের ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। রজনীবাবু সিঁড়ির রেলিং-এর কাছে দাঁড়াইয়াছেন।

সিঁড়ির উপর দুইটি ভক্ত দাঁড়াইয়া আছে কিছুক্ষণ হইতে। মহাপুরুষের দৃষ্টি তাঁহাদিগের উপর পড়িতেই বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তোমরা কি চাও? হাঁ তোমাদের হবে, যাও হবে।

দক্ষিণের দিকে আসিতেছেন, প্যাসেজের মুখে আসিয়া পুনরায় ভক্তদের দিকে ফিরিয়া সেবককে বলিলেন, প্রসাদ দিয়ে দাও। এসো রজনী এইদিকে, বলিয়াই প্যাসেজের ভিতর দিয়া গঙ্গার দিকের বারান্দায় যাইতেছেন। নিভৃতে কথা কহিবেন।

চৌকাঠ পার হইয়া দক্ষিণাস্য দাঁড়াইলেন, রজনীবাবু উত্তরাস্য। তাঁহার পিছনে স্বামীজীর ঘর। বালকের ন্যায় কৌতূহলী হইয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হাঁ, বল দিকিন কি হল? রজনী উত্তর করিলেন, গোলমাল হবে না, অনেকটা আশাপ্রদ। এখানে বড় হাওয়া মহারাজ, ভিতরে চলুন। মহাপুরুষও শিশুর মত বলিলেন, হাঁ, বড় হাওয়া, এসো এই (ছোট) ঘরে যাই। যেন ছোট শিশু — প্রিয়জনের সঙ্গে চলিলেন খেলনা বা মোদকের আশায়।

খোকা মহারাজের ছোট ঘরে মহাপুরুষ খাটে বসিয়াছেন। রজনীবাবু সামনে দাঁড়ানো উত্তরাস্য। ঘরের বিজলী জ্বালাইয়া দিলেন রজনীবাবু। একজন সাধু প্রথমে স্বামীজীর ঘরের পাপোশের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছেন — পরে সিঁড়ির রেলিং-এর পাশে দাঁড়াইয়া শুনিলেন।

রজনীবাবু বলিলেন, মিটমাটের কথা উঠেছে।

মহাপুরুষ বলিলেন, আমি ঠাকুরকে প্রার্থনা করেছি — 'ঠাকুর তুমিই তো মুসলমান ধর্মের সাধনা করলে। আবার খ্রীস্টানদের — কত কি করলে। এখন তবে এখানে এরূপ গোল কেন?'

রজনীবাবু উত্তর করিলেন, হাঁ মহারাজ, আমিও করেছি। রজনীবাবু আবার বলিতেছেন, মুসলমান গুণ্ডাটার মন ফিরে গেছে। আজ এসে আমায় বলছে, 'এই দেখুন পরোয়ানা।' কোন মোল্লায় দিয়েছে আপস করার জন্য। বলেছে, 'আমিও খোদার কাজ করতে এসেছি।'

মহাপুরুষ আহ্লাদে বলিলেন, আরে এ-ও খোদার কাজ — এ-ও তাই। আমরা খোদার কাজ করছি! (একটু চুপ) দেখলে, এই তাঁর কাজ। এই ঠাকুরের কাজ। ঠাকুর ওদের মন বদলিয়ে দিয়েছেন।

একটি সাধু অবাক হইয়া ভাবিতেছেন, কি বিচিত্র আচরণ পরমহংসদের! নিচের মনটা দিয়ে বিষয়ের সহিত খেলা করছেন যেন কত বিষয়ী। উপরের মনটা শ্রীভগবানে লগ্ন। এঁদের জলের স্বভাব। যে পাত্রে রাখা যায় তার আকার ধারণ করে। অথবা যেন স্বচ্ছ কাঁচ। যার কাছে থাকে তার রং ধরে। নিজে কিন্তু সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত।

তিনটি দৃশ্য দেখলাম — বিষয়ে সিংহতুল্য বিষয়ীর ন্যায়। রজনীর সামনে, শিশুর মত ঘরে এসে বসলেন। আবার ভক্তসঙ্গে করুণাময় — বললেন, এদের প্রসাদ দিয়ে দাও। হাঁ তোমাদের হবে (দীক্ষা), ভক্তদের বললেন। সাধু গীতার শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র আবৃত্তি করিতেছেন।

'ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥' (গীতা ৩:২২)।

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। মহাপুরুষের ঘর। উনি খাটে বসা। আজ ১১ই ফেব্রুয়ারী

১৯৩০, মঙ্গলবার। মঠের ভাণ্ডারী বিকাশ প্রণাম করিয়া উঠিতেই মহাপুরুষ বলিলেন, গঙ্গায় ছোট ছোট ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে। রজনীবাবুকে বলে রাখবে। দু'চারটে এনে রোজ ঠাকুরকে ভোগ দিতে হবে।

ঠাকুর সর্বদা মঠে রয়েছেন সূক্ষ্ম জ্যোতির্ময় দেহে। এটা নিত্য প্রত্যক্ষ হয়তো করেন। নিজে অসুস্থ, মাছ খান না। কিন্তু ঠাকুরের আহারের উপর কত দৃষ্টি! মহাপুরুষের দৃষ্টি সর্বত্র।

শ্রীম — ভক্তের কাছে ভগবান জীবন্ত, জাগ্রত। সর্বদা চোখের সামনে তাঁকে দেখে। তাই নিজ শরীরেরই মত তাঁকে ভালবাসে এবং তাঁর যত্ন নেয়। তাই ভগবান গীতায় বলছেন —

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।। (গীতা ৯:২৬)

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠে স্বামীজীর ঘরে বসিয়া একটি সাধু ধ্যান করিতেছেন টেবিলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। এখন সকাল পৌনে সাতটা। আজ ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ। ১লা ফাল্গুন ১৩৬৬, বৃহস্পতিবার।

শ্রীমহাপুরুষের সেবক শঙ্কর আসিয়া ডাকিলেন, জগবন্ধু মহারাজ আছেন? সাধু সাড়া দিতেই বলিলেন, মহাপুরুষ মহারাজ ডাকছেন। সাধু ভাবিলেন, হয়তো কোথাও যাওয়ার কথা বলবেন। কিন্তু তাঁর মন নিশ্চিন্ত।

মহাপুরুষ খাটে বসা। ঘরে প্রবেশ করিতেই বলিতেছেন — জগবন্ধু, একটা টেবিল ক্লথ এয়েছে। এইটি স্বামীজীর টেবিলে পেতে দাও। শংকর হাতে দিতেই "যে আজ্ঞে" বলিয়া সাধু বাহির হইতেছেন। মহাপুরুষ বলিলেন সেবককে, খুলে দেখে দাও। হাতে লইয়া সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষুনি পেতে দেব কি? হাঁ, এক্ষুনি দাও। শঙ্কর ও সাধু টেবিলে পাতিতেছেন।

বেলা নয়টা। মহাপুরুষ দোতলার দক্ষিণের অফিসঘরে বসিয়া আছেন চেয়ারে, উত্তরাস্য। পাশে আর একখানা চেয়ারে ঋষিকেশের একজন সাধু। তিনি মহাপুরুষকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। উভয়ে ঋষিকেশ ও উত্তরাখণ্ডের নানা কথা কহিতেছেন। মহাপুরুষের সেক্রেটারী পূর্ব-দক্ষিণ কোণে বসিয়া মহাপুরুষের চিঠি লিখিতেছেন। মাঝে মাঝে উনি তাঁহাদের

কথায় যোগ দিতেছেন।

সন্ধ্যা সাতটা। আরতি হইয়া গিয়াছে। একটি সাধু স্বামীজীর ঘরে টেবিলে ঠেশ দিয়া উত্তরমুখী হইয়া জপ করিতেছেন। জপে মন বসিতেছে না। তিনি ভাবিতেছেন, ভগবানের নামে সব দুঃখ দূর হয়, মন আনন্দে থাকে। এই বলিয়া একটু জোরে জপ করিতে লাগিলেন।

মহাপুরুষ বারান্দা হইতে প্যাসেজ দিয়া পশ্চিম দিকে যাইতেছেন, আর গুন গুন করিয়া গাহিতেছেন, 'সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে।' কি মধুর স্বর — ভাবে যেন মগ্ন!

ভজনরত সাধুর মন ভগবানে স্থির হইয়া গেল — আনন্দে ভরপুর। তিনি ভাবিলেন, ঠাকুরই কৃপা করিয়া শ্রীগুরুর মুখ দিয়া সুখানন্দদায়ী তাঁহার নাম-মহিমা শুনাইলেন।

অনন্ত হইতে উঠিয়া অনন্তে মিলাইয়া গেল সেই স্বরলহরী। কিন্তু সাধুর হৃদয়ে সুখস্মৃতির একটি মধুর রেখাপাত করিয়া গেল। সাধুর কানে বাজিতেছে ঐ সুমধুর স্বরলহরী — 'সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে।'

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — আহা কি গান! 'সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে।' এই গানটি স্বামীজীর মুখে শুনে ঠাকুরের সমাধি হয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশ বছর হলেও সেই সুরলহরী কানে বাজছে এখনও। আহা, কি যে তিনি ছিলেন! ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। আজ ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার। শ্রীমহাপুরুষের কক্ষ। মহাপুরুষ খাটে বসা র‌্যাপার জড়াইয়া। সামনে বেতের মোড়ায় বসা স্বামী অম্বিকানন্দ — টেবিলের দক্ষিণে। সাধুরা কেহ কেহ এদিক ওদিক ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন।

কথায় কথায় ছক্কু মহারাজের (স্বামী যাদবানন্দ) কথা উঠিল। স্বামী অম্বিকানন্দ বলিলেন, ছক্কু বেশ বদলে গেছে। সেই সব গেছে। সাধুভাব আসছে। ওঁদের (মা ও ঠাকুরের শিষ্যদের) কৃপা পেয়েছে কি না! ধ্যানজপও করে, যোগবাশিষ্ঠ পড়ে। পাহাড়ে চাম্বায় আছে এক বৃদ্ধ বৈষ্ণব সাধুর কাছে। এক একবার বিচারেও লেগে যায়। বৃদ্ধ সাধু বলেন, এক একবার বেশ কথা বলে। সাধুটি বড় স্নেহ করেন। অভিমান করলে স্নেহ করে বলেন, 'আরে যাদবানন্দ, আরে বেটা।'

আর একজন বুড়ো সাধুও রয়েছেন। সকলেই মাধুকরী করে খান। কিন্তু সাধুদের জন্য সব যোগাড় আছে। সাধু গেলে সেবা করেন। ডাল চাল আটা ঘি, সব মজুত আছে। নিজেরা খান না, সাধুদের খাওয়ান।

মহাপুরুষ — বাঃ, বাঃ, এইতো চাই! নিজে না খেয়ে সাধুদের খাওয়ান! এই তো সাধুর কাজ! স্নেহ করেন ছক্কুকে — বাঃ, বাঃ!

স্বামী অম্বিকানন্দ — ছক্কুকে বলেন, 'তুম মহন্ত হো যাও।' সে বলে 'না মহারাজ, আমি তা পারবো না।' সাধু তখন বলেন, 'আরে বেটা, তুমকো কুছ নেহি করনা হোগা — কেবল মহাত্মা লোক আবে গে — উনলোগোকী সেবা করনা, ব্যস্।' আমি একখানা চিঠি লিখবো ছক্কুকে।

মহাপুরুষ (অতিশয় আনন্দ ও সস্নেহে) — আমিও লিখবো একখানা। আহা থাক্ থাক্ ওখানে। বৃদ্ধ সাধুর কাছে থাকা ভাল। ঠাকুরই জুটিয়ে দিয়েছেন তা। কতকগুলি বদ্ অভ্যাস ছিল কি না!

স্বামী অম্বিকানন্দ — এক বছর আছে ওখানে।

মহাপুরুষ — আহা, থাক্। আমিও লিখবো। ঠাকুর, মা তাঁর মঙ্গল করুন।

৪

সন্ধ্যার পর মহাপুরুষ মহারাজ গঙ্গার বারান্দা হইতে প্যাসেজ দিয়া নিজের ঘরে যাইতেছেন। স্বামীজীর ঘরের সেবক সাধু ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করিতেছেন। কি, আনন্দময় মূর্তি! ধর্মের জীবন্ত ভাষ্য!

মহাপুরুষ সাধুকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, এবার বন্ধ করবে ঘর? আজ্ঞে হাঁ, বলিয়া সাধু দরজায় তালা লাগাইলেন। মন আনন্দে পূর্ণ। ভাবিতেছেন, কত ভাগ্যবলে এসব দুর্লভ সঙ্গ ও কৃপা লাভ হয়েছে আমাদের। ইহাই বুঝি 'kingdom of heaven on earth' (ধরাতে বৈকুণ্ঠ)।

বেলুড় মঠ। ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। মহাপুরুষ খাটে বসিয়া আছেন। এখন সকাল সওয়া সাতটা।

স্বামী স্বয়মানন্দ আসিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি জাতিতে পার্শী, নাম ছিল দীন শা কাপাড়িয়া। ঘরে আরো সাধু রহিয়াছেন — বড় হীরেন প্রভৃতি।

মহাপুরুষ আনন্দে বলিতেছেন, 'দীনশরণ' আমি এই নামটি রেখেছি (হাস্য)। 'দীন শা' — 'দীনশরণ' বেশ নামটি। (কাপাড়িয়ার প্রতি) ভাল আছ? কাপাড়িয়া মাথা নাড়িয়া উত্তর দিলেন, ভাল আছি।

মহাপুরুষ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন — 'দীনশরণ', ভাল না? কাপাড়িয়া এবারও মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন।

শ্রীম — হাঁ, ঠাকুরই দীনশরণ।

ডায়েরী পাঠ শেষ হইল। এখন ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে।

স্বামী দেশিকানন্দ — গস্‌পেল (Gospel — ইংরেজীতে লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের দুই ভাগ) আপনি লিখেছেন বলে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত আপনাকে সর্বত্র জানে এই বইয়ের throughতে (মাধ্যমে)।

* One High Court Judge read the Gospel (Part I) seventeen times. And he told me, every time he found new light. He is a Malayalee. I am speaking of one instance, there are plenty unreported. You recognised him as God-incarnate, and we hear from you.

M. — No, it was he that made us recognise him as God. We did not recognise him. In the Gita Arjuna says, 'স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।' (গীতা১০:১৫) — He

* হাইকোর্টের একজন বিচারক সতের বার পড়েছেন গস্‌পেলের প্রথম ভাগ (শ্রীম দ্বারা ইংরেজীতে লিখিত 'Gospel of Sri Ramakrishna' প্রথম ভাগ)। আমাকে বললেন, প্রত্যেক বারই তিনি নূতন জ্ঞান লাভ করেছেন। তিনি একজন মালয়ালী। আমি তো মাত্র একটি ঘটনারই কথা বলছি। অসংখ্যই তো অজ্ঞাত রয়েছে। আপনিই ঠাকুরকে ঈশ্বরের অবতার বলে চিনেছিলেন, আর আমরা ভাগ্যবলে আপনার মুখে শুন্‌ছি।

শ্রীম — না, উনিই আমাদের চেনালেন নিজেকে ঈশ্বররূপে। আমরা চিনি নাই। গীতায় অর্জুন বলেছেন, 'স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম'

knows Himself, none else knows Him. And those whom He make Him know, only they know Him. যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ — the Veda says.

♦He says in the Gita — for the salvation of the sadhus, I incarnate myself in flesh and blood whenever it is required. He comes to save, and the sadhus come to be saved.

The book-learning — it has very little value. The Avatar comes to interprete the books or scriptures. So long the scriptures were sealed books. The Lord Krishna came and interpreted the truth in the Gita.

Who will interprete the Sastras? The intellect; it is blind. Weighed in balance it is found wanting. Such is the value of the intellect. Very feeble it is. By the intellect name, fame and money can be had. So Christ says, 'do not lean on a broken reed.' The Divine interpreter comes to interprete the sastras.

জনৈক সাধু নিজ মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন —

আমাদের হয়তো তিনি সাবধান করছেন, আমরা কেবল শাস্ত্র পড়ে

— তিনি নিজকে নিজেই জানেন, আর কেউ তাঁকে জানে না। যাঁদের তিনি বুঝান তাঁরাই তাঁকে বুঝতে পারেন। 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ' — বেদের বাণী।

♦ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলছেন, সাধুদের মুক্ত করতে আবশ্যক হলেই আমি মানুষরূপে অবতীর্ণ হই। উনি আসেন পরিত্রাণ করতে, আর সাধুরা আসেন পরিত্রাণ পেতে।

অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞানের দাম অতি অল্প। অবতার আসেন শাস্ত্রের, ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা করতে। এতকাল শাস্ত্র অবোধ্য ছিল। ভগবান কৃষ্ণরূপে এলেন আর গীতায় সত্যস্বরূপের ব্যাখ্যা করলেন।

শাস্ত্রের ব্যাখ্যা কে করতে পারে? বুদ্ধি — সে তো অন্ধ! এর ওজন করতে গেলে এটা অতি কম। এটাই হল বুদ্ধির দাম — এটা খুবই দুর্বল। নামযশ পয়সা কড়ি হতে পারে বুদ্ধি দ্বারা। তাই ক্রাইস্ট বলছেন, দুর্বলচিত্ত মানুষের ভরসা করো না! মানুষ ঐ রকম। ঐশী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাখ্যাতাই আসেন শাস্ত্রগুলি ব্যাখ্যা করতে।

যাতে গোলমালে না পড়ে যাই। ঠাকুরের মহাবাক্যের সঙ্গে মিলিয়ে সকলের এগুলি পাঠ করা উচিত। তারপর সব কিছু পরিত্যাগ করে সাধন দরকার। ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে থাকাই শান্তিলাভের একমাত্র উপায়। সর্বদা আমাদের, ঠাকুরের মহাবাক্য ধরে থাকতে হবে।

➢M. — He (Sri Ramakrishna) said, 'I knoweth no letters.' But he speaketh through this mouth such words that are listened to by learned pundits. 'One ray', he added, from the goddess of learning, dazzels the eyes of the big pundits.

"Martha, Martha, these things are good and thou art troubled with them. But one thing is needful; and Mary has chosen that, the better part of which shall not be taken away from into her", Christ said.

'These things' means rituals and ceremonies — *yag-yajna, hom* etc. And 'one thing' means love of God.

একটি সাধু (স্বগতঃ) — ঠাকুরকে ভালবাসাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য।

শ্রীম (পূর্ণেন্দুকে) — আন না প্রসাদ। পূর্ণেন্দু একটি এনামেলের সসারে দুইটি বড় রসগোল্লা আনিলেন। শ্রীম বলিলেন, দিন ওঁদের।

ইতিমধ্যে অপর ভক্তগণও আসিয়াছেন — শুকলাল, বলাই, সুখেন্দু, শান্তি, মনোরঞ্জন প্রভৃতি। অন্য কথা উঠিয়াছে। পুনরায় ঈশ্বরীয় কথার

➢শ্রীম —ঠাকুর বলতেন, 'আমি মুখ্যু, লেখা পড়া জানি না।' কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে এমন কথা বের হতো যে, মহাপণ্ডিতগণও নীরবে তা শ্রবণ করতেন। তিনি আরও বলতেন, সরস্বতীর এইটুকু একটু কিরণে বড় বড় পণ্ডিতের চোখ ঝলসিয়ে দেয়।

'মার্থা, মার্থা, এগুলো ভাল জিনিস, আর দুঃখ তোমার ওদের জন্যই। কিন্তু আর একটি জিনিস আবশ্যক, মেরী তাই নিয়েছে। ওর ভাল অংশ তার কখনও হাতছাড়া হবে না,' ক্রাইস্ট বলেছেন।

'এগুলো' মানে বৈদিক কর্ম — যাগযজ্ঞ, হোম ইত্যাদি। আর 'এক জিনিস' মানে ঈশ্বরের ভালবাসা।

উদ্দেশ্যে স্বামী দেশিকানন্দ বলিলেন শ্রীমকে — 'You were telling us about God." (আপনি আমাদের ঈশ্বরের সম্বন্ধে বলছিলেন।) কিন্তু রসভঙ্গ হইয়া যাওয়ায় কথা আর তেমন জমিল না।

সন্ধ্যার আলো আসিয়াছে দেখিয়া হাততালি দিয়া শ্রীম বলিতে লাগিলেন, হরিবোল, হরিবোল। পূর্ণেন্দু হ্যারিকেনটি তুলসীতলায় লইয়া গেলেন। শ্রীম এবং সাধু ভক্তগণও গেলেন। ছাদের উত্তর দিকে তুলসীকুঞ্জ। বড় মাটির টবে তুলসী ও নানা প্রকার পুষ্পতরু।

সাধু ও ভক্তরা ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। শ্রীম খ্রীস্টভক্তের মত হাঁটু গাড়িয়া যুক্তকরে প্রণাম ও প্রার্থনা করিতেছেন। হাত কাঁপিতেছে, তবুও যুক্তকর বারবার কপালে লগ্ন করিতেছেন। আর মুখে ঠাকুরদের নাম।

একটি সাধু (স্বগত) — কি নিষ্ঠা ভগবানের পার্ষদের! বৃদ্ধ শরীর, অন্য লক্ষ্য নাই। শরীর মন প্রাণ আত্মা সব যেন এক হয়ে লগ্ন, শ্রীভগবানের চরণকমলে। আমাদের সে নিষ্ঠা কোথায়? নিজ আচরণ দিয়ে যেন আমাদের বলছেন, শাস্ত্রপাঠ বৈধিভক্তি ভাল হলেও প্রেমাভক্তি শ্রেষ্ঠ, উহাই গ্রহণ কর। কিন্তু আমাদের সে ভালবাসা কোথায়?

শ্রীম তুলসীতলা হইতে নিজের ঘরে গেলেন। হ্যারিকেন লণ্ঠনটি হাতে লইয়া দেয়ালে টাঙ্গান দেবীর ছবিকে আলো দেখাইলেন। আবার ছাদে নয়, সিঁড়ির ঘরে বসিলেন — খাম্বার পাশে উত্তরাস্য চেয়ারে। মাথায় একটা তোয়ালে, গায়ে লং-ক্লথের পাঞ্জাবী। ভক্ত ও সাধুগণ শ্রীম-র সামনে ও পাশে বেঞ্চিতে বসিয়াছেন।

অন্তেবাসী কহিলেন — বিশ্রাম করুন তো, ঘরে গিয়ে করুন।

শ্রীম বলিলেন — না, এইখানে বসেই আহ্নিক করি। শ্রীম চক্ষু বুজিয়া ধ্যান করিতেছেন।

একজন সন্ন্যাসী ভাবিতেছেন, কি সংযম, কি ধৃতি, কি ঈশ্বরের ভালবাসা এই মহাপুরুষের! ঈশ্বরপ্রীতি মনটিকে পরিপূর্ণরূপে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বার্ধক্য, শারীরিক অসুস্থতা, দেহসুখ প্রভৃতির ঐ মনে প্রবেশ নিষেধ।

৫

ধ্যানান্তে শ্রীম সাধুদের কাছে মঠের সংবাদ লইতেছেন। একজন বলিলেন, আমার কয়েকটি কথা আছে জিজ্ঞাসার। শ্রীম তাঁহাকে লইয়া ছাদে গেলেন। লোহার সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথা হইতেছে।

জনৈক — ওঁরা শুনছি আমায় দেওঘর পাঠাতে পারেন। স্থান ভাল, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ভাল, তাই।

শ্রীম — কি, চেঞ্জে?

জনৈক — না, কর্মী হিসাবে।

শ্রীম — তা নূতন জায়গা। বেশ তো। একবার experiment (পরীক্ষা) করা যাক না। ভাল না হয় তো চলে এলেই হবে। তা ছাড়া এ সময়টা ওখানে নাকি ভাল সময়!

খুব responsible (দায়িত্বপূর্ণ)! ছেলেমানুষ সব সেখানে থাকে। অনেক গণ্ডগোল হয়ে গেছে শুনেছি। Young men (যুবকরা) বিয়ে করে নাই। বড় সাবধানে ও-গুলি বাঁচিয়ে তবে থাকতে হয়। ভারি responsible (দায়িত্বপূর্ণ)।

জনৈক — অনেকের অনেক কথা। কিছুই স্থির করা যায় না। মহাপুরুষ মহারাজ কিছু বললে implicitly (নির্বিচারে) তা পালন করা যায়। তাঁর কথায় বিশ্বাস হয়! অপরের কথায় তা হয় না। বড়ই মুস্কিল। আবার sympathy-ও (সহানুভূতিও) পাওয়া যায় না তেমন।

শ্রীম — কেন, ওরা পারছে না বুঝি?

জনৈক — যে যা ভালবাসে সে তাই বলে।

শ্রীম — তা কেমন করে হবে? সকলেই সকলের নিজের নিজের চিন্তায় ব্যস্ত। সকলেই তো সিদ্ধপুরুষ নয়। নানা রকম প্রকৃতি, খুব tactfully (দেখেশুনে) চলতে হয়। আর সর্বদা prayer (প্রার্থনা)। বিবেকানন্দ বলেছেন, ঠাকুরই আমাদের hero (উপাস্য)। তাঁকেই সব বলতে হয়।

Organisation-এ (সঙ্ঘে) থাকা বড়ই শক্ত ব্যাপার। তাই tact (কৌশল) আর prayer (প্রার্থনা)। Imitation of Christ (ইমিটেশন

অব ক্রাইস্ট) লিখেছেন যিনি, তিনি ছিলেন কিনা সঙ্ঘে। তাই বলেছেন, সর্বদাই prayer (প্রার্থনা) দরকার। প্রার্থনা করা — প্রভো, অমুক কথা শুনছে না, অমুক গোলমাল করছে, ইত্যাদি।

Organisation-এর (সঙ্ঘের) কত শক্তি! মানুষকে মেরে ফেলে মনে কর। ক্রাইস্টকে মেরেই ফেললে।

আর ওদের কাছ থেকে বেশী claim (দাবী) করা উচিত নয়। তা হলে একটা grievance (মানসিক দুঃখ) থেকে যায়। তা বড় খারাপ। কোনও বিষয়ে পরামর্শ করতে হলে খুব kindly (বিনীতভাবে) করতে হয়, আর সেবা করতে হয়। মনে কর, একজনের অসুখ করেছে। কেউ নাই বা বললে — তবুও সেবা করতে হয়। তা না করে তখন ধ্যান করা — এ ভাল না।

জনৈক — ওরও বিপদ আছে। এই মাদ্রাজে যখন আমার শরীর খারাপ হয়ে পড়লো এই রকম করে, যাঁদের দিকে চেয়ে করা তাঁরাই বললেন, কেন যাও করতে? যদি এই ভাবে সেবা করতে করতে শরীর পড়ে যায়, তবুও সেবা করা উচিত কি?

শ্রীম — তখন বলতে হয়, তোমরা কর। আমি আর পারছি না। শরীর দেখতে হবে। যতক্ষণ করার energy (শক্তি) আছে ততক্ষণ করা উচিত। যখন নিজেকেই সামলাতে পারা যাচ্ছে না, তখন অন্যদের বলতে হয়।

এই মঠে অত বড় একটা schism (দলভেদ) হয়ে গেল। এইটা recover (পূরণ) করতে কত বেগ পেতে হচ্ছে।

Tact (কৌশল) আর সর্বদা তাঁকে প্রার্থনা করা। Organisation এ (সঙ্ঘে) থাকতে গেলে কতকগুলি advantage (সুবিধা) যেমন পাওয়া যাচ্ছে তেমনি কতকগুলি disadvantage-ও (অসুবিধাও) আছে। আর তা না হলে গাছতলায় যেতে হয়। কিন্তু তাতেও কত অসুবিধা। কাল কি খাব তার ঠিক নাই।

জনৈক — পূর্বে কত memory (স্মৃতিশক্তি) ছিল। এখন কিছু মনে রাখতে পারি না।

শ্রীম — ও শরীর খারাপ বলে, অমন হয়। আর self-seeking

(সুবিধাবাদী) হলে মনের উন্নতি হয় না। তাই সেবা করতে হয় যতক্ষণ পারা যায়।

জনৈক — আমি দেখেছি মাদ্রাজে, মন ভাল থাকে সেবা করলে। কিন্তু শরীর তো তা মানে না।

শ্রীম — অসুখ থাকলে আলাদা কথা। আসুন না এইখানে। এই বলিয়া শ্রীম সিঁড়ির ঘরে আসিয়া বসিলেন চেয়ারে। আবার কথা হইতেছে।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন গীতায় —

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ (গীতা ৯:২৭)

দেখ, বলছেন — যা কর, সব আমাকে অর্পণ কর — তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্। যা কর, যা খাও, সব দাও, general termএ (সাধারণ ভাবে) বলছেন। তপস্যা করছ (চক্ষু বুজিয়া ধ্যানের অভিনয় করিয়া) এমন করে, তাও আমাকে দাও। তবেই হবে। তা না হলে খানিকটা আমার নিজের জন্য, খানিকটা তাঁর জন্য — তা হলে হবে না। সব তাঁর জন্য করতে হবে।

গুরূপদিষ্ট কর্ম করতে হয়। গুরু যা বলেন তাই করতে হবে। তবেই তোমার caseটা (অবস্থাটা) represent (উপস্থাপিত) করা যায়। তবুও যদি বলেন, তবে করতেই হবে। যদি পড়াতে হয় তা-ও তাঁর জন্য।

(খানিক চিন্তার পর) তবে বড় কঠিন নিষ্কাম কর্ম, বড় কঠিন। কিন্তু বলেছেন আবার, একটু করলেই হবে। 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য' — এই নিষ্কাম কর্মের একটুতেই হবে। কি হবে? 'ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ' মহাভয় থেকে পরিত্রাণ করবে। কি সে মহাভয়? জন্মমৃত্যু চক্র। পরিত্রাণ মানে মুক্তি। একটু নিষ্কাম কর্ম করতে পারলেই চিত্ত শুদ্ধ হবে। তা হলেই জ্ঞানপ্রাপ্তি। তা থেকে মুক্তি। নিষ্কাম ভাবে না করলে শুভাশুভ ফল পেতে হবে। তাতেই জন্মমরণ চক্রে পড়তে হবে। জন্মমরণই সকল দুঃখের কারণ। তাই মহাভয়। 'ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ' — এইটি হল message of hope (আশার বাণী)।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। চোখে মুখে গুপ্ত হাসি। আবার কথা।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — এ আর একটি আছে — যেমন সীতাপতি

মহারাজ (স্বামী রাঘবানন্দ)। মাঝে মাঝে গিয়ে একটু করে দিয়ে আসেন — নিষ্কাম কর্ম।

অনেকদিন নির্জনে ছিলেন। আবার উদ্বোধনের বিবাদের সময় কিছুদিন করেছিলেন। আর ওদিকে (উত্তর-পশ্চিম ভারতে) মঠের কাজে আর তীর্থে। ও একটি (থাক) আছে।

পূর্ণেন্দু — উনি বলেন, বরাবরই করবো? বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।

শ্রীম (সহাস্যে) — তা বলে ছাড়বে কেন?

ক্ষণকাল ভাবান্তর। আবার কথা।

শ্রীম (শুকলালকে লক্ষ্য করিয়া) — এই যারা সংসারে থাকে, ভোগ নিলেই বিপদ — বদ্ধ হয়ে গেল। আর ভোগ না নিলে তা হয় না।

(সকলের প্রতি) মঠেই থাক আর বাড়িতেই থাক, ভোগ নিলেই বদ্ধ হয়ে গেল।

দুর্গাপদ মিত্রের প্রবেশ। শ্রীম আহ্বান করিতেছেন, আসুন আসুন, বসতে আজ্ঞা হোক। আপনি star-এর (তারকার) মত দেখা দিয়ে (কুম্ভে) চলে গেলেন।

দুর্গাবাবু শ্রীম-র হাতে একটি ম্যাগাজিন দিলেন। ইহাতে কুম্ভের নানারকম সাধুসন্তের ছবি আছে। শ্রীম পাতা উল্টাইয়া অতি নিবিষ্টভাবে দেখিতেছেন। বলিতেছেন, এই আমাদের কুম্ভ দর্শন হলো। অপরের কাছে শুনলেও বার আনা চৌদ্দ আনা হয়, যদি খুব strong imagination (প্রবল কল্পনাশক্তি) থাকে। এ মনে কর তার উপর ছবিদর্শন। সায়েন্সের এই সব good application (উত্তম ব্যবস্থা) আমরা দূরে বসেও দেখছি।

আর একটা আছে 'দিব্যচক্ষু'। সেটা যৌগিক শক্তি, মনের ব্যাপার। বেদব্যাস সঞ্জয়কে দিয়েছিলেন সেই শক্তি। তবে দিল্লীতে বসে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ দেখতে পেয়েছিলেন। আর ধৃতরাষ্ট্রকে তাই বলতেন। গীতার জন্ম ঐতে হয়। সায়েন্সও অনেক এগুচ্ছে। এখানে বসে দূরের সংবাদ শোনা যায়। আবার বলা যায় টেলিফোনে। আবার wireless (বেতার যন্ত্র) হচ্ছে। কালে হয়ত দেখাও যাবে দূরের জিনিস।

এসব হচ্ছে material science (জড়বিজ্ঞান)। আর mental science (মনোবিজ্ঞান), আবার তার উপর spiritual science

(আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান)। West-এ (পশ্চাত্ত্যে) material science-এরই (জড়বিজ্ঞানেরই) experiment (গবেষণা) চলছে এখন। তারপর mental science (মনোবিজ্ঞান) — প্রাচীন কালে যুদ্ধে তার প্রয়োগ দেখা যায়। Spiritual science-এর (আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের) নাম ব্রহ্মবিদ্যা। তাতে ঈশ্বরদর্শন, আত্মদর্শন হয়।

একসঙ্গে চললে তিনটাতেই সুফল হয়। নইলে কুফল। West-এর (পাশ্চাত্ত্যের) এরা কেবল material science (জড়বিজ্ঞান) নিয়ে আছে। Spiritual Science (আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান) সঙ্গে না থাকলে ওতেই ধ্বংস হবে — বুদ্ধিবিভ্রান্ত হয়ে। তারই নমুনা দেখা যাচ্ছে। এই First World War-ই (প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধই) তার দৃষ্টান্ত।

রাত্রি প্রায় আটটা। স্বামী দেশিকানন্দ ও স্বামী নিত্যাত্মানন্দ প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। তাঁহারা বেলুড় মঠে যাইবেন। পূর্ণেন্দু আলো লইয়া সাধুদের সঙ্গে নিচের তলায় গেলেন। শুকলাল পাথেয় বাবদ দুইটি টাকা দিলেন।

সাধুরা কর্মযোগ করেন। রাস্তায় চলিতে চলিতে ভাবিতেছেন, শ্রীম খুব জোর দিলেন গুরূপদিষ্ট কর্মে। আর ভরসা দিলেন গীতার কথায়। একটু নিষ্কাম কর্ম করতে পারলেই কাজ হবে 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ' (গীতা ২:৪০)।

বেলুড় মঠ।
২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার।

সপ্তম অধ্যায়

মুক্তার মালা এসব কথা

১

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। মধ্যস্থলে চেয়ারে শ্রীম বসিয়া আছেন উত্তরাস্য। শ্রীম-র বাম হাতে জোড়া বেঞ্চ, উপরে শতরঞ্জি। ইহাতে সাধুরা বসেন। শ্রীম-র ডান হাতেও বেঞ্চ পাতা। তাহাতে ভৌমিক, পূর্ণেন্দু আর কয়েকজন ভক্ত উপবিষ্ট।

আজ ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। এখন পাঁচটা। বেলুড় মঠ হইতে স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, স্বামী জিতাত্মানন্দ ও দিনাজপুরের মণীন্দ্র মহারাজ ধর্মতলায় দাঁতের ডাক্তারের বাড়ি গিয়াছিলেন। সেখান হইতে আসিয়াছেন। দেখিয়াই শ্রীম অভ্যর্থনা করিয়া নিকটে জোড়া বেঞ্চিতে বসিতে বলিলেন। তাঁহারা প্রণাম করিয়া বসিলেন। কুশল প্রশ্নাদি শেষ হইল। এখন অন্যান্য কথাবার্তা হইতেছে।

জগবন্ধু মহারাজ — ঠাকুরের তিথিপূজাতে মঠে যাবেন কি?

শ্রীম — ইচ্ছে তো আছে। দেখি কি হয়। একবার ইচ্ছে হল কুম্ভে চলে যাই (প্রয়াগে)। যাই তো এখনি যাই। ও মা, সে ইচ্ছাটি গেল অমনি। এদিকে একতলা দোতলায় উঠতে পারছি না। এমন সব। মন নিয়ে কথা কি না। মঠে যেতে তো ইচ্ছে হয় — ঝাঁপ দেয় যেমন পতঙ্গ আগুনে।

উটি থেকেও নিমন্ত্রণ এসেছে ঠাকুরের উৎসবের। ৯ই মার্চে উৎসব — চিদ্‌ভবানন্দ পাঠিয়েছেন!

চিঠিখানা হাতে লইয়া খুলিলেন। পড়িয়া বুক পকেটে রাখিয়া দিলেন।

শ্রীম — উলসূর (ব্যাঙ্গালোর) থেকেও নিমন্ত্রণ এসেছে। কে আছেন ওখানে?

জগবন্ধু — তাম্বি।

শ্রীম — না।

জগবন্ধু মহারাজ — তাহলে স্বামীজীর শিষ্য যোগেশ্বরানন্দজী।

শ্রীম — হাঁ। তিনিও ওখানে উৎসব করছেন। (জনৈক সন্ন্যাসীর প্রতি) আপনার কোথাও যাওয়া স্থির হল কি? ডাক্তারের কাছে আসছেন না এখন?

সন্ন্যাসী — আজ্ঞে না। আগের মত নয়।

শ্রীম — এখন কে ডাক্তার — অমরবাবু নন?

সন্ন্যাসী — আজ্ঞে না, শ্যামাপদবাবু।

শ্রীম — কি খান?

সন্ন্যাসী — রাত্রে এক পোয়া দুধ আর তিনখানা রুটি। আর দিনে ঝোলভাত।

শ্রীম — রুটি বেশী খেতে পারেন — ইচ্ছা হয়?

সন্ন্যাসী — আজ্ঞে, ইচ্ছে হয়। তবে হজম করা শক্ত হয়। তবে দুধ মনে হয় খেতে পারি বেশী। Liquid (তরল) বেশী খাওয়া চলে।

শ্রীম — সকালে দুধ খান?

সন্ন্যাসী — না। ঘোল খেতে বলেছেন। সকলের জন্য ঘোল হয় যেদিন পাই, সে দিন খাই। সর্বদাই strain (শরীর ও মনের উপর চাপ)।

শ্রীম — কথায় বলতে গেলে, রাখাল মহারাজ বলতেন — সন্ন্যাসী মানে বেওয়ারিশ মাল।

কিন্তু, এ (সন্ন্যাস) চিরকাল থেকে চলে আসছে। বুদ্ধদেব বলেছিলেন, মহারাজ, আমি আপনার বংশে জন্মাই নাই। আপনি ভাববেন না। আমি বুদ্ধবংশে জন্মেছি। বুদ্ধদেবের বাবা বলেছিলেন কি না, তুমি আমার বংশে জন্মে ভিক্ষা করে খাচ্ছ? তাতেই বুদ্ধদেব বলেছিলেন, মহারাজ আমি বুদ্ধবংশে জন্মেছি।

(একটু ভাবিয়া) গিন্নী জানে, কোন হাঁড়ির উপর কোন হাঁড়ি রাখতে হয়। ভাবতে হবে না। তিনি যেকালে এতগুলি আশ্রম করেছেন — এ তাঁরই lookout (দেখা কর্তব্য) — ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এসব আশ্রম তিনিই করেছেন, তিনিই ভাবছেন।

দেখ না, সূর্যকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন রোজ। হাওয়া করে দিয়েছেন, তবে

প্রাণধারণ হয়। আবার মাছের তেলে মাছ ভাজছেন। ঢেলা দিয়ে ভাঙ্গছেন ঢেলা।

নিরামিষ (সন্ন্যাসী) আবার আমিষ (গৃহস্থ)। যারা নিরামিষ তাদেরও দেখছেন। আবার যারা আমিষ, তাদের বলেছেন, তোমরা এঁদের সেবা করবে, তবে তোমাদের কল্যাণ হবে। এমনতর ব্যবস্থা তাঁর!

শ্রীম (ভৌমিকের প্রতি) — এই যে আপনি চেষ্টা করছেন কর্মের জন্য, এও তিনিই দিচ্ছেন।

ভৌমিক — আপনি বলেছিলেন সাদা (পাশের) বাড়িতে — যে মন একটা বিষয় ভাবে, সে তো অতি সহজ। কিন্তু যে দশটা ভাবে সেই তো বড় — যেমন নেপোলিয়ান।

শ্রীম — হাঁ, সে অবতারাদি পারেন। ওঁরা (নেপোলিয়ান প্রভৃতি) আসক্ত হয়ে করেছিলেন। কিন্তু অবতারাদি অনাসক্ত হয়ে করেছেন। সে আবার কেমন? স্নান আহার ছেড়ে দিয়ে। 'অতন্দ্রিত' — দেখ না, বিশ্রাম নাই। কাজ করছেন, কিন্তু অনাসক্ত হয়ে।

নেপোলিয়ানও বলেছিলেন সেন্ট হেলেনায়, ডাক্তারের ছেলেদের ম্যাপে জেরুসালেম দেখিয়ে — He is victorious – not I (তিনিই চিরবিজয়ী, আমি নই)। মানে ক্রাইস্টের জয়।

শ্রীম আনমনে কি ভাবিতেছেন। আবার কথা।

শ্রীম (স্বগত, সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া) — বুদ্ধদেব বলছেন, মহারাজ আমি বুদ্ধবংশে জন্মেছি। আপনার বংশে জন্মাই নাই।

শ্রীম ভাবমত্ত হইয়া গান গাহিতেছেন।

গান।

শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী মা কি কল করেছে।
চৌদ্দ পোয়া কলের ভিতরি কত রঙ্গ দেখাতেছে॥
আপনি থাকি কলের ভিতরি কল ঘুরাচ্ছে দিবানিশি।
কল বলে আপনি ঘুরি, জানে না কে ঘুরাতেছে॥
যে কলে জেনেছে তাঁরে, কল হতে হবে না তারে।
কোন কলের ভক্তিডোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে॥

শ্রীম বারবার আখর দিতেছেন, 'আপনি থাকি কলের ভিতরি কল

ঘুরাচ্ছে দিবানিশি’। যেন চোখের সামনে দেখিতেছেন মাকে — তিনি কল ঘুরাইতেছেন। চোখে মুখে আনন্দের ছটা। প্রশান্ত নির্ভয় ভাবে রঞ্জিত।

সন্ধ্যা সমাগতা। শ্রীম আসন ছাড়িয়া ছাদের উত্তর ধারের তুলসীকুঞ্জে গিয়া বসিলেন। সাধু ও ভক্তরাও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। কেহ প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলেন। অধিকাংশই শ্রীম-র সঙ্গে বসা। সাধুরা আসিয়া বেঞ্চিতে বসিয়াছেন। আধ ঘন্টা পরে শ্রীম আসিলেন।

লক্ষ্মণ আসিয়াছেন। ইনি উড়িষ্যাবাসী, ঠাকুরের আশ্রমে পাচকের কাজ করেন। মঠের দীক্ষিত ভক্ত। মাদ্রাজে কয়েক বছর ঠাকুরের ভোগ রান্না করিয়াছেন। সম্প্রতি কর্ম নাই। শ্রীম স্বামী নিত্যাত্মানন্দকে বলিতেছেন, দেখুন, এর একটা কর্ম যদি হয় কোনও আশ্রমে। মাদ্রাজ মঠে বেশ ছিল।

হিমাংশু আসিলেন, সঙ্গে একটি ভক্ত। ভক্তটি কতকগুলি তালপাতার পাখা আনিয়াছেন, আর মিষ্টি। আর একজন যুবক ভক্ত আসিলেন। নাম সুন্দর বসু। চেহারাটিও সুন্দর। লক্ষ্মীবিলাস তৈলের সত্ত্বাধিকারীদের ভাগিনেয়। মহাপুরুষ মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত। তাঁহারও হাতে মিষ্টি। শ্রীম বলিতেছেন পূর্ণেন্দুকে, মিষ্টি ঠাকুরদের দিতে হবে। হাত ধুয়ে রেখে দিন। পাখাগুলি মঠে দিয়ে দাও। গঙ্গা দিয়ে রাখ — ত্রিবেণী-সংগমের গঙ্গা।

সাধুরা জোড়া বেঞ্চে বসা — বিনয়, মণীন্দ্র ও জগবন্ধু। সুন্দরও তাঁহাদের সঙ্গে বসিলেন শ্রীম-র কাছে। সাধুদের সামনে পশ্চিমাস্য বসা শুকলাল, মুকুন্দ, পূর্ণেন্দু, লক্ষ্মণ, হিমাংশু প্রভৃতি অনেক ভক্ত। শ্রীম-র সামনেও দুই সারি বেঞ্চি। তাহাতেও ভক্তগণ অনেকে বসিয়া আছেন।

শ্রীম একবার ঘরে গেলেন। মিষ্টিটা দুইভাগ করিয়া রাখিয়া দিলেন। এক ভাগ যাইবে মঠে, আর এক ভাগ ঠাকুরবাড়ি। ফিরিয়া আসিয়া নিজের আসনে বসিলেন। সুন্দরের সঙ্গে আনন্দে কথা কহিতেছেন। সুন্দরের গায়ে সাদা পাঞ্জাবী, গোঁফ কামানো, অতি ফর্সা রং। বয়স তেইশ চব্বিশ। ডাক্তাররা বলিতেছেন, তাহার ব্লাড-প্রেসার হইয়াছে।

শ্রীম (সুন্দরের প্রতি) — দেখুন, এই সব কথা, ব্লাড-প্রেসার আদি, ঝেড়ে ফেলে দিন মন থেকে। আমরা ছেলেবেলায় এসব নামও শুনি নি।

আজকালই কত সব বলছে ডাক্তাররা। বুঝলেন, ঝেড়ে ফেলে দিন। De-hypnotised (অসম্মোহিত) হয়ে যান।

শ্রীম কিছুক্ষণ কি ভাবিতেছেন — যেন নিজের ভিতরে কিছু দেখিতেছেন। যেন তাঁহার ভিতর হইতে আর একজন শ্রীম-র মুখ দিয়া কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঈশ্বর এত ভালবাসেন মানুষকে যে, নিজে মানুষ হয়ে আসেন জ্ঞান উপদেশ করবার জন্য — 'পরিত্রাণায় সাধূনাম্' (গীতা ৪:৮)। তা না হলে সাধুরা দাঁড়ায় কোথায়?

তিনই সব দেখছেন। মানুষের ভাবতে হবে না। সূর্য, হাওয়া — সব দিয়েছেন। তবে প্রাণটি থাকবে।

তারপর এই কি একটা life (জীবন) ? — Eternal life (অনন্ত জীবন) রয়েছে।

একজন বলেছিল ওঁকে, (ঠাকুরকে) — মশায়, পরকাল আছে কি না? তিনি বললেন, ওগুলো অত ভাবছো কেন? আম খেতে এসেছ, আম খাও। আরও বললেন, আমি শুনে রেখে দিয়েছি যতক্ষণ হাঁড়িটা কাঁচা থাকে কুমোর ততক্ষণ চাকে ফেলে বারবার। কিন্তু পেকে গেলে আর ওর দ্বারা কাজ হয় না।

দেখেন নি, কুমোররা হাঁড়ি করলো, ভেঙ্গে গেল। তখন আবার চাকে ফেলে দিল। কিন্তু পুড়ে লাল হয়ে গেলে তখন আর এর দ্বারা কাজ হয় না।

বলেছিলেন, শুনে রেখে দিয়েছি। মানে, তার importance (প্রাধান্য) নেই।

(সকলের প্রতি) — পণ্ডিতগুলো কত রকম করে বলে! কিন্তু অবতারের কথা দেখ — বালকের মত। গিন্নী জানেন সব। তিনিই জানেন যিনি জন্ম দিয়েছেন। মানুষের ভাবতে হবে না কিছু, নিশ্চিন্তি।

যদি বল, (মানুষ) চেষ্টা করবে না? তার উত্তর, তিনিই চেষ্টা দেন। তবে অহংকারটা যত দিন রয়েছে, প্রার্থনা করতে হয় তাঁকে। সব সংশয় তিনি মিটিয়ে দিয়ে গেছেন — 'ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ' (মুন্ডক ২:২:৮)।

এত ভালবাসা, যে নিজে অবতীর্ণ হন — সাধুদের উদ্ধারের জন্য।

তা না হলে সাধুরা দাঁড়ায় কোথায় বল? জ্ঞান ভক্তি উপদেশ দিবার জন্য আসেন।

জনৈক (স্বগত) — ভগবান অবতার হয়ে এসে সাধু তৈরী করেন। আর ভক্ত। ভক্তরা সাধুদের সেবা করবে। সাধুরা ভক্তদের জ্ঞান ভক্তির কথা বলবে। পরস্পর সম্বন্ধ। আজ আমার এতদিনের সংশয় মিটলো, সাধু যোগসূত্র — ঈশ্বর ও ভক্তদের।

শ্রীম — 'কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি।।'* (গীতা ৬:৩৮)

একেবারে জ্ঞানে আরূঢ় হয়ে না থাকতে পারলে alternative (উপায়ান্তর) ভক্তসেবা। এতে সাধুর কর্মসংস্কারও কাটে আর ভক্তদেরও কাজ হয়।

'দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।।'** (গীতা ৩:১১)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মনকে সংসারধর্ম থেকে উঠিয়ে ব্রহ্মে লগ্ন করলেন। অর্জুন ঐ অবস্থায় অপ্রতিষ্ঠিত। তাই বিনাশের ভয়ে বললেন — উভয় দিক থেকেই বিভ্রষ্ট হয়ে আমি কি ছিন্নমেঘের একটা টুকরোর মত বিনষ্ট হয়ে যাব? যেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম সেখান থেকে মনকে ভুলিয়ে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উত্থিত করেছ। আমি কিন্তু ওখানে অপ্রতিষ্ঠিত। 'ইতঃ নষ্ট তত ভ্রষ্ট'-এর ন্যায়, আমি না সংসারের, না ঈশ্বরের।

২

শ্রীম জগবন্ধু মহারাজকে ডায়েরী পাঠ করিতে বলিলেন।

জগবন্ধু মহারাজ পড়িতেছেন।

---

*হে মহাবাহো! তত্ত্বজ্ঞানবিমূঢ় এবং কর্ম ও উপাসনা — এতদুভয় হইতেই ভ্রষ্ট ব্যক্তি কি দুইটি বৃহৎ মেঘের মধ্যে একটি ক্ষুদ্রতর মেঘখণ্ডের ন্যায় ছিন্নভিন্ন হইয়া বিনষ্ট হয় না?

**হে প্রজাগণ! এই যজ্ঞাদি কর্মদ্বারা তোমরা দেবগণকে সন্তুষ্ট কর, এবং দেবগণও তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করুন। এইরূপে পরস্পরের সন্তোষসাধন দ্বারা কল্যাণ লাভ কর।

বেলুড় মঠ। ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। দোতলার বারান্দা। সকাল প্রায় আটটা। মহাপুরুষ, প্যাসেজ ও স্বামীজীর ঘরের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন দক্ষিণাস্য। গায়ে গরম গেঞ্জি। তাহার উপর চাঁপা রং-এর গরম পাঞ্জাবী — পায়ে ভেলভেটের চটি। কেডুলা (ব্রহ্মচারী মঙ্গল চৈতন্য) আসিয়া প্রণাম করিলেন। ইনি সম্প্রতি আমেরিকা হইতে আসিয়াছেন।

কেডুলা প্রণাম করিয়া উত্তরাস্য মহাপুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তাঁহার পিছনে স্বামীজীর ঘর, বাঁ হাতে প্যাসেজ। প্যাসেজের দক্ষিণ ও উত্তরে দাঁড়ান স্বামীজীর ঘরের সেবক সাধু ও ভজহরি (স্বামী সর্বজ্ঞানন্দ)। শৈলেশ (স্বামী কৈলাসানন্দ) বারান্দার ছোট ঘরের দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

মহাপুরুষ মহারাজ সহাস্য বদনে কেডুলাকে কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

*Mahapurusha — How do you do — quite well?

Kadula — Yes, Maharaj. Thanks. How are you?

Mahapurusha — The body is invalidated — very weak.

Kadula — But the Spirit —

Mahapurusha — Yes, the Spirit is alright. (In a cheerful inspired mood) That is alright.

Swami Omkarananda, Saswatananda and Nepal Maharaj of Kasi Enter.

---

*মহাপুরুষ — কেমন আছ — ভাল তো?

কেডুলা — আজ্ঞে হাঁ। আপনি কেমন?

মহাপুরুষ — শরীরটা ভেঙ্গে পড়েছে — অচল। তাই দুর্বল।

কেডুলা — কিন্তু আত্মা—

মহাপুরুষ — হাঁ, আত্মা সম্পূর্ণ ঠিক আছে। (সহাস্য বদনে উদ্দীপিত ভাবে হাঁ, ও টি নিশ্চয়ই ঠিক আছে।

স্বামী ওঁকারানন্দ, শাশ্বতানন্দ ও কাশীর নেপাল মহারাজ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

Mahapurusha — This life is only a buble, a quarter. In the Vedas, in the Gita, the Lord says — a quarter is this world and three-fourths are outside of it.

This is a buble — this life in the world. The spirit is Eternal. That life is Eternal.

Kadula — If God is knowledge, then why is this ignorance in this world?

Mahapurusha — Nobody can answer this question. God is and ignorance is. That is a fact. But by His Will one can go out of this ignorance.

Kadula — By trying, by struggle —

Mahapurusha — But the power of struggle also is (pointing the heart by the right hand) here in the soul.

(Placing his right hand on his chest) – By the Mother's Will, we have gone out of this ignorance.

মহাপুরুষ (কেডুলার প্রতি) —এই জীবনটা একটি জলবুদ্‌বুদ্‌ বই তো নয় — মাত্র এক-চতুর্থাংশ। বেদ ও গীতামুখে ভগবান এই কথাই বলেছেন — মাত্র এক-চতুর্থাংশ হচ্ছে এই জগৎ। বাকী তিনভাগ এই জগতের বাইরে।

হাঁ, এই শরীরটা একটা জলবুদ্‌বুদ্‌ মাত্র — এই সংসারী জীবনটা। আত্মা শাশ্বত। ঐ জীবনটা অনন্তকাল স্থায়ী, সনাতন।

কেডুলা — ঈশ্বর যদি জ্ঞানস্বরূপ হন তবে তাঁর সৃষ্ট এই জগতে এত অজ্ঞানতা কেন?

মহাপুরুষ — এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারে না। ঈশ্বর আছেন আর অজ্ঞানতা আছে। এটা একটা সত্য। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় একজন এই অজ্ঞানতা অতিক্রম করতে পারে।

কেডুলা — চেষ্টা দ্বারা, সংগ্রামের দ্বারা —

মহাপুরুষ — কিন্তু সংগ্রামের শক্তিও (দক্ষিণ হস্তে হৃদয় স্পর্শ করিয়া) এখান থেকে আসে — হৃদয়বিহারী অন্তর্যামী পুরুষ থেকে।

(স্বীয় দক্ষিণ হস্ত বক্ষস্থলে স্থাপন করিয়া) — মায়ের ইচ্ছায় আমরা এই অজ্ঞানের পরপারে চলে গেছি, এই অজ্ঞান অতিক্রম করেছি।

Yes, by Divine Will many have gone, many are going and many will go out of this ignorance.

But this question (why there is ignorance) can not be answered.

A Sadhu (to himself) — God and Ignorance are two quite different things. God has become the man. By His Will the man is drowned in ignorance. By His Will again man is lifted up from this ignorance and shown his real nature which is God.

God + Ignorance = Man

God – Ignorance = Man-God, Jivanmukta.

We must pray to Him constantly to take us out of this ignorance. Sri Ramakrishna by his touch has pulled up so many drowned souls out of this ignorance. Swami Vivekananda and all his disciples are lifted up from this ignorance. Even now Mahapurusha said, 'By the Mother's Will, we have gone out of this ignorance.'

হাঁ, ঈশ্বরেচ্ছায় অনেকে এই অজ্ঞান অতিক্রম করেছে, অনেকে অতিক্রম করছে। এবং অনেকে এই অজ্ঞান অতিক্রম করবে ভবিষ্যতে।

কিন্তু এই প্রশ্নের (কেন এই অজ্ঞানতা) কোন উত্তর নাই।

একজন সাধু (স্বগত) — ঈশ্বর ও অজ্ঞানতা — এই দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। ঈশ্বরই জীবজগৎ হয়েছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই জীব অজ্ঞানে নিমজ্জিত। আবার ঈশ্বরের ইচ্ছাতে এই জীব অজ্ঞানতা থেকে উত্তীর্ণ হতে পারে। আর তখনই তাঁর সত্যস্বরূপ দর্শন হয়। ঈশ্বর সত্যস্বরূপ।

ঈশ্বর + অজ্ঞানতা = মানুষ, জীব।

ঈশ্বর - অজ্ঞানতা = নরদেব, জীবন্মুক্ত।

আমাদের সর্বদা তাঁর নিকট প্রার্থনা করা উচিত যাতে আমরা এই অজ্ঞানতার পরপারে যেতে পারি। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর একটিমাত্র স্পর্শের দ্বারা এই অজ্ঞানতায় নিমজ্জমান বহুজনকে অজ্ঞানতার পরপারে নিয়ে গিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁর সকল অন্তরঙ্গ পার্ষদদের তিনি এই অবিদ্যার পরপারে নিয়ে গিয়েছেন। এইমাত্র মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, মায়ের ইচ্ছায় আমরা এই অবিদ্যার পরপারে গিয়েছি।

Will Thakur lift us also up from this ignorance? May He make us so!

It is extremely clear now from this open declaration of Mahapurusha that, this depends entirely on His Will. We have no other way but to pray, to weep, to completely surrender to Him for getting back our Divine sight.

But we can not keep up this attitude of complete surrender in mind. We forget, so we become devoid of peace.

We forget Him in activity. Leisure and meditation are required. And yet we can't go out of this activity. Being in activity let us try and pray — Lord, do not delude me, take me out of this ignorance. Mother, thou are ignorance too. Show unto us thy real self and also the real self of Thakur.

ঠাকুর কি আমাদেরও এই অজ্ঞানান্ধকার থেকে উত্তীর্ণ করবেন? তিনি কৃপা করে আমাদের অজ্ঞান অবিদ্যার পরপারে নিয়ে যান, তাঁর শ্রীচরণে আমাদের এই প্রার্থনা।

মহাপুরুষ মহারাজের এই অকপট উক্তির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয়েছে যে, এটি কেবলমাত্র ঈশ্বরেচ্ছাধীন। অকপট প্রার্থনা, প্রেমাশ্রু বিসর্জন ও সম্পূর্ণ শরণাগতি ব্যতীত আর কোনও পথ নাই, আমাদের দিব্য অধিকার পুনরায় প্রাপ্তিতে।

কিন্তু এই সম্পূর্ণ শরণাগতির ভাবটি আমরা সর্বদা মনে জাগ্রত রাখতে পারি না। আমরা ভুলে যাই। তাইতো আমাদের এই অশান্তি।

কর্মপ্রবাহে পড়ে আমরা ঈশ্বরকে ভুলে যাই। অবসর ও ধ্যানের আবশ্যক। কই, আমরা কি এই কর্মপ্রবাহের বাইরে যেতে পারি — কর্ম না করে থাকতে পারি? কর্মপ্রবাহে থেকেই আমাদের ব্যাকুল প্রার্থনা করতে হবে — প্রভো, আমাদের ভুলিও না। আমাদের অবিদ্যার পরপারে নিয়ে যাও। মা, তুমিই তো অবিদ্যারূপিণী! মা, তোমার স্বরূপ আমাদের দর্শন করাও, আর শ্রীশ্রীঠাকুরের সত্যস্বরূপও দর্শন করাও। কৃতার্থ কর মা!

All are speechless. Everything is clam. Mahapurusha's words are vibrating in the atmosphere.

The morning of the winter has flooded the verandah with sweet sun-shine. The minds of the Sadhus are also kindled by the wisdom's rays of the seer standing before them!

শ্রীম — ঠাকুর তাই তো সর্বদাই বলতেন, সাধুসঙ্গ সংসারী লোকের সর্বদাই দরকার, সকলেরই দরকার। সন্ন্যাসীরও দরকার, তবে সংসারীদের বিশেষতঃ। রোগ লেগেই আছে — কামিনীকাঞ্চনের মধ্যে সর্বদা থাকতে হয়।

৩

সাধু আবার ডায়েরী পাঠ করিতে লাগিলেন।

বেলুড় মঠ। দোতলার বারান্দা। এখন সন্ধ্যা সাতটা। ঠাকুরঘরে আরতি শেষ হইয়া গিয়াছে। সাধুরা কেহ কেহ মহাপুরুষের কাছে আসিয়াছেন।

মহাপুরুষ মহারাজ প্যাসেজের বাম হাতে ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন। গরম র‍্যাপারে তাঁহার শরীর ঢাকা। সম্মুখে গঙ্গা। স্বামী অম্বিকানন্দ বাম দিকে মোড়ার উপরে বসিয়াছেন। স্বামী ওঁকারানন্দ রেলিং-এ ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আর স্বামীজীর ঘরের সেবক প্যাসেজের মুখে দাঁড়ান উত্তরাস্য। দরজা ভেজান — সামান্য একটু ফাঁক আছে।

সকলেই নির্বাক। সকলেই প্রশান্ত। মহাপুরুষের দিব্যবাণী আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

মঠের দ্বিতলের বারান্দা শীতের প্রভাতের সুমধুর উজ্জ্বল কিরণে উদ্ভাসিত। সাধুদের হৃদয়কমলও উদ্ভাসিত সম্মুখে দণ্ডায়মান ব্রহ্মদ্রষ্টা মহাপুরুষের ব্রহ্মজ্ঞানের সুবিমল কিরণে।

স্বামীজীর কথা উঠিয়াছে।

স্বামী ওঁকারানন্দ — বিজ্ঞান মহারাজ বলেন, 'আমি বলতে গেলে বলবো ঠাকুরের উপযুক্ত শিষ্য একমাত্র স্বামীজীই। আর কেউ নয়।'

মহাপুরুষ (উদ্দীপিত হইয়া) — তাই তো, তাই তো! তাঁর কি capacity (শক্তি)! আমরা ঠাকুরকে বুঝতে পারতাম না। কিন্তু তাঁর capacity (শক্তি) ছিল। তাই তো তাঁকে দেখলে কেমন হয়ে যেতেন ঠাকুর। অখণ্ডের ভাবে মেতে যেতেন। খুচরা ভাব সব ভুলে যেতেন।

একবার ঠাকুরের উৎসব হয় দক্ষিণেশ্বরে। তখন ঐ উত্তর-পূর্বের লম্বা বারান্দায় বসা হতো। ভক্ত তো এতো ছিল না — এই পঞ্চাশ ষাটজন। স্বামীজী এলেন। অমনি ঠাকুর বললেন আহ্লাদে, 'ঐ নরেন এসেছে।' তারপর নিজের পা দু'খানি ওঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। স্বামীজীও অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে উহা ধারণ করলেন। ঠাকুর ওঁর (স্বামীজীর) ভেতর একটা শক্তি দেখতে পেতেন।

আমরাও ধন্য! এমন সব লোকের সঙ্গে থাকা গেছে, আনন্দ করা গেছে, খাওয়া গেছে! আমরা ও সাধারণ লোক ধন্য!

স্বামীজীর কাজ তো দশ বছর — উনত্রিশ থেকে উনচল্লিশ। তার মধ্যে তিন বছর তো অসুখ। মাত্র সাত বছর কাজ করেছেন।

আজকাল ওয়েস্টে বেদান্তের উচ্চ ভাবগুলি নিচ্ছেন অনেকগুলি পণ্ডিত। তাঁরাই প্রথমে নেন — intellectually (জ্ঞান-বুদ্ধিতে) তো নেবে প্রথম। তবে তো ধারণা হবে। পরে অনেকে নিচ্ছে।

মহাপুরুষ (ওঁকারানন্দের প্রতি) — তুমি পড় না 'প্রবুদ্ধ ভারত'?

স্বামী ওঁকারানন্দ — না। তবে বড় লেখকের প্রবন্ধ থাকলে পড়ি।

মহাপুরুষ — হাঁ। অশোকানন্দ লেখে ভাল। আর সংগ্রহগুলিও ভাল।

স্বামী অম্বিকানন্দ — অশোকানন্দ কে?

মহাপুরুষ — যোগেশ, মাদ্রাজের যোগেশ।

স্বামী ওঁকারানন্দ — প্রিন্সিপ্যাল কামাখ্যাবাবু বেশ লিখেছেন। পড়ি নাই, শুনেছি।

মহাপুরুষ — খুব ভক্ত ঠাকুর স্বামীজীর। কিন্তু শুধু ভক্ত টাইপের

লোক নয়। বুঝে সুঝে তবে লেখে। আর যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করে।

সকলেই নীরব। মহাপুরুষও কিছুকাল মৌন রহিলেন। আবার কথা কহিতেছেন।

মহাপুরুষ (সহাস্যে) — মাদ্রাজ থেকে আসা যাচ্ছে জাহাজে, স্বামীজীর সঙ্গে। তখন তিনি আমেরিকা থেকে ফিরেছেন।

স্বামী অম্বিকানন্দ — আচ্ছা, গুপ্ত মহারাজ সঙ্গে ছিলেন কি?

মহাপুরুষ — হাঁ, গুপ্ত সঙ্গেই ছিল। মাদ্রাজ থেকেই সঙ্গে আসে গুপ্ত। আর নিরঞ্জন কলম্বো থেকে। আমিও কলম্বো থেকে আসি। জাহাজে আমি টল্‌ছি। স্বামীজী আমায় (বগল দিয়া চাপিয়া ধরিয়া) এমন করে ধরে ফেললেন (হাস্য)! তখন দুটি লোক ও একটি মেম 'ডেকে' বেড়াচ্ছিলেন।

খুব খিদে হয় সাগরে বেড়ালে। Oxygen (অক্সিজেন) রয়েছে কিনা। ওরা বলে ozone (ওজোন)।

স্বামী ওঁকারানন্দ — প্রথমে বজবজে আসেন। তারপর মঠে।

মহাপুরুষ — সব যাত্রী নেমে গিছিল! কেবল আমরা রয়ে গেলাম রাত্রে জাহাজেই। উঃ কি মশা! অনেক খাবার নিয়ে গিছলো ছোট গোপাল — বরদার ভাই।

পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। আজ ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার। দ্বিতলের বারান্দা। আরতি হইয়া গিয়াছে। শ্রীমহাপুরুষ স্বামীজীর ঘরের পাশে বসিয়া আছেন ইজি-চেয়ারে, উত্তরাস্য। স্বামী বামদেবানন্দ গামছা দিয়া মাথায় হাওয়া করিতেছেন। সামনে স্বামী অম্বিকানন্দ উপবিষ্ট মোড়ায়। স্বামী ওঁকারানন্দ আসিয়া রেলিং-এ পিছন দিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

'নাথের পো' ও সুদর্শন আসিয়াছেন। সুদর্শন দর্জির কাজ করেন। সুদর্শন মহাপুরুষের সঙ্গে কাঠের কাজ, ফটোগ্রাফির কাজ প্রভৃতি বিষয়ে নানা কথা কহিতেছেন। মহাপুরুষ বলিলেন, দর্জির কাজে সর্বত্রই পয়সা আসে। মানুষ জামা তৈরি করাবেই।

স্বামী পুণ্যানন্দ আসিয়া স্বামী অম্বিকানন্দকে কানে কানে জিজ্ঞাসা

করিলেন, রেডিও হবে কি না? নিচে ভিজিটার্স রুমে রেডিও। স্বামী অম্বিকানন্দ বলিলেন, তোমরা ফিট কর। (মহাপুরুষের প্রতি) আপনার কষ্ট হবে কি না তাই জিজ্ঞাসা করছে। মহাপুরুষ বলিলেন — না, আমি ঘরে যাব। করুক না।

মহাপুরুষ ঘরে আসিয়াছেন, ইজি-চেয়ারে বসা। স্বামী ওঁকারানন্দ দরজার পাশে ঘরে দাঁড়ান। একজন সাধু সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া মহাপুরুষকে দর্শন করিতেছেন। ঘরে নীল বাতি জ্বলিতেছে। সেবক মতি দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

৪

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

আজ ২৩শে, ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার। বেলুড় মঠ। সকাল আটটা। একটি সাধু স্বামীজীর ঘর পরিষ্কার করিতেছেন। মহাপুরুষের সেক্রেটারী স্বামী গঙ্গেশানন্দ আসিয়া বলিলেন, তোমাকে অমরবাবুর বাড়ি যেতে হবে মহাপুরুষের ওষুধ আনতে।

শ্রীমহাপুরুষ বারান্দায় বসা প্যাসেজের পাশে চেয়ারে, পূর্বাস্য। সেবক স্বামীজীর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মহাপুরুষের কাছে দাঁড়াইলেন।

মহাপুরুষের সেবক ক্ষিতীন্দ্রের হাতে একখানা বড় সাদা পাথরের থালা। ক্ষিতীন্দ্র বলিলেন, জগবন্ধু মহারাজ যাবেন। (সাধুর প্রতি) হাঁ জগবন্ধু, তুমি যাবে? সম্মতি জানাইলে বলিলেন, এই থালাটি অমরবাবুকে দিও, আর বলো আমি দিয়েছি। ওতে যেন ভাত খায়। সাধু 'আজ্ঞে আচ্ছা' বলিয়া থালা লইয়া রওনা হইলেন। মহাপুরুষ বলিলেন, ইস্টিমারে উঠবার সময় আর নামবার সময় খুব সাবধান হবে। একজন অন্য লোক কেউ সঙ্গে গেলে ভাল হতো। সাধু রুগ্ন, তাই অত ভাবিতেছেন।

সাধু বলিলেন, আজ্ঞে আমিই পারবো। মহাপুরুষ পুনরায় বলিলেন, আচ্ছা, এখানে কেউ একজন গিয়ে স্টিমারে তুলে দেবে? সাধু বলিলেন, না দিলেও হবে। মহাপুরুষ তবুও বলিলেন, এই যে কালীসদয়। সে যাক্ না। কালী সঙ্গে সঙ্গে গিয়া বেলুড় স্টিমারে তুলিয়া দিলেন।

যাইবার সময় শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, নামবার সময় একজনকে বলো,

অনুগ্রহ করে আমার এটা একটু ধরুন। আমি নামবো।

কুঠিঘাটে স্টিমার হইতে নামিবার সময় সাধু ঋষি মহারাজকে বলিলেন ধরিতে। তিনিও কলিকাতা যাইতেছেন।

হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার অমর মুখার্জিকে থালা দিয়া ঔষধ লইয়া সাধু সাড়ে দশটায় ফিরিলেন। মহাপুরুষ তখন নিজের ঘরে দরজার পাশে ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন। সাধু ঔষধ দিয়া বলিলেন, এখন খান। মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষুনিই? সাধু উত্তর করিলেন, আজ্ঞে হাঁ, এক্ষুনিই। তিনি একটা পুরিয়া খুলিয়া ঔষধ মুখে ঢালিয়া দিলেন।

সন্ধ্যার পর সাতটা। শ্রীমহাপুরুষ গঙ্গার দিকের বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসা উত্তরাস্য। একটি গদি পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে, স্বামীজীর ঘরের জানালার সম্মুখে। সামনে খোকা মহারাজ দক্ষিণাস্য আর একটা চেয়ারে বসিয়াছেন। আজ একটু গরম পড়িয়াছে। ক্ষিতীন্দ্র তাই পাখা দিয়া খোকা মহারাজকে হাওয়া করিতেছেন। আর নরসিংবাবু মহাপুরুষকে দিতেছেন পাখার হাওয়া। স্বামী বামদেবানন্দ একখানা গামছা দিয়া বাতাস দিতেছেন মহাপুরুষের মাথায়।

স্বামী ওঁকারানন্দ মহাপুরুষের ডান দিকে রেলিং-এ পিছন দিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আর একজন সাধু স্বামীজীর ঘর বন্ধ করিয়া প্রথম প্যাসেজে দাঁড়াইলেন, তারপর স্বামী ওঁকারানন্দের পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

মহাপুরুষ ধ্যান করিতেছেন। শরীর দুর্বল, হার্ট দুর্বল। কিন্তু ধ্যানে বিরতি নাই। ধনুকের মতন বাঁকা হইয়া বসিয়াছেন। শরীর ধনুর মতন হইলেও ধ্যান চাই।

সাধুরা নীরবে এই দেবদৃশ্য দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন — আমাদের শিক্ষার জন্য এই ধ্যান। মুখে না বলিয়া কাজে দেখাইয়া শিক্ষা দিতেছেন। সাধুদের প্রাণ মন শীতল হইয়া যাইতেছে এই সান্নিধ্যে। মন আনন্দে ভরপুর।

বেশী ধ্যান করিলে মাথার রোগ বৃদ্ধি পায় তাই স্বামী ওঁকারানন্দ ঐ অবস্থা হইতে বুত্থিত করিবার জন্য কথা কহিতে লাগিলেন।

স্বামী ওঁকারানন্দ — দীনেশ (স্বামী নিখিলানন্দ) একটা উত্তর লিখেছে মহেশ ঘোষের article-এর (প্রবন্ধের)।

মহাপুরুষ — কি লিখেছে?

স্বামী ওঁকারানন্দ — মহেশ ঘোষ 'Modern Review'-তে (মডার্ণ রিভিউ-এ) The Gospel of Sri Ramakrishna-এর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের) একটা সমালোচনা লিখেছেন। এক স্থানে আছে 'শক্তি' মানে কি? — না, যে ভুলিয়ে খারাপ পথে মানুষকে নিয়ে যায়। প্রতাপ মজুমদারের লেখা quote (উদ্ধৃত) করেছেন।

মহাপুরুষ (সোজা হইয়া বসিয়া উত্তেজিতভাবে প্রতিবাদ করিয়া) — আহা, কি কথাই বলেছে! ঠাকুর সর্বদা মা-ছাড়া কিছু জানতেন না। সর্বদা তিনি সন্তানভাবে থাকতেন — মুখে সর্বদা 'মা, মা'।

স্বামী ওঁকারানন্দ — আমি চারটে পার্টেরই[১] ('কথামৃতের') পাতা উল্টে দেখলাম — অচলানন্দ ঠাকুরকে বলেছেন, 'তুমি ওটা (বীরভাব) মান না। তুমি শিবের কলম উল্টে দিতে চাও?' ঠাকুর উত্তর করলেন, 'কি জানি বাপু আমার মাতৃভাব'।

মহাপুরুষ — হাঁ, অচলানন্দের সম্বন্ধে ঠাকুর বলতেন, ওর একটু হয়েছে, সার আছে। অন্যদের কিছু নাই। কেউ হয়তো কারণ করে টলছে। কেউ অজ্ঞান হয়ে গেছে কিংবা বমি করে ফেলেছে। কিন্তু অচলানন্দ জপটপ করছে দেখেছি। ওরা সব বসতো কি না চক্র করে ঠাকুরের সামনে। অচলানন্দ দক্ষিণ দেশের লোক।

স্বামী ওঁকারানন্দ — আর একটা কথা বলেছেন মহেশ ঘোষ — রামকৃষ্ণ পরমহংস কেবল নাম করতে বলেছেন। আমরা (ব্রাহ্ম সমাজ) ধ্যানের কথা বলি।

মহাপুরুষ (ব্যঙ্গ করে) — আহা, কি অমূল্য কথাই বলছে!

৫

স্বামী ওঁকারানন্দ — 'কথামৃত' থেকেই দেখানো হয়েছে ঠাকুর পূজা পাঠ, জপ ধ্যান, ভাব মহাভাবের কথাও বলেছেন।

---

(১) 'কথামৃত' পঞ্চম ভাগ তখনও বাহির হয় নাই।

স্বামী ওঁকারানন্দ — এই 'মর্ডাণ রিভিউ'তেই অশোক চাটুয্যে লিখেছিলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ ওয়েস্টে সাধারণ লোকের কাছে প্রচার করেছেন। সে দেশের intelligentia-র (বুদ্ধিজীবীদের) সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নাই।' তারও উত্তর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, জেমস্ (James), রয়েস (Royce) প্রভৃতি ফিলজফার ওঁর লেকচার attend (উপস্থিত থাকতেন) করতেন।[২]

মহাপুরুষ — এদের যেমন বুদ্ধি! দু'পাতা ইংরেজী পড়েছে বই তো নয়। আর কোথায় স্বামীজী! কত বড় একটা spirituality (আধ্যাত্মিক শক্তি)! তাঁর সঙ্গে তুলনা! তাঁর সম্বন্ধে কথা!

মহাপুরুষ তাঁহার ঘরে যাইতেছেন। স্বামী ওঁকারানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, মাথায় কষ্ট হচ্ছে কি? উনি উত্তর করিলেন, হাঁ, গরমের দিনে বিকেলে মাথা একটু গরম হয়।

একটি সাধু ভাবিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষগণও সংসারের সমালোচনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পান না। এমনি মহামায়ার খেলা! সর্বমঙ্গলা ব্রহ্মশক্তিকে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁদের সামনে বলা হচ্ছে, শক্তি অমঙ্গলা।

শ্রীম (সহাস্যে) — এটা শুনে ঠাকুরের একটি মহাবাণীর কথা মনে হল। ঠাকুর বলতেন, 'একজন বলেছিল — আমার মামার বাড়িতে এক গোয়াল ঘোড়া।' এতেই মনে হয় যে, মামার বাড়িও নাই, গোয়ালও নাই, ঘোড়াও নাই। কারণ গোয়ালে তো গরু থাকে। ঘোড়া থাকে আস্তাবলে।

আর একটি গল্প ঠাকুর বলেছিলেন। একজনের একটা হীরা ছিল। সে ওটাকে বাজারে বেচতে গিয়েছে। বেগুনওয়ালাকে দেখালে। সে বললে, এর দাম নয় সের বেগুন। তারপর কাপড়ওয়ালার কাছে নিয়ে গেল। সে

---

(২) বস্তুবাদী দার্শনিক ইন্‌জারসোল, ধনকুবের রকফেলার প্রভৃতি স্বামীজীর সঙ্গে মিশেছেন, কথা কয়েছেন, তাঁর বক্তৃতা শুনেছেন। হার্ভার্ডের দর্শন বিভাগের একটা স্থায়ী মুখ্য অধ্যাপক হবার প্রস্তাব স্বামীজীর কাছে এসেছিল। হার্ভার্ডের অন্যতম বিখ্যাত অধ্যাপক ডক্টর রাইট স্বামীজীর বন্ধু ছিলেন। একটা পরিচয়পত্রে স্বামীজীর সম্বন্ধে লিখেছিলেন, 'He is more learned than all of us put together' (আমাদের সকলের বিদ্যা একত্র করলেও তার থেকে অধিক বিদ্বান স্বামী বিবেকানন্দ)।

বললে, ন'শো টাকা। পাশের ঘর জহুরীর। সে এটা দেখেই এক লাখ টাকা দাম দিলে। জহুরী চেনে হীরা।

আবার ডায়েরী পাঠ হইতে লাগিল।

বেলুড় মঠ। আজ ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার। মহাপুরুষ মহারাজের ঘর। সকাল সাড়ে সাতটা। একটু গরম পড়িয়াছে। অনেক সাধু আসিয়া প্রণাম করিতেছেন।

শ্রীমহাপুরুষ খাটে বসা। স্বামী ওঁকারানন্দ, জ্যোতির্ময়ানন্দ, শাশ্বতানন্দ, দেশিকানন্দ, নিত্যাত্মানন্দ, ঢাকার ব্রহ্মচারী মণি, শৈলেশ প্রভৃতি যে যেখানে পারেন দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন।

আমেরিকাবাসী ব্রহ্মচারী কেডুলা (Kadula) আসিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি ব্রহ্মচর্য-ব্রত গ্রহণে ইচ্ছুক ঠাকুরের জন্মতিথিতে।

*Kadula — Maharaj, I want to take the vow of Brahmacharya ceremonially. Pray, grant me that.

Mahaurusha — You are already a Brahmacharin, following the rules. You know them all.

Kadula — No, Maharaj, not all.

Mahapurusha — So, Omkarananda will explain the meaning of them all. Only before a consecrated fire to chant them.

But everything is within. To Pray to Him always — I may not deviate from my vows. Everything is within

---

*কেডুলা — মহারাজ, আমি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রহ্মচর্যব্রত নিতে ইচ্ছা করেছি। আপনি কৃপা করে উহা প্রদান করুন।

মহাপুরুষ — তুমি তো আগে থেকেই ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচর্যের সব নিয়ম পালন করছ। ব্রহ্মচর্যের নিয়মগুলি সব জান।

কেডুলা — না মহারাজ, সবগুলি জানি না।

মহাপুরুষ — তা, ওঁকারানন্দ ঐ মন্ত্রগুলির অর্থ তোমার নিকট ব্যাখ্যা করবে। কেবলমাত্র পবিত্র হেমাগ্নিতে আহুতি দেওয়া ঐ মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করে — এইটে বাকী।

কিন্তু সবই অন্তরে। ঈশ্বরের কাছে সর্বদা আন্তরিক প্রার্থনা করা — প্রভো,

everything mental.

He is all in all. Sri Ramakrishna is the Paramatman, over-soul, the Lord incarnate. He is all-knowledge, all purity. He is all in all.

একটি সাধু (স্বগত) — আমার মন এই গুরু গম্ভীর বাণী কেবল স্মৃতিবদ্ধ করছে। কই, ধারণার দিকে অগ্রসর হচ্ছে না কেন? হৃদয়ে বদ্ধ করে রাখতে হবে, ধরে রাখতে হবে এই মহাবাক্য — 'Sri Ramakrishna is the Paramatman, the over-soul, the Lord incarnate!' (শ্রীরামকৃষ্ণই পরমাত্মা। তিনিই বিশ্বাত্মা। তিনিই পরমেশ্বর — ইদানীং নরকলেবরে অবতীর্ণ)।

বাইরের অবস্থার সংঘর্ষে এই মহাবাণী সর্বদা স্মরণ রাখতে পারছি কই? প্রভো, হৃদয়ে এই বাণীর ধারণা করিয়ে দাও।

শ্রীম — আন্তরিক ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। ঠাকুর বলতেন, পিঁপড়ের পায়ের শব্দ তাঁর কানে পৌঁছায়, আর ভক্তের ডাক পৌঁছাবে না? তাঁর নিবাসস্থল তো অন্তরই — হৃদয়! হৃদয় থেকে বললে নিশ্চয় পৌঁছায়।

৬

একজন সাধু ডায়েরী পাঠ করিতেছেন।

আজ শিবরাত্রি, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার। সকাল আটটা। শ্রীমহাপুরুষ বেলুড় মঠের দ্বিতলের বারান্দায় ধীরে ধীরে বেড়াইতেছেন উত্তর-দক্ষিণ।

বারান্দায় যাইবার সময় প্যাসেজে দরজার রেলিং-এর উপর দিয়া স্বামীজীকে দর্শন করিতেছেন বিছানায়। আর যুক্ত করে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, স্বামীজী মহারাজ, দয়া কর। জয় গুরুমহারাজ!

আমি যেন ব্রহ্মচর্যব্রত হতে ভ্রষ্ট না হই। সবই অন্তরের ব্যাপার, সবই মনোমধ্যে।

তিনি সর্বেসর্বা। শ্রীরামকৃষ্ণই পরমাত্মা। তিনিই বিশ্বাত্মা। তিনিই পরমেশ্বরন — নরকলেবরে অবতীর্ণ। তিনিই জ্ঞানস্বরূপ। তিনিই পবিত্রতার বিগ্রহ। তিনিই সর্বেসর্বা।

বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজীর ঘরের বারান্দার দরজার রেলিং-এ ঝুঁকিয়া ভিতর দেখিতেছেন। একটি সাধু বিছানার চাদর, ওয়াড় সব বদলাইতেছেন। ক্যাম্পখাটের বালিশের ওয়াড়টা খুলিয়া আর একটা পরাইতেছেন। ভিতরে একটা ছিন্ন ওয়াড়। উহা দেখিয়া মহাপুরুষ বলিলেন, ওটা বড় বিশ্রী হয়ে গেছে। বদলালে হয় না?

অতি সুস্পষ্ট ভাবে এই কথা বলিলেন। সেবক উত্তর করিলেন, আজ্ঞে, এটা স্বামীজীর ব্যবহৃত।

তা হলে থাক্, থাক্। তা হলে থাক্ — মহাপুরুষ বলিলেন।

আবার বেড়াইতেছেন। আবার রেলিং-এর কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন, এই টেবিল-ক্লথটা বেশ হয়েছে, না?

সেবক বলিলেন, আজ্ঞে হাঁ। রাত্রিতে আরও ভাল দেখায়, দরজা বন্ধ করে আলো জেলে দিলে। এই কথা শুনিয়া বিস্ময়ে বলিলেন, হাঁ, আরও ভাল দেখায়! কয়দিন হয় মহাপুরুষ এই টেবিল-ক্লথটা দিয়াছেন।

আবার বেড়াইতেছেন। আবার রেলিং-এর কাছে দাঁড়াইয়া স্বামীজীর কাছে প্রার্থনা করিতেছেন করজোড়ে — স্বামীজী, দয়া কর, শান্তি কর।

একটি সাধু ভাবিতেছেন — মহাপুরুষ মহারাজের কি ভক্তি গুরুভাইয়ের উপর! সত্য সত্যই জীবন্ত স্বামীজীকে দর্শন করিতেছেন এখানে। আর তাঁহার কাছে আমাদের জন্য আর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। আমাদের ভক্তি মুখের কথা মাত্র। আজ শিবরাত্রি — আমি এই জীবন্ত শিব স্বামীজীকেই পূজা করিব — স্বতন্ত্র পূজা আর এবার করিব না। এ ঘরে আমার যে সেবা, এটা যেন একটা কাজমাত্র। স্বামীজী এখানে জীবন্ত, এই ভাবে তো দেখিতে পারি নাই এত দিন! তাই, সন্তানের অপরাধ নিও না স্বামীজী মহারাজ!

এখন সকাল সাড়ে আটটা। মহাপুরুষ বারান্দায় বসিয়া আছেন চেয়ারে গদির উপর। সামনে গঙ্গা। শৈলেশ রেলিং-এ পিছন দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

শৈলেশ — গিরিজা (পরে স্বামী ধীরেশানন্দ) সন্ন্যাস নিতে এসেছে।

মহাপুরুষ — তা নিয়ে যায় যাক্! ওতে কিছুই হয় না। কাপড়

রঙালে কিছু হয় না। এতে ভিক্ষার সুবিধা হয় মাত্র।

আসল সন্ন্যাস সমাধি। সমাধি না হলে কিছুই হলো না। তাঁ'তে জ্ঞান ভক্তি হলেই সন্ন্যাস। নয়তো, কাপড় পরে কিছুই হয় না।

শৈলেশ — তবে আপনাদের হাত থেকে নিলে একটা সংস্কার হয়।

মহাপুরুষ (অনিচ্ছাসত্ত্বে) — তা হয়।

এইবার কথা উল্টাইয়া দিলেন। নিচে পাচক গোপীনাথ গঙ্গাস্নান করিয়া লনের উপর দিয়া তাহার ঘরে যাইতেছে। মহাপুরুষ দেখিয়া বলিলেন, নমঃ শিবায়। নমঃ শিবায়। আজ আবার শিবরাত্রি! গোপীনাথ সঙ্কুচিত হইয়া প্রণাম করিলেন।

অপরাহ্ণে অনেক ভক্ত আসিয়াছেন। মহাপুরুষ সকলকে লইয়া গঙ্গার ধারে বারান্দায় বসিয়া আছেন স্বামীজীর ঘরের সামনে ইজি-চেয়ারে, উত্তরাস্য। ভক্তরা সব মেঝেতে বসা।

নিচে খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ) লনে পায়চারী করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহাপুরুষ বলিলেন, খোকা বড় রোগা হয়ে গেছে দেখছি।

আজ ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। বেলুড় মঠ। মহাপুরুষের ঘর। মহাপুরুষ খাটে বসিয়া আছেন। এখন সাতটা। শৈলেশ একটি সত্যনারায়ণের রঙ্গীন পুতুল আনিয়া ঘরে রাখিয়াছেন। দৃষ্টি পড়িতেই শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, পুতুল কে এনেছে। শৈলেশ বলিলেন, আমি। মহাপুরুষ বলিলেন, দেখি কার মূর্তি। শৈলেশ উত্তর করিলেন, সত্যনারায়ণের। মহাপুরুষ দাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কত? শৈলেশ বলিলেন, ছ'পয়সা। মহাপুরুষ বিস্ময়ে বলিলেন, অত?

এখন সাড়ে সাতটা। গত রাত্রিতে সাধুরা শিবপূজা করিয়াছেন সারা রাত সারা দিন উপবাস থাকিয়া। এখন গঙ্গাস্নান করিয়া সকলে উঠানে প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন।

৭

সাধু ব্রহ্মচারীগণ সমস্বরে আহুতি প্রদান করিতেছেন —

ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।।[১] (গীতা ৪:২৪)

মহাপুরুষ বালকের ন্যায় অবাধ আনন্দ করিতেছেন। চোখ ও মুখে ব্রহ্মানন্দের ছটা। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করিতেছেন, ওঁ ব্রহ্মার্পণম্ ব্রহ্মহবি — ইত্যাদি।

তারপর বলিতেছেন, ওঁ নমো শিবায়, ওঁ নমো শিবায়। আবার তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ আবৃত্তি করিয়া ব্রহ্মদর্শনের পর সর্বত্র ব্রহ্ম, সর্ববস্তুতে ব্রহ্মদর্শন করিয়া আনন্দে ভরপুর ব্রহ্মদ্রষ্টার ভাবে বলিতেছেন —

ওঁ অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্ব্রতং[২]

অন্নং ন পরিচক্ষীত। তদ্ব্রতং[৩] (তৈত্তিরীয়, ভৃগুবল্ল)

ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া বলিতেছেন —

---

১. আহুতি দানের স্রুবাদি অর্পণ ব্রহ্ম, ঘৃত আদি হবিও ব্রহ্ম, অগ্নিও ব্রহ্ম, হোতা যিনি হোম করিতেছেন তিনিও ব্রহ্ম, এ কর্মদ্বারা ব্রহ্মকেই লাভ করা হইবে। এইরূপ কর্মে যাঁহার ব্রহ্মবুদ্ধি থাকে, তিনি ব্রহ্মকেই লাভ করিয়া থাকেন।

এখানে ভোজনের সময় নিজ হস্তই হইল স্রুবাদি, হবিস্বরূপ খাদ্যদ্রব্যকে জঠরাগ্নি রূপ ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইতেছে। ভোক্তজনই হোতা। এই ব্রহ্মরূপ কর্মের দ্বারা ব্রহ্মই প্রাপ্ত হইবে।

২। ভৃগু তপস্যা দ্বারা প্রথম বার এইরূপ জানিয়েছিলেন — অন্নই ব্রহ্ম। কারণ অন্ন হইতেই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে এবং শেষে অন্নেই বিলীন হয়।

অন্নের নিন্দা কখনও করিবে না। ইহাই ব্রত।

৩। অন্নকে উপেক্ষা করিবে না। ইহাও একটা ব্রত।

হা ..... উ, হা..... উ, হা.... উ। অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদোঽহমন্নাদোঽহমন্নাদঃ।[৪]

মহাপুরুষ যেন পাঁচ বছরের বালক — আনন্দে আনন্দ-সাগরে উলট-পালট খাইতেছেন। আবার বলিলেন, ওঁ নমো শিবায়, ওঁ নমো শিবায়।

আজ যেন সকল পৃথিবী শিবময়, ব্রহ্মময়।

শৈলেশ পশ্চিমের জানালার পাশে দাঁড়াইয়া নিচে সাধুভোজনের সামান্য commentary (ব্যাখ্যা) করিতেছেন। আর মহাপুরুষ আনন্দে পুনরায় বলিতেছেন, জয় গুরুমহারাজ, জয় গুরুমহারাজ, জয় শ্রীরামকৃষ্ণ, জয় মা, জয় স্বামীজী! তাঁদের কৃপায় আজ এ আনন্দধাম।

স্বামী বামদেবানন্দ প্রসাদ পাইয়া ফিরিয়াছেন। এবার মহাপুরুষ মহারাজের সেবা করিবেন।

একটি সাধুকে মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি উপোস কর নি? সাধু বলিলেন, আজ্ঞে না। মহাপরুষ বলিলেন, ভাল করেছ, রোগা শরীর।

সন্ধ্যা-আরতি হইয়া গেল। মহাপুরুষ বারান্দায় ছোট ঘরের পাশে বসিয়া আছেন ইজি চেয়ারে গদীর উপর। কোমর বাঁকিয়া ধনুর মত হইয়াছে শরীর। সেবক মতি পায়ে গামছা দিয়া মশা তাড়াইতেছেন বামদেবানন্দ মাথায় মৃদু হাওয়া করিতেছেন।

মহাপুরুষ দেবীসূক্ত আবৃত্তি করিতেছেন সমগ্রটা।

ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চারাম্যহমাদিত্যৈরুতবিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।।*

৪। ক্রমাগত তপস্যা করিয়া ভৃগু ব্রহ্মদর্শন করিলেন। তখন আনন্দে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিয়া বিস্ময়ে এইরপে ব্রহ্মভাবের প্রকাশ করিতেছেন যে... হা... উ, হা...উ, হা...উ। আমিই অন্ন, আমিই অন্ন, আমিই অন্ন। আমিই অন্নের ভোক্তা, আমি অন্নের ভোক্তা, আমি অন্নের ভোক্তা।

*অম্ভৃণ মহর্ষির কন্যা বাগ্‌দেবী ব্রহ্মদর্শনের পর ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করিয়া এইরূপ বলিলেন — আমিই একাদশ রুদ্ররূপে ও অষ্ট বসুরূপে বিচরণ করি। আমিই দ্বাদশ সূর্যরূপে ও সকল দেবগণরূপে বিচরণ করি। আমিই মিত্র ও বরুণ উভয়কে ধারণ করি। আমিই ইন্দ্র ও অগ্নিদেবকে এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করি। অর্থাৎ আমিই সব হয়ে রয়েছি।

মহাপুরুষ বলিলেন, এই হয়ে গেল চণ্ডীপাঠ। দেবীসূক্ত পাঠ করলেই হয়ে গেল চণ্ডীপাঠ।

বারান্দায় বিজলী জ্বলিতেছে। গঙ্গার ওপারে জেটিতেও আলোর মালা। মহাপুরুষ ঘরে যাইতেছেন, প্যাসেজে বলিলেন, জগবন্ধু, এবার স্বামীজীর ঘর বন্ধ কর।

ডায়েরী পাঠ শেষ হইল।

শ্রীম — আহা, কি সব সুন্দর কথা। কি দেবদৃশ্য! ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ মহারাজের এই ছোট-খাট কথায় যেন জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস মূর্তি ধারণ করেছে। এতে কত উপকার হবে ভক্তদের! যে লেখে তারই উপকার বেশী। লিখতে লিখতে চিন্তা হয় আর তাতে মনে গেঁথে যায়।

মহাপুরুষের কথাগুলি যেন মুক্তার মালা। আহা, ইনি এই ডায়েরী শোনানোতে আমাদেরও কত বড় সাধুসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরের কৃপা না হলে এসব লিখে রাখার ইচ্ছাই হয় না। ধন্য ইনি! আমরাও ধন্য — এঁর মুখে এসব মঠের জীবন্ত নাটকের বিবরণ শুনে। ঠাকুর এসেছিলেন বলেই এসব সম্ভব — এই জীবন্ত ধর্ম।

বিনয় মহারাজ, জগবন্ধু মহারাজ ও মণীন্দ্র মহারাজ মিষ্টিমুখ করিয়া বিদায় লইতেছেন। এখন রাত্রি সাড়ে সাতটা। শ্রীম জগবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হাত ধুয়েছেন কি? ঠাকুরদের জন্য মিষ্টি নিতে হবে। কি ভাবিয়া তখনই বিনয়ের হাতে মিষ্টির হাঁড়িটা দিলেন। অনেক মিষ্টি, তাই বলিতেছেন, সাবধানে নিয়ে যেও। জগবন্ধুর হাতে এক ডজন তালপাতার পাখা দিলেন সাধুদের জন্য।

বাগবাজার। স্টীমার ঘাট। স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী প্রবোধানন্দ ও স্বামী প্রণবানন্দ স্টীমারের অপেক্ষা করিতেছেন।

মঠের ম্যানেজার স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ বলিলেন, পাখাগুলি স্বামীজীর ঘরে রেখে দাও। প্রয়োজনমত নেওয়া যাবে। জগবন্ধু মহারাজ স্বামীজীর ঘরের সেবক।

বেলুড় মঠ, কলিকাতা।
২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার।

অষ্টম অধ্যায়

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ

১

মর্টন স্কুল। পঞ্চাশ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীট কলিকাতা। আজ ১১ই মার্চ মঙ্গলবার, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ। কয়েকদিন পর দোলযাত্রা, ফাল্গুন পূর্ণিমা। এই শুভদিনে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়।

সকাল সাড়ে দশটা। স্বামী জিতাত্মানন্দ ও নিত্যাত্মানন্দ (বিনয় ও জগবন্ধু) শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। কয়েকদিন পরই জগবন্ধু দেওঘরের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে যাইবেন।

শ্রীম চারতলার সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন দোরগোড়ায় চেয়ারে, দক্ষিণাস্য। অনেক ভক্তসমাগম হইয়াছে। শ্রীম অন্তর্মুখ। কিছুক্ষণ পর কথা কহিতেছেন। শ্রীম জগবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মঠের ডায়েরী এনেছ কি? তাহলে পড়। এ যেন বৈকুণ্ঠের সংবাদ!

সাধু ডায়েরী পড়িতেছেন।

বেলুড় মঠ। আজ শ্রীশ্রী ঠাকুরের জন্মোৎসব। ২রা মার্চ ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার। তিথিপূজা আগে হইয়াছে। অপরাহ্নে - লনে মিটিং। সভাপতি অনুকূলবাবু। ইনি মুন্সেফ। বক্তা স্বামী বিজয়ানন্দ ও বাসুদেবানন্দ।

শ্রীমহাপুরুষ দোতলার বারান্দায় বসিয়া আছেন ইজিচেয়ারে, স্বামীজীর ঘরের সামনে, উত্তরাস্য। চেয়ারে গদী পাতা। একজন ভক্ত পশ্চাতে দাঁড়াইয়া উলের পাখার হাওয়া করিতেছেন। সেবক শঙ্কর প্যাসেজের সামনে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার কপালে সিঁদুরের লম্বা টিপ।

স্বামী বাসুদেবানন্দ বক্তৃতা করিতেছেন। শেষ হইলে মহাপুরুষ হাততালি দিয়া বালকের ন্যায় আনন্দ করিতেছেন। বলিতেছেন—বা, বা, বাসুদেবানন্দ।

এখন প্রায় পাঁচটা।

কতকগুলি ভক্ত মহিলা আসিয়া মহাপুরুষ মহারাজের সামনে

দাঁড়াইলেন। মহাপুরুষ মহারাজ চক্ষু বুজিয়া ধ্যান করিতেছেন। নিচে অনুকূলবাবু বক্তৃতা করিতেছেন।

বেলুড় মঠ। ৩রা মার্চ ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার। সকাল সাড়ে সাতটা। মহাপুরুষ দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন প্যাসেজের সামনে, উত্তরাস্য। সাধুরা প্রণাম করিতেছেন। ঘরে গিয়া না পাইয়া এখানে আসিয়াছেন।

স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ দাঁড়াইয়াছেন ছোট ঘরের দেয়ালের গায়ে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া। স্বামী রাঘবানন্দ মহাপুরুষের সামনে। স্বামী অম্বিকানন্দ ও দেশিকানন্দও সামনে। স্বামী নিত্যাত্মানন্দ স্বামীজীর ঘরের জানালার সামনে। ভজহরি (স্বামী সর্বজ্ঞানন্দ) দাঁড়াইলেন স্বামীজীর ঘরের জানালার পাশে বারান্দায়।

এ-কথা সে-কথার পর বাগবাজারের নূতন মঠের কথা ও স্বামী অভেদানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের কথা উঠিল।

শ্রীমহাপুরুষ বলিতেছেন, হোক্ না, খুব হোক্। আরো হোক্। যত হয় ভাল। (সহাস্যে) এখানে (বেলুড় মঠে) এতগুলি (সাধু) হলে ধরবে কোথায়? সব স্থান থেকেই তো তাঁর কথা প্রচার হচ্ছে। খুব ভাল। হোক্ না। এই যে হচ্ছে এ-ও তাঁর ইচ্ছা। আমি তাই ভাবি — এ তাঁরই ইচ্ছা।

তবে এখানে যারা থাকবে তাদের principle-টা (নীতি) ঠিক থাকবে। ত্যাগ, পবিত্রতা, ভজন, পূজা, পাঠ — এই সব এখানে থাকবে। স্বামীজীর আদর্শ এই। পবিত্রতা, একেবারে ত্যাগ — খুব পাঠ, বিদ্যা — খুব থাকবে। আর love (ভালবাসা)। Love-এতে সব হয়। খুব love চাই।

আর যাঁরা আসবেন তাঁদের সঙ্গে তাঁর কথা বলা। (হাতে, চোখমুখে অন্তর ও উপর দেখাইয়া ঈশ্বরের ইঙ্গিত করিলেন) — ঈশ্বরের, ঠাকুরের কথা বলা।

শ্রীম — আহা, কি উচ্চ উদার ভাব! দেখ, যাঁরা ঈশ্বরের নাম প্রচার করবেন তাঁরা সকলেই আপনার লোক। তত্ত্বজ্ঞ লোকেরই এই দৃষ্টি সম্ভব। ক্ষুদ্র দৃষ্টিতেই দলাদলির কথা। কি সুন্দর কথা! সবাই ঠাকুরের নাম প্রচার করছে। আহা কি কথা — যে-ই আসবে তাকেই ঈশ্বরের কথা শোনাবে!

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। আজ ৫ই মার্চ, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার। গঙ্গার দিকের

দ্বিতলের বারান্দা। সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়া অর্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া আছেন। চেয়ারে গদী পাতা। আজ পেটের গোলমাল চলিতেছে, তাই খুব ক্লান্ত। বৃদ্ধ শরীর। চেয়ারখানা আজ রাখা হইয়াছে প্যাসেজের বাম দিকে। সম্মুখেই গঙ্গা। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছেন। এক একবার চাহিয়া গঙ্গাদর্শন করিতেছেন।

স্বামীজীর ঘরের সেবক সাধু দরজা জানালা বন্ধ করিতেছেন। আর এক একবার মহাপুরুষকে দর্শন করিতেছেন। মহাপুরুষও দেখিতেছেন সেবকের কাজ। খড়খড়ি খোলা রাখা হয়। তাহার ফাঁক দিয়া মহাপুরুষও দেখিতেছেন, সেবকও দেখিতেছেন। হঠাৎ একটু জোরে দরজাটা বন্ধ করা হইল। মহাপুরুষ মহারাজ চকিতে চাহিয়া দেখিতেছেন।

সেবক স্বামীজীর ঘরে ধুপ ও আলো জ্বালাইলেন। ঁদক্ষিণেশ্বরের মা কালী, ঠাকুর ও গঙ্গামাতাকেও ধুপ দেখান হইল। শ্রীমহাপুরুষের চরণযুগলেও ধূপদান হইল। চরণযুগল সমানভাবে মেঝের উপর ভেলভেটের চটিতে রাখা।

সন্ধ্যা হয় হয়। মহাপুরুষ ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন। ধ্যানস্থ নয়ন। সেবক রমেন (স্বামী বামদেবানন্দ) তোয়ালে দিয়া মাথায় হাওয়া করিতেছেন। আর মতি মহারাজ (স্বামী শিবস্বরূপানন্দ) তালপাতার পাখায় মহাপুরুষের পায়ে হাওয়া করিয়া মশা তাড়াইতেছেন।

অদূরে উত্তর দিকে রেলিং-এর পাশে খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ) মাদুরে বসা তাকিয়া ঠেস দিয়া — দক্ষিণমুখী। একটি সাধু প্যাসেজের মুখে দাঁড়াইয়া উভয়কে দর্শন করিতেছেন।

দেওঘর বিদ্যাপীঠ হইতে কতকগুলি জলের কুঁজা পাঠাইয়াছে সেই প্রসঙ্গে দেওঘরের সম্বন্ধে এ-কথা সে-কথা চলিতেছে।

স্বামী সুবোধানন্দ —ওঁরা (সরোজ ও গিরিজা মহারাজ) চলে গেছেন দেওঘর?

রমেন — না।

মহাপুরুষ — আচ্ছা, বিদ্যাপীঠের পোলটা হয়ে গেছে?

রমেন — আজ্ঞে হাঁ।

রমেন বিদ্যাপীঠের ভূতপূর্ব কর্মী।

রমেন — দেওঘরে একজন একটা বাঘ পোষে। বাচ্চা বয়স থেকে খাঁচায় রেখে দিয়েছে। কুকুর, শেয়াল, ছাগল — এসব একে খেতে দেয়।

মহাপুরুষ (বিস্মিতভাবে) — ও বাবা, এসব কেন?

ঠাকুরঘরের শঙ্খধ্বনি হইল। মহাপুরুষ ব্যস্তভাবে সোজা হইয়া বসিলেন। কথাবার্তা সব বন্ধ। ধ্যান করিতেছেন, ইহার পূর্বে ঠাকুর দেবতাদের নাম করিতেছেন — "দুর্গা, দুর্গা, শিবদুর্গা। জয় প্রভু, জয় প্রভু, জয় প্রভু। দুর্গা, শিবদুর্গা।" পৃষ্ঠদেশ ধনুর মত বক্র। তবুও অভ্যাসে নিষ্ঠা।

সম্মুখে গঙ্গা দিয়া সাদা রঙ্গের একখানা জাহাজ যাইতেছে উত্তর দিকে মাথা উঁচু করিয়া, তীরের ন্যায় নির্ভীকভাবে। Tail light-টিতে (পিছনের আলোতে) সাদা রং, আর head light-টি (সামনের আলো) লাল।

ঘাটের পাশ দিয়া সবেগে যাইতেছে একখানা সুরকি-বোঝাই নৌকা, দক্ষিণ দিকে। মাঝিরা সব দাঁড় টানিতেছে। গঙ্গার জল সাদা — জোয়ার আসিয়া গিয়াছে। সুরকিগুলি পাইল-করা, উঁচু। বেশ সুন্দরদর্শন।

ঘাটের উপর দক্ষিণ পাশে লনে কয়েক বস্তা মাল পড়িয়া আছে। কলিকাতার বাজার হইতে আসিয়াছে। উৎসব নিকটবর্তী।

শ্রীমহাপুরুষের শরীরে কষ্ট। কিন্তু তবুও ধ্যানমগ্ন।

শ্রীম — কি সুন্দর বিবরণ! যেন চোখের সামনে এনে সব ধরে দিচ্ছে। শরীর অপটু, বেঁকে ধনুর মত হয়েছে। তথাপি আরতির ঘন্টা পড়তেই ভগবানের নাম করছেন মহাপুরুষ, আর ধ্যানমগ্ন। এতে ভক্তদের বহু কল্যাণ হবে। তারাও অসুখে বা বার্ধক্যে এইরূপ ঈশ্বরচিন্তা করতে চেষ্টা করবে। এ সব object lesson (আদর্শ শিক্ষা)।

আবার ডায়েরী পাঠ হইতে লাগিল।

বেলুড় মঠ। ৬ই মার্চ, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। মহাপুরুষের ঘর। সকাল সাতটা। অনেক সাধু ঘরে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন — স্বামী ওঁকারানন্দ, আত্মপ্রকাশানন্দ, শাশ্বতানন্দ, ভাস্বরানন্দ, নিত্যাত্মানন্দ, শৈলেশ প্রভৃতি।

মিস্টার কেডুলা (Mr. Kadula) প্রবেশ করিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, What is your name? (তোমার নাক কি?) কেডুলা প্রণামান্তে উত্তর করিলেন সহাস্যে, মঙ্গলচৈতন্য। মহাপুরুষ মহারাজ আনন্দে বলিলেন, বেশ

নাম। মঙ্গলকে peace (পীস) বলবে? না, তা তো শান্তি। (সকলের প্রতি) মঙ্গলকে কি বলবে? স্বামী শাশ্বতানন্দ বলিলেন, good (গুড — ভাল)। নিত্যাত্মানন্দ বলিলেন, blessedness (ব্লেসেডনেস — পবিত্রতা)। শৈলেশ বলিলেন, auspicious (অস্‌পীশাস্ — শুভ)।

আজ উৎসব, ৮ই মার্চ, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার। বেলুড় মঠ। সকাল সাড়ে সাতটা। শ্রীমহাপুরুষ দোতলার বারান্দায় উত্তর-দক্ষিণে পায়চারী করিতেছেন। খোকা মহারাজ মহাপুরুষের ঘরের সামনের রেলিং-এর পাশে ইজি-চেয়ারে বসা, দক্ষিণাস্য। মহাপুরুষ উত্তরের দিকে ছাদে যাওয়ার দরজার কাছে। আবার ঘুরিয়া দক্ষিণ দিকে প্যাসেজের কাছে আসিলেন।

অনেক সাধু, ভক্ত দাঁড়াইয়া আছেন এদিক সেদিক — বিনয়, শৈলেশ, দেবানন্দ, নিত্যাত্মানন্দ, ভজহরি প্রভৃতি। স্বামী ধ্রুবেশ্বরানন্দ আসিয়াছেন। মহাপুরুষ তাঁহাকে বলিলেন, ওঁ নমো নারায়ণায়। উনি কোন প্রত্যুত্তর না করায় স্বামী দেবানন্দ বলিলেন, আপনি কিছু বললেন না? তবুও ধ্রুবেশ্বরানন্দ চুপ করিয়া রহিলেন।

মহাপুরুষ ততক্ষণ উত্তর প্রান্তে। দক্ষিণ দিকে ফিরিয়া সহাস্যে বলিতে লাগিলেন, একবার বড় মজা হয়েছিল, অনেক দিন আগে, আলমোড়ায়। একজন সাধু আমাকে 'ওঁ নমো নারায়ণ' বলেছিলেন। আমি উত্তর করেছিলাম, 'নারায়ণ'। সাধু খুব চটে গিয়ে বললেন — কি, আমি তোমায় ওঁ নমো নারায়ণ, বললাম। আর তুমি কি না বললে, নারায়ণ। আমি বললাম, কি বলতে হয়? উনি বললেন, 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলতে হয়। আমি তখন বলি — হাঁ, তাই বলছি। আমি জানি না। তখন খুব খুশী।

শ্রীমহাপুরুষ শিশুর মত 'হি হি' করিয়া হাসিতে লাগিলেন হাত নাড়াইয়া।

আজ এগারটার সময় শ্রীম মঠে আসিয়াছেন। স্বামীজীর মন্দিরের কাছে, দর্শনান্তে প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইতেছেন জোর করিয়া অন্তেবাসী। সঙ্গে অমূল্য ও সুধীর। বিনয় মহারাজ ও গদাধর মহারাজও আসিয়া উপস্থিত।

ডায়েরী পাঠ শেষ হইল।

শ্রীম — খুব graphic (ছবির মত)। লিখতে লিখতে লেখার কৌশল বেড়ে যায়। লোকের সামনে দূরের ঘটনা জীবন্ত করে আনা যায়।

২

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। শ্রীম চেয়ারে উত্তরাস্য বসা। শ্রীম-র সামনে বেঞ্চে বসা একটি নূতন ভক্ত। বেশ লম্বা চওড়া শক্ত চেহারা। বিলাতফেরৎ। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ, বর্ধমান কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। কথাবার্তা হইতেছে কুশল প্রশ্নাদির পর। বিনয় মহারাজ ও জগবন্ধু মহারাজ প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা বেলুড় মঠ হইতে আসিয়াছেন। অমৃতবাবুর সঙ্গে পরামর্শ আছে কোনও বৈষয়িক বিষয়ে। একজন আম-মোক্তারী দিবেন অপর আর একজনকে।

শ্রীম সাধুদের জোড়া বেঞ্চিতে আসনের উপর বসাইলেন আহ্বান করিয়া — আসুন, আসুন, বসতে আজ্ঞা হোক। (প্রিন্সিপ্যালের প্রতি) এই দর্শন করুন সাধু। এঁরা সব ছেড়েছেন ঈশ্বরের জন্য। এখন বেলুড় মঠে রয়েছেন। Wholetime man. Amateurs in religion নন — সারা জীবনের জন্য ব্রতী, সখের ধর্ম নয়। Serious life (অতি কঠিন জীবন) নিয়েছেন।

প্রিন্সিপ্যালের মনে এ কথা ভাল লাগে নাই।

প্রিন্সিপ্যাল (শ্রীম-র প্রতি) — ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু বলুন। তাঁর কথা শুনতে এসেছি।

শ্রীম — বা, আপনি তো ভক্ত লোক! তাঁর কথা শুনবেন? তাঁর প্রথম কথা — সাধুসঙ্গ। দ্বিতীয় কথা — সাধুসঙ্গ। শেষ কথা — সাধুসঙ্গ। এক কথায় তাঁর সমস্ত উপদেশ বলতে হলে বলতে হয় — সাধুসঙ্গ।

ঠাকুর কি শুধু কথা শোনাতেন? — তা নয়। তিনি মানুষ তৈরী করতেন। বলতেন, বাজনার বোল হাতে আনতে হয়। কেবল মুখে বললে কি হবে? তেমনি ঈশ্বরীয় কথা। ঈশ্বরীয় কথা শুনলে পালন করা উচিত। নইলে তাঁর আস্বাদ লাগবে না। সেই আস্বাদ পাওয়া যায় সাধুসঙ্গ করলে। সাধুসঙ্গ আর সাধুসেবা। কেন? না, তাঁরা যে বাজনার বোল হাতে আনতে চেষ্টা করছেন। সব ছেড়ে তাঁ’তে মন দেবার জন্য আপ্রাণ খাটছেন। তাই তাঁদের সঙ্গ করলে তাঁরা যা করেন তাই করতে ইচ্ছা হবে। তাইতো তিনি এসে সাধু তৈরী করেছেন। সাধু ছাড়া ঈশ্বরীয় শিক্ষা কেন, কোন শিক্ষাই worth the name (নামের যোগ্য) হয় না। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার

এটি মূলস্তম্ভ। সর্বত্যাগী ঋষিগণ এই দেশের সমাজ, সভ্যতা রচনা করেছেন এই ভিত্তির উপর।

সব ছাড়া কি চারটি খানিক কথা? সংসারের ভোগবাসনা থাকলে ছাড়তে পারে না। হয়তো, একটা ভিটেমাত্র আছে, তবুও ছাড়া যায় না। যাদের মনে কর সব আছে, বিদ্যা বুদ্ধি ধন মান সব আছে, তাদের পক্ষে সব ছাড়া কি ছেলেখেলা? বহুজন্মের চেষ্টায় এটি হয়।

ক্রাইস্টের কাছে একজন বড়লোক ভক্ত গেছেন। বললেন, Good Master, what shall I do that I may inherit eternal life? (St. Mark 10:17) (আমি আপনার কাছে থাকতে চাই প্রভো)। ক্রাইস্ট তখন বললেন, তুমি কি কর? সে বললে, আমি ten commandments (দশ নীতি) পালন করি। তখন তিনি বললেন, বা তুমি তো বেশ লোক! তবে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি তোমার নেই। সেটা করে ফেল। বললেন, 'Go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor ... take the cross, and follow me.' (St. Mark 10:21) (বাড়ি যাও, সব বিক্রি করে ফেল। আর ঐ অর্থ দরিদ্রদিগকে বিতরণ কর। তারপর স্কন্ধে ক্রুশটি রাখ। তারপর আমার সঙ্গ নাও) 'Take the cross' মানে মৃত্যুকে বরণ করা। ভক্তটি ঐ কথা শুনে গালে হাত দিয়ে বসে রইল। পারলে না সব ছাড়তে, মৃত্যু বরণ করতে। ঘরে ফিরে গেল। এমনি কঠিন ত্যাগ! ত্যাগ না করলে ঈশ্বরলাভ হয় না। বেদে আছে, "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ত্বমানশুঃ।' (কৈবল্য ১:২)

তাই ঠাকুর বলতেন — সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ। এ বৈ উপায় নাই। যেমন উকীলের সঙ্গ করলে, সেবা করলে উকীল হওয়া যায়, তেমনি সাধুর সঙ্গ ও সেবা করলে ঈশ্বরকে জানা যায়। সাধুরা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ করার সূত্র। তাঁদের bypass (ত্যাগ) করে ধর্ম হয় না।

এই ত্যাগ নেই বলে আজকাল স্কুল কলেজের পড়ায় কিছু হচ্ছে না। চরিত্র গঠিত মোটেই হচ্ছে না। যারা পড়াবে তাদেরই আদপে শিক্ষা নেই, কি পড়াবে তা হলে? এই যে হাজার হাজার গ্র্যাজুয়েট তৈরী হচ্ছে তার ফল কি হচ্ছে? Culture (সংস্কৃতি) হচ্ছে কি? কিছুই না। কতগুলি information (তথ্য) জানার নাম শিক্ষা নয়। মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা

রয়েছে সেটাকে ব্যবহারে আনা। মানুষের স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ কি না! সেই জ্ঞানটিকে বাইরে আনা। একেই বলে ব্রহ্মজ্ঞান।

ব্রহ্মজ্ঞানকে আদর্শ না রাখলে বাইরের জ্ঞানলাভ মানুষকে শান্তি সুখ দিতে পারে না। মানুষের চরিত্র Himalayan basis-এর (হিমালয়রূপ সুদৃঢ় ভিত্তির) উপর খাড়া থাকতে পারে না। এই ব্রহ্মজ্ঞানের পর মনোবিজ্ঞান। যোগশাস্ত্রে তার অনুশীলন হয়েছে। তারপর জড়বিজ্ঞান। স্থূল জগতের নানাবিষয়ক জ্ঞান। West (প্রতীচী) এই জড় বিজ্ঞানে পারদর্শী হয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মবিজ্ঞান জানে না বলে এতো জেনেও ফল কুফল হচ্ছে। চরিত্র গঠিত হয় না। মনে শক্তি নাই। হিংসা দ্বেষ দিন দিন বাড়ছে।

একজন গ্র্যাজুয়েটকে জিজ্ঞাসা করা হলো, Geography-র (ভূগোলের) elementary question (অতি সাধারণ প্রশ্ন)। সে বললে, আমার Geography (ভূগোল) ছিল না। ইংলিশও জানে না। ফল দেখেই গাছ চেনা যায়। এই সব productions (তৈরী মাল) দেখে যারা পড়ায় তাদের মুরোদ বোঝা যায়।

ক্রাইস্ট কি লেখাপড়া জানতেন? ঠাকুর কি লেখাপড়া জানতেন? নিজের চোখে দেখেছি, যাদের সারা দুনিয়া মানতো পণ্ডিত বলে, সে সব লোক পায়ের কাছে নিচে বসে আছে হাতজোড় করে। আর ক্রাইস্ট? তাঁরও তাই। বড় বড় ‘doctors' (ডক্টররা) মানে, পণ্ডিতরা ভয়ে জড় সড় হয়ে গিছলো। বিস্ময়ে বলেছিল, Is not this carpenter's son? (St. Matth. 13:55) He knoweth no letters. But never man spake like this one. He speaketh like one in authority! (ইনি কি সূত্রধর জোসেফের পুত্র? নিরক্ষর হয়ে এত জ্ঞান কোথা থেকে পেলো? আমরা তো এমন গভীর জ্ঞানের কথা কোথাও শুনি নাই)!

তাই সাধুসঙ্গ দরকার । সাধুসঙ্গ করলে নিজের মূল্য বোঝা যায়। তখন ঠিক ঠিক জ্ঞান লাভ হয়। শুধু বিদ্যায় কিছু হয় না। উল্টো ফল হয়। নিজের ও অপরের সুখ শান্তি লাভ হয় না, বরং বিনাশের পথ আরো প্রশস্ত হয়।

তাই ঋষিরা ঈশ্বরকে, মোক্ষকে সামনে রেখে, অর্থাৎ মোক্ষলাভ মানুষ-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ জেনে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে নানাবিধ শিক্ষা দিতেন।

বেদে দু'টি typical case-এর (আদর্শ ঘটনার) কথা আছে। মহাবিদ্বান

ছিলেন কুলপতি শৌনক আর নারদ। যাবতীয় বিদ্যায় পারদর্শী হয়েও চিত্তে শান্তি ছিল না তাঁদের। তাই ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির কাছে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের পর তখন শান্ত হন। তখনই নিজের ও সমাজের কল্যাণকর হলেন যথার্থরূপে। শৌনক ছিলেন নৈমিষ্যারণ্য University-র Chancellor (বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি)। মহাশাল বলা হতো তাঁকে। দশ হাজার ছাত্র যাঁর অধীনে থাকতো তাঁকেই এই উপাধি দেওয়া হতো। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর তাঁর যথার্থ শান্তি হল!

যে ব্রহ্মবিদ্যা ও লৌকিক বিদ্যায় পারদর্শী কেবল সে-ই পারে শিক্ষক হতে ঠিক ঠিক। লৌকিক বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া কি কম শক্ত! যে যে বিষয় নিয়েছে — মনন করতে করতে তার সঙ্গে এক হয়ে গেলে তবে সে বিদ্যা লাভ হয়। Invention or discovery (নূতন যন্ত্র অথবা নূতন সত্য আবিষ্কার) যারা করে তাদের এত concentration-এর (একাগ্রতার) দরকার। একশ' গুণ নিজের জানা থাকলে অপরকে কিছু দেওয়া যায়।

ক্রাইস্টের তো লৌকিক বিদ্যা জানা ছিল না। কিন্তু, দেখ না, তাঁর monument — St. Paul Cathedral, (বিজয়স্তম্ভ — সেন্ট পল ক্যাথিড্রল) কত বিদ্যার ফল এটি! এটিতে কি শিক্ষা হচ্ছে? লৌকিক বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার দাসী, চরণাশ্রিতা সেবিকা।

প্রিন্সিপাল বিদায় হইলেন।

শ্রীম (একজন সন্ন্যাসীর প্রতি) — ইনি প্রিন্সিপাল, তাই গোটা কয়েক কথা শুনিয়ে দিলুম। ঠাকুর বলতেন, হেগো গুরুর পেদো শিষ্য। তাই হচ্ছে আজকাল স্কুল কলেজের শিক্ষায়।

সন্ধ্যার পর শ্রীম সিঁড়ির ঘরে গিয়া বসিলেন। পূর্বের চেয়ারে। অনেক ভক্তসমাগম হইয়াছে। কথায় কথায় কর্মের কথা উঠিয়াছে — কোন্ কর্মে ঈশ্বরদর্শন হয়?

শ্রীম — গুরূপদিষ্ট কর্ম করতে হবে। অন্য কর্ম করলে জড়িয়ে যাবে। গুরু যা বলেন তাই নিষ্কামভাবে করবার চেষ্টা করা। ঈশ্বরের জন্য কর্ম করাও নিষ্কাম কর্ম। বড় কঠিন নিষ্কাম কর্ম! তাই ভরসা দিয়েছেন ভগবান গীতায়, 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।' একটু করলেই কাজ হয়ে যাবে, মৃত্যুঞ্জয় হবে। মানে, ভগবান জানেন জীব দুর্বল। তবুও যদি

সাহস করে একটু করতে চেষ্টা করে নিষ্কাম কর্ম, তা হলেই তিনি প্রীত হয়ে মুক্তি দিয়ে দেন। এই ভরসা।

নিষ্কাম কর্মে নিজেরও চিত্তশুদ্ধি হয়, তারপর জ্ঞানপ্রাপ্তি। আবার এতে অপরেরও কল্যাণ হয়। গুরূপদিষ্ট কর্ম চাই। নিজে নিজে হয় না। গুরুর শরণাগত হয়ে করা চাই।

লোকশিক্ষা বড় কঠিন। ভগবানের ইচ্ছা হলে তবে হয়। মানুষের ইচ্ছায় লোকের শিক্ষা হতে পারে না। তাইতো পণ্ডিত শশধরকে ডেকে বলে দিলেন, তুমি কি চাপরাশ পেয়েছো যে লোকশিক্ষা দিচ্ছ? তা নইলে কেউ শুনবে না তোমার কথা। চাপরাশ মানে commission (আদেশ)! ভগবান সাক্ষাৎকার ক'রে, তাঁর আদেশ হলে তখন শক্তি হয়। সে ব্যক্তির কথা শুনে জগৎ স্তম্ভিত হয়।

৩

কলিকাতা। বেচু চ্যাটার্জীর স্ট্রীট। রাজপথ। দুইটি সাধু চলিতেছেন আমহার্স্ট স্ট্রীটের দিকে। শ্রীমকে দর্শন করিবেন। তাঁহারা বেলুড় মঠ হইতে আসিয়াছেন। পূর্বমুখী রাস্তায় বাঁ দিকে একটি জলের কলে একজন সাধু হাত ধুইতেছেন — হেয়ার প্রেসের সামনে। এখানে পূর্বে খোলার ঘর ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে প্রথম বয়সে থাকিতেন। ঝামাপুকুর এই মহল্লার প্রাচীন নাম। রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে গৃহদেবতার পূজারী ছিলেন কিছুকাল। এই রাস্তায় ঝামাপুকুর লেনের মোড়ে অপর একটি খোলার ঘরে সংস্কৃত টোল ছিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের।

সাধু দুইটি হইলেন বিনয় ও জগবন্ধু। ইঁহারা শ্রীম-র কৃপা দীর্ঘ দিন ধরিয়া পাইয়া আসিতেছেন। জগবন্ধু শীঘ্রই বৈদ্যনাথধাম যাইবেন কর্ম নিয়া — শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে। তাই তিনি শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

আজ ফাল্গুন-পূর্ণিমা। দোলযাত্রা। আবার শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মদিন। এই শুভ দিনে সাধুরা যাইতেছেন শ্রীম-র চরণ দর্শন করিতে। মনে খুব আগ্রহ।

একজন সাধু কলে হাত ধুইতেছেন। পূর্ব দিকে ফিরিয়া দেখেন, শ্রীম পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন সহাস্যবদনে। শ্রীম-র আগে চলিতেছে বলাই, সঙ্গে সুখেন্দু। এখন বেলা সাড়ে পাঁচটা।

সাধুদের দেখিয়াই শ্রীম আনন্দে বলিলেন, যান আপনারা গিয়ে (মর্টনের) ছাদে বসুন হাওয়ায়। আমরা ঠাকুর বাড়ি হয়ে ফিরছি।

সাধুরা ভক্তসঙ্গে ছাদে বসিয়া আছেন। শ্রীম ফিরিলেন রাত্রি নয়টায়। দোতলার বারান্দার পূর্ব ধারের চেয়ারে এখন বসিয়া আছেন, পশ্চিমাস্য। ভক্তরাও কেহ কেহ উপবিষ্ট। একজন সেবককে বলিলেন, ছাদে মঠের সাধুরা বসে আছেন। এখানে নিয়ে আসুন ডেকে।

সাধুরা আসিয়া শ্রীম-র পাশে বসিলেন। তাঁহাদের হাতে সন্দেশ দিলেন নিজহস্তে। সাধুরা সন্দেশ হাতে রাখিয়া শ্রীম-র কথা শুনিতে ব্যগ্র। শ্রীম বলিলেন, খেয়ে ফেলুন। প্রসাদ 'প্রাপ্তিমাত্রেন ভক্ষয়েৎ।' মানে, দুর্লভ জিনিস! যদি বিঘ্ন হয় খাওয়ায়। প্রসন্ন হয়ে যা দেন ভগবান, তাকে বলে প্রসাদ। তাই প্রসাদ চেয়ে নিতে হয়। অন্য জিনিস অপ্রতিগ্রহ। কিন্তু প্রসাদের বেলায় তা নয়। দীনভাবে তা চেয়ে নিতে হয়। নিজের কল্যাণ কি না! এতে জীব মুক্ত হয়।

জগবন্ধু — আগামী পরশু আমি বৈদ্যনাথধামে যাচ্ছি বিদ্যাপীঠে। সুরপতি নিয়ে যাবেন। তিনি আজকাল উহার অধ্যক্ষ।

শ্রীম — কে সুরপতি?

জগবন্ধু — এখনকার নাম বোধাত্মানন্দ। সাধু হওয়ার পূর্বে এখানে আসতেন বৌবাজার থেকে। কালও এসেছিলেন, অনেকক্ষণ ছিলেন।

শ্রীম (নয়নহাস্যে) — (সুরপতি) আমায় বললেন, 'ঠাকুরের কথা বলুন (হাস্য)। আমি বললাম, র'সো ক্রমশঃ প্রকাশ্য। বললাম ঠাকুরের একটি সিন্। চাঁচর সেদিন। কাশীপুর বাগান। ঠাকুর বললেন নরেন্দ্রকে, হৃদয়ে হাত দিয়ে — আঙ্গুল দিয়ে চারদিকের সব দেখিয়ে ইঙ্গিতে। বললেন, 'বল্ তো কি বললাম?' সে বললে, 'অর্থাৎ আপনার ভিতর থেকে সব বের হয়েছে, সারা বিশ্ব'। তখন ভারি খুশি হয়ে রাখালকে বললেন, 'দেখলে কেমন বুঝছে আজকাল।' আগে অবতার মানতো না কি না। এখন বুঝেছে। তাই ঠাকুরের অত আনন্দ।

গীতায়ও ভগবান বলছেন এই কথাই ঃ

'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
মযি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।।' (গীতা ৭:৭)*

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — হাজার ভাষ্য পড়, টীকা কর, টিপ্পনী দেখ, আর শাস্ত্র পড় — এ আলাদা জিনিস। এটার এই অর্থ, ওটার ঐ অর্থ — এসব দেখে শাস্ত্রেতে। তিনি বলতেন তাঁর যদি একটি রশ্মি কেউ পায়, তবে তার কণ্ঠে সরস্বতী বাস করেন।

তিনি বলেছিলেন, গোপীদের ভালবাসার যদি এক কণাও কেউ পায় তবে হেউ ঢেউ হয়ে যায়। মন বুদ্ধি সেখানে যেতে পারে না — ফিরে আসে। তাই বেদে আছে — 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।'

অত দুর্লভ যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম মানুষ হয়ে এসেছেন। যুগে যুগে আসেন। এবার এই শরীরে শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে। বিশ্বাস হয় কোথায়, বললেই? তাই অত আনন্দ নরেন্দ্র যখন বললে, আপনা থেকে এই বিশ্ব এসেছে।

Intellectually (বুদ্ধি দ্বারা) বুঝলে হয় না, ধারণা হয় না। কেন? ভাণ্ড ছোট। তিনি না বোঝালে বুঝবার যো নাই। নরেন্দ্রকে বুঝিয়েছেন। তাই নরেন্দ্র ঐ কথা বললেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভক্ত অভয়বাবু আসিয়াছেন। আর একটি ভক্ত — ডিস্‌পেপ্‌টিক। তিনি আফিস হইতে ফেরৎ পথে আসিয়াছেন। চোগা চাপকান পরনে। হাতে প্রসাদ আনিয়াছেন।

জ্যোৎস্নায় চারদিক ঝলমল করিতেছে। শ্রীম বলিলেন, এখন ন'টা বেজে গেছে। সাধুদের বলছেন, এবার আপনারা উঠুন। অনেক দূর যাবেন।

সাধুরা প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ললিত ও ছোট অমূল্য সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। আমহার্স্ট স্ট্রীটে দাঁড়াইয়া সাধুদের বিদায় দিলেন। পায়ে দুইজনে দুইটি টাকা দিলেন।

বেলুড় মঠ,
১৪ মার্চ, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার।

* হে ধনঞ্জয়, আমাকে ছাড়া অন্য কিছুই নাই এ জগতে। যেমন একটা সূত্রে অনেক রকমের মণি গ্রথিত থাকে তেমনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমাতে (সূত্রাত্মাতে) সংগ্রথিত।

নবম অধ্যায়

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ

১

মর্টন স্কুল। শ্রীম চারতলায় ছাদে বসা উত্তরাস্য। আজ ১৫ই মার্চ, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার। জগবন্ধু আসিয়াছেন, শ্রীমকে দর্শন করিয়া বিদায় নিবেন। তিনি দেওঘর বিদ্যাপীঠে যাইতেছেন সেবাকর্ম নিয়া। এখন অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা।

শ্রীম সস্নেহে জগবন্ধুকে তাঁহার নিজের পাশে জোড়া বেঞ্চিতে বসাইলেন। কুশল প্রশ্নাদির পর কথাবার্তা হইতেছে।

জগবন্ধু — গত কয়েকটা দিনের ডায়েরী এবং পুরানো ডায়েরীর কতক অংশ আপনাকে শোনান হয় নাই। আজ শোনাব বলে সঙ্গে এনেছি।

শ্রীম — হাঁ, শোনান শোনান। আমাদেরও সাধুদর্শন হয়ে যাবে।

সাধু ডায়েরী পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন।

বেলুড় মঠ, ১২ই মার্চ, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার। সকাল সাড়ে সাতটা। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ বারান্দায় পায়চারী করিতেছেন। গায়ে চাঁপা রং-এর পাঞ্জাবী। পায়ে ভেলভেটের চটি। পায়চারী করিতেছেন আর বলিতেছেন, দুর্গা, শিবদুর্গা, শিবদুর্গা। ঠাকুরের এই দুর্গানাম করলে সব আপদ কেটে যায়। বলিয়াই ঠাকুরের এই গানটি গাহিতেছেন —

বল রে বল সবে শ্রীদুর্গানাম।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে যে বা পথ চলে যায়।
শূলহস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায়॥

এখন শ্রীমহাপুরুষ চেয়ারে বসিলেন প্যাসেজের মুখে পূর্ব-দক্ষিণমুখী হইয়া। প্রসন্নবদন, স্মিতহাস্যে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। খোকা মহারাজ বসা ইজি-চেয়ারে রেলিং-এর গায়ে। তাঁহার সহিত কথা হইতেছে। স্বামীজীর ঘরের সেবক এই দৃশ্য দর্শন করিয়া নিচে যাইতেছেন।

আজ চাঁচর। ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৩৬ সাল, বৃহস্পতিবার। ১৩ই মার্চ, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ। সন্ধ্যার পর সাড়ে সাতটা হইবে। শ্রীমহাপুরুষ রেলিং-এ ঝুঁকিয়া চাঁচর দর্শন করিতেছেন দক্ষিণ দিকে গঙ্গাতীরে চন্দনতলায়। রেলিং-এর উত্তর দিক হইতে দ্বিতীয় ব্লকে দাঁড়ান। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, তত উজ্জ্বল নয়। তবুও চাঁচর গৃহ দেখা যাইতেছে। এখনও অগ্নিসংযোগ হয় নাই। শ্রীমহাপুরুষের পশ্চাতে অনঙ্গ, মতি, রমেন ও জগবন্ধু। বলিতেছেন, দেখ ঐ দেখা যাচ্ছে একটু, অন্ধকার। গোবিন্দায় নমঃ, কৃষ্ণায় নমঃ।

নয়টা দশটার সময় শ্রীমহাপুরুষ নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। সিঁড়ির উপর একটি সাধুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শরীর এমন রোগা হয়ে যাচ্ছে কেন? সাধু উত্তর করিলেন, পিঠের pain-টা (ব্যথা) রয়েছে বলে। Strain (অধিক খাটুনী) করতে পারি না — body, brain (দেহ ও মস্তিষ্ক) দু'টোই। অতি সকরুণভাবে মহাপুরুষ মহারাজ উত্তর করিলেন, না বাবা, করো না।

পরদিন দোল। ১৪ই মার্চ ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। বেলা সাড়ে দশটা। স্বামীজীর সেবক সাধু ঠাকুর দেবতাদের সকলকে আবীর দিয়া শ্রীমহাপুরুষের কাছে আসিয়াছেন। তিনি ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন। কেদার মেঝেতে বসা। আবীর দেখিয়া বলিলেন, না বাবা। সেবক মেঝেতে পায়ের কাছে দুই বিন্দু সমর্পণ করিলেন। মহাপুরুষ আনন্দে বলিলেন, হাঁ তাই দাও।

মহাপুরুষ বারান্দায় যাইতেছেন। সঙ্গে একটি সাধু পশ্চাতে। প্যাসেজে সাধু বলিলেন, দেওঘর বিদ্যাপীঠে যেতে বলছেন ওঁরা (কর্তৃপক্ষ)। মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? সাধু বলিলেন, একটু পড়াতে হবে। আর ভাল জায়গা, যদি একটু change (বায়ু পরিবর্তন) হয়। মহাপুরুষ বলিলেন, হাঁ জায়গা ভাল। তবে বড় গরম। তবে তোমার মাদ্রাজের গরম সওয়া আছে।

মহাপুরুষ বারান্দায় পায়চারী করিতেছেন। সাধুর কথা শুনিয়া ভাবিত হইয়াছেন। এই সাধু রুগ্ন শরীর লইয়া মাদ্রাজ হইতে এখানে আসিয়াছেন। বিশেষ কাজ করিলেই রোগবৃদ্ধি হয়। এখানে সামান্য একটু কাজ করেন, স্বামীজীর ঘরের সেবা।

একটু পর মহাপুরুষ চিন্তিত হইয়া বলিলেন দৃঢ়ভাবে, হাঁ, এইটুকু কাজ। (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া) এইটুকু কাজ — বেশী নয়।

শ্রীম অন্তেবাসীকে বলিলেন, কই পুরানো ডায়েরী? বলেছিলে, মহাপুরুষ মহারাজের পুরী ও ভুবনেশ্বর দর্শনের কথা আছে। ওটা পড়ে শোনাও।

এখন পুরানো ডায়েরী পাঠ চলিতেছে। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ মিশনের কর্মোপলক্ষ্যে মাদ্রাজ যাইতেছেন। বেলুড় মঠ হইতে আসিয়া তিনি কয়েকদিন ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে রহিয়াছেন। আজ সদলবলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে আসিয়াছেন। আজ ৫ মে, ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ, বৈশাখের ২২ তারিখ, ১৩৩২ সাল, বুধবার।

শ্রীমহাপুরুষ রেলস্টেশন হইতে মোটরে করিয়া সোজা অরুণস্তম্ভের নিকট মন্দিরদ্বারে উপস্থিত। সঙ্গীগণ কেহ মোটরে, কেহ ঘোড়ার গাড়িতে আসিলেন। এখন প্রায় সাতটা।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে অভ্যর্থনার জন্য অরুণস্তম্ভের নিকট জগবন্ধু, গদাধর ও মহেশচৈতন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ইঁহারা সকলে ক্ষেত্রবাসী। স্বামী সিদ্ধানন্দ ও ব্রহ্মচারী গোপালও ক্ষেত্রবাসী। উনি মোটর হইতে নামিয়াই বলিলেন, এই যে জগবন্ধু, আসল জগবন্ধুকে গিয়ে দেখি চল।

প্রণাম সম্ভাষণাদির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ভুবনেশ্বর মঠের অধ্যক্ষ। তিনি ও স্বামী শর্বানন্দ আর স্বামী যতীশ্বরানন্দ একই মোটরে আসিয়াছেন। পরে আসিলেন স্বামী গঙ্গেশানন্দ, অপূর্বানন্দ, স্বামী সিদ্ধানন্দ, চিনু, মণীন্দ্র, তাম্বি ও বর্ধমানের ডাক্তার। স্বামী সিদ্ধানন্দ স্টেশনে গিয়া লইয়া আসিয়াছেন। লক্ষ্মণ ও গোপাল আসিয়া এইসঙ্গে মিলিত হইলেন।

শ্রীমহাপুরুষ ফটক দিয়া প্রবেশ করিলেন, পশ্চাতে সকলে। চৌকিদার শর্বানন্দজীকে কোমরের চামড়ার বেল্ট খুলিয়া যাইতে বলিল। মন্দিরের মধ্যে চামড়ার প্রবেশ নিষিদ্ধ। মন্দিরের ম্যানেজারের নিকট হইতে খাতিরদারী 'পাশ' সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন ক্ষেত্রবাসী সাধু ও ব্রহ্মচারীগণ। কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন — না, ভগবানকে সকলের

সঙ্গে দর্শন করতে হয় দীনভাবে।

নাটমন্দিরের দক্ষিণ দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া শয়নমন্দির পার হইয়া রত্নবেদীতে গর্ভগৃহে শ্রীমহাপুরুষ সদলে উপস্থিত। খুব ভীড়, ঘৃতের ক্ষীণোজ্জ্বল দীপের সহিত যেন অন্ধকারের সংগ্রাম চলিতেছে। মঠের পাণ্ডারা দীপ হাতে লইয়া অগ্রে যাইতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ ও সঙ্গীগণ পিছনে পিছনে চলিয়া রত্নবেদীতে অবস্থিত শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। গ্রীষ্মকাল, তাহার উপর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, দীপের ধূম ও অসংখ্য লোকের নিঃশ্বাসে মন্দিরাভ্যন্তর বেশ উষ্ণ হইয়াছে। শ্রীমহাপুরুষ এক কোণে একটু দাঁড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পরনে মুক্তকচ্ছ দুই ভাঁজ ধুতি, গায়ে মাদ্রাজী চাদর। ঘামে সব ভিজিয়া গিয়াছে।

এইবার শয়নমন্দিরের দরজা দিয়া বাহিরে আসিয়া বিমলাদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। বিমলাপীঠ একান্ন শক্তিপীঠের অন্যতম। শ্রীমহাপুরুষের ইচ্ছায় একটি চম্পক পুষ্পের মালা মায়ের গলায় পরাইয়া দিলেন। প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিয়া সোজা লক্ষ্মীমন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সকল মন্দিরেই যথেষ্ট প্রণামী দিয়া প্রণাম করিলেন। পাণ্ডাগণও নানাবিধ নির্মাল্য প্রদান করিলেন। শ্রীমহাপুরুষের মন অন্তর্মুখীন — তিনি নির্বাক দর্শন, প্রণাম ও পরিক্রমা করিতেছেন। লক্ষ্মীর নাটমন্দিরের কোণে ক্ষণকালের জন্য বসিলেন। এই মন্দিরে বসিয়া দর্শনকারী ভক্তগণ ক্ষণকাল ঈশ্বরচিন্তা করেন। তারপর আনন্দবাজারে প্রবেশ করেন। এইস্থানে মহাপ্রসাদ বিক্রয় হয়। স্পর্শদোষ নাই এখানে। উচ্ছিষ্ট দোষও নাই। এখন মহাপুরুষ আনন্দবাজারের ভিতর দিয়া ফটকের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীমহাপুরুষ কয়েকজনকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া মোটরে শ্রীহরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী উকিলের বাড়ি রওনা হইলেন। হরেন্দ্রবাবু শ্রীমহাপুরুষের মন্ত্রশিষ্য। তাঁহার বাড়ি শশী নিকেতনের পাশে সমুদ্রের পথে।

হরেনবাবুর বাড়ি। দক্ষিণের বারান্দার পূর্ব পার্শ্বে শ্রীমহাপুরুষ চেয়ারে বসা দক্ষিণাস্য — তামাক খাইতেছেন গড়গড়ায়। এখন সকাল সাড়ে আটটা। সাধু ও ভক্তগণ কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া আছেন। সাধুদের জলযোগ হইতেছে ভিতরে। শ্রীমহাপুরুষ ঠাকুরের পবিত্র স্মৃতিকথার অবতারণা করিলেন।

শ্রীমহাপুরুষ — (সকলের প্রতি) স্বামীজীকে ঠাকুর মহাপ্রসাদ খেতে বলতেন। নিজে রোজ একদানা 'আটকে' মহাপ্রসাদ খেতেন। স্বামীজী বলতেন, এতে কি হবে? বিশ্বাস করতেন না। তখন ঠাকুর বলতেন, আরে দ্রব্যগুণ তো আছে — বিষ খেলে তো তার ফল হবে — খা। মন যখন খারাপ হবে তখন খাবে একটু মহাপ্রসাদ। দ্রব্যগুণের কথায় স্বামীজীর বিশ্বাস হয়।

আমার বাবা, জগন্নাথের উপর ভক্তি ছিল না, অভক্তিও ছিল না। একবার এই সামনের বাড়িতে 'শশী নিকেতনে', মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বাস করতেন। আমি সকালে বেলুড় মঠ থেকে এসেছি ট্রেনে, তাঁর কাছে একটা কাজ ছিল, সই করাতে হবে একটা দলিলে। কাজ হয়ে গেছে। ভাবছি, সন্ধ্যের ট্রেনে ফিরবো। মহারাজ বললেন — তারকদা, একবার জগন্নাথদর্শন করে যাবেন না? এত দূর এলেন। আমি ঐ বাবা — বললাম, আমার ভক্তিও নাই, অভক্তিও নাই জগন্নাথে। তবে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যেখানে যাবে আমি যাব। তারপর মহারাজ সঙ্গে গেলেন। গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করতেই মহারাজের মন বিলীন হয়ে গেল। ভাবসমাধি হয়েছিল। আমার মনও খুব উঁচুতে উঠে গেল। বাইরের কোন জ্ঞান ছিল না — খুব ধ্যান হল। তখন থেকেই বুঝলাম, এখানে ভগবানের বিশেষ শক্তি রয়েছে — বিশেষ আবির্ভাব! তাই তো চৈতন্যদেব এখানে অতদিন ছিলেন।

২

শ্রীমহাপুরুষ এবার উঠিয়া গিয়া হলঘরে তক্তপোষের উপর বসিলেন। মাঝে মাঝে গড়গড়ার নলে মুখ সংলগ্ন করিয়া এক আধটা টান দিতেছেন। মন অন্তর্মুখ। কথা দিয়া অন্তরের ভাবের প্রকাশ হইতেছে।

শ্রীমহাপুরুষ (সাধু ও ভক্তদের প্রতি) — রাস্তায় আসতে আসতে দূর থেকে জগন্নাথের ধ্বজা দেখে চৈতন্যদেব একেবারে ভাবে বিহ্বল হয়ে যেতেন। ঠাকুরের, জগন্নাথের নাম করতেই বা শুনলেই, সমাধি হয়ে যেত। বলরামবাবুরা অনেকবার তা দেখেছেন। তাঁদের বাড়িতে জগন্নাথের নিত্যপূজা আছে। বলতেন, ওখানে (পুরী) গেলে আর এ

শরীর থাকবে না। ঠাকুর জগন্নাথধামে আসেন নাই তাই। গয়াতেও তাই।

একজন ভক্ত — 'রামকৃষ্ণ' নাম কি করে হলো?

শ্রীমহাপুরুষ — স্বামীজী surmise (অনুমান) করতেন, বোধহয় তোতাপুরী দিয়েছেন। বলতেন, সন্ন্যাসের তো একটা নাম হবে। বোধহয় এই নাম দিয়েছিলেন।

ভক্ত — শশীবাবু ঠাকুরের জীবনীতে অন্যরূপ লিখেছেন।

শ্রীমহাপুরুষ — শশীবাবু নিজের opinion (মত) লিখেছেন। তা খুব পারেন। কতজনে তো কত কথা লিখছেন। কথামৃত লিখেছেন মাস্টারমশায়। একেবারে ঠাকুরের মুখ থেকে শুনে। শরৎ মহারাজও লিখেছেন ঠাকুরের কাছ থেকে, 'প্লাস' (আর) মার মুখ থেকে শুনে। আর আমরা যা বলি, বিশেষতঃ আমি, সবই তাঁর মুখ থেকে শুনে।

এখন বেলা এগারটা। শ্রীমহাপুরুষ স্নান করিতে গেলেন।

অপরাহ্ন চারিটা। শ্রীমহাপুরুষ বিশ্রামান্তে হলঘরে আসিয়া বসিয়াছেন, উত্তরের দরজার পূর্ব পাশে দেয়ালের গায়ে দক্ষিণাস্য। তামাক খাইতেছেন, আশেপাশে অনেক সাধু ও ভক্ত আছেন। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। শরীর শীর্ণ, সত্তরের উপরে বয়স। পরনে ময়লা সাদাপেড়ে ধুতি। তিনি মহাপুরুষকে নমস্কার করিলেন না দেখিয়া সকলে অবাক। শ্রীমহাপুরুষ দেহ উন্নত ও চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আশ্চর্যবৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি?

বৃদ্ধা মহিলা বলিলেন, তুমি চিনতে পারছ না — তুমি তারক? (সকলের বিস্ময়)।

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ, তুমি কে? (পরিচয় বলিলে, সহাস্যে সকলের প্রতি) আমার জ্যেঠতুতো জ্যেষ্ঠা ভগিনী। (মহিলার প্রতি) আজ প্রায় যাট বছর পর তোমার সঙ্গে দেখা।

বৃদ্ধা — বরানগরে একবার দেখেছিলাম।

শ্রীমহাপুরুষ — তা হলে পঁয়ত্রিশ বছর পর।

বৃদ্ধা — কাশীতে একবার গিছলাম দেখা হয় নাই।

শ্রীমহাপুরুষ — শুনেছিলাম। কেষ্টলাল বলেছিল, তুমি এখানে রয়েছ। শরীরটা ভাল আছে তো?

বৃদ্ধা — মাথায় যন্ত্রণা হয়।

শ্রীমহাপুরুষ — তা একটু তিলের তেল দেবে। সরষের তেলে কিছু হবে না।

বৃদ্ধা আপনার জীর্ণ শীর্ণ বাহুদ্বয় দেখাইতেছেন। আর অনিমেষ নয়নে ছোট ভাইকে দর্শন করিতেছেন তাঁহার সমস্ত মন আর প্রাণ স্নেহসিক্ত করিয়া।

বৃদ্ধা — তুমি সেই ছোট্ট তারকটি ছিলে, আর এখন হয়েছ মহারাজ।

শ্রীমহারাজ — আমি তোমার কাছে এখনও তোমার সেই ছোট্ট ভাইটিই। যাদের মহারাজ, তাদের মহারাজ।

বৃদ্ধা — তোমার কপালে সেই দাগটি এখনও রয়েছে দেখছি। তাই দেখে চিনলাম। অন্য আত্মীয়দের কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় নি?

শ্রীমহাপুরুষ — না, আমি কোথাও যাই না। কে একবার নিমন্ত্রণ করেছিল। আমি বললাম, যদি ভগবানের কোনও একটা উৎসব হয়, কোনও পূজা কি নিদেন ভাগবত পাঠ, তবে যেতে পারি। তা নইলে নয়। এমনি নিমন্ত্রণ খাওয়া হবে না। অমুক (কনিষ্ঠা ভগিনী) আত্মীয়তা দেখিয়ে কাশী সেবাশ্রম থেকে দরিদ্রের সাহায্য নিতে এসেছিল। আমি বললুম, সমস্ত জগৎই আমার ভাইবোন, একা তুমি কি আমার বোন? সকল মানুষই আমার ভাইবোন, মা বাপ। সাধুর আবার কে কি? — 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। তা তাকে বললুম, ঠাকুরের ওখানে দশজন গরীবে পায়, তুমি চাও তো পেতে পার। ভাই বলে পরিচয় কেন? ভাই, বোন এসব যে মায়া!

হরেনবাবু — পিসিমার একটু শুচিবায়ু আছে (হরেন, বুড়িকে দেখাশোনা করেন)।

শ্রীমহাপুরুষ — (বৃদ্ধাকে) শুচি ভাল, শুচিবায়ু ভাল না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা বেশ।

বৃদ্ধা — তোমার সম্বন্ধে যা বলেছিল কালীঘাটের সাধু, তাই হলো। বলেছিল, 'হয় রাজা হবে, না হয়তো বের হয়ে চলে যাবে, নয়তো খুব লম্পট হবে'।

শ্রীমহাপুরুষ — (বৃদ্ধার মুখ থেকে কথা কাড়িয়া লইয়া) রাজাও

আবার হয়? আমায় যদি কেউ বলে রাজা হও, আমি জোড় হাতে বলি, না বাবা। আমার এটাই ঠিক — সাধু হওয়া, বের হয়ে যাওয়া। রাজা! রাম রাম!

হাঁ, সে সাধুর কিছু সিদ্ধাই ছিল, তান্ত্রিক। তাঁর ওখানে কলসী থেকে একটা গাছ বেরিয়েছিল — একতলা সমান। আমি দেখেছি।

অপরাহ্ন পাঁচটা। পুরীর প্রধান উকীল বিধুভূষণ ব্যানার্জী শ্রীমহাপুরুষকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে জামাতা, উকীল জিতেন্দ্রনাথ মুখার্জী, ভাগিনেয় ও কনিষ্ঠ পুত্র হিমাদ্রি (রবি)। পুরীবাসের সহায়করূপে একটি ভক্ত হিমাদ্রির গৃহশিক্ষক। স্বামী সিদ্ধানন্দ সকলকে পরিচয় করাইবার প্রসঙ্গে একটি ভক্তকে দেখাইয়া বলিলেন, ‘এঁর ছাত্র এ ছেলেটি (হিমাদ্রি)। শ্রীমহাপুরুষ ছেলেটিকে এক দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। ছেলেটির বয়স চৌদ্দ, গৌরবর্ণ, অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে।

এই শিক্ষক ভক্তটি কলিকাতা হইতে মার্চ মাসে আসিবার সময় মঠে শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ ও শ্রীম-র সহিত পরামর্শ করিয়া ও তাঁহাদের অনুমতি লইয়া এখানে আসিয়াছেন, এবং ঐ গৃহশিক্ষকতা লইয়াছেন। শ্রীমহাপুরুষ উৎসাহ দিয়া বলিয়াছিলেন, খুব ভাল, যাও — অমন তীর্থ! আর জাগ্রত ভগবান জগন্নাথ। যখন মন খারাপ হবে তখন গর্ভমন্দিরে গিয়ে জপ করবে। ওখানে একটা মহাশক্তির আবির্ভাব রয়েছে। যাও, ভগবানের খুব কৃপা অমন স্থানে বাস করা। মাঝে মাঝে চিঠি লিখো। শ্রীম বলিয়াছেন, এতে আবার জিজ্ঞাসা — শুভস্য শীঘ্রম্। মহাতীর্থে বাস, জগন্নাথ দর্শন, মহাপ্রসাদ সেবন, সমুদ্র দর্শন, আবার চৈতন্যদেবের পুণ্যস্মৃতি! ঠাকুরই তো চৈতন্য! মহাভাবে ছিলেন একটানা বার বছর। সেই সব ভাবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত রয়েছে। ঠাকুর নিজে বলেছেন, আমিই গৌরাঙ্গ, আমিই জগন্নাথ। তাইতো ওখানে যেতে পারতেন না। গেলে, গৌরলীলার কথা স্মরণ হয়ে মহাভাবে দেহত্যাগ হবে। আমারই তো যেতে ইচ্ছে হচ্ছে আপনার সঙ্গে। আর অমন সুবিধা হয়েছে — একটা থাকা খাওয়ার স্থান হয়েছে। যান, আমার জন্যও ঐরূপ একটা সুবিধা করে দিন। দেখবেন। টাকা দিয়ে দেওয়া গেল — আহার পাওয়া যাবে। রান্নার ল্যাঠা বড্ড বেশী। ঐতে দিন চলে যায়।

শ্রীমহাপুরুষ কিশোর বালকটিকে দেখিয়া প্রসন্ন হইয়াছেন। তাই তাহাকে কৃপা করিয়া দুই চারিটি কথা বলিতেছেন। কিন্তু লক্ষ্য তার পিতা। বলিলেন, খুব ভাল লোক পেয়েছ। লেখাপড়া বেশ জানে আর খুব পবিত্র। সৎ লোক পাওয়া, এমন সঙ্গ — পাওয়া যায় না, বহু ভাগ্যে পাওয়া যায়।

কথা সমাপ্ত হইতেই একটি তিন বছরের শিশু আসিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল। শ্রীমহাপুরুষ সহাস্যে বলিলেন, দেখে দেখে এসব হয়। বাপ-মা ঠাকুরঘরে নিত্য সকাল-সন্ধ্যায় বসলে তাদের দেখে ছেলেদেরও বসতে ইচ্ছা হয়। তাই বাড়িতে ঠাকুরঘর রাখা ভাল। ছেলেদের ঠাকুরের কাজ একটু একটু করানো আরও ভাল।

(বৃদ্ধা ভগিনীকে লক্ষ্য করিয়া বিধুবাবু প্রভৃতির প্রতি) — মহামায়ার প্রভাবে তো সবাই কাজ করছে। তবে এই দেখতে হবে, তাঁর উপর একটু ভক্তি আছে কিনা। ভক্তি থাকলে তার মার নেই — যেমন খুঁটি পেলে। এখন ঐ ধরে চারদিকে ঘোরা। ভক্তি না থাকলে কিছু হলো না।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। পুরীর রেলস্টেশন। শ্রীমহাপুরুষ ও পার্টি ভুবনেশ্বর যাইতেছেন কলিকাতা এক্সপ্রেসে। একটি ভক্ত ভুবনেশ্বর মঠে যাইবার অনুমতি চাহিলেন। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, হাঁ, চল। যাবে বই কি, চল চল। শ্রীমহাপুরুষ আরও কয়েকজন সাধুকে লইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে বসিয়াছেন। খুর্দা জংশনে গাড়ি থামিলে, ভক্ত ও রেলকর্মী রাজেন আসিয়া গাড়িতেই ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার স্ত্রী অসুস্থা, খুব কষ্ট, সংসার অচল। শ্রীমহাপুরুষ বেশ হাসিখুশির সহিত কথাবার্তা কহিতেছিলেন। ভক্তের দুঃখের কথা শুনিয়া যেন মায়ের মত সহানুভূতিতে দুঃখময় ভাব ধারণ করিলেন। কি মন ইঁহাদের। যেন ব্লটিং পেপার। সান্ত্বনা দিয়া মাত্র কয়েকটি কথা বলিলেন, সংসারের এই হাল, বাবা। ঠাকুরকে বল, তিনি দুঃখ দূর করবেন। নিজে অন্তর্মুখ হইয়া ঠাকুরকে যেন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

গাড়ী ভুবনেশ্বর থামিলে স্টেশনমাস্টার আসিয়া শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে নামাইয়া একটি নূতন কাঠের যষ্টি উপহার দিলেন। মঠ হইতেও সনৎ

মহারাজ ও ভবানী মহারাজ রিক্সা লইয়া আসিয়াছেন। শ্রীমহাপুরুষ 'শ্রীমহারাজের' ব্যবহৃত রিক্সাতে আরোহণ করিলেন। অপর সকলে পদব্রজে রওনা হইলেন। আধ মাইল রাস্তা, মঠে পৌঁছিতে রাত্রি নয়টা বাজিল।

ঠাকুরের ভোগের পর শয়ন হইয়াছে। সাধু ভক্তগণের প্রসাদ পাইতে বেশী রাত্রি হইয়া গেল। ঐ সঙ্গে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ সকলে গ্রহণ করিলেন। শ্রীমহাপুরুষ শয়ন করিয়াছেন হলের পূর্বধারের ঘরে।

পরদিন ৬ই মে ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ। বৃহস্পতিবার সকাল ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ নিজকক্ষে চেয়ারে বসিয়া আছেন তামাক খাইতেছেন। ঘরে লক্ষ্মণ আছে। আর একটি যুবক গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রণামের পর বলিলেন, আমি দীক্ষা নিতে এসেছি। শ্রীমহাপুরুষ প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। যুবক পুনরায় ঐ কথা আবৃত্তি করিলে তিনি বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন, সে কি? তুমি দীক্ষা নাও নাই — অতদিনের পুরোনো ভক্ত? (একটু পর) আচ্ছা হয়ে যাবে।

সাড়ে সাতটায় সাধু ভক্তগণ দল করিয়া গৌরীকুণ্ডে স্নান করিতে গেলেন — স্বামী সিদ্ধানন্দ, চীনু, মণীন্দ্র, জগবন্ধু, তাম্বি ও ডাক্তার। তারপর গেলেন লিঙ্গরাজ মন্দিরে। ইঁহারা মন্দিরে গিয়া দেখিলেন শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে। স্বামী শর্বানন্দ, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, স্বামী যতীশ্বরানন্দ ও স্বামী নির্বাণানন্দও সঙ্গে আসিয়াছেন। দর্শনের পর নাটমন্দিরের সংস্কার সকলে দর্শন করিতেছেন। বহু বৎসর পর সরকার মন্দির সংস্কার করিতেছেন। ভুবনেশ্বর মন্দির একাদশ শতকের কারুকার্যে অতুলনীয় ও ভারতবিখ্যাত। গুজরাট হইতে শ্রেষ্ঠ ভাস্কর আনিয়া ভগ্ন মূর্তিসমূহের সংস্কার করা হইতেছে। ইন্‌জিনিয়ার বুঝাইয়া দিতেছেন। যাত্রীদের নিকট হইতে এই সংস্কারকার্যের জন্য জনপ্রতি দুই পয়সা করিয়া লওয়া হইতেছে।

মহাপুরুষ এই মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছেন। পাণ্ডারা হাঁক দিতেছে, ইয়ারে আস, দর্শন কর। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, হাঁ-হাঁ। (সাধুদের প্রতি) দাও, একটা একটা পয়সা দিয়ে দাও ওদের, তা হলেই হলো।

মহাপুরুষ মন্দিরের বাহিরে আসিয়া রিক্সাতে উঠিলেন। রিক্সা

বিন্দুসরোবরের পূর্ব পাড় দিয়া মঠে আসিল।

৩

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

এখন সাড়ে নয়টা। দীক্ষার্থীগণ দোতলায় ঠাকুরঘরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। দশটার সময় শ্রীমহাপুরুষ উপরে আসিয়া ঠাকুরঘরে বসিলেন। প্রথমে একটি ভক্ত মহিলার দীক্ষা হইল। তারপর ডাক পড়িল একটি যুবকের। ভাস্বরেশ্বরানন্দ পূজারী। ইনি আসিয়া যুবককে ঠাকুরঘরে যাইতে বলিলেন। যুবক ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিতেই শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, ঠাকুরকে প্রণাম করে বসো। যুবক বসিলেন, দক্ষিণাস্য, শ্রীমহাপুরুষ বসিয়াছেন পূজারীর আসনে, উত্তরাস্য। গৃহে এক স্বচ্ছ প্রশান্ত গম্ভীর ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। অবতারের অন্তরঙ্গ পার্ষদের আন্তরিক আহ্বানে আজ বুঝি ঠাকুর আসিয়াছেন। সিদ্ধ আচার্য হইয়াও যেন দাসবৎ ঠাকুরের নাম বিতরণ কার্যে ব্রতী। অহংকারের লেশ নাই। অতি মৃদুভাবে যুবককে বলিলেন, তোমাকে কি বলবো — তোমরা সবই জান। মাস্টার মশায়ের এমন দুর্লভ সঙ্গ আর কৃপা পেয়েছ। তোমাদের বলবার আর কিছু নাই। তোমরা তো শরীর মন তাঁকেই সমর্পণ করেছ। তবে তুমি তাঁর নাম চাইছো তাই তোমাকে বলে দিচ্ছি।...এই তোমার ইষ্টমন্ত্র। আর সব যেমন করছো তাই করবে। তবে সকাল আর সন্ধ্যায় দুইবার বসতে হবে।

সংখ্যা জপের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, তোমার যা ইচ্ছা — দুই পাঁচ সাত মিনিট — যা ইচ্ছা, বসবে ও জপ করবে। সময় ক্রমে বাড়িয়ে দিতে পার!

এখন দশটা তের মিনিট দেখিয়া বলিলেন, আচ্ছা, বাইরে বারান্দায় বসে জপ কর। আর লক্ষ্মণকে ডেকে দিও।

পূর্বের মহিলা ও লক্ষ্মণকে দিয়া অনেক পূজা, অঞ্জলি, অর্ঘাদি দেওয়াইলেন। যুবককে কেবল ঐ নাম ও উপরের বাণীমাত্র বলিলেন। আহার করিতে সাড়ে বারটা বাজিয়া গেল — শ্রীমহাপুরুষের প্রসাদও গ্রহণ করা হইল।

অপরাহ্ণ চারিটার সময় ফটকের বাহিরে বনে বটতলায় বসিয়া ধ্যান করিতেছেন যুবক। সন্ধ্যায় সাধু ও ভক্তসঙ্গে ভ্রমণান্তর সকলে আরতি

দর্শন করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া জপধ্যান করিতেছেন। যুবক শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের সাড়া পাইয়া নিচে নামিয়া আসিলেন। এখন সন্ধ্যা সাতটা।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ হলঘরের সম্মুখে বারান্দায় ইজি-চেয়ারে উপবিষ্ট, দক্ষিণাস্য। একটি ভক্ত যুবক আসিয়াছেন, দীক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন। যুবকের বয়স ত্রিশ হইবে। বারান্দায় পশ্চিম প্রান্তে স্বামী শর্বানন্দ, বরদানন্দ প্রভৃতি অন্ধকারে মেঝেতে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন। বনের মধ্যে মঠটি — চারদিকে গভীর নীরবতা। এই নীরবতা ভেদ করিয়া মহাপুরুষের বাণী দৈববাণীর মত সকলের কর্ণে প্রবেশ করিল।

শ্রীমহাপুরুষ — (দীক্ষাপ্রার্থীর প্রতি) বাবা, গায়ত্রী জপ করতে পার না, আবার দীক্ষা নিয়ে কি হবে? দীক্ষা নিলে যে bound up (নিয়মবদ্ধ) হয়ে যাবে। গায়ত্রী দীক্ষা তো পেয়েছ। কিন্তু তা পালন করতে পারছ না। আবার দীক্ষা নিয়ে কাজ না করা, সে আরও খারাপ। করছি না — এমনি তা বরং ভাল। তবুও নিয়ে না করা আরও খারাপ, আরও খারাপ।

দীক্ষার্থী — নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে হয়ে ওঠে না।

শ্রীমহাপুরুষ — কই, তোমার শৌচাদি বন্ধ তো হয়না তা'তে? যত না করা তাঁর বেলায়। খাওয়াদাওয়া, শৌচ, নিদ্রা —এগুলি তো বন্ধ হয় না। শৌচ পেলে কি বন্ধ করে রাখতে পারে? তেমনি ঈশ্বরে ডাকা। শৌচাদি যেমন অপরিহার্য — তেমনি তাঁকে ডাকা।

আরে বাবা, যাঁর ব্রহ্মাণ্ডে বাস, যিনি সকলের পিতা মাতা ভ্রাতা স্বজন সুহৃদ — সমস্ত, তাঁকে একটু ডাকবে না মানুষ, তো কি করবে! আমি তুমি সব চলে যাবে। তিনি থাকবেন — তাঁকে ডাকবে না!

"গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥" (গীতা ৯:১৮)

চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচ মিনিট দিলে হয়। চব্বিশ ঘন্টায় এ সময় হয় না? তবে আর মানুষে আর পশুতে তফাৎ কি? আহার বিহার শয়ন ইত্যাদিতে উভয়েরই সমান।

"আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুর্ভিনরাণাং
ধর্ম হি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানা॥"

(আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনে মানুষ আর পশুতে ব্যবহার সমান। মানুষের বিশেষত্ব ধর্মাচরণ। ধর্মাচরণ ছাড়িয়া দিলে মানুষও পশুর সমান।)

তফাৎ ঐটুকুতে — মানুষ তাঁকে ডাকতে পারে, পশুরা তা পারে না। দেখেছ তো, তাঁকে না ডেকে মানুষ কিরূপ মোহে পড়ে? এদিক দিয়ে প্রাণ বেরুচ্ছে তবুও বলছে, আন কালি কলম। লিখছে, অমুক — অত কোম্পানীর কাগজ। অমুক — এত টাকা, ইত্যাদি। তাঁর মহামায়াতে আমরা সবাই রয়েছি। যার যা কাজ তা কর না — কাজ করবে না তো কি করবে? কিন্তু তাঁকে ভুলো না।

বাপ মরে যাচ্ছে ছেলেরা কাঁদছে। আবার খাচ্ছেও। ও-টি বন্ধ হতে পারে না। তেমনি তাঁকে ডাকা। তাঁ'তে ভালবাসা না হলে কিছুই কিছু নয়। তাঁকে ভালবাসাই জীবনের উদ্দেশ্য। দীক্ষা ফীক্কা কিছুই কিছু নয় ও-টি না হলে।

এ সংসারেরই নাম প্রবৃত্তি। নিবৃত্তিই তিনি। আর duty (কর্তব্য) হিসাবে যদি ধর, তা হলে তাঁকে ডাকা one of the chief duties (প্রধান কর্তব্যের মধ্যে একটি)।

দেখছো না, এসব কাজ না করে ব্রাহ্মণ কি হয়ে গেছে! কি দুর্ভাগ্য, বাড়িতে নারায়ণ আছেন — তাঁর পুজো করাচ্ছে মাইনে করা বামুন দ্বারা। আরে কি দুর্ভাগ্য! কোথায় নিজের করবার কথা — তা না, মাইনে-করা লোকদ্বারা করানো হচ্ছে। এতেই তো এইরকম দুর্দশা।

আর জীবের উপর, fellow beings-দের উপর একটু দয়া করা। অনেকে বলে টাকা নেই। আরে, শুধু টাকাতে কি দয়া হয়? তোমার মনে যদি থাকে দয়া, তা হলেই হলো। তোমার (টাকা) নেই, অন্যের কাছ থেকে চেয়ে যদি দাও — মশায়, এঁর বড় কষ্ট হচ্ছে বলে — তা হলেও হয়। তেমন হৃদয়ে তাঁর কৃপা শীঘ্র হয়। এই কথাগুলি রাত্রে গিয়ে বিবেচনা করে দেখ। এখনও অনেক সময় আছে।

শ্রীমহাপুরুষ একটু মৌন রহিলেন। আবার কথা কহিতেছেন। কিন্তু এবারের কথায় বিচার নাই — কেবল দয়া, কৃপা, করুণা। কণ্ঠস্বর বদলাইয়া গেল। অতি করুণামধুর স্বরে বলিলেন — আরে, দীক্ষা তাঁর (ঠাকুরের)

নাম, শুনিয়ে দেব না কেন, বাবা — ভগবানের নাম শুনিয়ে দেব না, কেন বাবা?

এই কথা শুনিয়া একজন ভাবিতেছেন, কি সুদৃঢ় বিশ্বাস এই মহাপুরুষের! বলছেন, ঠাকুরই ভগবান। প্রত্যক্ষ অনুভূতিপ্রসূত এই বিশ্বাস। ঠাকুরের কৃপায়ই কেবল আমাদের এই বিশ্বাস লাভ হতে পারে।

পরের দিন, ৭ই মে, শুক্রবার। আজ সকালে স্বামী সিদ্ধানন্দ, জগবন্ধু, ডাক্তার প্রভৃতি সকলে বিখ্যাত গুহা উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি দর্শন করিতে গেলেন। ভারতবিখ্যাত এইসব গুহা হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন সাধুদের তপস্যার স্থান। ফিরিতে দেরী হয় নাই, তবুও শোনা গেল, শ্রীমহাপুরুষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। হয়তো বা তাঁহার অনুমতি না নিয়া যাওয়ায় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

আজ শ্রীমহাপুরুষ মাদ্রাজ রওনা হইবেন। তাই আহারাদি শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া সকলে বিশ্রাম করিতেছেন। বেলা প্রায় দেড়টা। শ্রীমহাপুরুষ হলঘরে চেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। কাছে সেবক অপূর্বানন্দ, সিদ্ধানন্দ, মণীন্দ্র, তাম্বি প্রভৃতি। পুরীবাসী একটি যুবক শ্রীমহাপুরুষকে একটি টাকা দিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, তুমি টাকা দিচ্ছ, কোথায় পাবে? বিদেশে রয়েছ। যুবক সঙ্কুচিত হইয়া করজোড়ে উত্তর করিলেন, চলবে। শ্রীমহাপুরুষ আবার বলিলেন, কি করে চলবে বিদেশে? যুবক মৌন হইয়া রহিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা দেখিয়া টাকাটি গ্রহণ করিলেন। সেবককে বলিলেন, নাও রেখে দাও। যুবক অকিঞ্চন ব্রহ্মচারী।

ভুবনেশ্বর হইতে আড়াইটার গাড়ীতে শ্রীমহাপুরুষ ও পার্টি মাদ্রাজে রওনা হইলেন। পুরীর পার্টিও ঐ সঙ্গে উঠিলেন। খুর্দাতে গাড়ী ধরিবেন। শ্রীমহাপুরুষকে সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমে প্রণাম করিয়া পুরীর পার্টি ট্রেনে উঠিলেন।

ট্রেনে বসিয়া সাধু ও ব্রহ্মচারীগণ এই তিনদিনের আনন্দ উৎসবের কথা ভাবিতেছেন। কি আশ্চর্য পুরুষ ব্রহ্মদ্রষ্টাগণ, আবার ভগবানের পার্ষদ যাঁরা! শ্রীমহাপুরুষকে ঘিরিয়া যেন একটা অভয় ও আনন্দভাব বিরাজমান। কোন কথা না বলিলেও যে স্থানে উনি থাকেন সেই স্থান

সুখ শান্তি আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে। মঠ যেন আনন্দসাগরে ভাসিতেছিল। তাই শাস্ত্র বলেন, মহাপুরুষ সংসারে দুর্লভ। আমরা ভাগ্যবান নিশ্চয়! অবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান মহাপুরুষ মহারাজ প্রভৃতি সকলে স্নেহ করেন, আমাদিগকে ভালবাসেন — অকিঞ্চন জানিয়াও। ইহাই অহেতুক কৃপা।

পুরী ও ভুবনেশ্বর-প্রসঙ্গ পাঠ শেষ হইল। শ্রীম বলিলেন, এই আমাদের পুরী ও ভুবনেশ্বর দর্শন হয়ে গেল। এসব অমূল্য বিবরণ। শুনলে জোর করে মনকে ঈশ্বরে নিয়ে যায়। সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা-বৈ মানুষের উপায় নাই।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — আরও কিছু বিবরণ আছে কি পুরানো ডায়েরীতে?

অন্তেবাসী — আজ্ঞে, হাঁ। মঠের, মহাপুরুষ মহারাজের আরও কিছু কথা আছে।

শ্রীম — বেশ তা-ও শোনাও পড়ে। এসব অমৃত! যতই শোনা যায় ততই ভাল। যে শোনায়, আর যে শোনে, উভয়ের মঙ্গল হয় এতে। মন ঈশ্বরে নিয়ে যায়। মহাপুরুষগণ তাই বলেছেন শাস্ত্র অপরকে শোনাতে। উভয়ের কল্যাণ।

৪

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

২৪শে মার্চ, ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ, ১০ই চৈত্র, ১৩৩৩ সাল, বৃহস্পতিবার। বেলুড় মঠ। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের গৃহ। সময় সকাল সাতটা। মহাপুরুষ মহারাজ কি লিখিতেছিলেন। একটি যুবক গৃহে প্রবেশ করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। তিনি মহাপুরুষ মহারাজকে বলিলেন — মহারাজ, আপনি যখন কৃপা করে নাম ও গেরুয়া বস্ত্র দিবেন, ঐ সঙ্গে ব্রহ্মচর্য সংস্কারটা হলে বেশ হয়, মন শান্ত হয়। তিনি মুখ তুলিয়া বলিলেন — হাঁ, হবে। ডাক তো অনঙ্গকে (স্বামী ওঁকারানন্দকে)। (উনি আসিলে) দেখ, কাল এর ব্রহ্মচর্য হবে। সব যোগাড় কর। অনঙ্গ উত্তর করিলেন, আমায় নোয়াখালি যেতে হবে। শশধরকে (স্বামী মুকুন্দানন্দকে) বলে

যাব। পূজ্যপাদ শ্রীমও একদিন যুবকের নিকট ব্রহ্মচর্য সংস্কারের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন।

অপরাহ্ন ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ মঠের সম্মুখের লনে পায়চারি করিতেছেন। একটু পর লনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের বুরুজে গিয়া বসিলেন। নিম্নে গঙ্গা। একজন ব্রহ্মচারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীমহাপুরুষ ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, পোস্তাটা তেতেছে খুব। এই কথার অভিপ্রায় বুঝিয়া ব্রহ্মচারী দুইটি বালতি লইয়া আসিলেন। আর গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া পোস্তার উপর ঢালিতে লাগিলেন। স্বামী ওঁকারানন্দ দূর হইতে ইহা দেখিলেন। তিনিও আসিয়া জল তুলিতে লাগিলেন।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ উপস্থিত সাধুদিগকে বলিলেন — স্বামীজী বলেছিলেন, এখানে লেখাপড়ার খুব চর্চা থাকবে। যেমন শাস্ত্রজ্ঞান দরকার, তেমনি জগতের নানা বিদ্যার জ্ঞানও থাকবে। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান — এসবও জানা চাই। স্বামী ওঁকারানন্দ উত্তর করিলেন — হাঁ মহারাজ, এখান থেকে প্রচারক পাশ্চাত্যেও যাবে। ও সবেরই দরকার।

একটু পর শ্রীমহাপুরুষ উঠিয়া পূর্ব বারান্দায় বেঞ্চিতে গিয়া বসিলেন গদির উপর। গঙ্গা দর্শন করিতেছেন। সাধুরা কেহ কেহ আশেপাশে দাঁড়াইয়া আছেন। নানা কথা হইতেছে। স্বামী ওঁকারানন্দ কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, গোপাল (স্বামী গোপালানন্দ) ময়মনসিং-এ আছে, আশ্রমে। মঠে আসতে চায়। শ্রীমহাপুরুষ উত্তর করিলেন, ও বাইরে থাকতে পারে না। মঠের উপর খুব টান। বাবুরাম মহারাজের স্মৃতি রয়েছে কিনা এখানে। খুব ভক্ত লোক।

এখন সন্ধ্যা। ঠাকুরের আরতি হইয়া গিয়াছে। সাধুরা অনেকেই ঠাকুর-ঘরে ও অন্যত্র জপধ্যান করিতেছেন। স্বামী বিরজানন্দ একজন যুবককে ব্রহ্মচারী ব্রহ্মকে দিয়া ডাকাইয়া আনিলেন, দ্বিতলে তাঁহার ঘরে। ইনি যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, উনি (মহাপুরুষ) কি বলেছিলেন? ব্রহ্মচর্যের কথা উনি বলেন নাই। তুমি বলেছিলে? যুবক উত্তর করিলেন — না, গোড়ায় উনিই বলেছিলেন। আজ আমিও বলেছিলাম। স্বামী বিরজানন্দ সেক্রেটারী।

একটু পর স্বামী শুদ্ধানন্দ ও যুবককে লইয়া তাঁহার ঘরে (মহারাজের ঘরে) প্রবেশ করিলেন। কথাবার্তা হইতেছে। উনি যুবককে বলিলেন, আচ্ছা গেরুয়ার কি দরকার আছে? তুমি বরং মাদ্রাজে যাও। যদি দরকার হয় আমি তোমায় যাতায়াতের ভাড়া দিব। এসে নিয়ে যাবে।

ইহার পর স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী শুদ্ধানন্দ শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা কহিলেন, যাহাতে ঐ যুবকের ব্রহ্মচর্য সংস্কার না হয়। যুবক মঠে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করিয়াছেন ছয় মাস পূর্বে। তদবধি স্বামীজীর মন্দিরের সেবা করিতেছেন। বহুকাল হইতে মঠে যাতায়াত করেন যুবক, সকলের সুপরিচিত।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ স্বামীদ্বয়কে বলিলেন — না, হয়ে যাক্ ব্রহ্মচর্য। আম বহুদিন থেকে জানি। খুব ভাল ছেলে, আর পবিত্র। লেখাপড়া জানে, 'ল' পড়েছে। বহুদিন মাস্টার মশায়ের কাছে রয়েছে। স্বামীজীরা উত্তর করিলেন, তিন বছর থাকার পর ব্রহ্মচর্য হওয়ার নিয়ম আছে। ওটা ভঙ্গ হয়। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন — দেখ, নিয়ম কিছু নয়। মানুষকে দেখতে হয়। তিন বছর বলছো, তা আমি অনেক বছর থেকে তাকে জানি। খুব সৎ ও পবিত্র, আর বুদ্ধিমান ছেলে। নানা কথার আদান প্রদানেও শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের নিজের মত অপ্রতিহত রহিল। তিনি যুবককে আগামী কল্য গেরুয়া ও ব্রহ্মচর্য দিবেন।

রাত্রির আহার শেষ হইয়া গিয়াছে। সাধু ব্রহ্মচারীগণ নিজ নিজ থালা গঙ্গায় ধুইয়া আসিতেছেন। একটি যুবকও থালা ধুইয়া ফিরিতেছেন। তিনি গঙ্গা হইতে আসিয়া মঠের পূর্ব বারান্দায় উঠিয়াছেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী বিরজানন্দ বারান্দায় হেলান বঞ্চিতে বসিয়া আছেন। তাহারা যুবককে বলিলেন, তুমি থালাটা রেখে একবার এদিকে এসো। যুবক আসিলে, স্বামী শুদ্ধানন্দ যুবককে তাঁহার পাশে বেঞ্চিতে বসাইয়া বলিলেন — দেখ, তুমি educated, intelligent (শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান) ভক্ত লোক। এতদিন ধরে আসা-যাওয়া করছো। মঠের সব ব্যাপার তো জান। তোমরা যদি মঠের নিয়ম না মান তবে সব farce (তামাসা) হয়ে দাঁড়ায়। Institution-এর (সঙ্ঘের) rules-এর (নিয়মের) দিকেও দেখতে হয়। তুমি sacrifice (স্বার্থত্যাগ) কর। তোমাকে তো বলেছি, আমি

promise (প্রতিজ্ঞা) করছি, তোমার আসা-যাওয়ার খরচ দিব, যদি গেরুয়া নেওয়ার দরকার থাকে, মাদ্রাজে কাজ করতে হলে। sacrifice (নিজের স্বার্থ ত্যাগ) কর সঙ্ঘের জন্য। যুবক উত্তর করিলেন, আমার পক্ষে মহাপুরুষ মহারাজকে কিছু বলা বড়ই difficult question (কঠিন ব্যাপার)। আমি তো গোড়ায় চাই নাই কিছুই। উনিই কয়েক মাস ধরে বলছেন প্রত্যহ, 'Get ready for gerua' (গেরুয়া নেবার জন্য প্রস্তুত হও)। উনি যদি কৃপা করে নিজে যেচে কিছু দিতে চান আমার ধর্মজীবনের কল্যাণের জন্য, তা হলে আমার পক্ষে উহা প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। আপনারা তাঁকে বলে ক'য়ে তাঁর মত পরিবর্তন করাতে পারেন তা'তে আমার আপত্তি নাই।

মহাপুরুষ মহারাজের তিনমাস ধরিয়া যুবককে গেরুয়া নিবার জন্য প্রত্যহ বলার আর একটা কারণও আছে বলিয়া মনে হয়। উহা তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্মজীবনের উন্নতি। এই যুবক দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্রীম-র মুখে বহুবার শুনিয়া আসিতেছেন — গেরুয়া নিবার অধিকার হয় যখন কেহ চব্বিশ ঘন্টা ভগবানের চিন্তা করিতে সমর্থ হয়। যুবক বিচার করিয়া দেখিলেন, তিনি চব্বিশ ঘন্টা ঈশ্বরচিন্তা করিতে সমর্থ নহেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, সাধুজীবন যাপন করিব। যদি ঈশ্বরের কৃপায় এমন সময় আসে যখন চব্বিশ ঘণ্টা ঈশ্বরচিন্তা করিতে সমর্থ হই, তখন গেরুয়া নিব। তাহার পূর্বে সাদা কাপড়েই সাধু হইয়া থাকিব। যুবক সরলভাবে বিশ্বাস করিতেন, মঠের গেরুয়াধারী সকল সাধুই চব্বিশ ঘন্টা ঈশ্বরচিন্তা করিতে সমর্থ। এই জন্য মঠের সাধুদের উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তিশ্রদ্ধা জাগরূক ছিল। শ্রীম-র দৃষ্টিতে তিনি তাঁহাদিগকে দৈবী মানুষ মনে করিতেন।

শ্রীমহাপুরুষ ইদানীং নিত্য গেরুয়া নিবার কথা বলায় তাঁহার মনে এক সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীম মায়ের মত স্নেহে শিক্ষা দিয়াছেন — চব্বিশ ঘন্টা ঈশ্বরচিন্তা করিতে পারিলে গেরুয়া নিবার অধিকার। শ্রীমহাপুরুষ এখন গুরুরূপে বলিতেছেন, গেরুয়া নিবার জন্য প্রস্তুত হও। নিজের মনের ভিতর চাহিয়া দেখিলেন, চব্বিশ ঘন্টা ঈশ্বরচিন্তা করিতে তিনি অসমর্থ। এই দুইটি পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবের ঘাতপ্রতিঘাতে বিব্রত হইয়া যুবক একদিন মাতৃপ্রাণ শ্রীম-র নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা

বলিলেন। শ্রীম জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন, মহাপুরুষ তিনমাস ধরিয়া নিত্য গেরুয়া নিবার কথা বলিতেছেন। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বল মহাপুরুষ মহারাজকে, উনি যখন গেরুয়া নিতে বলেন? যুবক বলিলেন, কিছুই বলি না, চুপ করে থাকি। শ্রীম তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, মহাপুরুষ গেরুয়া দিতে চান, আর তুমি চুপ করে থাক। এতো বুদ্ধি তোমার! আমায় যদি এরূপভাবে গেরুয়া নিতে বলেন, তবে আমি ধেই ধেই করে নাচি গেরুয়া মাথায় নিয়ে। একি আর মহাপুরুষ দিচ্ছেন, ঠাকুর স্বয়ং দিচ্ছেন! ঠাকুরের link (সংযোগ-যন্ত্র) এঁরা।

অভিমান আহত হওয়ায় শ্রীম-র স্নেহতিরস্কারে, যুবক বলিলেন, মহাপুরুষ মহারাজের অযাচিত কৃপাপ্রকাশে চুপ করে ছিলাম সে তো আপনারই শিক্ষায়। আপনি বরাবর বলেছেন, চব্বিশ ঘন্টা ঈশ্বরচিন্তা করতে পারলে গেরুয়া নিবার অধিকার হয়। যুবকের সস্নেহ অভিমানের ফলস্বরূপ শ্রীম-র মুখে প্রস্ফুটিত হইল একটি সরল সরস দৈবী হাসি। বলিলেন — হাঁ, তখন বলেছি ঐ কথা — এখন বলছি এই কথা। গেরুয়া নেও। যাও, এক্ষুনি মঠে চলে যাও। মহাপুরুষ কাল সকালে যখন গেরুয়া নেবার কথা তুলবেন, তখন করজোড়ে বলবে — মহারাজ, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন।

রাত্রি অধিক বলিয়া যুবক মঠে গেলেন না। শ্রীম-র কাছেই রহিলেন মর্টন স্কুলে। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া মঠে গেলেন। আর শ্রীম-র শিক্ষা অনুসারে মহাপুরুষ মহারাজকে বলিলেন — যখন তিনি গেরুয়া নিবার প্রস্তাব করিলেন পরের দিন — মহারাজ, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন। মহাপুরুষ মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন — হাঁ বাবা, তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে। তোমায় গেরুয়া দেব।

দুইজন দিব্য মানবের, দুইজন গুরুর দুইটি আপাতঃবিরুদ্ধভাবে যখন যুবকের মন বিব্রত, তখন যুবক একজন সুপণ্ডিত বৈরাগ্যবান প্রাচীন সাধুর সঙ্গে সকল কথার আলোচনা করিলেন। সাধু বলিলেন, দুইজনেই একই কথা ভাবিয়াছেন। শ্রীম একটি উচ্চ আদর্শ সম্মুখে ধরিলেন যাহাতে ধর্মজীবন সুপ্রতিষ্ঠ হয়, যাহাতে ভগবানদর্শন জীবনের উদ্দেশ্য — এটা

সর্বদা মনের সম্মুখে জাগ্রত থাকে। আর মহাপুরুষও আপনার ধর্মজীবনের উন্নতির কথাই ভাবিয়াছেন। মধ্যপথেই জীবন আরম্ভ হয়। আপনার সন্ন্যাস না নেওয়ার সঙ্কল্প তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অধিকার ও অনধিকার — এই চিন্তা-প্রবাহের মধ্যস্থলেই ধর্মজীবন। দীর্ঘকাল একটি ভাব ধরিয়া থাকিলে উর্দ্ধগতি ব্যাহত হয়। তাই মহাপুরুষ এই কথা বুঝিয়া ধীরে ধীরে গেরুয়া না লইবার সঙ্কল্প ছিন্ন করিয়া দিলেন। তাই শ্রীমও এখন আনন্দে মত দিলেন গেরুয়া লইবার। দুইজনেরই একই ভাব — ভক্তের উপর অহেতুক কৃপা। শ্রীমহাপুরুষের কৃপায় আগামী কল্য যুবকের ব্রহ্মচর্য ও গেরুয়া ধারণ হইবে।

এখন রাত্রি দশটা। শ্রীমহাপুরুষ নিজের ঘরে বসিয়া আহার করিতেছেন। সেবক ক্ষিতীন্দ্র সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। দক্ষিণ দরজার পাশে দাঁড়াইয়া স্বামী শঙ্করানন্দ মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

একটি যুবক দরজার বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। প্রায় পনের মিনিট পর শ্রীমহাপুরুষের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল। তিনি আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, ready for gerua, ready for Madras! (গেরুয়া নেবার জন্য প্রস্তুত হও, মাদ্রাজ যাবার জন্য প্রস্তুত হও)। যুবক উত্তর করিলেন — আজ্ঞে হাঁ, সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সব হবে, কৃপা করে গেরুয়া দিবেন, নাম দিবেন, অথচ হোম সংস্কারটা হবে না বলে মনে কি রকম একটা খটকা লাগছে।

শ্রীমহাপুরুষ — দেখ, খটকা এনো না। আমাদের উপর ভার দিয়েছ, তোমার খটকা কি? তোমার খটকা কেন আবার? আমি সব করিয়ে দেব অন্যভাবে। আমি যাব নিজে তোমায় নিয়ে ঠাকুরঘরে! ঠাকুরের পাদপদ্মে মন্ত্র বলে এক একটি করে অর্ঘপ্রদান আমি নিজে করাবো। আমি সব করিয়ে দেব। ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে তোমাকে উৎসর্গ করে দেব।

যুবক — মনে হচ্ছে, দশজনের যেমন হয় সব হোম আদি করে, আমার তেমন হলো না, এই বলে খটকা।

শ্রীমহাপুরুষ — দেখ, form-টার (বাহ্য আকারটার) উপর লক্ষ্য রেখো না। Spirit-এর (অন্তরের ভাবটির) উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। (বুকে হাত দিয়া) এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে — spirit-এ (অন্তরের ভাবটিতে)।

Spirit (ভাব) না থাকলে শুধু form (বাহ্য আচরণে) কি হয়?

স্বামী শংকরানন্দ — তুমি কেন অত ভাবছো? তিনি যখন নিজে তোমার ভার নিলেন তখন তোমার কেন অত সব ভাবনা? ছেড়ে দাও ওঁর ওপর।

যুবক তবুও দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, রাত্রি এগারটা হয়ে গেছে। এখন যাও শোওগে। কাল সব হয়ে যাবে। ঠাকুরের শ্রীচরণে তোমায় উৎসর্গ করে দেব আমি নিজে। তাঁর চরণই সার। তিনিই জীবের ও জগতের অন্তরাত্মা। তিনিই পরমব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা। তিনিই অন্তর্যামী। তিনিই ইদানীং নরকলেবরে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। তিনি আমাদের তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়েছেন। সেই শ্রীচরণে কাল তোমায় সমর্পণ করে দেব। আনন্দ কর। যাও, এখন গিয়ে আনন্দে শুয়ে পড়। জয় প্রভু!

স্বামীজী যখন মঠের নিয়ম গঠন করেন তখন বলিয়াছিলেন, আমরা এইসব নিয়মের ঊর্ধ্বে উঠবো। Spirit-ই (ভাবই) আসল। এটাই সত্যিকার জিনিস। এরই জমাটবাঁধা মূর্তি ঠাকুর।

শ্রীম — আহা! কি কথা! দেবদৃশ্য! অমূল্য বিবরণ! সংসার যাচ্ছে ভোগপ্রবাহে। আর এঁরা যাচ্ছেন তার বিপরীত দিকে, ঈশ্বরের দিকে। এটি না থাকলে সংসার পশুশালায় পরিণত হতো। ঈশ্বর ও জগৎ, God and mammon, এই দুইটি বিপরীত দিকে চলছে। সাধুরা যাচ্ছেন ঈশ্বরের দিকে। অন্যরা অন্য দিকে, সংসারভোগে। আরও আছে?

অন্তেবাসী — আজ্ঞে হাঁ। এরই অপরাংশ।

শ্রীম — শোনাও। ভক্তরা শুনলে চৈতন্য হয়ে যাবে।

৫

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

২৫শে মার্চ ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ। ১১ই চৈত্র ১৩৩৪ সাল, শুক্রবার। বেলুড় মঠ। বসন্ত কাল। সকাল সাড়ে আটটা। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের কক্ষ। তিনি পালঙ্কের উপর বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। এক একবার ঠাকুরঘরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। সশ্রদ্ধ আনন্দময় ভাব। প্রসন্ন

মুখমণ্ডল। একটি যুবক আসিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। শ্রীমহাপুরুষ কুশল জিজ্ঞাসার পর তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন। যুবক ব্রহ্মচারী। মঠের কাজে তিনি আজ মাদ্রাজ যাইবেন।

শ্রীমহাপুরুষ — (ব্রহ্মচারীর প্রতি) আমি নিজে সব করিয়ে দেব, কি ভাবনা! তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে — কোনরকম নড়বে না। মাস্টার মশায়ের ওখানে ছিলে। দেখেছ তো — কেমন ঠাকুরগত প্রাণ তিনি! ঠাকুর ছাড়া কিছুই জানেন না। ঠাকুরের অনেকগুলি ভাব আছে ওখানে। ওখানে থেকে কতকগুলি ভাব পেয়েছ। তা আমি দেখতে পাচ্ছি। তাই স্থির ভাব আছে তোমার — নড়বে না।

পুরী থেকে যখন তুমি আমায় মাদ্রাজে লিখেছিলে, তখনই আমি রামুকে বলে রেখেছি তোমার কথা। (রামু ঠাকুরের প্রধান সেবক, কর্মী রামুস্বামী আয়ঙ্গার)। রামু এখন আর তেমন কর্ম করতে পারে না, বয়স হয়েছে। তার কাজটা তুমি দেখবে স্টুডেন্টস্ হোমে। আর তখনই (বেলুড় মঠে) ওদেরও লিখেছিলাম, ও মঠে আসবে! ওকে আমার মাদ্রাজের কাজের জন্য রেখে দিও।

দেখ, কত ভাগ্যে মাস্টার মশায়ের সঙ্গে এতদিন ছিলে! আরও কত তাঁর কৃপা যে এখানে আসতে পেয়েছো! আরও কত ভাগ্য, তাঁর কাজে লাগতে পেরেছ!

মাস্টারমশায় (শ্রীম) ব্রহ্মচারীকে মঙ্গলময় উচ্চ ভাবে আরোহণ করাইবার জন্য সুগভীর উপদেশ দিয়াছিলেন, অনেকদিন হইতে অনেকবার — গৈরিক, সন্ন্যাস গ্রহণ করা যায় যখন চব্বিশ ঘন্টা ঈশ্বরের চিন্তা করা যায়। ব্রহ্মচারী নিজের ভিতর এই উচ্চ ভাবের অভাব দেখিয়া সংকল্প করিয়াছেন, সাধুজীবনই যাপন করিবেন, কিন্তু শুভ্রবস্ত্রে। অথচ কিছুকাল ধরিয়া শ্রীমহাপুরুষ তাঁহাকে গৈরিকবস্ত্র ধারণ করিতে উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু, ব্রহ্মচারী শুভ্রবস্ত্রেই থাকিতে চান। এই সম্বন্ধে কথাবার্তা চলিতেছে।

শ্রীমহাপুরুষ (ব্রহ্মচারীর প্রতি) — তাহলে কিছুদিন সাদা কাপড়ে থাকবে? ওখানেও (মাদ্রাজ মঠেও) আছে গণেশচৈতন্য।

মহাপুরুষের গৈরিক দিবার অত আগ্রহের কথা জানিতে পারিয়া শ্রীম ব্রহ্মচারীর পরম কল্যাণসাধনের জন্য নূতন করিয়া উপদেশ দিয়াছেন,

শ্রীমহাপুরুষের হস্তে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দিতে, সম্পূর্ণ শরণাগত হইতে। ইহাতে পরম মঙ্গল হইবে। তাই ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন নিম্নরূপ।

ব্রহ্মচারী (শ্রীমহাপুরুষের প্রতি) — আজ্ঞে, আপনার যা খুশি তাই করুন। আমার আর কিছু বলবার নাই।

শ্রীমহাপুরুষ (প্রসন্নভাবে) — হাঁ, তাই ঠিক। শরণাগত, তাঁর পাদপদ্মে শরণাগত — complete resignation.

বাবা, বিবেকবৈরাগ্য কি বস্তু, তা কি আমরা জানতাম? তাঁকে (ঠাকুরকে) দেখে আমরা একটু বুঝেছি — জ্ঞান ভক্তি বিবেকবৈরাগ্য ভালবাসা প্রেম — এই সব কি বস্তু! তিনি না এলে কোথায় দেখতে পেতাম এসব!

বাইরে যাও না। দেখবে, এক পয়সার গেরুয়া কিনে কাপড় রং করে নিজেই নাম নিলে সহজানন্দ কি, এমনি একটা কিছু। আমরা criticise (সমালোচনা) করছি না। তবে চোখের সামনে যা দেখছি তাই বলছি। খাঁটি জিনিসটি, তাঁকে দেখেছিলাম বলে, একটু যা বোঝা গেছে! তোমার গেরুয়া পরা চাই-ই! কাপড়ে রং দিয়েছ?

ব্রহ্মচারী — আজ্ঞে না।

শ্রীমহাপুরুষ — আচ্ছা, হয়ে যাবে। এখান থেকেই দেওয়া যাবে।

এখন দশটা। ঠাকুরের নিত্যপূজা শেষ হইয়াছে। শ্রীমহাপুরুষ ঠাকুর-ভাঁড়ারি গঙ্গাধরকে বলিলেন, একটি পুষ্পপাত্রে সব সাজিয়ে— বিল্বপত্র, পুষ্প, দুর্বাদল, চন্দন, তণ্ডুলাদি ঠাকুরঘরে রেখে দাও।

শ্রীমহাপুরুষ শুদ্ধবস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিয়া ব্রহ্মচারীকে লইয়া দ্বিতলে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি নিজে ঘরের সকল দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন, আর পূজারীর আসনে বসিলেন উত্তরাস্য দক্ষিণের মধ্য দরজার পশ্চিম পার্শ্বে। তাঁহার সম্মুখে ঠাকুরের শ্রীপাদুকা কাষ্ঠের বাক্সে রহিয়াছে। আসন ও পাদুকার বাক্সের মধ্যস্থলে মেঝেতে পুষ্পপাত্র ও কোষাকুষি রহিয়াছে। এই সকলের পূর্বদিকে ডান হাতে মহাপুরুষ নিজহাতে একখানা আসন পাতিয়া দিলেন। এই আসনে ব্রহ্মচারীকে বসিতে বলিলেন পশ্চিমাস্য। মহাপুরুষের সম্মুখে ঠাকুরের পাদুকা, বামহস্তে বেদিকার উপর ঠাকুরের প্রতিকৃতি। বেদিকার ভিতর চাবিবদ্ধ ঠাকুরের পবিত্র অস্থিপূর্ণ

'আত্মরামের' কৌটা। বেদিকার দক্ষিণে স্বামী বিবেকানন্দের ও উত্তরে শ্রীমাঠাকরুনের প্রতিকৃতি ক্ষুদ্র কাষ্ঠচৌকির উপর স্থাপিত।

কুষির জল ব্রহ্মচারীর হাতে দিয়া বলিলেন, আচমন করে নাও। তারপর এক একটি অর্ঘ সাজাইয়া ব্রহ্মচারীর হাতে দিতেছেন। আর নিজে এক একটি ব্রহ্মচর্যের মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। ব্রহ্মচারীও সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করিতেছেন। বলিলেন, দাও এই অর্ঘটি ঠাকুরের পাদপদ্মে দাও। এইরূপে দ্বাদশটি মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া দ্বাদশটি অর্ঘ শ্রীপাদুকাতে উৎসর্গীকৃত হইল। প্রত্যেক অর্ঘ উৎসর্গের সঙ্গে সঙ্গে — 'ভবতু শুভায়, ভবতু শিবায়, ভবতু ক্ষেমায়' — এই প্রার্থনামন্ত্রটি চক্ষু নিমীলিত করিয়া শ্রীমহাপুরুষ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। এইবার পুষ্পাঞ্জলি ও বেদীমূলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

বলিলেন, এই তোমার ব্রহ্মচর্য হয়ে গেল। ইচ্ছা হয় হোম কর, না হয় না কর। আমার কাছে যা আছে তা এই তোমায় দিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে তোমায় নিবেদন করে দিলাম। দেহ মন বুদ্ধি আত্মা — সব তাঁর শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত হল। তোমার আর কিছু রইল না — সব তাঁর। এই তোমার ব্রহ্মচর্য, এই তোমার সন্ন্যাস — এই-ই সব।

শ্রীমহাপুরুষ আসন হইতে উঠিয়া পূর্ব দরজার কাছে গিয়া বলিলেন, মাদ্রাজে গিয়ে নিত্য ঠাকুরঘরে এইসব মন্ত্র পাঠ করবে, আর ঠাকুরকে (অঞ্জলিমুদ্রা দেখাইয়া) অঞ্জলি দেবে।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের মুখমণ্ডলে এক অপার্থিব আনন্দময় ভাবের প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। আর এক অপরূপ দিব্য ও পবিত্র আকর্ষণ মুখমণ্ডলে বিরাজিত।

গতকল্য শ্রীমহাপুরুষ এই ব্রহ্মচারীকে বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মচর্যের মন্ত্রগুলি ভাল করে পড়ে নাও। তাই মন্ত্রের আবৃত্তি আজ অতি সুমধুর হইয়াছে।

দক্ষিণের দরজা মহাপুরুষ খুলিয়া দিলেন। বারান্দায় শশধর (স্বামী মুকুন্দানন্দ) দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নাম হল? মহাপুরুষ সস্নেহে বলিলেন, শ্রীশচৈতন্য — ব্রহ্মচারী শ্রীশচৈতন্য।

ব্রহ্মচারী ধ্যানঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি কিছুকাল ধ্যান করিবার পর নিজ মনে ভাবিতেছেন, কি সৌভাগ্য আমার! আজ শ্রীভগবানের

অন্তরঙ্গ পার্ষদ সঙ্ঘপতি নিজহস্তে আমায় ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে উৎসর্গ করিলেন। এই তো প্রকৃত সন্ন্যাস! ঠাকুর, কৃপা করিয়া শক্তি দিও, যেন ইহার মর্যাদা রক্ষা করিতে পারি।

শ্রীমহাপুরুষের মধ্যাহ্নভোজন হইয়া গেল। ব্রহ্মচারী আসিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। তৎপর তাঁহার প্রসাদ লইয়া পঙ্গদে গিয়া ভোজন করিতে বসিলেন। পঙ্গদ ঠাকুরঘরের নিম্নতলে।

অপরাহ্ন চারিটা। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ দ্বিতলের ছোট ঘরে প্রবেশ করিয়া তক্তাপোষের উপর বসিয়াছেন দক্ষিণাস্য। সম্মুখে স্টুলের উপর গড়গড়া। তাহার লম্বা নলে এক একবার দুই একটা টান দিতেছেন। নিচে মেঝেতে কয়েকজন ভক্ত স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। মহাপুরুষের মন অন্তর্মুখ। মাঝে মাঝে দুই একটা কথা কহিতেছেন।

ব্রহ্মচারী শ্রীশচৈতন্য ও স্বামী নিষ্কামানন্দ (চিদাম্বরনাথ) দ্বিতলের গঙ্গার দিকের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইয়া আছেন ঘরের পূর্ব দরজার পাশে। তাঁহাদের উপর মহাপুরুষের দৃষ্টি পড়িতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কখন যাবে? তারপর হুঁকায় দুই একটা টান দিয়া মস্তক নত করিয়া কিছু ভাবিতেছেন। একটু পর মুখ তুলিয়া বলিলেন, গৈরিক কোথায়? ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন, আজ্ঞে আমার তো গৈরিক বস্ত্র নাই। সকালে আপনাকে এই কথা বললে আপনি বলেছিলেন, তা হবে এখন। এখান থেকে দেওয়া যাবে। বলেছিলাম? — শ্রীমহাপুরুষ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন, আজ্ঞে হাঁ।

'ক্ষিতীন্দ্র ক্ষিতীন্দ্র' বলিয়া শ্রীমহাপুরুষ তাঁহার সেবককে ডাকিতে লাগিলেন। সেবক আসিলে বলিলেন, দেখ তো আমার কাপড় আছে কিনা। সেবক উত্তর করিলেন, সব পরা-কাপড় আছে। পরা ছাড়া নাই? — বলিতে বলিতে সেবকসঙ্গে নিজের কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

খাটের নিচে ট্রাঙ্ক। মহাপুরুষ উপুড় হইয়া বসিয়া ট্রাঙ্ক খুলিয়া কাপড় দেখিতে লাগিলেন। পাশে সেবক। সাদা পাড়ের আধখানা অতি মিহি সুতার গৈরিক রং-করা কাপড় হাতে লইয়া ডাকিতে লাগিলেন — জগবন্ধু, ও জগবন্ধু। ব্রহ্মচারী নিকটে আসিলে বলিলেন, ন্যাও। এই বলিয়া গৈরিক বস্ত্রখানা তাঁহার হাতে দিলেন। বলিলেন, আর সব বস্ত্র

রং করে নিও। এইবার সেবক কৌপীন আনিয়া শ্রীমহাপুরুষেরই হাতে দিলেন। ইনি ‘জয় গুরু, জয় গুরু’ — এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কৌপীনখানি ব্রহ্মচারীর হাতে দিলেন। ব্রহ্মচারী টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন উত্তরাস্য। শ্রীমহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে দাক্ষিণাস্য হইয়া কৌপীন দিলেন।

শ্রীমহাপুরুষ শৌচাগারে প্রবেশ করিলেন। সেবক ক্ষিতীন্দ্র ও প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারীকে নূতন গৈরিক বস্ত্র পরিতে বলিলেন। পাশের ছোট ঘরের ভিতরে গিয়া ব্রহ্মচারী শ্রীশচৈতন্য শ্রীমহাপুরুষের প্রদত্ত নূতন গেরুয়া বস্ত্র ও কৌপীন পরিলেন। আর গায়ে দিলেন স্বামী নিষ্কামানন্দের উত্তরীয়।

শ্রীমহাপুরুষ গৃহে আসিলে ব্রহ্মচারী শ্রীশচৈতন্য গিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। টেবিলের সম্মুখে। তিনি চক্ষু ভিতরে টানিয়া উচ্চারণ করিলেন, ‘জয় গুরু, জয় গুরু’।

শ্রীমহাপুরুষ গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্বে ব্রহ্মচারী গৈরিক বস্ত্র পরিয়া টেবিলের পাশের জানালা ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। গদাধর আশ্রমের মহন্ত স্বামী কমলেশ্বরানন্দ তখন গৃহে প্রবেশ করিলেন। ব্রহ্মচারী বলিলেন, এই দেখুন, কেমন সাজাচ্ছেন। স্বামী কমলেশ্বরানন্দ বিস্ময়ানন্দে সহাস্যে উত্তর করিলেন — হাঁ, এই নূতন সন্ন্যাসী। বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে তো!

ব্রহ্মচারীর সাদা বস্ত্র ও চাদর সেবক প্রহ্লাদ লইয়া গেলেন উত্তরের ছাদে। তিনি গৈরিক রং দিতেছেন বস্ত্রে। এদিকে ব্রহ্মচারী দৌড়িয়া গিয়া প্রেমানন্দ মেমোরিয়াল হইতে জামা আনিয়া সেবক প্রহ্লাদের হাতে দিলেন। তিনি সব কাপড় রাঙ্গাইয়া ছাদে দড়িয়ে শুকাইতে দিলেন।

গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া ব্রহ্মচারী শ্রীশচৈতন্য ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুরের চরণতলে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ব্রহ্মচারী প্রার্থনা করিতে লাগিলেন - ঠাকুর আজ তোমার কৃপায় গৈরিক ধারণ করিবার সৌভাগ্য লাভ হইল। প্রভো, এর মর্যাদা যেন রক্ষা করিতে পারি, দায়িত্ব যেন পালন করিতে পারি। শক্তি দিও প্রভো!

মঠের দ্বিতলের আফিস ঘরে সাধুরা কেহ কেহ বসিয়া চা পান করিতেছেন — স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ, গঙ্গেশানন্দ প্রভৃতি। ব্রহ্মচারী ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার নূতন পোশাক দেখিয়া

সকলে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্বামী গঙ্গেশানন্দ সহাস্যে বলিলেন, এতক্ষণ বুঝি গৈরিক বস্ত্র লুকিয়ে রেখে দিছ্লে?

এখন মাদ্রাজে যাত্রা করিবার সময় ঘনীভূত হইতেছে। ব্রহ্মচারী সকল মন্দিরে প্রণাম করিতে বাহির হইলেন। চন্দনতলায় ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বক্সীর সঙ্গে দেখা হইল। তিনি পরিধানে গৈরিক দেখিয়া ব্রহ্মচারীকে আনন্দের আতিশয্যে হঠাৎ পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মচারী সঙ্কুচিত হইয়া পশ্চাতে অবগমন করিলেন। ডাক্তার আনন্দে বলিলেন, কখন গৈরিক ধারণ হলো? আহা, সিন্‌টা দেখতে পেলাম না!

সন্ধ্যার কিছু দেরী আছে। এখন সাড়ে ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ নিজকক্ষে চেয়ারে উপবিষ্ট দক্ষিণাস্য, টেবিলের সম্মুখে। জলযোগ করিতেছেন। সামনে একটি স্টুলের উপর একখানি রেকাবি। তাহাতে আছে দুইটি সন্দেশ, কিছু আঙ্গুর ও কমলালেবুর কোষ।

ব্রহ্মচারী বিদায় লইতে গৃহে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে স্বামী নিষ্কামানন্দ। তাঁহারা মাদ্রাজ মঠে যাইতেছেন সেবাকার্যে। এখন হাওড়া স্টেশনে যাইবেন। ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উভয়ে বলিলেন, এবার রওনা হব। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন — wait, wait (দাঁড়াও, দাঁড়াও)। তারপর নিজের হাতে রেকাবি হইতে কিছু ফল তুলিয়া উভয়ের হাতে দিলেন। তাঁহারা গমনোদ্যত। আবার বলিলেন, wait, wait (দাঁড়াও, দাঁড়াও)। আবার কিছু ফল দিলেন, সঙ্গে সন্দেশ।

এইবার আশীর্বাদ অভয় ও ভরসা প্রদান করিতেছেন। বলিলেন প্রশান্ত গম্ভীরভাবে — Yes, Guru Maharaj is always with you. He is with you, his bhaktas. He is with you, believe it! ঠাকুর সর্বদা তোমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি সর্বদা তাঁর ভক্তদের সঙ্গে থাকেন। তিনি তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন। বিশ্বাস কর। শেষের কথাগুলি এত অবিচলিত বিশ্বাস ও আন্তরিকতার সহিত বলিলেন যে, বিদায়প্রার্থী সেবকদের হৃদয়ে তাহা দ্রুত প্রবেশ করিয়া সুদৃঢ় ও গভীর রেখাপাত করিল।

মঠের প্রাচীন ম্যানেজার ও প্রবীণ মহাত্মা কেষ্টলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ব্রহ্মচারী শ্রীশচৈতন্য করজোড়ে শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে নিবেদন করিলেন, মহারাজ, আমার নিজের বিদ্যাবুদ্ধির উপর বিশ্বাস নাই। বিশ্বাস আছে আপনার কথার উপর — আর আছে নির্ভরতা। শ্রীমহাপুরুষ সুদৃঢ় কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিলেন অভয় দিয়া, শ্রীগুরু মহারাজ সর্বদা সঙ্গে আছেন — বিশ্বাস কর।

বলিলেন, খাবার নিয়েছ সঙ্গে? ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন, আজ্ঞে না। স্বামী ধীরানন্দ বলিলেন, মহারাজ এ মুখচোরা। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, এত মুখচোরা হলে কি হয়, বাবা। এত মুখচোরা হলে জগতে, সংসারে চলে না।

ব্রহ্মচারী সাধুমণ্ডলীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া চলিলেন হাওড়া স্টেশনে, সঙ্গে নিষ্কামানন্দ। ভাণ্ডারের সম্মুখে রোয়াকে দাঁড়াইয়া আছেন স্বামী রামানন্দ অতি কষ্টে। তাঁহার লাম্বেগো ব্যাথা আছে। সোজা হইয়া তিনি দাঁড়াইতে পারেন না। তাই বাঁকিয়া গিয়াছেন। হাতে একটি মুখবন্ধ মাটির হাড়ি রজ্জুবদ্ধ। ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, এই নিন্ এটা। এতে রাত্রের আহার আছে — রুটি আর বেগুনভাজা। উনি কাহারও মুখে শুনিয়াছিলেন, মহাপুরুষ মহারাজের ঘরের কথা — ব্রহ্মচারী রাত্রের আহারের কোন ব্যবস্থা করেন নাই। তাই তিনি খাবার তৈরী করাইয়া রাখিয়াছেন। কি মহান হৃদয়। এ কেবল খাবারের ভাণ্ড নয় — প্রেমের ভাণ্ড। জয় ঠাকুর!

মঠের অঙ্গনে একটি ক্যাম্পখাট পাতা। তাহার উপর বসিয়া আছেন স্বামী গঙ্গেশানন্দ ও স্বামী নির্বাণানন্দ। স্বামী গঙ্গেশানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গী স্বামী নিষ্কামানন্দকে বলিলেন, he is your mate now (ইনি আজ থেকে তোমার সহকর্মী) — ঠাকুরের সেবক।

পাশে দাঁড়াইয়া আছেন নলিনী ও বিজয়। স্বামী গঙ্গেশানন্দ তাঁহাদিগকে বলিলেন, যা না, তোরা এদের স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আয়। ইঁহারাও চলিলেন সঙ্গে, হাওড়া। যাত্রীগণ পুরী এক্সপ্রেসে যাইতেছেন প্রথমে ভুবনেশ্বর। সেখান হইতে যাইবেন ওয়ালটেয়ার হইয়া মাদ্রাজে।

হাওড়া স্টেশনে বেলুড় মঠের সাধুদের ভিড় লাগিয়াছে। একদল যাইতেছেন হরিদ্বারে কুম্ভে, স্বামী প্রবোধানন্দের নেতৃত্বে। রাত্রি সাড়ে আটটায় পুরী এক্সপ্রেস ছাড়িল।

ব্রহ্মচারীর মনে প্রবল ঝড় চলিতেছে — গৈরিকের প্রতিক্রিয়া। তিনি ভাবিতেছেন, কি গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম! পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীম-র কৃপায় আমার এই ধর্মজীবন। তিনি সর্বদা বলিতেন, চব্বিশ ঘন্টা ভগবানের চিন্তা করিতে পারিলে গৈরিক ধারণের অধিকার জন্মে। কি করিয়া উহা সম্ভব আমার দ্বারা? শ্রীম-র শুভেচ্ছায় ও শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের কৃপায় গেরুয়া গ্রহণ হইল বটে, কিন্তু সর্বদা, চব্বিশ ঘন্টা কি করিয়া ঈশ্বরচিন্তা সম্ভব হইবে? প্রাণপাত চেষ্টা করিয়া দেখিব। কিন্তু ভরসা একমাত্র ঠাকুর। চেষ্টা করিব সর্বকার্যে ঠাকুরকে স্মরণ রাখিতে। 'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ' — ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণরূপের এই মহাবাণী স্মরণ করিয়া ব্রহ্মচারীর হৃদয়ে সাহস ও ভরসা আসিল।

ব্রহ্মচারী গাড়িতে বসিয়া আরও ভাবিতেছেন, আজই পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীমহাপুরুষ ঠাকুরঘরে বলিয়াছিলেন, তোমার দেহ মন আত্মা — সব ঠাকুরের শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া দিলাম। তোমার আর কিছুই রহিল না। সব তাঁহার। চিন্তাও তাঁহার, কাজও তাঁহার। শরীর মন আত্মাও তাঁহার। এইভাবে শরণাগতিই একমাত্র পথ দেখিতেছি। এই সিদ্ধান্তে ব্রহ্মচারী শান্ত হইলেন। রাত্রির গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া গাড়ী ছুটিয়া চলিল ভগবান জগন্নাথের পুরী। জয় গুরু। জয় গুরু।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ক্রাইস্ট পিটারকে বলেছিলেন, আমার সঙ্গে চলে এসো। তিনি জাল মেরামত করছিলেন — মৎস্যজীবী ছিলেন কিনা! বলেছিলেন, মাছধরা ছেড়ে দাও। মানুষ-মাছ ধরাবো তোমাকে দিয়ে। অর্থাৎ জগদ্‌গুরু তৈরী করাবেন। 'সংসার জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড' কিনা, ঠাকুর বলেছিলেন। লোকদের সন্তপ্ত চিত্তে ভগবানের কথামৃত শুনিয়ে শান্তি সুখের পথ দেখাবেন।

এই যে মহাপুরুষ গেরুয়া দিলেন, এর অর্থও তাই। গেরুয়া মানে, সন্ন্যাস। সন্ন্যাস মানে, ঈশ্বরের খাস লোক — আপনার জন। এঁদেরই বলে জ্ঞানী। আর গীতার কথায়, ভগবানের আপনার জন। অনন্ত জন্মের পর মানুষের ঈশ্বরলাভের বাসনা হয়। এখন অবতার এসেছেন, তাই এসব লোক দেখা যাচ্ছে যাঁরা সব ছেড়ে তাঁকে ধরেছেন। এঁদের দেখে অপরেও এ পথে যেতে চেষ্টা করবে। যাদের তিনি গৃহে রাখবেন তারা এঁদের সঙ্গে

মিশে সংসারে আবদ্ধ হবে না। ঠাকুর আসায় এসব কথা শোনা যাচ্ছে, এসব দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। এ-ও জীবন্ত নাটক।

ডায়েরী পাঠ শেষ হইল। এখন ভক্তগণ শ্রীম-র কথামৃত শ্রবণ করিতে একত্রিত হইতেছেন।

আজ শনিবার, তাই অনেক ভক্তসমাগম। অনেক ভক্ত সপ্তাহে একদিন শ্রীমকে দর্শনের সুযোগ পান। ভাটপাড়ার প্রাচীন ভক্ত ললিত রায়, ভোলানাথ মুখার্জী প্রভৃতি আসিয়াছেন। নিত্যকার ভক্তগণও কেহ কেহ আছেন — পূর্ণেন্দু, বলাই প্রভৃতি। এখন অপরাহ্ন ছয়টা। স্বামী রাঘবানন্দও আসিয়া বসিলেন। ইনি শ্রীম-র কাছে থাকেন এখন, আমেরিকা হইতে ফিরিবার পর। ডাক্তার, মতি মহারাজও আসিয়াছেন।

শ্রীম নিজের হাতে সাধুকে ক্ষীরের মিষ্টি দিলেন। মিষ্টিটা ছাঁচে তৈরী একটি মন্দির। বলিলেন, আপনি বাবা বৈদ্যনাথের কাছে যাচ্ছেন। তাই মন্দিরটি আপনাকে উৎসর্গ করা গেল (হাস্য)। বেশ স্থান বৈদ্যনাথ! শিবের স্থান, যোগভূমি। খুব নির্জন পাহাড় আর বিস্তীর্ণ মাঠ। ঠাকুর গিছলেন। দেখবেন তো, ঐ স্থানটা উদ্ধার করতে পারেন কিনা যেখানে ছিলেন।

শ্রীম আর একটি মিষ্টি হাতে করিয়া আনিয়া বলিতেছেন, এটি স্ত্রীমূর্তি, ভাঙ্গতে হবে।

শ্রীম মুখ ধুইতে নিচে গেলেন। সাধু ও ভক্তরা নানাকথা কহিতেছেন। অনেক ভক্তও চলিয়া গেলেন। শ্রীম আসিয়া তুলসীতলায় সন্ধ্যা করিতে বসিলেন। বিনয় মহারাজ আসিলেন রাত্রি প্রায় আটটায়। তাঁহাকে দেখিয়াই শ্রীম বলিলেন, তোমার জন্য eagerly wait (উৎসুক হইয়া অপেক্ষা) করছেন ইনি।

বিনয় মহারাজকে মিষ্টি নিজ হাতে খাইতে দিলেন। মাঝে মাঝে ভক্তদের সঙ্গে এ-কথা সে-কথা হইতেছে। জগবন্ধু উঠিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। শ্রীম বলিলেন — ও, আপনি আসছেন, আহা! মাঝে মাঝে good news (সুসংবাদ) লিখবেন।

বেলুড় মঠ, কলিকাতা।
১৫ই মার্চ, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার।

দশম অধ্যায়

শিবচিত্র

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। আজ ৯ই জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার। শ্রীম বসিয়া আছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। বেলুড় মঠ হইতে একজন সাধু আসিয়াছেন। তিনি একটার স্টীমারে কলিকাতা আসেন, ডাক্তার শ্যামাপদ মুখার্জীর বাড়িতে। তারপর জয়গোপাল সেনের বাড়িতে সুখেন্দুর সঙ্গে দেখা করিয়া অদ্বৈতাশ্রমে রাত্রিতে থাকিবেন এই সংবাদ দিয়া শ্রীম-র কাছে আসিয়াছেন।

সাধু প্রণাম করিলে তাঁহাকে বেঞ্চিতে বসিতে বলিলেন আর অতি আনন্দের সহিত মঠের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, কই আপনার ডায়েরী?

সাধু ডায়েরী শুনাইতেছেন।

আজ ১৬ই মার্চ, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার। মহাপুরুষের ঘর। সকাল সাতটা। অন্তেবাসী আসিয়া প্রণাম করিলেন।

মহাপুরুষ (করুণামাখা স্বরে) — জগবন্ধু, ভাল আছ?

অন্তেবাস — আজ্ঞে হাঁ। আজ যাব।

মহাপুরুষ — দেওঘর? যাও। জায়গা ভাল। গরম খুব। তা ওরাও (সাধুরা) রয়েছে।

অন্তেবাসী (অতি বিনীত স্বরে) — ঠাকুরকে একটু বলবেন যাতে তাঁর উপর ভক্তি বিশ্বাস হয়।

মহাপুরুষ — তা তুমি বলবে তোমার কথা। তুমি বললে কি তিনি শুনবেন না? তোমার কথা তুমি বলবে। তবে আমি বলছি, তোমার ভক্তি বিশ্বাস হোক। আমি তাই বলছি — তোমার ভক্তি বিশ্বাস হোক। খেয়ে যাবে তো? — কি খাবে?

অন্তেবাসী — ভাতে ভাত!

মহাপুরুষ — তা আর কি, খেয়ে যেও।

এখন পৌনে দশটা। এবার অন্তেবাসী দেওঘর রওনা হইবেন। শ্রীমহাপুরুষকে প্রণাম করিতে আসিলেন। মহাপুরুষ ঘরে দরজার সামনে ইজি-চেয়ারে উপবিষ্ট। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে বলিলেন, যাবে — এসো।

সেবক মতি হাতে একটি জপের মালা দিলেন শুদ্ধির জন্য। মহাপুরুষ বলিলেন, কি জপ করে দিতে হবে? (চোখ ও মুখের ইঙ্গিতে অন্তেবাসীর প্রতি) আচ্ছা, এসো।

অন্তেবাসী খোকা মহারাজের ঘরে গেলেন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইতে। মতিকে পাঠাইয়া দিয়াছেন এই বলিয়া, 'বলে এস চিঠি লিখতে'।

অন্তেবাসী পুনরায় আসিলেন। তাঁহার মন যাইতে চাহে না মহাপুরুষকে আর মঠকে ছাড়িয়া। মহাপুরুষ বলিলেন, মাঝে মাঝে চিঠি লিখো। কেমন থাক, জানিও। আর ওখানে কাজও তত বেশী নাই।

অন্তেবাসী নীরবে মহাপুরুষের দিকে চাহিয়া আছেন — অন্তর চাহিতেছে না ছাড়িয়া যাইতে।

মহাপুরুষ (ধমক দিয়া) — কি বলেছি?

অন্তেবাসী (সবিনয়ে) — জানি না।

মহাপুরুষ — শরীর বুঝে কাজ নেবে। (বৃদ্ধা ও তর্জনী অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দিয়া দেখাইয়া) এইটুকু। (আবার ধমক, উত্তেজিতভাবে) এইটুকু। ওরা মানুষকে মেরে ফেলে।

অন্তেবাসী অতিরিক্ত কর্ম করিয়া মাদ্রাজে শরীর ভাঙ্গিয়া আসিয়াছেন। তাই তিনি মায়ের মত সাবধান করিতেছেন নিজে সঙ্ঘপতি হইয়াও।

অন্তেবাসী অফিস ঘর হইতে বাহির হইতেছেন সাধুদের প্রণাম করিয়া, মহাপুরুষ নিজের ঘর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসে যাবে? অন্তেবাসী বলিলেন, বাসে।

নিচে আসিলে স্বামী শাশ্বতানন্দ অন্তেবাসীকে একটি মোটর গাড়ীতে বসাইয়া দিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ, শশধর মহারাজ ও বৈরাগ্যানন্দ হাওড়া যাইবেন, তাঁহাদের গাড়ীতে। অন্তেবাসীর অন্তর কাঁদিতেছে, চক্ষু ছলছল।

স্বামী বোধাত্মানন্দ হাওড়ায় মিলিত হইলেন। ট্রেনেও একা কাঁদিতেছেন আর ভাবিতেছেন, — ঠাকুর আবার আমাকে ছাত্র পড়াইতে লইয়া যাইতেছেন। মন চায় থাকিতে ভূস্বর্গে, মঠে।

শ্রীম স্থির, দৃষ্টি আকাশে নিবদ্ধ। বলিলেন, সত্য, সত্যই এ কথা! সদ্য অবতার সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ ঠাকুরের সর্বত্যাগী পার্ষদদের হাট এই মঠ। এমন ভূস্বর্গ আর পাবে কোথায়?

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। আজ ৩রা জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার। দোতলার বারান্দা। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ পায়চারী করিতেছেন। এখন সকাল আটটা। গ্রীষ্মকাল। দেওঘর বিদ্যাপীঠের এখন গ্রীষ্মের ছুটি। দুইজন সন্ন্যাসী এইমাত্র বিদ্যাপীঠ হইতে আসিয়াছেন। ছুটিটা মঠে কাটাইবেন — স্বামী অজয়ানন্দ ও অপর একজন।

তাঁহারা মহাপুরুষকে প্রণাম করিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন একজন সাধুকে, তুমি এখন কোত্থেকে এলে? দেওঘর হইতে আসিয়াছেন জানিয়া স্বামী অজয়ানন্দকে সেখানকার স্কুলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। সস্নেহে সঙ্গী সাধুকে বলিলেন, জগবন্ধু ভাল আছ?

আজ ৫ই জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। সন্ধ্যার একটু পূর্বে শ্রীমহাপুরুষ আসিয়া গঙ্গার ধারের বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন ছোট ঘরের পাশে — সামনে গঙ্গা। স্বামী বামদেবানন্দ পাশে দাঁড়াইয়া পাখা দিয়া হাওয়া করিতেছেন মশা যাহাতে পায়ে না বসিতে পারে। শ্রীমহাপুরুষের চক্ষু স্থির, শরীর ক্লান্ত। কিন্তু মন সতেজ ও সরস — অন্তরে নিবিষ্ট। নিচে মেঝেতে ভক্তরা কেহ বসিয়া আছেন।

আরতির ঘন্টা পড়িতেই সকলে চলিয়া গেলেন ঠাকুরঘরে। একটু পর চেতলার দুইজন ভক্ত আসিয়া প্রণাম করিলেন ও এ-কথা সে-কথা বলিতে লাগিলেন। একটি সাধু আজ সকালে প্রণাম করিতে পারেন নাই। তিনি গতকাল কলিকাতায় শ্রীমাস্টার মহাশয়ের কাছে ছিলেন। তাই তিনি প্রণাম করিবার মানসে প্যাসেজে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

শ্রীমহাপুরুষ এইবার উঠিয়া নিজের ঘরে যাইতেছেন। সাধুটি স্বামীজীর ঘরের পাপোশের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীমহাপুরুষ সামনে আসিলে

প্রণাম করিলেন। তিনি সহাস্যে বলিলেন, এই তোমার পুরানো ঘর। সাধু বিস্ময়ে ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য, এত অসুখেও সব কথা স্মরণ আছে! স্থিতপ্রজ্ঞের এই লক্ষণ। সাধু স্বামীজীর ঘরের সেবক ছিলেন।

শ্রীমহাপুরুষ নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, কই কোথায় গেলে? পেচ্ছাব করতে হবে। স্বামী বামদেবানন্দ আসিয়া 'পিস পট' স্টুলের উপর রাখিলেন। নিচে বসিতে পারেন না, তাই দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিতেছেন — যেন শিশু, কোনও লজ্জা-সঙ্কোচ নাই। পরিহিত বস্ত্র একেবারে উপরে তুলিয়াছেন — যেমন শিশু করে। পরমহংস অবস্থা! ঠিক যেন বালক!

শ্রীম — ব্রহ্মদর্শন করে পরমহংস হয়েছেন কি না মহাপুরুষ! তাই এই বালকবৎ ব্যবহার। ঠাকুরের এই অবস্থা সর্বদা হত। কারও মনে কখনও বিন্দুমাত্রও সংশয় হতো না যে, তিনি পাঁচ বছরের শিশু নন। স্ত্রী-পুরুষ কারো মনে না। এই যে মহাপুরুষের কথা যা আপনি লিখেছেন, এ ঠিক পরমহংসের অবস্থা। বই পড়ে মানুষ এ কি বুঝিবে? তাই যারা এসব দেখে, ধন্য। সত্যধর্ম মানেই দর্শন। অবতার এলে এই সব দর্শন সর্বদা হয়। ধন্য যারা এসব দর্শন করে।

২

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

আজ গঙ্গা দশহরা, ৬ই জুন, শুক্রবার। আজ গঙ্গাপূজা ও স্নান করিলে কায়িক বাচিক ও মানসিক দশ প্রকার পাপ নাশ হয় বলিয়া শাস্ত্রবচন রহিয়াছে। তাই সমগ্র গঙ্গা অবতরণপথে পূজিতা হন।

শ্রীমহাপুরুষ দ্বিতলের স্বীয় কক্ষে চেয়ারে উপবিষ্ট, দক্ষিণাস্য। তাঁহার ডান হাতে দেয়ালের গায়ে টেবিল। তাহাতে পুস্তক, চিঠিপত্রাদি রহিয়াছে। শরীর রুগ্ন ও শীর্ণ। মাংস ও চর্বি শুষ্ক, আর গায়ের চর্ম ঝুলিয়া পড়িয়াছে। পৃষ্ঠদেশ বক্র, সোজা হইয়া বসিতে কষ্ট হয়। মাথার শিরা রোগযন্ত্রণায় ভাসমান। কিন্তু চক্ষুর দৃষ্টি সুস্থির। নয়নযুগল বৃহৎ, আর সম্মুখপ্রসারী ও ভাসমান। কি আশ্চর্য! চোখ দেখিয়া মনে হয়, ভিতরে যেন আর একটা আনন্দসাগর প্রবাহিত।

একজন সাধু ভাবিতেছেন, সাধারণ মানুষে আর এই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষে আকাশ পাতাল প্রভেদ বলিলেও বলা সম্পূর্ণ হয় না। অত দেহকষ্ট, কি করিয়া অন্তরের মনটি অমন নির্মল, স্বচ্ছ আনন্দময়! ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ দর্শন না করিলে শাস্ত্র পড়িয়া বা তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞের শাস্ত্রীয় লক্ষণের সম্যক্ বোধ হয় না। যেন দুইটি মানুষ, একটি রোগে ভুগিতেছেন — 'অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ' (মুন্ডক ৩:১:২) আর অপরটি দ্রষ্টা উদাসীন নির্বিকার প্রশান্ত আনন্দময়! আমরা মহা সৌভাগ্যবান, এই জীবনবৈভব নিজচক্ষে দেখিয়া ব্রহ্মজ্ঞের লক্ষণ যে কি, তাহা শিখিতেছি!

এখন সকাল সওয়া ছয়টা। মঠের সাধুগণ একে একে আসিয়া শ্রীমহাপুরুষকে প্রণাম করিতেছেন। তিনি এখন আচার্যভাবে অবস্থান করিতেছেন। নিরুদ্বেগে প্রশান্ত স্বরে সস্নেহে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কাশীর স্বামী ভাগবতানন্দ (নরেন) আসিয়া প্রণাম করিতেই শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, জগদীশানন্দ চলে গেল! বেশ হয়েছে, ভালই হয়েছে, কারুকে ভোগালে না, নিজেও ভুগলে না। জ্ঞানী ছিল, পুত্রকন্যার উপর মায়া ছিল না। মায়া হয় কাছে থাকলে। তা ভালই হয়েছে। এই একটা chapter (অধ্যায়) শেষ হয়ে গেল। অনন্ত জীবন — তার একটা chapter (অধ্যায়) শেষ হ'ল। ভালই হলো কাশীতে বিশ্বনাথের স্থানে মুক্ত হয়ে গেল। দেখেছি বরাবরই quiet nature-এর (শান্ত প্রকৃতির) লোক ছিল।

স্বামী ভাগবতানন্দ — কারো কাছ থেকে সেবা নেবার ইচ্ছা ছিল না। আমরা বলছি, হাওয়া করবো — উনি বলতেন, না। কিছুই ইচ্ছা ছিল না, খাওয়া কি পরার।

শ্রীমহাপুরুষ — ভোগ ফুরিয়ে এসেছে, তাই।

সাধুগণ আসিতেছেন যাইতেছেন প্রণাম করিয়া। দুইটি একটি কথাও হইতেছে নানা বিষয়ে। এবার স্বামী ওঁকারানন্দের সঙ্গে কথাবার্তা হইতেছে।

স্বামী ওঁকারানন্দ — আজ দশহরা। এদিন ঠাকুরের কোনও বিশেষ ভাব হতো কি?

শ্রীমহাপুরুষ — আমার মনে নাই। (একটু ভাবিয়া) না, মনে নাই। তবে গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি বলতেন — খুব ভক্তি ছিল।

আমরা তখন ওখানে যেতুম। ঝাউতলায় বাহ্যে করে জলশৌচ করতুম

গঙ্গায়। এমনি চলছে অনেক দিন। একদিন তা লক্ষ্য করেছেন। আর বললেন, কোথায় গিছলে? বাহ্যে করতে গিছলাম বলায় জিজ্ঞাসা করলেন, জলশৌচ করলে কোথায়? গঙ্গায় করেছি শুনে বললেন, ও করিস্ না — গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি। এই এখানে ঘটি আছে। এতে জল নিয়ে জলশৌচ করবি। আর বলেছিলেন, হাঁসপুকুর থেকে জল নিয়ে যাবি।

স্বামী ওঁকারানন্দ — আচ্ছা, ওটা কিভাবে বলতেন — ব্রহ্মবারি কি ব্রহ্মের বিশেষ প্রকাশ বলে?

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ, ব্রহ্মের বিশেষ প্রকাশ বলেই। আমরা তো আগে জানতুম না অত। উনি বললেন, তাই পরে বুঝলুম। শাস্ত্রেও ব্রহ্মবারি বলা হয়েছে — তাই উনিও তাই বলতেন। আস্তিক্য বুদ্ধি থাকলে অমনি হয় — সব বিশ্বাস করে, যা সব পূর্ব পূর্ব মহাত্মারা বলে গেছেন। তিনি বলতেন, সবই সত্য যা যা বলে গেছেন মহাত্মারা। এই ইংরেজী শিখে ছেলেরা হুট করে সব উড়িয়ে দেয়। তাঁর অমন ছিল না। সবেতে বিশ্বাস।

স্বামী ওঁকারানন্দ — আমাদের বুদ্ধি কত দূর? তাঁরা দূরদর্শী, দেখতে পান অনেক দূর। তিনি তো বলেছেন, কলিতে দারুব্রহ্ম, গঙ্গাবারি আর বৃন্দাবনের রজঃ — সাক্ষাৎ ব্রহ্ম।

দশহরায় কোথায় কিভাবে গঙ্গাপূজা হয় এই সব কথা হইতে লাগিল। আবার ঠাকুরের কথা উঠিল।

স্বামী ওঁকারানন্দ — শুনেছি, একদিন ভক্তরা সকলেই গঙ্গাস্নান করতে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। গিরিশবাবু যান নাই, ঠাকুরের ঘরেই বসে রইলেন। ঠাকুর বললেন, যাও না। গিরিশবাবু বললেন, আপনার কাছে রয়েছি — আর কোথায় যাব? ঠাকুর বললেন, আজ গঙ্গার বিশেষ আবির্ভাব। তাঁর কথায় গেলেন।

তারপর গঙ্গায় নেমে তাঁর কি একটা ভাব হলো আর অমনি জল ছিটিয়ে দিতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, সব পাপ দূর হয়ে যাবে।

শ্রীমহাপুরুষ — হতে পারে। তিনি (ঠাকুর) বললেই তো হয়ে যায়। ঈশ্বরীয় দর্শন সবই সত্য। সাধারণ লোক দেখতে পায় না, মন মলিন বলে। মন শুদ্ধ হলে সেসব ধরা যায় — যেমন wireless-এর message (বেতারের সংবাদ)। সর্বদাই কথা হচ্ছে, কিন্তু ধরতে পারা যায় যদি

receiver (গ্রাহকযন্ত্র) কাছে থাকে।

স্বামী ওঁকারানন্দ — শুনেছি, দেশে মা একবার ঠাকুরকে দর্শন করছেন। দেখলেন, তাঁর পা থেকে গঙ্গা বের হয়ে যাচ্ছে — জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। তারপর মা জবাফুল দিয়ে পূজো করলেন। কি একটা যোগ ছিল — মা গঙ্গাস্নানে আসতে পারেন নি বলে মনে একটু কষ্ট হয়েছিল। তাই ঠাকুর ও রূপ দেখালেন। মা পরে ভক্তদের ঐ জায়গাটা দেখিয়েছিলেন — 'এইখানে' বলে।

শ্রীমহাপুরুষ — হবে, ওঁদের দৃষ্টিই আলাদা। কারো কারো ধ্যান করতে করতে তাঁর কৃপায় ঈশ্বরীয় দর্শনাদি হয় আপনা আপনি।

স্বামী ওঁকারানন্দ — আচ্ছা ধ্যান করায়, যে মূর্তিটির ধ্যান করবে তার তো স্বরূপের বোধ নাই, তবে সেইটি কি imagine (কল্পনা) ক'রে ধ্যান করা — শেষে খুলে যাবে স্বরূপটি আপনা আপনিই?

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ, তাতেই শেষে আপনিই বুঝবে স্বরূপ।

স্বামী ওঁকারানন্দ — যেমন দুধেতে পোকা আছে — এমনি চোখে তা দেখা যায় না, কিন্তু mycroscope (অনুবীক্ষণ) দিয়ে দেখা যায়, তেমনি মন যত ভাল হবে ততই সূক্ষ্ম জিনিস বোঝা যায়।

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ মহাকারণ — সবই তো রয়েছে! মন যত শুদ্ধ হবে ক্রমে সেইগুলি তত বোঝা যাবে। তবে ঐ মাইক্রোস্কোপ ভিতরেই রয়েছে — তৈরী করতে হয় না।

স্বামী ওঁকারানন্দ — সেটা মন?

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ মন। মনই তো সব। মনেরই অবস্থান্তর এই সব। স্থূল যা এখন দেখা যাচ্ছে — মন সূক্ষ্মে গেলে — এই স্থূল স্থূলই থাকবে। কিন্তু মনটা অন্য রকম হয়ে যাবে। তেমনি কারণ মহাকারণ। যা যেমন আছে তেমনি থাকে — কেবল মনটা বদলাচ্ছে।

কারণ সকলেরই এক। (ওঁকারানন্দের শরীর লক্ষ্য করিয়া) এর, (টেবিলের উপর পুস্তক লক্ষ্য করিয়া) এর, (ডান হাতের দেয়াল দেখাইয়া) আর এর — সকলেরই কারণ এক। কারণের তফাৎ নাই — কাগজের যে কারণ, দেয়ালেরও সেই কারণ। কারণ এক, কার্য ভিন্ন।

স্বামী ওঁকারানন্দ — মনটা ক্রমশঃ উপরে উঠে উঠে শেষে বিরাট

মনের সঙ্গে এক হয়ে যায় তখন সেই মনে সব বোঝা যায়।

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ, তাই।

শ্রীমহাপুরুষ এবার জলযোগ করিবেন। সাধুগণ বাহিরে চলিয়া যাইতেছেন। কথা এখানেই বন্ধ রহিল। এখন সকাল সাড়ে ছয়টা।

শ্রীম — ঠাকুর খুব জোর দিয়ে বলতেন, কলিতে ব্রহ্মদর্শন খুবই কঠিন। কিন্তু জগন্নাথের আটকা, বৃন্দাবনের রজঃ ও গঙ্গাবারি — এই তিনটিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলতেন।

মায়ের গঙ্গারূপ ঠাকুর দর্শন করেছিলেন। এসব মানতে হয়। উড়িয়ে দিলে হয় না। বিচার করতে যাও তো বহু দূরে। বিশ্বাস কর, তবে হাতের তলায়। ঠাকুর কৃপা করে ভক্তদের, সর্বজীবে তিনি, সর্ববস্তুতে তিনি — এ দেখিয়েছিলেন। ইংরেজী পড়ায় সরল বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। তাঁর কৃপায় ভক্তরা পুনরায় ফিরে পান।

৩

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

গঙ্গার দিকের বারান্দা। দ্বিতলে স্বামী সুবোধানন্দ ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন স্বামীজীর ঘরের গায়ে উত্তরাস্য। তামাক খাইতেছেন গড়গড়ায়, রবারের নলে। কয়েকজন সাধু দাঁড়াইয়া আছেন। দুইটি একটি এ-কথা, সে-কথা হইতেছে। স্বামী ওঁকারানন্দ আসিয়া প্রণাম করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন।

স্বামী ওঁকারানন্দ (স্বামী সুবোধানন্দের প্রতি চাহিয়া) — আজ দশহরা গঙ্গাপূজা। আপনি (পোস্তা দেখাইয়া) ঐখানে গঙ্গাদর্শন করেছিলেন?

স্বামী সুবোধানন্দ (সহাস্যে) — হাঁ। গান হচ্ছিল (ভিজিটার্স রুমে আরতির পর)। ওখানে (গঙ্গায় নামিবার সিঁড়ির বাঁ দিকে) পোস্তার উপর বসে পা ঝুলিয়ে — পাঁচ ছ’ বছরের মেয়ে, খুব সুশ্রী। আমি এখানে বসে ছিলাম। মহাপুরুষকে ডেকে বললাম, এইতো পোড়ারমুখী বসে আছে মরতে। কাদের বাড়ির মেয়ে? অমনি ধপাস করে পড়ে গেল জলে।

স্বামী ওঁকারানন্দ — ‘কালভয়বারিণি কপালিনী কালরূপিণী’ — এ গান হচ্ছিল। দেখতে কেমন?

স্বামী সুবোধানন্দ — খুব সুন্দরী!

স্বামী ওঁকারানন্দ — বিজ্ঞানস্বামীও দেখেছিলেন। প্রয়াগে ত্রিবেণীতে স্নান করছেন অমনি দেখলেন একটি মেয়ে। পিঠে তাঁর তিনটি বেণী। (ব্রহ্মানন্দ) মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ঠিক, কি hallucination (মতিভ্রম)? উনি উত্তর করলেন, 'তুম তো মার দিয়া।'

স্বামী সুবোধানন্দ — ঠাকুরের দৃষ্টি আলাদা আর আমাদের দৃষ্টি আলাদা।

স্বামী ওঁকারানন্দ — আচ্ছা, আজের দিনে দশহরায় ঠাকুরের কোন ভাবটাবের কথা মনে আছে আপনার?

স্বামী সুবোধানন্দ — দশহরায় কাচা কাপড় পরে স্নান করতেন। আর মন খারাপ হলে একটু গঙ্গাজল খেতে বলতেন। আজের দিনে ওদিকে (হাওড়া পুলের দিকে) গঙ্গাকে বিরাট ফুলের মালা পরানো হত — এপার ওপার।

(সহাস্যে) অনেকের ভাব আমি ভেঙ্গেছি। ঠাকুরের কাছে যাঁরা যেতেন তাঁদের অনেকেরই ভাব হতো। দেবেনবাবু, মাস্টারমশায় প্রভৃতি অনেকে যেতেন - অনেকের ভাবাবেশ হতো। কারো কারো দাঁত মুখ খিঁচিয়ে যেতো।

ঠাকুর একদিন আমায় বললেন, যা না, ওখানে কীর্তন হচ্ছে। আমি বললাম — না, যাব না, কি দেখতে যাব? ওদের ভাব আমার ভাল লাগে না। তারপর উনি গেলেন, তখন তাঁর সঙ্গে গেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ওঁদের কার ভাব ঠিক? ঠাকুর বললেন, লেটোর। ওর বুকে পা না দিলে হুঁশ হয় না। শেষের দিকে লাটু মহারাজের ঐ রকম দর্শন হতো। ছাদে বসে আছি দুজনে, খুব গরম। বললেন, 'যাও, সেবাশ্রমে যাও। ওখানে দেখবে সব। এখানে কি?' আমি তো অবাক — লোক দেখছি না কা'কে বলছেন? তখন বললেন, এই মেয়েগুলো এসেছে। ওদের বললুম যেতে।

আমায় বলেছিলেন, থাক্ তুই এখানে। তুই ঠাকুরের ছেলে, তোর কোনও অভাব হবে না। আমার শরীর অসুস্থ শুনে বললেন, আমি রোজ একসের দুধের ব্যবস্থা করে দেবো — থাক্ এখানে পড়ে।

স্বামীজীর একদিন ভাব হয়েছিল কুটনো কোটে যেখানে শিবরাত্রিতে। গান গাইছিলেন, তানপুরা নিয়ে। নাকের সামনে তুলো ধরা হলো —

নড়ছে না। মহাপুরুষ তখন হাত থেকে তানপুরা নিয়ে গেলেন। স্বামীজী তখন কাত হয়ে পড়লেন। তাই দেখে মহাপুরুষ তখন তানপুরা বাজিয়ে 'হর, হর ব্যোম্ ব্যোম্' করতে লাগলেন। তখন হুঁশ হল। আর আমাকে বললেন, চল্ খোকা ঘুমুই গিয়ে। এই শুনে রাখাল মহারাজ আমাকে ইঙ্গিত করলেন নিয়ে যেতে আবার যদি ঐ সব হয়, এই ভয়। আমি নিয়ে গেলাম তাঁর ঘরে।

আমি এই (ছোট) ঘরে থাকি। শুনছি, স্বামীজী কথা কইছেন। ভাবলুম, কে এলো এ সময়ে। গিয়ে দেখি একা বসে। বললুম, কি স্বামীজী, কার সঙ্গে কথা কইছো? তিনি হেসে উত্তর করলেন, খোকা, একটু তামাক খাওয়া।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ নিজ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া প্যাসেজে স্বামীজীর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া আছেন নমস্কার মুদ্রায় — বলিতেছেন, 'জয় স্বামীজীর জয়'। 'জয় স্বামীজীর জয়।' পায়ে পায়ে চলেন টলিতে টলিতে। শরীর বাঁকিয়া যায় সামনের দিকে। স্বামী সুবোধানন্দ ইজি-চেয়ার হইতে উঠিতে চেষ্টা করিলেন। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, উঠো না — বস বস।

শ্রীমহাপুরুষ বারান্দার উত্তর-দক্ষিণে পায়চারি করিতেছেন। খালি গা, আধখানা পাতলা বস্ত্র পরিধানে, কাপড় সামলাইতে পারিতেছেন না, তাই মাঝখান হইতে ভাঙিয়া কোমরে গোঁজা। পায়ে লাল ভেলভেটের চটি। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছে, জরাব্যাধির হাত হইতে আত্মদ্রষ্টা পরমহংসেরও নিস্তার নাই। তবুও ইঁহারা মনের সম্রাট। মন সচ্চিদানন্দে সদা লগ্ন। জরামৃত্যুর সহিত অজর-অমরত্ব একসঙ্গেই দৃষ্ট হয় তাঁহাদের শরীরে।

শ্রীমহাপুরুষ দক্ষিণমুখী হইয়া ইজি-চেয়ারের সামনে দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামী সুবোধানন্দ উত্তরাস্য ইজি-চেয়ারে বসা। স্বামী ওঁকারানন্দ রেলিং-এ পিছন দিয়া দাঁড়ান, তাঁহার বামদিকে ব্রহ্মচারী গদাধর পূর্ব-দক্ষিণ কোণে আর পশ্চিম-দক্ষিণে দাঁড়ানো অপর একজন সন্ন্যাসী। আবার গঙ্গাপূজার কথা উঠিল, পাঁঠাবলির কথা।

শ্রীমহাপুরুষ — একবার বরাহনগরে হয়েছিল।

স্বামী ওঁকারানন্দ — খোল বাজিয়ে পাঁঠাটাকে দেবত্বে বরণ মন্ত্রটি সকলেই সম্মিলিত কণ্ঠে আবৃত্তি করেছিলেন। স্বামীজী শিখিয়েছিলেন

এটি। এমনি ভাব হয়েছিল — পাঁঠা যেন সত্য সত্য দেবত্ব লাভ করল।

শ্রীমহাপুরুষ — মঠে বড় কেউ আসতো না। লোকেরা বলতো, শালারা খোল বাজিয়ে পাঁঠাবলি দেয়। মাস্টারমশায় আর কেউ কেউ এসে মাকে বললেন, এই কথা। মা তখন এপারে থাকতেন। মা ডাকিয়ে বললেন, 'কি কাজ বাবা যাতে অন্যের মনে কষ্ট হয়?' তারপর হয় নি আর।

স্বামী ওঁকারানন্দ — মঠের দুর্গাপূজায়ও স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল রুধিরকর্দম হবে — যেমন আছে শাস্ত্রে 'নবব্যাং রুধির কর্দমং।' মা নাকি বন্ধ করে দিছলেন। মাকে জিজ্ঞাসা করায় মা বললেন, না, থাক।

একজন সাধু — আচ্ছা, কাশীতে শঙ্কটাতে নাকি বলি হয়?

শ্রীমহাপুরুষ — না, কাশীর অন্য কোথাও 'বলি' হয় না — দুর্গাবাড়ি ছাড়া। না, আর কোথাও না।

একজন সাধু — পুরীর বিমলার মন্দিরে —

শ্রীমহাপুরুষ — সে অনেক রাতে হয় লোকজন সরিয়ে দিয়ে।

স্বামী ওঁকারানন্দ — একবার শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) দেখেছিলেন বলির মাথাটি বিল্বপত্রের মাঝে পরের দিন — নিতে ভুলে গেছে।

একজন সাধু — কালীঘাটের বলি কেউ বন্ধ করতে পারে নি।

শ্রীমহাপুরুষ — তাতো হবেই — বরাবরই হয়ে আসছে।

স্বামী সুবোধানন্দ (সহাস্যে) — মা এতকাল খাচ্ছেন, দাঁত পড়ে না? (সকলের হাস্য)।

শ্রীমহাপুরুষ — বাবা, আমি এসব বুঝি না। তিনি মা, দয়াময়ী ত্রিতাপহারিণী — এই বুঝি। 'নিত্যৈব সা জগন্মাতা ত্বয়া ততমিদং জগৎ।' দেবতাগণ স্তবে প্রার্থনা করছেন —

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবী সমস্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥*

স্বামী ওঁকারানন্দ চণ্ডীর নারায়ণী স্তুতির কিছু কিছু অংশ আবৃত্তি

---

*মা তুমি বিষ্ণুর শক্তি। তোমার পরাক্রম অনন্ত। তুমি এই বিশ্বের পরমবীজ। তুমি মহামায়ারূপিণী তোমার এই বিচিত্র মায়াতে, হে দেবী, এই সমস্ত বিশ্ব সম্মোহিত। কিন্তু তুমি প্রসন্না হলেই সংসারবন্ধন থেকে লোক মুক্ত হতে পারে।

করিতেছেন।

শ্রীমহাপুরুষ — তিনি দয়াময়ী ত্রিতাপহারিণী, জগতের কল্যাণের জন্য আসেন। নানা রূপ তাঁর। যখন যে রূপেই আসুন — তা জগতের কল্যাণের জন্যই আসেন। তাঁ'তে অমঙ্গল অকল্যাণ নাই। তিনি যে সর্বমঙ্গলা। কল্যাণ করা ছাড়া তাঁর আর অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই। তাঁর কিসের অভাব — 'নানাবাপ্তমবাপ্তব্যম্ বর্ত এব চ কর্মণি।' (গীতা ৩:২২) নিজের অপ্রাপ্য কিছুই নেই। তবুও জগতের কল্যাণের জন্য কাজ করেন। তাঁর সাকার ভাবটি জগতের কল্যাণের জন্য (তাঁহার দৃষ্টি গঙ্গা ও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের দিকে)। তাঁর হৃদয় দয়া, ভালবাসা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ।

একজন সাধু (স্বগত) — হরপার্বতী আদি দেবরূপ, এবং রাম-কৃষ্ণাদি অবতার-রূপেরই কথা বলছেন কি — সাকার ভাবটি জগতের কল্যাণের জন্য — এই উক্তি দ্বারা? এক সত্যবস্তু পরব্রহ্মেরই এই নানা সাকার রূপ — যতক্ষণ না পরব্রহ্মে লীন হয় জীব ততক্ষণ এই সবই সত্য।

শ্রীমহাপুরুষ এবার নিজের ঘরের দিকে যাইতেছেন, সঙ্গে সাধুরা। প্যাসেজের পশ্চিম প্রান্তে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, আমার বাবা ছিলেন শাক্ত। ছেলেবেলায় দেখেছি জগদ্ধাত্রীপূজাতে পাঁঠা কেটে তার মাথাটা নিজের শিরে রেখে চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করছেন — সমস্ত রক্তে রক্তাক্ত। আমার এসব ভাল লাগে না — এ কি, জ্যান্ত জানোয়ারটা কাটা! ওসব রাজসিক ব্যাপার! ঠাকুর বলতেন, মা'র এমন সব রূপ আছে যা এর গন্ধ শুঁকতে পারে না।

শ্রীমহাপুরুষ নিজকক্ষে প্রবেশ করিলেন। এবার বিশ্রাম করিবেন, বৃদ্ধ শরীর তাই। এখন সকাল সাড়ে সাতটা।

আজ ৮ই জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার। সকালে শ্রীমহাপুরুষ নিজকক্ষে চেয়ারে বসিয়া আছেন দক্ষিণাস্য, টেবিলের সামনে। সাধুরা প্রণাম করিতেছেন আর যথোপযুক্ত বাক্যে সকলকে স্নেহাশিস বিতরণ করিতেছেন নিজের শরীরের অসুখ ভুলিয়া। নলিনী (সারদেশ্বরানন্দ) প্রণাম করিতেই সহাস্য বলিতেছেন।

'নলিনীদলগত জলমতি তরলং। তাবৎজীবনং অতিশয় চপলং।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে॥

৪

ডায়েরী পাঠ শেষ হইল।

শ্রীম (পাঠান্তে) — এ দেবদেবী সব সত্য। এতে আর আশ্চর্য কি? তিনি এই বিচিত্র অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হয়েছেন, আর এই সব নানা রূপ হতে পারেন না — দেবদেবী আদি? ঠিক কথা। তাঁর কৃপা হলে চিত্ত একেবারে শুদ্ধ হয়ে যায় আর তা'তে তাঁর নানা রূপ দর্শন হয়।

ঠাকুর কি শুধু বলতেন, এ সব সত্য? ভক্তদের আবার সব দেখিয়ে দিয়েছেন — সাকার নিরাকার, সব। বেশী দেখালে আবার সইতে পারে না। অর্জুনের তা হয়েছিল। তাই যতটা সয় ততটাই দেখান।

ঠাকুর কে? এ ব্রহ্মশক্তিই ঠাকুর — যিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। শক্তি ব্রহ্ম অভেদ। ঠাকুর ও মা, শক্তি ও ব্রহ্ম। ঠাকুর ও মা অভেদ।

এখন সন্ধ্যা সমাগতা। শ্রীম তুলসীতলায় নীরবে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। আশে পাশে বসা স্বামী রাঘবানন্দ, মোটা সুধীর, পূর্ণেন্দু প্রভৃতি। দুইটি মালাবারী যুবকও বসিয়া আছেন।

ধ্যানান্তে শ্রীম দক্ষিণে নিজের আসনের দিকে আসিতেছেন। মধ্য রাস্তায় একজন সাধু শ্রীমকে আবার প্রণাম করিলেন পায়ে হাত দিয়া। অন্ধকারে চিনিতে না পারিয়া বলিলেন, দেখি কে? সাধু বলিলেন, জগবন্ধু। শ্রীম আনন্দে সহাস্যে বলিলেন, ও জগবন্ধু! ন্যাড়া হয়েছ — এখানে এসে হয়েছ?

শ্রীম চেয়ারে বসিয়া আছেন উত্তরাস্য। তাঁহার বাঁ হাতে জোড়া বেঞ্চিতে সাধুরা। সামনে ও ডান হাতে অপর বেঞ্চিতে ভক্তরা। মাদ্রাজী যুবক দইটি গিয়া শ্রীমকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। শ্রীম সাধুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, এরা বুঝি স্টুডেন্টস্? সাধু বলিলেন আজ্ঞে হাঁ। এরা দু'ভাই, মাদ্রাজ মঠে আসে। স্বামী ঘনানন্দের মামাতো ভাই। মালাবারবাসী।

শ্রীম (অতি আনন্দে) — দেখ, তিনি (ঠাকুর) আসায় সব দেশটা যেন একটা family-তে (পরিবারে) পরিণত হয়েছে।

সুরেন চক্রবর্তীর প্রবেশ।

বড় জিতেনবাবু (জিতেন্দ্রনাথ সেন) হাইকোর্টের বেঞ্চ ক্লার্ক। তিনি একটা এ্যালুমিনিয়ামের বড় পাত্রে অনেক সিঙ্গাড়া করিয়া পাঠাইয়াছেন। জিতেনবাবুর ছেলের হাত হইতে পাত্রটা দুই হাতে লইয়া চোখ বুঁজিয়া নিবেদন করিয়া সাধুদের সামনে ধরিলেন।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — আপনারা দু'টি করে নিন্। (সুরেন চক্রবর্তীর সামনে ধরিয়া) নিন্, আপনি নিন্।

সুরেন চক্রবর্তী — আমার আহ্নিক হয় নাই।

শ্রীম — সে কি! সাধু হলেন নারায়ণ। অমন সাধু যখন নিয়েছেন, তখন প্রসাদ। অমন প্রসাদ কি পাওয়া যায়? নিন্, নিন্।

কিন্তু সুরেনবাবু কিছুতেই নিলেন না।

একটি সাধু (স্বগতঃ) — কি আশ্চর্য! মহাপুরুষ ভগবানের অন্তরঙ্গ পার্ষদ, নিজ হাতে দিচ্ছেন, উনি নিচ্ছেন না। লোকটি তীক্ষ্ণবুদ্ধি নন্ দেখছি। যার জন্য আহ্নিক সেই জিনিস সামনে বসে, চিনতে পারছেন না। অতবড় পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম আর অত নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ — তিনি কিন্তু এর বিপরীত কাজ করেছিলেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রসাদী জগন্নাথের চন্দন ও তুলসী দিলে — শৌচাদির পূর্বেই মস্তকে ধারণ করে মুখে দিয়ে দিলেন।

সুরেনবাবু এম.এ. পাস। মায়ের মন্ত্রশিষ্য। মেডিক্যাল কলেজের সেক্রেটারী।

শ্রীম গিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিলেন। সাধু ভক্তদের কীর্তন করিতে বলিলেন। খোল আছে কিন্তু বাজাইবার লোক নাই।

শ্রীম (সহাস্যে একজন সাধুর প্রতি) — জগবন্ধুবাবু, জান না? শিখে ফেল না। বরানগরে স্বামীজী ওঁদের (ঠাকুরের সন্তানদের) গান বাজনা শিখাতেন। রাখাল মহারাজ, তারক মহারাজ এঁরা তবলা জানতেন। শরৎ মহারাজ গান বাজনা দুই-ই জানতেন।

ভক্তগণ হাততালি দিয়া কীর্তন করিতেছেন — 'রাধে গোবিন্দ জয়, শ্রীরাধে গোবিন্দ জয়।'

শ্রীম কিছুক্ষণ শুনিয়া ঘরে গিয়া নৈশ ভোজন করিতে বসিলেন। পাছে ভক্তগণ অন্য কথা ক'ন ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া, শ্রীম ভক্তদের এইরূপ

— পাঠশ্রবণে, কিংবা কীর্তনে রত রাখিয়া ভোজন করিতে যান।

ঘরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মেঝেতে বসিয়া আহার করিতেছেন দুধ ও রুটি — চিনি ছাড়া। একটা প্লেটে ঢালিয়া দুধ পান করিতেছেন। একজন সেবক সামনে দাঁড়াইয়া। বলিলেন, জগবন্ধুবাবুর খাবার আনা হয় নাই? সেবক বলিলেন, উনি অদ্বৈতাশ্রমে চলে যাবেন।

সাধু শ্রীমকে দর্শন ও যুক্তকরে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

অদ্বৈতাশ্রম, ৪, ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা।
৯ই জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার।

একাদশ অধ্যায়

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ

১

মর্টন স্কুল। আজ ১৯শে জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। সন্ধ্যার একটু দেরী আছে। শ্রীম ঘর হইতে ছাদে আসিয়া বসিলেন। ছাদে স্বামী রাঘবানন্দ উপবিষ্ট। আরও কয়েকজন ভক্ত আছেন। স্বামী নিত্যাত্মানন্দও আসিয়া শ্রীম-র অপেক্ষায় ছিলেন। সকলে উঠিয়া শ্রীমকে যুক্তকরে নমস্কার করিলেন। শ্রীমও প্রতিনমস্কার করিয়া কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীম (স্বামী নিত্যাত্মানন্দের প্রতি) — আপনি কোত্থেকে এলেন?

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ — এখন আসছি 'বসুমতী' আফিস থেকে। মাদ্রাজ মঠের জন্য একটি মাসিক 'বসুমতী' বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। মঠ থেকে বেরিয়েছি একটার স্টীমারে।

একজন সাধু শ্রীম-র অনুমতি লইয়া বেলুড় মঠের ডায়েরী পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন।

আজ জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা। ১০ই জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার। জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রাও আজ। এই দিনেই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়।

এখন সকাল ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ বিছানায় বসিয়া আছেন। সাধুরা প্রণাম করিতেছেন। প্রণামান্তে কেহ চলিয়া যাইতেছেন। দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন — অসঙ্গানন্দ, অজয়ানন্দ, জ্যোতির্ময়ানন্দ, ভোলানাথ, নিত্যাত্মানন্দ প্রভৃতি সাধুগণ।

শ্রীমহাপুরুষ (স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দের প্রতি) — আজ স্নানযাত্রা। 'আত্মারাম'কে (ঠাকুরের অস্থিকৌটা) বার করলে বেশ।

আজ অসঙ্গানন্দ প্রভৃতিকে লইয়া নিত্যাত্মানন্দ দক্ষিণেশ্বর গেলেন। আর ওখানকার যদু মল্লিক ও শম্ভু মল্লিকের বাড়ি ও অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণ-

পদরজঃপূত পুণ্যভূমিসমূহ দর্শন করিলেন। হিমাংশু দক্ষিণেশ্বর ফটকে প্রসাদ দিলেন সাধুদের হাতে। উনি কলিকাতায় ফিরিতেছেন।

বেলুড় মঠ। ১২ই জুন ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ সাল। শ্রীমহাপুরুষের কক্ষ। এখন সকাল ছয়টা কুড়ি মিনিট। খুব গরম পড়িয়াছে, তাই শ্রীমহাপুরুষ নগ্ন গাত্রে বিছানায় বসিয়া আছেন, পশ্চিমাস্য। পিঠ বাঁকিয়া যাইতেছে বসিতে। সহাস্য বদন। ব্রহ্মচারী বিমল ও দেওঘরের ব্রহ্মচারী ভোলানাথ প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

একটি সাধু ঘরে ঢুকিতেই, সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নাম হলো তোমার? সাধু অগ্রসর হইয়া খাট ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া উত্তর করিলেন, নিত্যাত্মানন্দ। মহাপুরুষ মহারাজ মন অন্তরে রাখিয়া আবৃত্তি করিলেন, 'নিত্যাত্মা'।

ঘরে একটা বোলতা ঢুকিয়াছে। গড়গড়ার লাল রবারের নলে বসিয়াছে। গড়গড়া শ্রীমহাপুরুষের সামনে স্টুলের উপর। মাঝে মাঝে একটা টান দিতেছেন। বোলতাটাকে তাড়াইতে হইবে। শ্রীমহাপুরুষ এদিক ওদিক দেখিতেছেন। সাধু বুঝিতে পারিলেন, পাখা খুঁজিতেছেন। তাই সাধু বলিলেন, পাখা খুঁজছেন? উনি উত্তর করিলেন — হাঁ, দাও তো পাখাটা। পাখা বিছানায় বালিশের পাশেই ছিল। সাধু পাখা দিয়া বোলতাটাকে বাহির করিয়া দিলেন।

বোলতা আবার আসিয়াছে। ঘরের উত্তর-পশ্চিম জানালার গায়ে বসিয়াছে। সারশি বন্ধ। সাধু উহা দেখিতে পান নাই। দক্ষিণ-পশ্চিম জানালাও বন্ধ। একটা মশা ঐ জানালার গায়ে উড়িতেছে। সাধু পাখা দিয়া উহাকে বাহির করিতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, আবার এসেছে, দাও দাও, বের করে দাও — জানালা খুলে। সাধু দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের জানালাটা খুলিতেছেন দেখিয়া শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, না এটা নয় ওটা। সাধু তখন বোলতাকে দেখিতে পাইয়া পশ্চিম-উত্তরের জানালাটা খুলিয়া বোলতাকে তাড়াইয়া দিলেন। বোলতাটাকে সাধু দেখিতে পান নাই বলিয়া লজ্জিত হইলেন।

মিশনের ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুলের একটি ছেলে ভট্টাচার্য আসিয়া প্রণাম করিল। শ্রীমহাপুরুষ ফষ্টিনষ্টির ভাবে হাসিয়া বলিলেন, কি গুরুকুলের

ভট্টাচার্যী — দশকর্ম শিখছিস্? কুলধর্ম নষ্ট করতে নেই। ছেলেটি উত্তর করিল, বড় ভাই আর মেজো ভাই ঐ সব করছেন। শ্রীমহাপুরুষ রহস্যচ্ছলে বলিলেন, আর তুই কি শিখছিস্ — তাঁত? ভট্চার্যীর ছেলে হয়ে শিখছিস্ তাঁত (হাস্য)। তা ভাল। আজকাল যে দিন পড়েছে ওসব একটু শেখা ভাল।

শ্রীমহাপুরুষ জলযোগ সারিয়া নিত্যকার মত আজও দোতলার বারান্দায় পায়চারী করিতেছেন উত্তর-দক্ষিণ। সঙ্গে স্বামী ভাস্বরানন্দ ও ব্রহ্মচারী শৈলেশ। একটি সাধু স্বামীজীর ঘরে বসিয়া ধ্যানজপ করেন — উদ্দেশ্য এখান হইতে প্রায়ই শ্রীমহাপুরুষকে দর্শনের ও তাঁহার কথা শুনিবার সুবিধা হয়। মহাপুরুষ আসিতেছেন দেখিয়া উনি স্বামীজীর ঘরের বাহিরে গিয়া প্যাসেজে দাঁড়াইলেন। টলিতে টলিতে শ্রীমহাপুরুষ ফিরিয়া আসিলেন, ক্লান্ত। দারুণ গরম। প্যাসেজ দিয়া যাইয়া অফিসঘরে ঢুকিলেন। এখন সকাল, সওয়া সাতটা বাজিয়াছে।

শ্রীমহাপুরুষ নিজ কক্ষে আসিয়া খাটের উপর বসিয়াছেন। এখন সাড়ে আটটা, তিনি বিশ্রাম করিবেন। স্বামী প্রণবানন্দ আসিয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীমহাপুরুষ (স্বামী প্রণবানন্দের প্রতি) — জগন্নাথের স্নানযাত্রা হয়ে গেল। এইবার অসুখ হবে।

স্বামী প্রণবানন্দ — পাঁচন খাওয়াবে।

শ্রীমহাপুরুষ — কলমীর বিছানায় শোয়াবে আর পটলের বালিশ মাথায় দেবে।

স্বামী প্রণবানন্দ — আজ্ঞে হাঁ। পটল খাওয়া উঠে গেল। কলমী আর পটল ব্রাহ্মণের বিধবা যতিরা (স্ত্রীলোকেরা) খাবে না।

শ্রীমহাপুরুষ (বালকের ন্যায় মুক্ত হাস্যে) — কেমন করে এসব প্রথা এলো, কে জানে?

স্বামী প্রণবানন্দ — পটলেও এখন সোয়াদ নাই।

শ্রীম — স্থিতপ্রজ্ঞের সব আচরণই মূল্যবান। আহার শয়ন ভ্রমণ চিন্তন, সবই মূল্যবান। Watch করে (নিরীক্ষণ করে) দেখলে দেখতে পাওয়া যায় এসবের ভেতর দিয়েও ব্রহ্মজ্ঞান উঁকি মারছে। তাঁদের এসব ব্যবহার সাধারণ লোকের মত নয়। সব আচরণ ব্রহ্মরসে রঞ্জিত। ব্রহ্মজ্ঞের সকল

আচরণের ভিতরই চুম্বকের ন্যায় একটা আকর্ষণ শক্তি রয়েছে। সত্যিকার ভক্তগণ তা দেখতে পায়। মহাপুরুষের ছোট ছোট কথা ও আচরণের ভিতর ঐ আকর্ষণ রয়েছে। তাই সবই মূল্যবান।

২

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। ১৪ই জুন ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার — ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ সাল। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। সকাল সওয়া ছয়টা। গরমের পর বৃষ্টি হওয়ায় ঠাণ্ডা হইয়াছে। তিনি প্রসন্ন চিত্তে খাটে বসিয়া আছেন আচার্য-ভাবে। সহাস্য বদন। অত অসুখ, কিন্তু কোনও চিহ্ন নাই চোখে মুখে। পুরুষসিংহের শরীরই জরাগ্রস্ত, কিন্তু মন সিংহতুল্য। কি বলিষ্ঠ, সরস, জ্যোতির্ময় ও চিন্তালেশশূন্য!

সাধুরা আসিতেছেন, চলিয়া যাইতেছেন প্রণাম করিয়া। সহাস্য বদনে সকলকে তাঁহার স্নেহাশিস্ বর্ষণ করিতেছেন এই জরাগ্রস্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ!

আজ বায়ুমণ্ডল সুশীতল হওয়ায় স্তবপাঠ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। 'বৃহৎ স্তবকবচমালা'—খানা আনাইয়া স্বামী অসঙ্গানন্দের হাতে দিয়া বলিলেন, রাবণকৃত শিবের স্তবটা বের করে দাও তো!

ঘরে এখন অসঙ্গানন্দ, শাশ্বতানন্দ, জিতাত্মানন্দ, নিত্যাত্মানন্দ প্রভৃতি সাধুগণ দাঁড়াইয়া শ্রীমহাপুরুষকে দর্শন করিতেছেন আর শুনিতেছেন, এই জরাগ্রস্ত শরীরেও জীবন্মুক্ত 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য,' 'স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত'। আর দেখিতেছেন, 'কিমাসীত ব্রজেত কিম্।' (গীতা ২:৫৪)

শ্রীমহাপুরুষ খাটে বসিয়া রাবণকৃত মহাদেবের স্তবটি একটু একটু পড়িতেছেন, বালকের মত একটি একটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া।

জটাটবী-গলজ্জল-প্রবাহ-পাবিত-স্থলে
গলেঽবলম্ব্য লম্বিতাং ভুজঙ্গ-তুঙ্গ-মালিকাম্।
ডমড্-ডমড্-ডমান্নিনাদবড্ ডমর্বযং
চকার চণ্ডতাণ্ডবং তনোতু নঃ শিবঃ শিবম্॥ ইত্যাদি।

কতক অংশ পাঠ করিয়া শ্রীমহাপুরুষ সহাস্যে বলিতেছেন, হাঁ, ঠিক

রাবণের মতই হয়েছে। যেমনি ভাষা, তেমনি শব্দবিন্যাস আর তেমনি স্বর!

এ সবই ভালর জন্য। শিবের তাণ্ডব নৃত্য — এও জগতের কল্যাণের জন্য। তিনি তো সর্বমঙ্গলময়— তাই তো তাঁর নাম শিব — 'শিব' মানে মঙ্গল, কল্যাণ।

(স্মরণ করিয়া সহাস্যে) স্বামীজীর গানটিও বেশ। আবেগভরে উচ্চ রাগিণীতে গাহিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার দম বন্ধ হইয়া যাইতেছে হাঁফানীর জন্য। আরম্ভ করিলেন, হর হর মহাদেব—। এক পদ গাহিতেছেন, অমনি বন্ধ হইতেছে আবার আর একপদ গাহিতে চেষ্টা করিতেছেন, পারিতেছেন না। বলিতেছেন, শরীরের জন্য পারি না — আগে গাইতে পারতাম।

জলখাবার আসিয়াছে। একটু হরলিকস্ ও দুইখানা সন্দেশ। সাধুগণ সকলে বাহিরে গেলেন। বালকের মত খাইতেছেন।

স্বামী প্রণবানন্দ আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। উনি প্রায়ই এই সময় আসেন। তিনি মঠের ডাক্তার। পাড়ার সকলের সংবাদ দিতেছেন, নানা কথা হইতেছে।

স্বামী প্রণবানন্দ — ঠাণ্ডা পড়েছে মহারাজ। আরাবিয়ায় সকালে এমনি ঠাণ্ডা — হিমালয়ের কাছে কি না!

শ্রীমহাপুরুষ — বেশ ঠাণ্ডা।

স্বামী প্রণবানন্দ — গুমোট গেল।

শ্রীমহাপুরুষ — আবার হবে।

জলযোগ করিয়া শ্রীমহাপুরুষ দোতলার বারান্দায় গেলেন। স্বামীজীর ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, জয় গুরু মহারাজ, জয় স্বামীজী। একটি সাধু অফিসঘরে দাঁড়াইয়া ইহা শুনিলেন। আজকাল প্রায় রোজই স্বামীজীর ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া করজোড়ে এই জয়গান করেন।

সাধু অফিসের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, বারান্দায় প্যাসেজের সামনে মাদ্রাজ মঠের ব্রহ্মচারী দামু শ্রীমহাপুরুষকে প্রণাম করিতেছে। আর তিনি তাহার সহিত বালকবৎ ফষ্টিনষ্টি করিতেছেন। বলিতেছেন, দামোদরম্ কেমনম্ আছস্? (বালকের দুষ্ট হাস্য)। হাস্যকৌতুক করিতে করিতে আসিয়া চেয়ারে বসিলেন ছোট ঘরের সামনে চেয়ারে। সম্মুখে পতিতপাবনী

জাহ্নবী। আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া পুনরায় বলিতেছেন, ওদের দেশে দক্ষিণে সবেতে 'ম্' লাগায় — বলে 'নমস্কারম্।

একটু পরেই আবার উঠিয়া অফিসঘরে আসিতেছেন — গায়ে পাতলা ফতুয়া, পরনে দুই ভাঁজ পাতলা তাঁতের ছোট ধুতি। পায়ে লাল ভেলভেটের চটি। টলিতে টলিতে সম্মুখে ঝুঁকিয়া অগ্রসর হইতেছেন।

একটি সাধু তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন আর আনন্দে ভাবিতেছেন, আমরা নিশ্চয় সৌভাগ্যবান — জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ অবতারের পার্ষদকে দর্শন করতে পারছি রোজ! এ দর্শন সত্যই সুদুর্লভ! লক্ষ লক্ষ জন্মের পর শ্রীভগবানের কৃপায় মানুষের পরমতত্ত্ব ব্রহ্মদর্শন হয়। এই মহাপুরুষের সেই ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন হয়েছে, তিনি কৃতকৃত্য। আমরাও ধন্য, এঁরা আমাদের ভালবাসেন, অভয় প্রদান করেছেন।

শ্রীমহাপুরুষ অফিসঘরে গিয়া পূর্ব-দক্ষিণের জানালার পাশে চেয়ারে বসিলেন, উত্তরাস্য। স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ দরজার সামনে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া শ্রীমহাপুরুষের সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি অতি কাতর স্বরে তাঁহাকে আত্ম-নিবেদন করিতেছেন।

স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ — মহারাজ, মনটা এই বেশ থাকে, আবার খারাপ হয়ে যায়। ভাল থাকার সময় মনে হয় — এমন থাকলে বেশ হয়। ধ্যান জপও করতে পারি না তেমন — মাথা কেমন হয়ে যায়।

মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) কাছে শুনেছি — material things (জাগতিক জিনিস) ভেবে ভেবে সাধুর পতন হয়ে যায়। ধ্যান জপ করলে সেইটা হয় না। মহারাজ বলতেন, এ বিশ্বাস বিশ্বাসই নয়। ধাক্কায় পড়লে সব ভেসে যায়।

শ্রীমহাপুরুষ (সস্নেহে) — কি আর করবে? স্মরণ মনন করতে থাক। আর প্রার্থনা করবে — 'ভক্তি বিশ্বাস দাও, হে প্রভো, হে দয়াময়! হে শিব, আমায় ভক্তি বিশ্বাস পবিত্রতা দাও!' সর্বদা প্রার্থনা করবে। আর কি করতে পার? ধ্যান করতে পার না বেশী, জপ করতে পার না বেশী। আর কি করবে — সর্বদা প্রার্থনা করা, 'হে প্রভো দয়াময়, আমায় ভক্তি বিশ্বাস দাও।' এতেই হয়ে যাবে। সর্বদা প্রার্থনা করবে।

সেবক মতি ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সাধুরা বাহিরে

দাঁড়াইয়া এই অমূল্য উপদেশ শুনিতেছিলেন। তাহাতে কিঞ্চিৎ বাধা পড়িল।

স্বামী মুক্তশ্বেরানন্দ (ঈশ্বর) — কাম ক্রোধাদিতে মন চঞ্চল হয়। আবার কখন উত্তম আহারাদিতে মন যায়।

শ্রীমহাপুরুষ — কি করবে? শরীর থাকলে অমন হয়। প্রার্থনা কর সর্বদা — ভক্তি বিশ্বাস দাও, মন তোমার পায়ে টেনে নাও, প্রভো! (মতির প্রতি) বেশ তো হাওয়া চলছিল — দরজাটা বন্ধ করলে কেন? খুলে দাও — হাওয়া চলুক।

মতি — ঝাঁট দেব ঘর, ধূলো উড়বে তাই বন্ধ ছিল।

দরজা খুলিয়া দিতেই সজোরে হাওয়া চলিতে লাগিল।

শ্রীমহাপুরুষ উঠিয়া নিজ কক্ষের দিকে আসিতেছেন। স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দও সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন।

শ্রীমহাপুরুষ বলিতেছেন, এতকাল মহারাজের সঙ্গে রইলে, এঁদের ভালোবাসা পেয়েছ — সব ঠিক হয়ে যাবে। এঁদের ভালবাসা ব্যর্থ হয় না। তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া খাটে উপবিষ্ট হইলেন, জামা খুলিতেছেন। এবার বিশ্রাম করিবেন। স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ সঙ্গে সঙ্গে দোরগোড়া পর্যন্ত গেলেন।

একজন সাধুর কর্ণে 'এঁদের ভালবাসা ব্যর্থ হয় না' — ভরসার এই মহাবাণী বহুক্ষণ ধরিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল। হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া প্রশ্ন তুলিল, তুমি কি এঁদের কারো ভালবাসা পেয়েছ? শুদ্ধ মন উত্তর করিল, পেয়েছ বই কি! নইলে এই সাধুজীবন লাভ হল কি করে?

শ্রীম — মুক্তেশ্বরানন্দ কে? হাঁ, ঈশ্বর। গদাধর আশ্রমে বলেছিল, মহারাজের (ব্রহ্মানন্দজীর) ভালবাসা টেনে ঘর ছাড়িয়ে নিয়ে এল ষোল বছর বয়সে। বলেছিল, — প্রাণটা খালি চায় ভালবাসা। মহাপুরুষকেও তাই বললো। আহা, কি দৈবী ভালবাসায় বেঁধেছিলেন রাখাল মহারাজ ছেলেদের। অবতার এসেছেন বলেই এই শুদ্ধ পবিত্র ভালবাসা দেখা যাচ্ছে। মহাপুরুষদের ভালবাসা অবিনাশী। তাঁদের ভালোবাসা পেলেই ভগবানের ভালবাসা পাওয়া গেল।

৩

আবার ডায়েরী পাঠ হইতে লাগিল।

বেলুড় মঠ। আজ ১৭ই জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার। শ্রীমহাপুরুষের কক্ষ। শ্রীমহাপুরুষ খাটে বসিয়া আছেন। সকাল সাড়ে ছয়টা। সাধুরা প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার শরীর একটু খারাপ। স্বামী ওঁকারানন্দ পশ্চিম-দক্ষিণ জানালার সামনে দাঁড়াইয়া আছেন। আর একজন সাধু প্রবেশ-দরজার গোড়ায় ইজি-চেয়ারের পাশে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান। প্রণামের সময় এই সাধুকে অতিশয় করুণামাখা স্বরে বলিলেন, ভাল আছ? (সহাস্যে ওঁকারানন্দের প্রতি) — এঁর মাথাটা একদিকে একটু উঁচু। সাধু বলিলেন, পেছনে। উনি উত্তর করিলেন, না, না, বাঁ দিকে। কে জানে কত রকম আছে?

শ্রীমহাপুরুষ উঠিয়া পা টিপিয়া বারান্দায় যাইতেছেন।

আজ ১৮ই জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার। শ্রীমহাপুরুষের শরীর দুই তিন দিন হইতে তত ভাল নয়। আজ টেম্পারেচার ৯৮.৮ হইয়াছে। সাধুরা তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

এখন সাড়ে ছয়টা। মহাপুরুষ খাটে বসিয়া একটি সন্দেশ খাইতেছেন। সেবক বৈরাগ্যানন্দ পর্দা টানিয়া দিলেন যাহাতে ঘরে কেহ না আসে।

অফিসঘরে সেবক গঙ্গেশানন্দ ডাক্তার অমর মুখার্জীকে টেলিফোন করিয়া শ্রীমহাপুরুষের কথা জানাইতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ জলযোগ সমাপন করিয়া ধীরে ধীরে অফিসঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামী গঙ্গেশানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ডাক্তারকে বলেছিলে? উনি পাশের ঘর হইতে আসিয়া উত্তর করিলেন, আজ্ঞে হাঁ। বললেন, পূর্বের ঔষধই repeat (আবার সেবন) করতে। আজকাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইতেছে।

শ্রীমহাপুরুষ সেবকদের বলিতেছেন — না, আজ আর অন্ন খাব না। পলতার ঝোল আর দুধ-বার্লি খাব। ডাক্তারকে জানিয়ে দাও।

স্বামী গঙ্গেশানন্দ — আপনি কি একটা হরিণের চামড়া ট্যান করতে দিয়েছিলেন?

শ্রীমহাপুরুষ — না, আমি দিই নি — মনে পড়ে না।

স্বামী গঙ্গেশানন্দ — অদ্বৈত আশ্রমের ম্যানেজার দ্বিজেন (স্বামী ধীরাত্মানন্দ) বললে আপনি দিয়েছেন, আর অসীমানন্দজীর মারফৎ চামড়াটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গে পাঁচ টাকার বিল পাঠিয়েছে।

শ্রীমহাপুরুষ (বালকের ন্যায় সহজ ও সরস ক্রোধে) — আমি দিই নাই — আমার দরকারও নাই — টাকাও দিব না। যার দরকার টাকা দাও আর ওটা নাও (মধুর হাস্য)।

স্বামী মনীষানন্দ (মতি) দরজার পাশে দাঁড়াইয়া অনুমতি চাহিতেছেন, কলিকাতা যাইবেন। শ্রীমহাপুরুষ ঘাড় ও মুখ উঁচু করিয়া বলিলেন, বাবা, আজকাল আমি কিছু জানি না (সরল হাস্য)।

ডায়েরী পাঠ শেষ হইল।

শ্রীম (উদ্দীপিত হইয়া সকলের প্রতি) — আপনারা পুরী যাচ্ছেন তো? আহা, যাবেন বই কি। অমন মহোৎসব রথ! কত ভক্ত যাবে।

একজন ভক্ত — যেতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু অর্থের অভাব।

শ্রীম (রহস্যচ্ছলে) — সে কী। রথে ভগবানদর্শন, অত ভক্ত সমাগম। 'Beg, borrow or steal' — (ভিক্ষা কর, নয়ত ধার কর, নয় চুরি কর) ওরা বলে। যে ভাবেই হোক কার্যসিদ্ধি করা উচিত (ঈষৎ হাস্য)।

শ্রীম (কৌতুকচ্ছলে) — আপনি চুরি করেন না? (উচ্চ দীর্ঘ হাস্য)। আগে 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' তাঁকে দর্শন। তারপর তিনি — 'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি' (করবেন) (গীতা ১৮:৬৬)।

শ্রীম (ঐ ভক্তের প্রতি) — গভর্নমেন্ট আফিসে sick-leave notice (অসুখের জন্য ছুটির দরখাস্ত) দিলেই হয়, না (হাস্য)?

ভক্ত — হাঁ। আমাদের মার্চেন্ট আফিসে ওতে হয় না।

শ্রীম (সতীনাথের প্রতি) — আপনি স্নানযাত্রায় গেলেন না?

সতীনাথ — যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাবা টাকা দিলেন না।

শ্রীম (সহাস্যে) — আগে ধার করে কার্যসিদ্ধি করতে হয়, তারপর শোধের চেষ্টা। আগে কার্যসিদ্ধি।

এতক্ষণ শ্রীম ফষ্টিনষ্টি করিতেছিলেন। কথা কহিতেছেন half in jest half in earnest! (কৌতুক ও দৃঢ়তার সহিত)। এবার গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন।

শ্রীম (গম্ভীরভাবে সকলের প্রতি) — ঠাকুর বিশ বছর ছিলেন ওখানে (পুরীতে) — চৈতন্যদেব। ঠাকুর বলতেন কি না, 'আমিই চৈতন্যদেব'। তাই তিনি নিজে যেতেন না, ভক্তদের পাঠিয়ে দিতেন। গেলে মহাভাবে

শরীর যেতে পারে পূর্বকথা স্মরণ করে। তাই যেতেন না। আমাদের পাঁচ ছয়বার পাঠিয়ে দিছলেন।

একটি বিশ-বাইশ বছরের ছাত্রের প্রবেশ।

শ্রীম (ছাত্রের প্রতি) — এই, আপনি যাচ্ছেন তো? (ছাত্রটি তো হতভম্ব)। এঁরা সব অনেকে পুরী যাচ্ছেন। আপনিও যাচ্ছেন তো? আপনি যেকালে এসে পড়েছেন, আপনাকে নিশ্চয় তিনি টানছেন। আমরা ছেলে বেলায় শুনেছিলাম — জগন্নাথ না টানলে যাওয়া যায় না। আপনার যাওয়া হবে। এই ক'দিন তো? আবার কনসেসান দিচ্ছে।

ছেলেটি মৌন। মনে হইতেছে, তাহার ইচ্ছা আছে, কিন্তু অসুবিধাও আছে।

একজন সাধু — মঠ থেকে অনেকে যাচ্ছেন।

শ্রীম — তা যাবে না? মনে কর, কত বড় নেমন্তন্ন! বাড়ির কড়াইয়ের ডাল তো রোজই আছে।

একজন সাধু (স্বগতঃ) — ঠাকুর বলতেন, অমৃতসাগরে ইচ্ছা করেই পড়, আর ধাক্কা খেয়েই পড় — ফল এক, অমৃতত্বলাভ। এঁরা দেখছি উত্তম বৈদ্য — ধাক্কা মেরে ফেলে দেন। মানুষের মনকে ঈশ্বরের দিকে নেবার কত কৌশলপ্রয়োগ! একেই বুঝি বলে 'সা চাতুরী চাতুরী'।

সন্ধ্যা। শ্রীম তুলসীতলায় ধ্যানমগ্ন।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
১৯শে জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার।

দ্বাদশ অধ্যায়

পুরীর মহিমা

১

আজ ২১শে জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার। মর্টন স্কুল। পঞ্চাশ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীট। তিনতলার বারান্দা। গ্রীষ্মকাল। এখন পাঁচটা। আজ দারুণ গরম। শ্রীম বারান্দার পূর্বপ্রান্তে বসিয়া আছেন। দৃষ্টি পূর্বদিকে, আকাশে। উদাস ভাব। চোখ মুখ শুষ্ক। শ্রীম-র পরনে সাদাপাড় ধুতি। গায়ে লংক্লথের পাঞ্জাবী। বেলুড় মঠ হইতে অন্তেবাসী আসিয়াছেন। প্রণাম করিলেন যুক্ত করে। সাধুদের শ্রীম পায়ে হাত দিতে দেন না। এমনকি, কাহাকেও দেন না।

জ্যৈষ্ঠ মাস। পৃথিবীকে যেন আজ তপ্ত কড়াইয়ে ভাজা হইতেছে। গরমে বড় কষ্ট হয় শ্রীম-র। অন্তেবাসীকে বলিলেন, চলুন উপরে ছাদে যাওয়া যাক।

শ্রীম চেয়ারে বসিয়াছেন ছাদে উত্তরাস্য। একটু একটু হাওয়া চলিতেছে। শ্রীম আনন্দে বলিতেছেন, এই হাওয়াটি পাওয়াতে বেঁচে গেলাম। শ্রীম বাম হাতে ডান হাতের নাড়ী টিপিতেছেন। আর বলিতেছেন — ঠাকুর বলেছিলেন, 'মাকে বিশ্বাস কর। তা হলে আর কিছু করতে হবে না।' 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি।'

অন্তেবাসী — ডায়েরী রয়েছে। আপনাকে শোনাবার জন্য এনেছি। এখন কি শুনবেন?

শ্রীম (আনন্দে) — হাঁ, পড়ুন পড়ুন।

অন্তেবাসী ডায়েরী পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন।

আজ ২১শে জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার। বেলুড় মঠ। কয়দিন শ্রীমহাপুরুষ অসুস্থ — ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছে। সকালে শরীরের তাপ ৯৮.৮; বিকালে বৃদ্ধি হয়, ১০০.৬—১০১ হয়। তবুও সাধুরা সকালে প্রণাম

করিতে আসেন। তখন যেন জ্বর নাই — নূতন মানুষ, ঠিক আচার্য, পরমহংস! সকলের কুশল প্রশ্ন করেন আনন্দে।

ঘরে এখন স্বামী নিগমানন্দ দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি গয়াতে ঠাকুরের আশ্রম করিয়াছেন। গয়ার আশ্রমের কথা মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। স্বামী পরমানন্দও গয়ায় থাকেন, cave-এ (গুহাতে)। তাঁহার কথা উঠিল। শ্রীমহাপুরুষ বলিতেছেন, সে চেলা করে না? ন্যাংটাবাবার চেলা বলে তাকে মানে লোক। ন্যাংটাবাবাকে সকলেই খুব মানতো। সে (রাখাল) মহারাজের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়। প্রথমে ন্যাংটাবাবার কাছে উপদেশ পায়, পরে মহারাজের কাছে।

দেওঘর বিদ্যাপীঠের একজন সাধু প্রণাম করিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছ? আনমনা ভাব, অসুস্থ। (সহাস্যে) আবার তো যেতে হবে ওখানে? সাধু উত্তর করিলেন, আজ্ঞে হাঁ। আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কবে? সাধু বলিলেন, কাল। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, (সত্যাগ্রহ) গোলমালের জন্য পিম (স্বামী জ্যোতিরূপানন্দ) টাকা কড়ি পায় নাই কিছুই।

'পিম' বিদ্যাপীঠের জন্য বিহারের মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানের অর্থ-সংগ্রাহক। এবার গান্ধীজীর দেশব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্য অর্থসংগ্রহ হয় নাই।

ডায়েরী পাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী মনীষানন্দের প্রবেশ। নমস্কারাদির পর শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কর্মস্থল কোথায়? (অন্তেবাসীকে দেখাইয়া) এঁর মাদ্রাজে ছিল। এখন দেওঘরে (বিদ্যাপীঠে) transferred (বদলী) হয়েছেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — এই কর্মের অধ্যক্ষ কে, জানেন? — ঈশ্বর। তাই ঠাকুর বলেছিলেন, মাকে অর্থাৎ কর্মাধ্যক্ষকে বল। তাহলে সব কমিয়ে দেবেন।

কর্ম করতে হবে। 'প্রকৃতি স্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি' (গীতা ১৮:৫৯)। আর একরকম আছে, যারা নিজেরা কর্তা। তাদের কথা আলাদা। মাঝে মাঝে নির্জনে সকলেরই যাওয়া দরকার।

অন্তেবাসী — অনেক দিন comforts-এর (আরামের) ভেতর থেকে শেষে যেতে কষ্ট হয়। শরীরে সয় না।

শ্রীম — আপনার যেতে হবে না। যাদের শরীর খারাপ তাদের জন্যই তো মঠ। পাখী আকাশে পরিশ্রান্ত হয়ে ডালে বসে বিশ্রাম করতে। তেমনি মঠ।

অন্তেবাসী — তা হলে আর ফার্স্ট ক্লাস (সাধু) হওয়া গেল না। সেকেণ্ড — থার্ড ক্লাস হল।

শ্রীম — না। ওঁর (ঈশ্বরের) দিক থেকে সেকেণ্ড, থার্ড নেই — 'নাদত্তে কস্যচিদ্ পাপম্'। আর সেকেণ্ড, থার্ডও ফার্স্ট হওয়ার জন্যই। তা না হলে 'অনন্য চিন্তয়ন্তঃ' করতে গেলে যে চলবে না।

কচ্ছপ আকাশে উড়তে গিছলো। কিন্তু পড়ে চুরমার হয়ে গেল। ঈগল কিন্তু বারণ করেছিল, তবুও উড়তে চাইলে।

একটা কচ্ছপের বড় সাধ সে আকাশে ওড়ে। তার ছিল বন্ধুত্ব একটা ঈগলের সঙ্গে। ঈগল সর্বদা ওড়ে। একদিন পীড়াপীড়ি করায় ঈগল বললে, আচ্ছা তুমি এই কাঠিটা কামড়ে ধরে থাক। আমি এটাতে করে তোমায় নিয়ে যাব। খানিকটা উড়েছে। তখন কচ্ছপের কথা কইতে ইচ্ছা হল। যা-ই বলা, অমনি নিচে পতন। তার দফা রফা হয়ে গেল।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — আপনার একটা জায়গায় স্থির হয়ে বসা উচিত। যাদের নিজেই 'যোগক্ষেম' বইতে হয় তাদের 'অনন্যশ্চিন্তয়ন্ত' হয় না। (গীতা ৯:২২)

একজন সাধু (স্বগত) — আমার বাসনাও তাই — একস্থানে স্থির হয়ে বসি — কাশী কিম্বা পুরীতে। মহাপুরুষ মহারাজ কিংবা মাস্টার মশায়কে জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা ছিল। অযাচিতভাবেই উত্তর মিলে গেল।

শ্রীম (একটু ভাবনার পর) — কনখলে যখন ছিলাম, তখন হরি মহারাজের (স্বামী তুরীয়ানন্দ) সঙ্গে বিকালে নানা আশ্রমে বেড়াতাম।

আজ শনিবার বলিয়া বহু ভক্ত আফিসের ফেরৎ আসিয়াছেন। কয়েকদিন পর পুরীতে রথযাত্রা। শ্রীম কিছুদিন হইতে পুরীর কথাই ভাবিতেছেন। ভক্তদের জোর করিয়া রথোৎসবে পাঠাইতে চেষ্টা করিতেছেন। যিনি আসিতেছেন তাঁহাকেই পুরী যাইতে বলিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর বলতেন, 'আমি আর চৈতন্যদেব এক।' তিনি পুরীতে প্রায় বিশ বছর ছিলেন। (ঠাকুর) ভক্তদের জোর করে

পাঠিয়ে দিতেন। নিজে যান নাই। তাহলে শরীর থাকবে না, পূর্বাবতারের সব কথা স্মরণ হলে। তাই ভক্তদের পাঠিয়ে সব সংবাদ নিতেন।

যান না আপনারা। ফস্ করে একবার দেখে আসুন না, এই কয়দিন বৈ তো নয়। হয়তো দুই তিন দিন।

টোটা গোপীনাথ, সিদ্ধবকুল, গম্ভীরা, সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বর — এই সব দর্শন করতে বলতেন। আর জগন্নাথ।

আমরা পাঁচ ছ' বারেরও বেশী গিয়েছি। একবার তিন উইক (week—সপ্তাহ) ছিলাম এক পাণ্ডার বাড়িতে। নির্জন বাড়ি, ঝাঁটপাট নেই। সাপের ভয় হতো। মশারী বিছানায় গুঁজে দিতাম। কি জানি কেন, এতে আমার অত nervousness (ভয়ের দুর্বলতা) হতো। মহাপ্রসাদ কিনে খাওয়া। ওতে কোনও গোলমাল ছিল না, চেষ্টাও ছিল না।

ঠাকুর বলেছিলেন, 'অনেক টাকা সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো'। আহা, কত ভাবতেন! লোকবল নাই — অর্থবল থাকলেও অনেক। আর বলেছিলেন, 'জগন্নাথকে আলিঙ্গন করবে।' এক একবার বলতেন, 'পুরীতে জগন্নাথও আমি।'

নরেন্দ্রকে (স্বামী বিবেকানন্দ) বলেছিলেন, 'নদের গৌরের নাম শুনেছিস্, সে-ই আমি।' নরেন্দ্রের তখন বছর উনিশ বয়স। নরেন্দ্র এসে আমাদের বললেন এই কথা। আর বললেন, 'লোকটা পাগল হয়েছে না কি? বলে কি আমি নদের গৌর!' আবার আমায় বললেন, কাউকে বলবেন না এ কথা (হাস্য)।

আবার গীতায়ও তাই বলেছেন, 'বহূনি মে ব্যতীতানি' (গীতা ৪:৫) — কিন্তু তুমি তা জান না। আমি সব জানি।

ভাটপাড়ার ললিত রায়ের প্রবেশ।

শ্রীম (ললিতের প্রতি) — এই যে ললিতবাবু এসেছেন। যান না একবার পুরী ঘুরে আসুন, রথ।

ললিত — থাকার স্থান যে নাই।

শ্রীম — কেন? শশী নিকেতনে থাকবেন। বলরামবাবুদের বাড়ি। জোর চলে। এ্যাটিকেট — ভদ্রতা আবার কি? (মৃদু হাস্য) (যদি বলে) 'যাও যাও' (তখন বলবেন) আমি যাব না। শুয়ে পড়লাম (দীর্ঘ হাস্য)।

ঠাকুর বলেছিলেন, 'দুইরকম লোক আছে একরকম optimistic (আশাবাদী) উঠে পড়ে লাগে। কোন বাধা মানে না। আর এক pessimistic (নিরাশাবাদী)। তাদের আঠার মাসে বছর, বলতেন। তারা সাত পাঁচ ভাবে — কোথায় থাকবে, সুবিধা হবে কি না — এই সব ভাবনা ভাবে।

একটি সাধু (স্বগতঃ) — ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ। শ্রীম তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ — তাঁর এক কলা শক্তির আধার। শ্রীরামকৃষ্ণের পাদস্পর্শে তাঁর শরীর মন পবিত্র। আমিও শ্রীম-র পাদস্পর্শ করে পবিত্র হব।

সন্ধ্যা হইয়াছে। শ্রীম উঠিয়া তুলসীতলায় যাইবেন। একটি সাধু অন্ধকারে হঠাৎ ভূলুণ্ঠিত হইয়া শ্রীম-র পাদস্পর্শ করিলেন। শ্রীম দেখিয়াও বাধা দিলেন না আজ।

বিস্তৃত ছাদের উত্তরাংশে তুলসীকুঞ্জ। উহা কুসুমকাননের একাংশ। ইদানীং শ্রীম-র ইচ্ছায় উহা রচিত হইয়াছে। তুলসীকুঞ্জে বসিয়া শ্রীম ধ্যান করিতেছেন উত্তরাস্য। চারিদিকে ভক্তগণও ধ্যানমগ্ন।

অন্তেবাসী (স্বগতঃ) — ঠাকুর এক সময়ে তুলসীকুঞ্জে ধ্যান করিতেন। শ্রীম বুঝি তাহারই অনুকরণ করিতেছেন।

২

ধ্যানান্তে শ্রীম ছাদের দক্ষিণ দিকে আসিয়া বসিলেন মাদুরের উপর উত্তরাস্য। ভক্তগণ বসিয়াছেন কম্বলে শ্রীম-র সম্মুখে। এখন রাত্রি সাড়ে আটটা। চৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ চলিতেছে — মধ্যখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, রথাগ্রে নর্তন। হিমাংশু প্রথমে পড়িলেন, তারপর ভাটপাড়ার ললিত। শ্রীম যুক্ত করে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুনিতেছেন।

মহাপ্রভু ভক্তগণকে সাতটি দলে বিভক্ত করিলেন। প্রত্যেক দলের এক একজন দলপতি। তাঁহারা রথাগ্রে কীর্তন করিয়া চলিয়াছেন। স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য একদলে নৃত্যরত। তিনি নৃত্যানন্দে বিভোর। তেমনি অপর দলে নৃত্য করেন নিত্যানন্দ। অদ্বৈত, হরিদাস, বক্রেশ্বর — ইঁহারা নৃত্য করিবার আদেশ পাইলেন মহাপ্রভুর নিকট হইতে। রথের অগ্রে চার দল — তাহাদের দলপতি স্বরূপ, শ্রীবাস, মুকুন্দ ও গোবিন্দ।

রথের দুই পার্শ্বে দুই দল — কুলীনগ্রামের ভক্তগণ এক দলে। অপর পাশের দলে অদ্বৈতের অনুচরগণ। রথের পিছনে এক দল। সাত দলে চৌদ্দ মাদল বাজিতেছে, নৃত্য আর উচ্চকীর্তন চলিতেছে। মহাপ্রভুর অশ্রুকম্প স্বেদপুলক হইতেছে। জগন্নাথ-নাম উচ্চারণ করিতে পারিতেছেন না ভাবাবেশের তীব্রতায় — তাই গোঙ্গাইতেছেন — 'জ জ' 'গ গ' বলিয়া।

শ্রীম — সাত দলের দলপতিদের নাম বলুন তো?

পাঠক —স্বরূপ, শ্রীবাস, মুকুন্দ ও গোবিন্দ — এই চারজন রথাগ্রের দলপতি। আর তিন দলের দলপতিদের নাম নেই।

শ্রীম (সহাস্যে) — রথ অনেক স্থানে দাঁড়ায়। পাণ্ডারা বলে জগন্নাথের ইচ্ছায় দাঁড়ায়, আবার তাঁর ইচ্ছায় চলে। মডার্নরা বলে আমরা ইঞ্জিন বেঁধে চালাব, দেখি কেমন জগন্নাথের ইচ্ছায় চলে। পাণ্ডারা তখন জোড়হাত করে বলে, না বাবু, উ-টি করবেন না। আমাদের পাওনা তা হলে মাটি হবে। ইঞ্জিন কি জগন্নাথের ইচ্ছায় হয় নি? তিনি যে সর্বঘটে বুদ্ধিরূপে অবস্থান করছেন — 'যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা'!

পাঠ আবার চলিতেছে। শ্রীনিবাস হরিচন্দনকে ভাবাবেশে চড় মারিয়াছেন। কেন না, তিনি শ্রীনিবাসের গায়ে হাত দিয়া ঠেলিয়া দেন বারবার। তাহাতে ভাবাবেশে ক্ষুব্ধ হইয়া চড় মারেন। হরিচন্দন আর রাজা প্রতাপরুদ্র দাঁড়াইয়া মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শন করিতেছিলেন। শ্রীনিবাস আসিয়া রাজার সামনে দাঁড়ান। তাই তাঁহাকে ঠেলিয়া দেন যাহাতে রাজা দেখিতে পারেন। হরিচন্দন রাজমন্ত্রী। তিনিও ক্ষুব্ধ হইয়া শ্রীনিবাসকে অপমান করিতে প্রস্তুত দেখিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে বারণ করেন। বলেন, তুমি ভাগ্যবান, চৈতন্যপার্ষদের হস্তস্পর্শ পাইলে। আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিল না।

শ্রীম — প্রতাপরুদ্র রাজা। তাঁকে দর্শন দেন নি কেন এত দিন? এইজন্য — রাজাকে ভজনা করা মানে, ঐশ্বর্যকে ভজনা করা। বিষয়ীর শ্রেষ্ঠ রাজা। কিন্তু আজ তাঁর ভাগ্যোদয় হল।

সার্বভৌম, কাশীমিশ্র প্রভৃতির উপদেশে রাজা আজ দীনবেশে রথাগ্রে ঝাড়ু দিতেছেন আর চন্দন-জল রাস্তায় ছিটাইতেছেন। আর ভাগবতের

গোপীগীতা আবৃত্তি করিতেছেন —

তব কথামৃতম্ তপ্তজীবনম্ কবিভিরীড়িতম্ কল্মষাহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্ ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীগীতা)

মহাপ্রভু এই গীত শুনিয়া উন্মত্তবৎ গিয়া রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন। এটা হয় শেষে। কিন্তু পূর্বে একবার ভাবাবেশে দর্শনরত রাজাকে আলিঙ্গন করিতেই ভাব ভঙ্গ হইয়া গেল। ধিক্কার দিয়া নিজেকে বলিতে লাগিলেন — 'ছি, ছি, বিষয়ীর স্পর্শ হইল আমার।' মহাপ্রভু বেহুঁশ হইয়া রথাগ্রে পড়িয়া যাইতেছেন। রাজা তাঁহাকে ধরেন। তাই ধিক্কার দিয়া এই কথা বলিলেন। আর নিত্যানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দাদি ভক্তজনকে দোষ দেন — কেন তাঁহারা তাঁহার পার্শ্বরক্ষা করেন নাই। তবে রাজা ধরিতে পারিতেন না।

সার্বভৌম রাজাকে প্রবোধ দেন। বলেন, আপনার উপর কৃপা হইয়াছে।

শ্রীম — ভক্তদের শিক্ষার জন্য কেবল এই বিষয়নিন্দা আর রূঢ় কথা বললেন। দীন না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। তাই বাইবেলে আছে, "Blessed are the poor, for they shall see God." (অন্তরে যারা দীন তারা ধন্য — ঈশ্বর তাদেরই দর্শন দেন।)

আবার আছে, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. (Matth—18:3) (শিশুর মত দীন নিরহঙ্কার না হলে ধর্মরাজ্যে প্রবেশ অসম্ভব)।

ললিতের বয়স প্রায় পঞ্চান্ন। চশমা ছাড়া পড়িতে তাঁহার কষ্ট হইতেছে। অমৃত তাই অপর একজনের চশমা আনিয়া দিলেন। শ্রীম বাধা দিয়া বলিলেন, না, এতে attention diverted (মনোযোগ ব্যাহত) হয়ে যায়। পাঠের সময় disturbance (গোলমাল) না হয়।

এই টোটায় একবার মহাপ্রভু বিশ্রাম করছিলেন। তখন রাজা প্রতাপরুদ্র গিয়ে পদসেবা করেন। রথের পূর্বে, গুণ্ডিজামন্দির মার্জন করেন স্বগণসহ মহাপ্রভু। তারপর 'পকাল' অর্থাৎ পান্তা প্রসাদ খেয়ে বিশ্রাম করেন।

একজন সাধু — আজকাল রামদাস বাবাজী ঐরূপ মার্জনা করেন,

আর আইটোটায় পান্তা প্রসাদ খান সকলে। আমিও একবার ওঁদের সঙ্গে থেকে গুণ্ডিজা মার্জনা করেছিলাম।

শ্রীম (অতি আনন্দে ভক্তদের প্রতি) — এই দেখুন, ইনি গুণ্ডিজা মার্জন ও আইটোটার পান্তা মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করেছিলেন। যান না, আপনারাও করে আসুন না একবার।

পাঠ চলিতেছে। গোপীগণের অহেতুক কৃষ্ণপ্রেমের কথা হইতেছে। ব্রজ ছাড়িয়া মথুরায় কৃষ্ণ চলিয়া আসিলে শ্রীরাধাপ্রমুখ গোপীগণ বিরহকাতর। সংবাদ পাঠাইয়াছেন — তুমি আসিয়া ব্রজাঙ্গনাগণকে জীবিত কর। তাহারা অর্ধমৃত।

শ্রীম — আহা, কি প্রেম! সংসার ভুল হয়ে গেছে! মৃতের মত গোপীগণ কৃষ্ণবিরহে। তাই তো ঠাকুর গোপীদের অত মান দিতেন। বলতেন, তাদের প্রেমের এককণা পেলে হেউ ঢেউ হয়ে যায়।

উদ্ধবকে এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে পাঠান। বলছেন — যাও, যাও উদ্ধব, গোপীদের সংবাদ নিয়ে এস। আমাকে যখন কেউ জানতো না, তখন এরা ভালবেসেছে। তাদের ঋণ আমি শোধ করতে পারি না। তাইতো মহাপ্রভু বলতেন নিজেকে — 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োঃ দাসদাসানুদাসঃ।' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দাসের দাসানুদাস আমি।

শ্রীম চৈতন্যকৃত সম্পূর্ণ শ্লোকটি আবৃত্তি করিতেছেন —

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপিবৈশ্য ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে
গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।।

শ্রীম — শ্রীরাধার ভাবে মহাভাবগ্রস্ত শ্রীচৈতন্যদেব। শেষের দ্বাদশ বৎসর এই একটানা মহাভাবে বিলীন ছিলেন গম্ভীরায়। এইসব ভাবের স্পর্শ এখনও রয়েছে পুরীতে। যান না, যান একবার হয়ে আসুন।

এখন রাত্রি প্রায় নয়টা। সাধু ও ভক্তরা শ্রীমকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

বেলুড় মঠ। ২১শে জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রোগশয্যায় শ্রীম

১

মর্টন স্কুল। আজ ১৫ই অক্টোবর, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার। আশ্বিন মাস, ১৩৩৭ সাল। লক্ষ্মীপূর্ণিমা কয়েক দিন হয় গিয়াছে। শ্রীম সওয়া ছয়টায় তিনতলা হইতে হাতমুখ ধুইয়া চারতলার ছাদে যাইয়া বসিলেন। বেলুড় মঠের কয়েকজন সাধু শ্রীমকে দর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা উঠিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিলেন। শ্রীম সাধুদের আসনে বসাইয়া নিজে চেয়ারে বসিলেন। সাধুদের জন্য দুইটি বেঞ্চি একসঙ্গে রাখিয়া তাহার উপর একখানি সতরঞ্চি পাতা হইয়াছে।

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ ও অজয়ানন্দ বেলুড় মঠ হইতে ১।৫৫-এর স্টীমারে চড়িয়া আসেন ও বৌবাজারে বাঁকা রায়ের গলিতে স্টুডেন্টস্ হোমে যান। সেখান হইতে ওয়েলিংটন স্ট্রীটে ডাক্তার ভাদুড়ীর Eye Clinic (চক্ষু চিকিৎসালয়) হইয়া মর্টন স্কুলে আসিয়াছেন শ্রীমকে দর্শন করিবার মানসে। স্বামী বামদেবানন্দ আসিলেন 'উদ্বোধন' অফিস হইতে। স্বামী ধর্মেশানন্দও সেখান হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন। ব্রহ্মচারী ক্ষীরোদও (পরে স্বামী রমানন্দ) 'উদ্বোধন' হইতেই আসিয়াছেন।

সন্ধ্যার আলো এখনও আসে নাই। শ্রীম সাধুদের সঙ্গে দুই একটি কথা কহিয়া সকলের কুশল জানিয়া লইলেন। আলো আসিতেই তিনি উঠিয়া লম্বা ছাদের উত্তর প্রান্তে পুষ্পকাননে যাইতেছেন। সাধুদের বলিলেন, আপনারা বসে তাঁর চিন্তা করুন। আমরা আসছি তুলসীতলা থেকে।

পুষ্পকাননের এক অংশে তুলসীকুঞ্জ। ত্রিশ পঁয়ত্রিশটি বড় বড় মাটির টবে গ্যাঁদা, বেলী, জবা, স্থলপদ্ম প্রভৃতি পুষ্পতরু তিন দিকে রহিয়াছে। দক্ষিণ দিক খোলা। মধ্যস্থলে তুলসীকুঞ্জ। কতকগুলি তুলসী গাছ একটি বৃহৎ টবে।

শ্রীম উত্তরাস্য, ছাদের উপর বসিয়া আছেন একটি কম্বলাসনে। আসনখানা হাতে করিয়া আনেন রোজ এবং লইয়া যান, আর চেয়ারের উপর পাতেন। শ্রীম-র সামনে তুলসীমঞ্চ।

অন্তেবাসী কিছুক্ষণ বেঞ্চিতে বসিয়া আছেন। তাঁহার ভাল লাগিতেছে না। শ্রীম-র কাছে যাইয়া বসিবার ইচ্ছা। ইতস্ততঃ করিতে করিতে তিনি শ্রীম-র পিছনে গিয়া বসিলেন, ছাদের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত বেঞ্চি হইতে উঠিয়া। তিনি বসিয়া জপ করিতেছেন। মন বড় প্রসন্ন। ভাবিতেছেন — কি সৌভাগ্য, গুরুমূর্তি সামনে বসা! অবতারের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। বসিতেই মন কি আনন্দময় হইয়া উঠিল। কেন আগে আসিয়া বসেন নাই বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন।

একটি সাধু ভাবিতেছেন, শ্রীম-র বরাবরের ইচ্ছা তপোবনে বাস করেন ঋষিদের মত। সর্বদা না হইলেও মাঝে মাঝে, সারা জীবন এই আদর্শ পালন করিয়া আসিতেছেন। এখন জীবনসায়াহ্ন। পূর্ণভাবে না হইলেও আংশিকভাবে তপোবনবাসের গভীর আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। তাই পুষ্প-বৃক্ষাদিমণ্ডিত এই ক্ষুদ্র তপোবন। তিনি ভাবিতেছেন, শ্রীম-র জীবন তো প্রায় শেষ হইতে চলিল। আমাদের ভাগ্যে কি এই দিব্য ঐশ্বর্য লাভ সম্ভব হইবে, তপোবনে সর্বদা বাস করার?

শ্রীম আরও পনের মিনিট পর উঠিয়া পড়িলেন। কেন না সাধুরা অপেক্ষা করিতেছেন। ছাদের দক্ষিণ প্রান্তে আসিয়া তাঁহার চেয়ারে বসিলেন উত্তরাস্য। সাধুরা শ্রীম-র বাম দিকে বসা। সামনে ও ডান হাতে বেঞ্চিতে ভক্তগণ বসা, নিত্য যাঁহারা আসেন — বলাই, মনোরঞ্জন প্রভৃতি। খানিকক্ষণ পরে সাধুদের ন্যাড়া মাথা লক্ষ্য করিয়া শ্রীম উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, চলুন ঘরে গিয়ে বসা যাক, হিম পড়ছে। শ্রীম-র মাথায় কাপড়।

সিঁড়ির ঘরে শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তগণ শ্রীম-র আদেশে বাহির হইতে সতরঞ্চি উঠাইয়া আনিলেন, আর উত্তর দিকের জোড়া বেঞ্চির উপর পাতিয়া দিলেন। সাধুরা বসিলে শ্রীম তাঁহাদের সামনে সিঁড়ির পাশে চেয়ারে বসিলেন, উত্তরাস্য। বলিলেন, আপনারা সব দেখছি ন্যাড়া। প্রথম হিম মাথায় লাগলে অসুখ করে, তাই ভিতরে বসা! আমার মাথায় চাদর ছিল, হিম লাগতে পারে নাই।

খগেন ডাক্তারের প্রবেশ। ইনি সম্প্রতি ঁকাশী হইতে ফিরিয়াছেন। শ্রীম তাঁহার সহিত কাশীর নানা সংবাদ লইতেছেন। গদাধর মহারাজের (স্বামী জগন্নাথানন্দের) কথা হইতেছে। তিনি কাশীতে অদ্বৈতাশ্রমে আছেন। বাল্যাবস্থা হইতেই শ্রীম-র স্নেহভাজন।

খগেন ডাক্তার — কাশীতে একজন সাধু আছেন, নাম রামানন্দ গিরি! খুব পণ্ডিত। নিজের আশ্রম আছে। সেখানে শিবমন্দির। গদাধর মহারাজ মনে করেন, উনিই এঁর কাকা।

শ্রীম — হাঁ। উনি বলছেন না কি, বাংলা ও উৎকলের জলবায়ু অত্যন্ত খারাপ শরীরের পক্ষে। এ একটা clue (নিশানা) বটে। উৎকলের কথা কি করে বলবেন, যদি উনি ওখানে না থেকে থাকেন?

গদাধরের কাকা সতের আঠার বৎসর থেকে নিরুদ্দেশ। প্রথম চার পাঁচ বছর পরে একবার এসেছিলেন দেশে, গুরুর আদেশে। তখন বিয়ে হল। বিয়ের দিন বউ ঘরে নিয়ে যাচ্ছে মা, শোয়াতে। (সহাস্যে) অমনি লাঠি নিয়ে একেবারে তাড়া (সকলের হাস্য)। মা বললেন, তবে বিয়ে করলি কেন? উনি উত্তর করলেন, গুরু বলেছেন তাই বিয়ে করেছি। বউ টউ শোয়ান হবে না। তার পরদিনই একেবারে নিরুদ্দেশ। সেই বউটি কতক দিন হয় শরীর রেখেছেন।

গদাধরের ধারণা ইনিই তার কাকা। খুব পণ্ডিত। হিন্দুস্থানীতে কথা ক'ন। গদাধর উড়িয়াতে তাঁর সঙ্গে কথা কয় — 'আইছন্তি, খাইছন্তি'। যদি আরও কোন clue (পরিচয়) পায়।

অন্তেবাসী — গিরিশবাবু বলেছিলেন, মানুষকে রাগালেই মাতৃভাষা বের হয়ে যাবে। এই পলিসি নিলে হয়। (শ্রীম ও সকলের দীর্ঘ উচ্চ হাস্য)।

খগেন ডাক্তার — উনি ভারি পণ্ডিত। সকলে মানে। গদাধর মহারাজকে বলেন — পড়, বিদ্যালাভ কর। নয়ত বাপ-মাকে ছেড়ে কেন এলে? লাল কাপড় ছেড়ে ঘরে চলে যাও, যদি বিদ্যালাভ না কর। ইনি উত্তর করলেন, ভগবানলাভই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য — পাণ্ডিত্য, শ্লোক আওড়ান নয়।

রামানন্দজীর অনেক ভক্ত। তাঁরাই কাশীতে দেবালয় ও আশ্রম করে

দিয়েছেন। গদাধর মহারাজকে এই আশ্রম দিয়ে দিতে চান, আর তাঁর সব বই। ইনি বলছেন, অদ্বৈতাশ্রমে দাও। মাঝে মাঝে গদাধর মহারাজকে নিয়ে বেড়াতে যান। রাস্তায় পান কিনে নিজেও খান, এঁকেও খাওয়ান।

শ্রীম — এই আর একটা clue — নিশানা। উৎকলের লোক খুব পান খায়। আর যেকালে গদাধরকে আশ্রম দিতে চায়।

এতক্ষণ এইসব কথাবার্তা হাসিখুশির ভিতর চলিতেছিল। এখন শ্রীম গম্ভীর। কেহ কোন কথা বলে না, সকলে নীরব। কিছুক্ষণ পর শ্রীম কথাপ্রবাহ পরিবর্তন করিয়া দিলেন।

শ্রীম (অন্তর্মুখীন গাম্ভীর্যে) — ঠাকুরের সামনে বঙ্কিমবাবুর বই পড়া হয়েছিল। ঠাকুর শুনে বললেন, এই আছে একদল লোক। এদের মতে বিদ্যালাভ না হলে হবে না। তিনি বলতেন, যদি ঈশ্বরলাভ হয় (কণ্ঠে হাত দিয়া) তাহলে কণ্ঠে এসে সরস্বতী বসেন।

অবতারের message-ই (বাণীই) অন্য রকম। তাই বাল্মীকীকে 'মড়া' মন্ত্র জপ করতে দিলেন। 'ম' মানে ঈশ্বর, 'ড়া' মানে জগৎ। আগে ঈশ্বর, তারপর অন্য সব।

সাধুদের জন্য অবতারের ভারী ভাবনা। খালি কি গৃহস্থের জন্য? তাই গীতায় আছে —

পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভাবমি যুগে যুগে।। (গীতা ৪:৮)

মা-ঠাকরুণদের সামনেও এই সব কথা হয়েছিল। কাশী, বৃন্দাবন তীর্থ করে একজন ভক্তকে (শ্রীম-র ধর্মপত্নী গিন্নীমাকে) মা বললেন, অত জায়গা দেখলুম মা, কিন্তু তাঁর (ঠাকুরের) মত অমন সাধু দেখলুম না কোথাও। ভক্ত মহিলাটি উত্তর করলেন, মা তুমি যে কি বল — অন্য সাধুরা আসেন উদ্ধার হতে, আর তিনি এসেছেন উদ্ধার করতে। তাই গীতার কথার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে — 'পরিত্রাণায় সাধূনাম্।' সাধুগণের ত্রাণের জন্য তাঁর আগমন।

হবে না সাধুদের জন্য তাঁর ভাবনা বেশী! তাঁরা যে সব ছেড়ে কেবল তাঁকে নিয়েই রয়েছেন। এই যে সব সাধুরা, কত বিদ্যা — ওঁদের জন্য।

২

কিছুকাল আবার নীরব। আবার কথা।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — বক বড় স্যায়না — মাছের দিকে দৃষ্টি! কি করে মাছটা ধরবে plan (পরিকল্পনা) করছে, long or short (বড় কিম্বা ছোট)। ওমা, তার পেছনে শিকারী (তীরনিক্ষেপের অভিনয় করিয়া) এমনি করে দাঁড়িয়ে আছে। মৃত্যু যে সম্মুখে রয়েছে! Plan (পরিকল্পনা) করে কি করবে?

শ্রীম (সতীনাথের প্রতি) — গাও না একটা গান — শুনিয়ে দাও সাধুদের।

একজন সাধু শ্রীম-র পাশে চেয়ারে বসিয়াছিলেন। তিনি উঠিয়া গিয়া অন্যত্র বসিলেন। সতীনাথকে আনিয়া এখানে বসান হইল।

শ্রীম — এ-টি গাও — 'দিক্‌বসনা চন্দ্রভাল'। আর ও-টি — 'হৃদয়কমল মঞ্চে দোলে'। এইটি অন্তরের আর ঐটি বাহিরের।

হারমোনিয়ামসংযোগে সতীনাথ (পরে স্বামী সুপর্ণানন্দ) সুমধুর কণ্ঠে গাহিতেছেন —

লম্বিত গলে মুণ্ডমাল দম্ভিতা ধনি মুখ-করাল।
স্তম্ভিত পদে মহাকাল, কম্পিতা ভয়ে মেদিনী॥
দিগ্‌বসনা চন্দ্রভাল, এলায়ে পড়েছে কেশজাল,
শোভিত অসি করে কপাল প্রখরা শিখরি-নন্দিনী।
চারিদিকে কত দিকপাল, ভৈরবী শিবা তাল বেতাল,
অতি অপরূপ রূপ বিশাল কালী কলুষনাশিনী॥

গানের শেষ চরণ গীত হইতেছে — 'অতি অপরূপ রূপ বিশাল কালী কলুষনাশিনী॥' শ্রীম উঠিয়া বেগে তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তৎপূর্বে দৌহিত্র নেলু ঐ ঘরে গিয়াছে। একটু পর বলাই ঘরে গিয়া, আবার বাহিরে আসিয়াই পাখা নিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। অন্তেবাসী বুঝিলেন, ভিতরে কিছু হইয়াছে। তিনিও ঘরে গেলেন।

শ্রীম বিছানায় ছট্‌ফট করিতেছেন! নিউরলেজিক বেদনার আক্রমণ হইয়াছে। মাঝে মাঝে হয়। আজের আক্রমণ তীব্র। দম বন্ধ হইয়া যাইতেছে। বলিতেছেন, নাকের কাছে হাওয়া কর — জোরে কর।

অন্তেবাসী শ্রীম-র বিছানায় বসিতে তিনি উঠিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। বালকের মত যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ব্যাকুলভাবে বলিতেছেন, জগবন্ধু, ও জগবন্ধু। আবার বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। 'উহু উহু উহু' করিতেছেন। আবার উঠিলেন। আবার গলা জড়াইয়া কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া বলিতেছেন — ও জগবন্ধু, উহু উহু উহু।

বলিতেছেন, নরম বিছানা আন। ঘাড়ে press (চাপ প্রদান) কর, আরো জোরে — উহু উহু। বারবার বিছানায় উঠিতেছেন আর পড়িতেছেন। সাধু ও ভক্তরা কিছুই করিতে পারিতেছেন না বেদনা লাঘব করিবার জন্য। খগেন ডাক্তারও পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। নিচে খবর গেলে শ্রীম-র জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভাসবাবু ও নাতিরা আসিলেন। আবার কষ্টে বলিতেছেন, joints (হাতের গাঁট)-এ কট্‌কট্‌ করছে। আগুন দাও। বলাই ও মনোরঞ্জন হ্যারিকেনের উপর ফ্ল্যানেল গরম করিয়া সেঁক দিতেছেন — বাঁ হাতের গাঁটে আর ঘাড়ে।

পাড়ার একজন ডাক্তারও আসিয়াছেন। এতক্ষণ কেবল সেঁকই চলিতেছে। এখন সঙ্গে সঙ্গে গরম জলের বোতল, রাবারের ব্যাগে গরম জল — এ সবেরও সেঁক চলিতে লাগিল। অজস্র ঘাম হইতেছে, কিছুতেই থামিতেছে না। শুকনা কাপড় দিয়া ঘাম মুছান হইতেছে একটু পর পর। এইরূপে রাত্রি দশটা পর্যন্ত সেঁক চলিতে লাগিল। অন্তেবাসীর শরীর রুগ্ন ও দুর্বল। গরমে তাহার কষ্ট হইতেছে দেখিয়া প্রভাসবাবু ডাকিয়া বাহিরে ছাদে লইয়া গেলেন।

পাঁচ মিনিট পরই শ্রীম বলিতেছেন — কোথা গেলে জগবন্ধু, আঃ এসো না। একজন ভক্ত গিয়া বলিতেই উনি আসিয়া বিছানার কাছে দাঁড়াইতেই শ্রীম বলিলেন — বসো, এখানো বসো। আবার গলা জড়াইয়া 'উহু উহু' করিতেছেন। অন্তেবাসী গায়ে পিঠে হাত বুলাইয়া প্রবোধ দিয়া বলিলেন, 'এক্ষুণি আরাম হয়ে যাবে' — যেমন লোকে ছেলেমানুষদের বলে।

এতক্ষণে ঘরে লোকে লোকারণ্য। ভক্ত ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষও আসিয়াছেন। সকলে দাঁড়াইয়া আছেন। অদ্বৈতাশ্রমের সাধুরা — বীরেশ্বরানন্দ, ধীরাত্মানন্দ, প্রেমাত্মানন্দ প্রভৃতি সকলে উপস্থিত। তিন

ঘন্টার উপর এই আক্রমণ চলিল। পৌনে সাতটায় আরম্ভ হইয়াছে, এখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। এরূপ দারুণ আক্রমণ আর ইতিপূর্বে কখনও হয় নাই। দশটার পর বিছানায় লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে নিদ্রা আসিল। দুইজন ভক্ত ঘরে রহিলেন। ডাক্তারদের কথায় আর সকলে বাহির হইয়া ছাদে গেলেন।

স্বামী অজয়ানন্দ ও নিত্যাত্মানন্দ প্রায় রাত্রি এগারটায় 'স্টুডেন্টস্ হোম' গেলেন, বাঁকা রায়ের গলি।

ডাক্তাররা বলিলেন, ঘরে লোক যাবে না। কথা কইলে আবার হতে পারে। তাই মাত্র একজন ঘরের বাহিরে দোরগোড়ায় থাকিয়া পাহারা দিতেছেন সর্বদা। পরদিন বৃহস্পতিবারও সারাদিন এই ব্যবস্থা। কিন্তু শ্রীম তাহাতে প্রসন্ন নন। তিনি চান, সাধু ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুরের কথা বলিতে। তিনি সর্বদাই বলেন, এতে আমার রোগযন্ত্রণার উপশম হয়। একবার একমাস ধরে জ্বর। ছাড়ে না। ডাক্তারেরা কথা বন্ধ করে দিয়েছেন। বাড়ির লোক ভয় পেয়ে ভক্ত ডাক্তার সত্যশরণ চক্রবর্তীকে ডাকালেন। তিনি এসে বললেন, আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন।

এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া শ্রীম ভক্তদের সর্বদা বলিতেন, যে-ই ঠাকুরের কথা বলতে লাগলাম, অমনি জ্বর ছেড়ে গেল আর শীঘ্র আরাম হয়ে গেলাম। মনে কর, প্রাণ যা নেয় তা যদি না পায়, কেমন করে বাঁচে? একরকম বাল্যকাল থেকেই আমরা তাঁর চিন্তা করছি, তাঁর কথা বলছি। এটা হয়ে গেছে স্বভাব। তা যদি বন্ধ করে দেয় তবে কি করে বাঁচে মানুষ?

বেলুড় মঠে শ্রীম-র অসুখের সংবাদ গিয়াছে। সেখান হইতে সাধুরা দেখিতে আসিতেছেন। কলিকাতার বিভিন্ন কেন্দ্র হইতেও সাধুরা আসিতেছেন। সাধু ভক্তের মেলা লাগিয়া গিয়াছে। সকাল আটটার পর আসিলেন স্বামী ওঁকারানন্দ ও জ্যোতির্ময়ানন্দ। স্বামী ওঁকারানন্দ শ্রীম-র মর্টন স্কুলের ছাত্র আর পাড়ার ছেলে। তাই শ্রীম তাঁহাকে বড় স্নেহ করেন। কাছে বসাইয়া মিষ্টিমুখ করাইলেন। আর গত রাত্রির বেদনার কথা একে একে সব বলিলেন — যেমন লোক দরদীকে বলে।

শ্রীম — দেখ, দেহের এই হাল। এই নিয়ে মানুষ কি করে অহংকার

করে! Mudball (মাটির ঢেলা) এই দেহটা। কিন্তু ঠাকুর বলতেন, এই পাঁকের ভেতর থেকেই পদ্মফুল ফোটে তাঁর কৃপায়। তাঁর অসুখের সময় এক একদিন কি যন্ত্রণা! ডাবর ডাবর রক্ত যাচ্ছে। এক একবার ছট্‌ফট্ করছেন। এরই মধ্যে একটু ভাল বোধ করলেই ঈশ্বরীয় কথা। তখন রোগ নাই, যেন আর এক মানুষ। তাই তো ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার converted (সত্যধর্মে পরিবর্তিত) হলেন, রোগযন্ত্রণার ভিতরও এই আনন্দময় সরস বিদেহ ভাব হয় কি করে দেখে। মনটাকে ব্রহ্মে লীন করে দিতেন এমনভাবে। তখন কোথায় শরীর! কখনও এর একটু নিচে রাখতেন, তখনও দেহজ্ঞান নাই — দেহটা দেখছেন যেন একটা ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত মনে পড়ে।

বেলা দশটার সময় একটি ভক্ত মহিলা নিজের ছেলেকে নিয়া আসিয়াছেন শ্রীমকে দর্শন করিতে। হাতে ফল। তিনি ঘরের ভিতর ঢুকিয়াছেন, শ্রীম শুইয়া। সেবক মনোরঞ্জন বলিলেন, আপনি প্রণাম করে উঠে পড়ুন, ওঁর অসুখ। শ্রীম ইতিপূর্বেই তাঁহাকে আসন দিয়া বসাইয়াছেন। ভক্ত মহিলাটির পক্ষ নিয়া শ্রীম অনুনয় করিয়া সেবকদের বলিলেন, হাঁ, হাঁ যাচ্ছে, যাচ্ছে। একটু বসতে দাও।

মহাপুরুষের কি করুণা! মৃত্যুমুখেও জীবকল্যাণের চিন্তা!

৩

পরদিন শুক্রবার। শ্রীম চারতলার কক্ষেই থাকেন। ভক্তরা তিনতলার ঘরে বসা। সিঁড়ির গোড়ায় পাহারা দিতেছেন একজন। সাধুরা আসিলে এখানেই বসান হয়। পরে শ্রীম-র কাছে সুবিধামত লইয়া যান। বেলা এগারটা পর্যন্ত লোকের ভীড় লাগিয়া আছে।

সন্ধ্যার পূর্বে শ্রীম নিজের ঘরেই শৌচে গেলেন একটা সরাতে। অন্তেবাসী চারতলার ঘরের বাইরে বেঞ্চিতে বসা। দরজা খুলিয়াই শ্রীম তাহাকে বলিলেন, আপনারা একটু ওদিকে (ছাদে) যান। শ্রীম নিজ হাতে কাগজ ঢাকা দিয়া ময়লার সরাটা নিয়া ধীরে ধীরে তিনতলার পায়খানায় গেলেন। কয়দিন হইতেই ভক্তরা এ বিষয় নিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিতেছেন, তাঁহারা সাফ করিবেন। শ্রীম উহা শুনেন না। মহাপুরুষগণ

মৃত্যুশয্যাতেও নীতি ছাড়েন না, আর জীবশিক্ষা দেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে। শ্রীম চারতলার ঘরে বিছানায় বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন। বাহিরে সিঁড়ির ঘরে ও ছাদে নিত্যকার ভক্তগণ ও সাধুরা অনেকে অপেক্ষা করিতেছেন। কিছুক্ষণ পর একজন ভক্তকে দিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে চারিখানা চেয়ার রাখাইলেন। বলিলেন, যান, সাধুদের এনে এখানে বসান।

স্বামী ধীরাত্মানন্দ, নিত্যাত্মানন্দ, জিতাত্মানন্দ আর ব্রহ্মচারী গৌর — ইঁহারা সকলেই বেলুড় মঠের সাধু। শ্রীম বিছানায় শায়িত। গায়ে লং-ক্লথের পাঞ্জাবী। সাধুরা চেয়ারে বসিলে শ্রীম উঠিয়া বসিলেন। একজন ভক্তকে বলিলেন, দেখি কে কে? ভক্ত হ্যারিকেনটা ধরিলে একজন সেবক সাধুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ও! সকলের মুখ দর্শন করিয়া এইবার স্বামী ধীরাত্মানন্দের সঙ্গে আনন্দে কথা কহিতেছেন — ঐ এক কথা।

শ্রীম — দেহের এই অবস্থা। বাজী মাৎ হওয়ার পূর্বে কাজ হাসিল করে নিতে হয়। সোনা গালান হয়ে গেলে আর এর দরকার নাই। নইলে একে যত্নে রাখতে হয়। এই পাঁকের ভিতর থেকেই পদ্মফুল ফোটে, ঠাকুর বলতেন।

শরীর থাকলে এসব সুখ দুঃখ হবেই। কারও সাধ্য নাই এর হাত এড়ায়। অবতারেরা নিজের জীবন দিয়ে এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। রোগযন্ত্রণা তাঁকেও ভোগ করতে হয়েছে জীবের শিক্ষার জন্য। কিন্তু অত অসুখের ভিতরও ঈশ্বরানন্দ উপভোগ করছেন। এই যন্ত্রণায় ছটফট করছেন — একটু ঈশ্বরীয় কথা হল বা একটি গান হল — ওমা কোথাও কিছু নেই, যেন নূতন মানুষ!

আলো ও আঁধার, একসঙ্গে যেন চলছে ওঁর জীবনে। এই যেমন সাধারণ জীবের ব্যবহার, এক নিমেযে মায়াতীত অবস্থা। সকল সুখ দুঃখ, সকল জ্বালার ঊর্ধ্বে। সংসার যেন পায়ের তলায় পড়ে আছে, মরা সাপের মত। মুখকমল উজ্জ্বল, ব্রহ্মদীপ্তিতে দেদীপ্যমান। অলৌকিক অবস্থা! একবার বা একদিন নয় — সর্বদা, সারা জীবন! তাই অবতারকে না দেখলে শাস্ত্রের অর্থ বোঝা যায় না। ঈশ্বরের সম্বন্ধে ধারণা হয় না। অবতার হলেন ঈশ্বরের বাহ্য মুখ — যেমন ম্যাগনিফাইং গ্লাস। এর

ভিতরে ছবির দিকে তাকাও — কত শহর, কত পাহাড় পর্বত, কত কিছু দেখা যায়!

পরম ব্রহ্মের সঙ্গে লগ্ন যিনি সর্বদা থাকেন — অবিচ্ছেদ্যভাবে সর্বদা, সেটিই হল অবতার। স্বামীজী বলেছেন ওয়েস্টে, Man-God (নরদেব)। এটা হল তাঁর বাহ্য রূপ, মানুষ-রূপ। ভিতরের রূপটি অপার অনন্ত সচ্চিদানন্দ — অগাধ অসীম চিদানন্দসাগর। সেই ব্রহ্মবস্তু মানুষ হয়ে আমাদের সঙ্গে ছিলেন — খাইয়েছেন, ভালবেসেছেন, যেমন নিজ সন্তান! কিন্তু মায়ার সম্পর্ক নাই।

আপনারা তো তাঁর নাম শুনেই এয়েছেন। তাঁকে ধরে পড়ে থাকুন — আপনাদেরও অবশ্য কৃপা করবেন। সময় হলে ঘরের ছেলে ঘরে তুলে নেবেন। সেটা বাপ-মার কাজ। ছেলে রসানন্দে থাকুক!

অন্তেবাসী (শ্রীম-র প্রতি) — আপনি শুয়ে শুয়ে কথা ক'ন না!

শ্রীম (অপরাধীর ন্যায়) — হাঁ, হাঁ।

বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে শুইয়া পড়িলেন।

স্বামী ধীরাত্মানন্দ — ঐ দিন রাত্রে অদ্বৈতাশ্রমে আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে, তখনই সংবাদ গেল আপনার ব্যথার। আমরা সকলেই এসেছিলাম।

সতীনাথ (পরে স্বামী সুপর্ণানন্দ) হ্যারিকেনের আলোটা একটু কমাইয়া দিয়াছেন শ্রীম-র চক্ষুতে লাগে বলিয়া। হঠাৎ সেই দিকে শ্রীম-র নজর পড়িল।

শ্রীম — এটা (হ্যারিকেন) এমন হল কেন? তেল নেই বুঝি, সলতে ফুরিয়ে গেছে?

সতীনাথ — আপনার চোখে লাগবে বলে কমিয়ে দিয়েছি।

শ্রীম (বিস্ময়ে) — ওমা, সাধুরা এলে উৎসব করতে হয়! আর আলো নেভানো! বাড়িয়ে দাও, বাড়িয়ে দাও। 'হরিনাম মহোৎসব' কিসে পড়েছিলাম।

অন্তেবাসী — শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে। চৈতন্যদেব, রায় রামানন্দকে বলেছিলেন রাজামুণ্ড্রিতে, আপনি যখন পুরীতে যাবেন, সেখানে হরিনাম মহোৎসব হবে।

শ্রীম — তাই সাধুরা এলে উৎসব করতে হয়। সাধুরাই আত্মীয়, সাধুরাই বন্ধু ইহকাল পরকালের। এই দেখ না, ওঁরা সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছিলেন। অপর লোক কি তা করে? (সহাস্যে) একজন বলেছিলেন কাল, 'আমাকে ফোন করলেন না কেন, আমি আসতুম'। এরা সব অন্য লোক, খবর দাও তবে আসবে। আর সাধুরা সংবাদ নাই, কিছু নাই, তবুও ছুটে আসেন। নিজেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সংবাদ রাখেন। তাই দেখুন, সাধুরাই আপনার লোক, সুহৃৎ।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — তুমি মঠ থেকে এয়েছো এখন?

অন্তেবাসী — আজ্ঞে না, সেদিন আপনার অসুখ দেখে আর মঠে যাই নি। কয়দিন বাঁকা রায়ের গলিতে রয়েছি, স্টুডেন্টস হোমে।

শ্রীম — ওদিন যা দেখে গেলে তারপর যখন rally (নষ্টস্বাস্থ্য ভাল হল) করি — ও মা, তখন কোথাও কিছু নাই! যেন কিছুই হয় নাই, বিছানায় শুয়ে আছি। (একটু ভেবে) ঠাকুর বলতেন, লীলা সত্য। আবার এক একবার বলতেন, ভুড়ভুড়ির মত (তর্জনী অঙ্গুলী দিয়া ইঙ্গিত করিয়া) মিশে যাচ্ছে।

(আবার একটু ভাবিয়া) একটা গল্প বলেছিলেন — একটা pot (গামলা) রয়েছে, কাপড় ছোপাবে। একজন দিলে। কি রং-এ ছোপাব? — জিজ্ঞাসা করলে। 'লাল', অমনি লাল রং-এ ছুপিয়ে দিলে। অন্যরা সব সবুজ, হলদে রং-এ ছুপিয়ে নিলে। আর একজন এই কাণ্ড দেখে বললে, তুমি যে রংএ ছুপিয়েছ সেই রং-এ আমায় ছুপিয়ে দাও। (হাস্য) তাঁর কাছে কত রং-ই আছে — অনন্ত। 'স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম' (গীতা ১০:১৫)। তিনিই কেবল তাঁকে জানেন। আর যাকে জানান সে জানে।

একটি সাধু (স্বগত) — লীলা ও নিত্যের কথা দিয়ে কি শ্রীম নিজের অবস্থা বর্ণনা করছেন? এই অসুখের পর কি লীলাটি ভুড়ভুড়ির মত দেখছেন?

অন্তেবাসী (স্বগত) — এত সব গভীর কথা বলছেন। ভয় হয় আজও আবার বেদনা না বেড়ে যায়। আমাদের সব ছাদে গিয়ে বসলে হয়।

শ্রীম (স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া) — হাঁ, আপনারা ছাদে গিয়ে মিষ্টিমুখ করুন। ঘরে কষ্ট হবে।

সাধু ও ভক্তরা ছাদে আসিলেন, মিষ্টিমুখ করিয়া সাধুরা কেহ কেহ বেলুড় মঠে রওনা হইলেন। এখন রাত্রি ৭-৫২ মিঃ।

বেলুড় মঠ।
১৭ অক্টোবর, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার।

চতুর্দশ অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণময় শ্রীম

১

শ্রীম আজকাল অসুস্থ। বিছানাতেই শুইয়া থাকেন। সাধু ও ভক্তগণ সর্বদা আসিয়া দেখিয়া যাইতেছেন। শুইয়া শুইয়াও ঈশ্বরীয় কথার বিরাম নাই। মানা করিলে বলেন, এতে ভাল হয় শরীর মন। অন্তেবাসী ভাবিতেছেন, তাঁর কথা না বললে যে প্রাণ যায় যায় হয়! দেখছি এই অসুখে কত কষ্ট, বেদনাটা বাড়ে সময়ে। ওমা, এরই মধ্যে যেন তাঁর সেই কংকালসার শরীরের কথা মনে হয়। অমনি লজ্জা হয়, আমরা এইটুকু সইতে পারি না। আর তিনি এই স্কেলিটন (কংকাল) নিয়েই কি কাণ্ডখানা করে গেলেন — কত কথা! সমাধি, মুহুর্মুহু সমাধি চলছে। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার দেখে একেবারে অবাক্। মুখে কি আনন্দের আভা — অসীম আনন্দসাগরে যেন ডুবে আছেন! শান্তির যেন অজস্র বর্ষণ হচ্ছে ঐ মুখমণ্ডলে।

কার্তিক, মাস। এখন অপরাহ্ন পাঁচটা। আজ ২০শে অক্টোবর, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার। শ্রীম তিনতলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরে মেঝেতে বিছানায় শুইয়া আছেন, দক্ষিণ দিকে। বিছানার উত্তর দিকে মাদুর পাতা। ভক্তরা আসিলে তাহাতে বসেন। তিনি পূর্বশিয়রী শুইয়া মুকুন্দর সঙ্গে দুই-একটা কথা কহিতেছেন। মুকুন্দ তালপাতার পাখায় হাওয়া করিতেছেন। শ্রীম-র অসুখ শুনিয়া তিনি রামপুরহাট হইতে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। উনি ওখানকার স্কুলের রেক্টার।

স্বামী নিত্যাত্মানন্দের প্রবেশ। শ্রীম-র জ্যেষ্ঠ পুত্র পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, ঐ ঘরে রয়েছেন, যান। শ্রীম সাধুকে দেখিয়া হাত জোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া 'নমস্কার নমস্কার' বলিতে লাগিলেন। আর বলিলেন, আসন দাও, আসন দাও। মুকুন্দ একটি

কম্বলাসন মাদুরের উপর পাতিয়া দিলেন। সাধু ভাবিতেছেন, মহাপুরুষগণের বিরাম নাই। দিন রাত কাজ। সব লোকশিক্ষার জন্য। অতি অসুখেও সাধুর মর্যাদারক্ষার ভাবনা। তাই বুঝি এঁদের 'আচার্য' বলেন শাস্ত্র — 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'। কেবল মুখে উপদেশ নয় — হাতে নাতে করে শেখান — কি strenuous life (অবিরাম কর্মময় জীবন) এঁদের। Every moment they live not for themselves, but for the good of the world (জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁরা জগতের কল্যাণের জন্য ব্যয় করেন — নিজের জন্য নয়)। এবার সাধুর সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (সাধুর প্রতি) — তুমি কোথায় রয়েছ এখন?

সাধু — বেলুড় মঠ থেকে এসেছি এখন। পথে ডাক্তার শ্যামাপদ মুখার্জীর বাড়ি হয়ে এলাম। তারপর সেখান থেকে মহাপুরুষ মহারাজের ঔষধ আনতে যাই ডাক্তার অমর মুখার্জীর বাড়ি। হোমিওপ্যাথিক চলছে এখন। সকালেও কলকাতা এসেছিলাম। 'উদ্বোধন' হয়ে ডাক্তার শ্যামাপদর বাড়িতে যাই। সেখান থেকে তাঁর পরিচয়-পত্র নিয়ে ডাক্তার ঘোষের কাছে আসি বিবেকানন্দ রোডে আমার চক্ষু পরীক্ষা করাতে।

শ্রীম — মহাপুরুষ মহারাজকে কেমন দেখে এলে — changed diet-এ (পরিবর্তিত পথ্যে) কিছু ভাল আছেন কি?

সাধু — আজ্ঞে হাঁ। তিনিও আপনার অসুখের কথা খুঁটিনাটি সব জিজ্ঞাসা করেন। কোন্ ঘরে রয়েছেন, কোন্ ডাক্তার দেখছেন, খান কি, সেবা করছে কে কে — এই সব কথা। আর বলেছেন, ওষুধ খেতে আর ডাক্তারের কথা মেনে চলতে।

শ্রীম — সবই তো চলছে। তবে হাগা-মোতাটা বড় troublesome (কষ্টকর)।

সাধু — এ সম্বন্ধে মহাপুরুষ মহারাজ আপনাকে তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন। বলেছেন, আমার নাম করে বলবে, আমার প্রার্থনা — ঘরে যেন শৌচে যান — একটা পট বা কমোডে (commode)। হার্টের তো অসুখ রয়েছেই। অত ওপর নিচ ওঠানামায় বিপদ হতে পারে।

আর আমরা বলেছিলাম তাঁকে, আপনি এ অসুখেও সেবা নিতে চান

না ভক্তদের। তিনি শুনে বলেছেন, এখন দিনকতক সেবা নিলে ভাল হয়। ভাল হলে তখন না নিলেই হবে। তা নয় তো যদি অসুখ বেড়ে যায় তখন তো বাধ্য হয়ে সেবা নিতে হবে।

শ্রীম এই স্নেহের অনুযোগ সশ্রদ্ধ ভাবে গ্রহণ করিলেন। আর বলিলেন, মহাপুরুষগণ সকলের মঙ্গল চিন্তা করেন। তাই অত ভাবনা তাঁদের।

নিজের অসুখের কথা চাপা দিবার জন্যই বোধহয় কথাপ্রবাহ উল্টাইয়া দিলেন।

শ্রীম (সাধুর প্রতি) — মহাপুরুষ মহারাজ এখন কি খাচ্ছেন?

সাধু — সারা দিনে দেড় পোয়া দুধ। আধ পোয়া করে তিনবারে খান — সকাল সাতটা, এগারটা ও বিকালে পাঁচটায়। দুপুরে সাগু আর পাতলা ঝোল, আর পাতিলেবুর রস। বিকালে মিছরির সরবৎ আর তিনটায় বেদানার রস। এই খেয়ে দুই তিন দিন বেশ আছেন।

শ্রীম — খোকা মহারাজ এখন কেমন আছেন? বেড়ান কি? শুনেছিলাম একটা দুষ্টু খিদে হয়েছে। অসুখের পর অমন হয় — খালি 'খাই খাই' করে মন। তখন খুব সাবধানে খাওয়াতে হয়। সেবকদের কাজ বড় কঠিন! না দিলেই চটে যায়। তখন ছেলেমানুষের মত হয়ে যায় কি না! অনেক বুঝিয়ে শুজিয়ে বকুনি খেয়ে শান্ত করতে হয়। কালীকৃষ্ণ মহারাজ, সুধীর মহারাজ ওঁরা কেমন? এ সময়টা মঠের climate (জলবায়ু) একটু খারাপ হয়ে যায়। বুড়োদের আরও খারাপ। অসুখ বিসুখ আছে। কি আর করা এখন? আবার কালীপূজা সামনে। কত খাটুনি সাধুদের! ওতে খেটে খেটে আবার অনেকে অসুখে পড়বে। আচ্ছা, কালীপূজাতে সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য হবে কি?

সাধু — আজ্ঞে হাঁ, সন্ন্যাস হবে একজনের! ব্রহ্মচর্যের কথা শুনি নাই।

শ্রীম — ওসব কথা বলতে নেই। হয়ে গেলে তখন বলা যায়।

ভক্তরা সকলে বসিয়া আছেন। পাছে প্রচার করেন কথা, তাই সাবধান করিতেছেন।

শ্রীম (সাধুর প্রতি) — যাঁর (সন্ন্যাস) হবে তাঁর ভাইপো এসেছিলেন। তিনি বললেন, উনি (শৈলেশ) রোগা। আচ্ছা, ইনি কি মায়াবতীতে যিনি (স্বামী পবিত্রানন্দ) আছেন, তাঁর চাইতেও রোগা?

সাধু — না, অতো রোগা নন — particular (বিশেষ) কোন অসুখ নাই।

শ্রীম — সর্বদা কাজ করছেন — চটপটে।

সাধু — হয়ে গেলে তবে। অনেক বাধা আছে। আপত্তি উঠেছে।

শ্রীম — হাঁ, 'শ্রেয়াংসি বহুনি বিঘ্নানি'। দেখ, এদিকে (সংসারে) এসব চলছে। আবার side by side (পাশাপাশি) ও-ও চলছে — real life-এর (সত্যিকার জীবনের) চেষ্টা।

শ্রীম-র জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভাস আসিয়া অন্তেবাসীকে ডাকিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ হইতে ঐ দেশীয় দুইজন ভক্ত আসিয়াছেন। তাঁহারা প্রভাসের ঘরে বসিয়া আছেন। ইঁহারা শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। শ্রীম-র লিখিত Gospel of Ramakrishna (ইংরেজী কথামৃত, প্রথম ভাগ) পড়িয়াছেন। অন্তেবাসী ভক্তদের লইয়া শ্রীম-র গৃহে প্রবেশ করিলেন। ভক্তরা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীম বলিতেছেন, please take your seat (বসতে আজ্ঞা হোক)। (অন্তেবাসীর প্রতি) — মাদ্রাজ মঠে যান বুঝি এঁরা? অন্তেবাসী সম্প্রতি মাদ্রাজ মঠ হইতে আসিয়াছেন, কয়েক বৎসর ওখানে কাজ করিতেছেন। শ্রীম তাই মনে করিলেন ভক্তরা অন্তেবাসীর পরিচিত। অন্তেবাসী উত্তর করিলেন — আজ্ঞে না, এঁরা দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ থেকে এসেছেন। ভক্তরা করজোড়ে বসিয়া আছেন। খুব ভক্তিমান। শ্রীমকে এক দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছেন। শ্রীম ধীরে ধীরে কথা কহিতেছেন।

* M. (to the bhaktas) — I am very glad to see you both. But I am very weak due to ill health. You see, this body is subjected to disease, decay and death. But inside it, resides the Atman which is eternal and indestructible, birthless and deathless. Sri Ramakrishna

---

*শ্রীম (ভক্তদ্বয়ের প্রতি) — আমি আপনাদের দর্শন করে বড়ই আনন্দ লাভ করলাম। আমার শরীর অসুস্থ, তাই অতিশয় দুর্বল। দেখুন, এই শরীর রোগ, জরা ও মৃত্যুর অধীন। কিন্তু এর ভেতরে আত্মার নিবাস। তিনি শাশ্বত ও অবিনাশী, তাঁর জন্ম-মৃত্যু নাই। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, মানুষের

said that man's real nature is that. The apparent man must suffer, but the real man is ever blissful. To re-discover the real man, inside this apparent man is the highest ideal of human life, and so it is the greatest of duties.

Sri Ramakrishna said to his bhaktas, 'Meditate on me alone and I will do all for you'. What will he do? he will help man re-discover his real self.

Then like Sri Krishna and Christ he swore — 'Verily, verily do I say unto you, who-so-ever will meditate on me shall inherit my wealth even as a son does inherit his father's wealth. And my wealth consists of Jnan-Bhakti, Vivek-Vairagya, Shanti-Sukh, Prem and Samadhi'!

He further revealed himself saying, 'The Satchidananda has incarnated here in this body!'

Then he said, 'If you can know who am I and who you are, that will do! That is, thereby one will be able to re-discover his real self.'

সত্যিকার রূপ ঐটি। মানুষের এই বাহ্য শরীরটারই দুঃখকষ্ট। কিন্তু তার অন্তরাত্মা সদানন্দময়। এই বিনাশশীল দেহের অভ্যন্তরাবস্থিত অবিনাশী অন্তরাত্মার অনুসন্ধান করাই মানুষজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাই এই কর্তব্য সর্বশ্রেষ্ঠ।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলেছিলেন, তোমরা কেবল আমার চিন্তা কর। আমি তোমাদের সকল কর্তব্য করে দেব। কি কর্তব্য করে দেবেন? অর্থাৎ, মানুষের আত্মদর্শনের সহায়তা করবেন।

তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ক্রাইস্টের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন, 'মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে — যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। জ্ঞান ভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য, শান্তি সুখ, প্রেমসমাধি — আমার ঐশ্বর্য।'

আবার আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন, সচ্চিদানন্দ এই দেহে অবতীর্ণ হয়েছেন।

শেষ কথা বললেন, যদি তোমরা জানতে পার — আমি কে, আর তোমরা কে — তা হলেই হবে। এর অর্থ এই আর কি — তাহলে সাধক নিজের স্বরূপ অনায়াসে জানতে পারবে।

As a means he prescribed *sadhusanga* and *sadhuseva* (company and service of a holy man) constantly daily.

Well, do you know any sadhu?*

ভক্তরা মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন, এইবার উত্তর দিলেন।

Bhaktas — Yes sir, we always visit Swami Yogeswarananda, a disciple of Swami Vivekananda, He had made an Ashrama there.

M. — Oh, now I see, how you came here! When you will return, please convey our most affectionate greetings to Swami Yogeswarananda.

কথা কহিতে কহিতে শ্রীম-র দেহজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। ক্রমশঃ উদ্দীপিত হইয়া কথা বলেন ঠাকুরের। অন্তেবাসী ভক্তদের এক রকম জোর করিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। তিনতলায় বারান্দায় বসাইয়া তাঁহাদের মিষ্টিমুখ করাইতেছেন। খাইতে খাইতে তাঁহারা অন্তেবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'Swamiji, are you his son?' 'Yes, in spirit — not in body' (স্বামীজী, আপনি কি তাঁর পুত্র? হাঁ জী, ধর্মে—শরীরে নয়) — উত্তর করিলেন অন্তেবাসী। প্রভাস সামনে দাঁড়াইয়া মুচকি হাসিতেছেন। ভক্তরা বিদায় লইলেন।

কথা কওয়ায় ক্লান্তি আসিয়াছে। তাই শ্রীম তন্দ্রাবিষ্ট। মুকুন্দ সমানে পাখা করিতেছেন।

এর উপায়রূপে তিনি নিত্য, সর্বদা সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবার ব্যবস্থা দিয়েছিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আচ্ছা, আপনাদের সঙ্গে কোন সাধুর পরিচয় আছে কি?

ভক্তদ্বয় — আজ্ঞে হাঁ, আমরা সর্বদাই স্বামী যোগেশ্বরানন্দজীর কাছে যাতায়াত করে থাকি। তিনি স্বামী বিবেকানন্দজীর শিষ্য। হায়দরাবাদে একটি আশ্রম করেছেন।

শ্রীম (আনন্দে) — এখন আমি বুঝতে পারলাম, কি করে আপনারা এখানে এলেন। আপনারা যখন দেশে ফিরে যাবেন তখন অবশ্যই স্বামী যোগেশ্বরানন্দজীকে স্নেহ সম্ভাষণ জানাবেন।

কিছুক্ষণ পর চোখ মেলিয়া অন্তেবাসীর সঙ্গে একথা সেকথা কহিতেছেন। কথার ফাঁকে অন্তেবাসী শ্রীম-র কাছে প্রস্তাব করিলেন, আপনি অনুমতি করলে, ডাক্তার অমর মুখার্জীকে এনে দেখান যায়। সেদিন মোটরে আমায় এ বাড়ির নিচে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। উনি শুনেছেন আপনার অসুখের কথা। শ্রীম ভাবিত হইয়া উত্তর দিলেন, না, ওঁরা বড় ডাক্তার, ওষুধ না খেলে offended (ক্ষুব্ধ) হন। আমি তো ওষুধ খাব না। পীড়াপীড়ি করিলে বলিলেন — আচ্ছা, দরকার হলে খবর দেওয়া যাবে। এখন দেখিতেছেন — ডাক্তার অমিয়মাধব। বত্রিশ টাকা তাঁহার ফি। এখান হইতে কিছু লন না। পুরানো কলকব্জা সব এ শরীরে। ওষুধে কাজ করে না তেমন। তাই তিনি ব্যবস্থা দিয়াছেন diet and rest (পথ্য ও বিশ্রাম)।

অন্তেবাসী দেওঘর বিদ্যাপীঠে থাকেন। পূজার ছুটিতে মঠে আসিয়াছিলেন। শীঘ্রই ফিরিতে হইবে। শ্রীম তাঁহার সঙ্গে দেওঘরের কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — তোমরা কবে যাবে দেওঘর? আচ্ছা, ওখানে কি হিন্দুসভা আছে? তার লিফ্লেট মেনিফেস্টো দেখেছ?

অন্তেবাসী — আজ্ঞে না, এসব দেখি নাই। তবে হেমবাবু দুর্গাবাড়ি করেছেন। ওখানে বাঙ্গালীরা দুর্গোৎসব করেন।

শ্রীম — আর কি হয় সেখানে? তুমি গিয়েছ কি? কতদূর স্টেশন — টেম্পল ও বিদ্যাপীঠ থেকে?

অন্তেবাসী সব জবাব দিয়া বলিলেন, এখন ওখানে জলবায়ু বড়ই স্বাস্থ্যকর। আর দিনকয়েক পর একটু শক্ত হলে ওখানে চলুন! বিদ্যাপীঠে থাকবেন। আরম্ভের সময় তো মিহিজামে আপনার সঙ্গে আমরা ছিলাম। এখন অনেক বড় হয়েছে, চলুন দেখবেন। সাধু ব্রহ্মচারীরা সকলে ভারি আনন্দিত হবেন! কত বার তো আপনাকে হেমেন্দ্র মহারাজ (স্বামী সদ্ভাবানন্দ) নিমন্ত্রণ করেছেন, নিতেও এসেছিলেন। কিন্তু যাওয়া হয় নাই। এখন চলুন একবার। শ্রীম হাসিয়া উত্তর করিলেন, আমার আর নড়বার উপায় নাই।

শ্রীম তন্দ্রাবিষ্ট। অন্তেবাসী প্রণাম করিয়া উঠিলেন। ভক্তরা ছাদে

লইয়া গেলেন। মিষ্টিমুখ করাইতেছেন।

তারপর তিনি তিনতলায় নিদ্রিত শ্রীম-র উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বেলুড় মঠে রওনা হইলেন, রাত্রি তখন সাতটা বিশ।

২

শ্রীম-র অসুখ চলিতেছে। দুর্বলতা খুব। সারাদিনই বিছানায় শুইয়া কাটান। ডাক্তার কথা বলিতে বারণ করেন। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে ঠাকুরের কথা বলেন। সাধু ও ভক্তরা সর্বদা আসেন। তাহাতেও কথা বলিতে হয়। ডাক্তার কথা বলিতে না দিয়া প্রাণে বাঁচাইতে চান। আর শ্রীম-র প্রাণ যায় যায় হয় ঠাকুরের কথা না বলিলে। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাণ, শ্রীরামকৃষ্ণ ধ্যান — শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তামণি। শ্রীরামকৃষ্ণময় শ্রীম।

আর সাধু ভক্ত না হইলে শ্রীরামকৃষ্ণকীর্তন হয় না। তাই সর্বদা সাধু ও ভক্ত পরিবৃত হইয়া থাকেন। সাধুগণ শ্রীরামকৃষ্ণের জংগমরূপ, — শ্রীম-র এই ভাব। তাঁহাদের ভিতর বেশী প্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণ, বর্তমান যুগের অবতার। অতি দীনভাবে কৃতজ্ঞতার সহিত ঠাকুরকে প্রার্থনা জানাইয়া বলেন — এ শরীরটা বুড়ো হয়েছে, চলতে পারে না ইচ্ছামত। তাই তিনি সাধুদের পাঠিয়ে দেন। তাঁদের দর্শন করলে ঠাকুরের উদ্দীপন হবে, আর তাঁর গুণগান কীর্তন হবে। তিনি গীতার দুইটি শ্লোক এইভাবে সর্বদা আবৃত্তি করিয়া শোনান —

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।।
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাং উপযান্তি তে॥

(গীতা ১০:৯-১০)

শ্রীম কি চিত্তশুদ্ধির জন্য সাধকগণ যেরূপ নামগুণ কীর্তন করেন ভগবানের, সেরূপ করেন? তাহা তো নহে। কারণ তিনি এবারে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। পূর্বাবতার শ্রীচৈতন্যের পার্ষদও শ্রীম। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে এই চক্ষুতে চৈতন্যসংকীর্তন দর্শন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে শ্রীমকে দেখিয়াছিলেন, আর বলরামকে। যদি তাই হয় তবে তাঁহাদের

নিত্যসিদ্ধ নিত্য-পার্ষদ বলিতে হয়। আর শ্রীমও কখনও কখনও নিজ অন্তরঙ্গদের কাছে তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ভেদ করিয়া বলিয়া থাকেন, তাঁর কৃপায় সব হয়েছে। সাকার নিরাকার দর্শনাদি তিনি কৃপা করে করিয়ে দিয়েছেন। শ্রীম নিজেই তাহার উত্তর দেন মাঝে মাঝে, শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া —

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নিগ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।।

আবার জগদম্বা শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শ্রীমকে আদেশ করিয়াছেন জীবকে 'ভাগবত' শুনাইতে। শ্রীম-র তীব্র ইচ্ছা, সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। শ্রীরামকৃষ্ণকে বারংবার এই প্রার্থনা নিবেদন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "মা ভাগবতের পণ্ডিতকে একটা 'পাশ' দিয়ে ঘরে রেখে দেন, নইলে ভাগবত শোনাবে কে?" আবার ঠাকুর বলেছেন, 'মা, মাস্টারকে শক্তি দাও তোমার কথা বলতে। আমি আর পারি না।' মা এক কলা শক্তি দিলেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণকে সেই কথা বলিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'মাত্র এক কলা!' সদা আবির্ভূতা মা রামকৃষ্ণকে কিছু বলিলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে বলিলেন — 'ও, তা'তেই তোমার কাজ হয়ে যাবে? আচ্ছা।' তাই ঠাকুর নিজ ভক্তদের, খোকা প্রভৃতিকে, শ্রীম-র কাছে পাঠাইয়া দেন ঈশ্বরীয় কথা শুনিতে। তবুও শ্রীম-র ইচ্ছা সন্ন্যাসী হন, সর্বত্যাগ করিয়া। মনে প্রবল বৈরাগ্য। অন্তর্যামী শ্রীরামকৃষ্ণের অগোচর কিছু নাই। শ্রীম নিজ মুখে এই ঘটনা অপর একটি ভক্তের শিক্ষার জন্য বলিয়াছিলেন। তখন রাত্রি আটটা। ঠাকুর নিজের ছোট খাটে বসা পূর্বাস্য, ভাবসমাধি হইতে ব্যুত্থিত। সম্মুখের পাপোষের উপর বসিয়া আছেন একটি ভক্ত। তিনি যুবক, বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার প্রবল ইচ্ছা সব ছাড়িয়া সন্ন্যাস নেন। ঠাকুর বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'কেউ মনে না করে মায়ের কাজ আটকাবে। তাঁর ইচ্ছায় একটি তৃণ থেকে বড় বড় আচার্য তৈরী হয়।' এই কথা শুনিয়া হৃদয় কম্পিত হইল। ভক্তটি গৃহেই রহিয়া গেলেন। কিন্তু ঠাকুর সব লাল করিয়া দিলেন।

আর একবার শ্রীম নিজ মুখে বলিয়াছিলেন একটি যুবক ভক্তকে, পুরীতে জগন্নাথমন্দিরে, অন্য একদিন শশী নিকেতন, ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের

ডিসেম্বরের শেষ দিকে — ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, 'মা বলেছেন, তোমায় মায়ের একটু কাজ করতে হবে।' দেখ, পঞ্চাশ বছর ধরে দিবানিশি অতন্দ্রিতভাবে সেই কাজ (ভাগবত শোনান) করছি। এখনও ছুটি দিচ্ছেন না। আর তুমি এটা করতে আপত্তি করছ।

তাই বুঝি শ্রীম দিবানিশি শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা কীর্তন করেন — ভগবানের 'চাপরাশ' পাইয়া। মৃত্যুঞ্জয়ী শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায়! তবেই তো মৃত্যুকে গ্রাহ্য নাই! মন প্রাণ অন্তরাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণে মগ্ন, শ্রীরামকৃষ্ণময়! তাই মুখে সদা শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম!

আজ ২৩শে অক্টোবর, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। এখন কার্তিক মাস। সময়ও খারাপ। শ্রীম-র অসুখ আজ একটু বাড়িয়াছে। এখন অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটা — সন্ধ্যা হয় হয়। বেলুড় মঠ হইতে একটি সাধু শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। শ্রীম মর্টন স্কুলের তিনতলার পূর্ব-দক্ষিণ কোণের ঘরটিতে মেঝের উপর বিছানায় শুইয়া আছেন ঘরের দক্ষিণ দিকে। বেশ বড় ঘর। বিছানার উত্তরে দুইটি মাদুর পাতা। স্বামী বৈরাগ্যানন্দ বসিয়া শ্রীমকে তালপাতার পাখায় হাওয়া করিতেছেন। পাশে বড় অমূল্য প্রভৃতি ভক্তরা বসা। শ্রীম তন্দ্রাবিষ্ট। সাধুটি ঘরে প্রবেশ করিতেই স্বামী বৈরাগ্যানন্দ বলিয়া উঠিলেন, এই জগবন্ধু মহারাজ এসেছেন। শ্রীম চোখ মেলিয়া চাহিয়া যুক্ত করে নমস্কার করিলেন। সাধু ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। শ্রীম-র অসুখ আজ একটু বাড়াবাড়ি।

সেবক সতীনাথ ধীরে ধীরে এই কথা জানাইয়া বলিলেন, শরীর খারাপ আজ। কেহ কথা বলিবেন না। সাধু ও ভক্তরা সকলেই উঠিয়া পড়িলেন। শ্রীম সাধুদের বলিলেন কম্পিত কণ্ঠে, হাঁ, ছাদে গিয়ে বেড়াও।

ছাদে সাধু ও ভক্তরা বসিয়া আছেন। বড় নলিনী, বড় অমূল্য প্রভৃতি আছেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। একজন সাধুর সহিত বড় অমূল্য বিচার করিতেছেন। তিনি বলেন মহাপুরুষদের অসুখ স্বেচ্ছাকৃত। তাঁহারা ইহাতে affected (অভিভূত) হন না। মায়িক অসুখ। সাধু বলেন, তাহা হইলেও তাঁহারা মানুষ-শরীরে যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ দেহের সুখ দুঃখ আছে। এত দেহকষ্টেও তাঁহাদের মনের উপরিভাগ ভগবানে মগ্ন। দেহের কষ্ট নিম্ন মনে। দেহের দুঃখ বড় কম দুঃখ নয় — এক একবার নিম্ন

মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে। আর 'ভাগবতী তনু'কে যেন আক্রমণ করে। কিন্তু, তাঁহাদের উচ্চ মনটি মহাকারণে মগ্ন। তাই unblanced (বিচলিত) করিতে পারে না। একটা বিরাট পর্বতগাত্রে একটি পাথর সজোরে নিক্ষেপ করিলে যেমন হয় — পাথরটি খণ্ড খণ্ড হইয়া, বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, পাহাড়ের গায়ে দাগও কাটিতে পারে না — তেমনি মহাপুরুষদের উচ্চ মনটি যেন granite (গ্র্যানাইট)! তবুও দুঃখ কষ্ট শরীরে হয়। তাহাতে নিচের মন অভিভূত হয় দেখা যায়। রাম সীতার শোকে কাঁদেন, কৃষ্ণ পরিবারের কলহে দগ্ধ কাষ্ঠপ্রায়। শ্রীরামকৃষ্ণ ক্যানসারে আক্রান্ত। ক্রাইস্ট ক্রুশবিদ্ধ। যাঁহারা অবতারের, মহাপুরুষদের এই স্থূল শরীরের সেবা করিবেন শ্রদ্ধার সহিত, তাঁহাদের ইহাতেই কাজ হইয়া যাইবে।

এইরূপ কথা হইতেছে। সতীনাথ আসিয়া সাধুকে বলিলেন, যাবার সময় ওঁর সঙ্গে দেখা করে যেতে বললেন। ভক্তরা আরও কেহ কেহ আসিয়া ছাদে বসিয়া আছেন। খানিক পর অমৃত আসিয়া সাধুকে বলিলেন, উনি নিজে আপনাকে ডাকছেন। সঙ্গে সঙ্গেই সতীনাথ আবার আসিয়া বলিলেন — আপনি চলুন, উনি ব্যস্ত হয়ে গেছেন আপনার জন্য। অযাচিত কৃপায় সাধুর হৃদয় প্রেমপূর্ণ। সাধুটি অতি আনন্দে তিনতলায় শ্রীম-র ঘরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীম তাঁহাকে দেখিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। প্রসন্নভাবে নিজেকে নিচে নামাইয়া, যেমন বাপ-মা গুরু করেন, বলিতেছেন — দেখ, তোমাকে জগবন্ধুবাবু বলি নি, বলেছি জগবন্ধু বাপু! বাপু বাবার অপভ্রংশ। গুজরাটে বলে। গান্ধী মহারাজকে সকলে 'বাপু' বলে তাই এদেশে বলে কথায় কথায় — 'না বাপু'।

এই সাধুটি শ্রীম-র পদচ্ছায়ায় দীর্ঘকাল বাস করেন। তারপর শ্রীম কৃপা করিয়া সন্ন্যাসের পথ দেখাইয়া বেলুড় মঠে পাঠাইয়া দেন। পূর্ব অভ্যাসে কখনও শ্রীম, 'বাবু' বলিলে সাধুর মনে কষ্ট হয় সেই ভাবিয়া যেন তাঁহার কাছে আজ কৈফিয়ৎ দিয়া শান্ত করিতেছেন। অথবা ভক্তদের শিক্ষার জন্যও হইতে পারে এই অভিনয়।

এই সব কথা বলিতে বলিতে শ্রীম নিজে হাতে করিয়া একখানা আসন বিছাইয়া দিলেন মাদুরের উপর। শুকলাল আপত্তি করিয়া বলিলেন

— না, আপনার উঠে আসন দেওয়ার দরকার নাই — সতীনাথবাবু দিবেন। আপনি শুয়ে থাকুন। শ্রীম শুনিলেন না বারণ। শ্রীম এখন আচার্য-ভাবে ভরপুর। নিজে আচরণ করিয়া ভক্তদের শিখান সাধুসেবা, সাধুর পূজা, সাধুর সঙ্গে ব্যবহার।

শ্রীম বিছানায় বসা উত্তরাস্য, সাধু বসা তাঁহার সামনে দক্ষিণাস্য। তিনি হাতে জল চাহিয়া লইলেন। তারপর সাধুর বারণসত্ত্বেও মিষ্টির ভাঁড়টা হাতে লইয়া সাধুর হাতে একটি বড় পান্তুয়া দিলেন। এইটি খাওয়া হইলে একটি বড় সন্দেশ। সাধু খাইতেছেন আর ভাবিতেছেন, জগদম্বা এই কৃপা-প্রসাদ দিচ্ছেন এই শরীরে। অত অসুখ, তবুও কেন এই ভালবাসা? ইহা বুঝি অহেতুক কৃপা। এই করেই বুঝি শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের চিরতরে কিনে নিয়েছেন। সাধু খাইতেছেন আর শ্রীম মায়ের মত একথা সেকথা বলিতেছেন। বলিলেন, কবে যাবে দেওঘর? সাধু বলিলেন, ২৭শে খুলবে। আমি রবিবার যাবো। — ওঁরা (অন্য সাধুরা) গেছেন? উত্তর হইল, অজয়ানন্দজী যান নাই। আর সকলে গেছেন। (সহাস্যে) পান খেয়ে বিভ্রাট হয়েছে। তাই তাঁর যাওয়া বন্ধ হয়েছে। শ্রীম আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েছিল? সাধু বলিতেছেন, স্বামী অজয়ানন্দ দুই দিন হয় বেলা দশটায় দেওঘর রওনা হয়েছেন মঠ থেকে। আমি সঙ্গে যাচ্ছি হাওড়ায় তুলে দিতে ট্রেনে। উনি মঠ থেকে ভাত খেয়ে বের হয়েছিলেন। তখন ধর্মানন্দ স্বামী একটা পান দেন খেতে। তাতে সামান্য একটু জর্দা ছিল। বাসে উঠেছি গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে। হাওড়ার আধ রাস্তায় উনি মূর্চ্ছিত হয়ে গেছেন। গাড়িতে স্বামী তপানন্দও ছিলেন। বাস-স্ট্যাণ্ডে ওঁকে নামিয়ে ফুটপাথে শুইয়ে দিই। তারপর পাতিলেবু এনে রস খাইয়ে দিই আর হাওয়া করি। এতে অনেকটা আরাম হলে গাড়ী করে স্টুডেন্টস্ হোমে নিয়ে যাই বাঁকা রায়ের গলিতে। ওখানেই রয়েছেন। ভাল আছেন। আমাদের সঙ্গেই যাবেন রবিবার।

শ্রীম শুনিয়া বলিলেন, শরীরে কিছুই নাই। তা'তে অত খাটুনি। বলবেন, পান খেতে হলে সুপারি না খান। দোক্তাও খাবেন না।

রাত্রি হইয়াছে। বেলুড় মঠে যাইতে হইবে। সাধু প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। এখন সাতটা বাজিয়া পাঁচ মিনিট।

সাধুর মন আজ প্রেমরসে সিঞ্চিত। সমস্ত রাস্তায় চলিতেছেন, কোনও দিকে তেমন দৃষ্টি নাই। ট্রামে চড়িয়া হাওড়ায় গেলেন। তারপর বাসে চড়িলেন — যেন যন্ত্রচালিতবৎ। মঠে ফিরিয়া গিয়াও ভাবিতেছেন, শ্রীম-র আজের অহৈতুক কৃপা জগন্মাতারই কৃপা। নিজের শরীর অচল, তবুও ভক্তদের কল্যাণচিন্তা। আবার আচার্যের আচরণ জীবশিক্ষার জন্য। আমরা ধন্য এঁদের স্নেহ পেয়ে! জয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ!

৩

মর্টন স্কুল। তিনতলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘর। এখন অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটা। শ্রীম অসুস্থ, মেঝেতে বিছানায় শুইয়া আছেন। নিচে মাদুর ও সতরঞ্চি। তাহার উপর দুইখানা নরম তোষক। তোষকের উপর চাদর। দুইটি নরম বালিশ শিয়রে। আর একটি কোলবালিশ। ইহা তাকিয়ার মত ব্যবহার করেন। ঘরে কয়েকখানা লম্বা জোড়া বেঞ্চি দক্ষিণ দিকে রহিয়াছে। এই ঘরেও স্কুলের ক্লাস বসে। এখন পূজার ছুটি, তাই শ্রীম এই ঘরে রহিয়াছেন অসুস্থ হইয়া। তাঁহার শয়নকক্ষ চারতলায়। তিনতলায় উত্তরের ব্লকে থাকেন পরিবারের লোক। তাঁহারা দেখাশোনা করিতে পারিবেন বলিয়া শ্রীমকে তিনতলায় আনিয়াছেন। আজ বিছানার পাশে পশ্চিম দেওয়ালে মা-ঠাকরুণের একটি ছবি। আর পূর্ব দেওয়ালে ঠাকুরের। ঘরে আসবাব কিছু নাই। তিন দিকে সব বড় বড় খোলা জানালা। পূর্বদিকের জানালা খুলিয়া দিলেই সুগন্ধি তৈল বিক্রেতা এইচ বোসের বাড়ি দেখা যায়, একেবারে সংলগ্ন।

হেমন্তকাল। সময় খারাপ। আজ ২৪শে অক্টোবর, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। আজ শ্রীম একটু ভাল। তাঁহাকে দেখিতে অনেক সাধু ও ভক্ত রোজ আসেন। কেহ কেহ নিত্য বেলুড় মঠ হইতে আসেন। অন্তেবাসী আজ দ্বিপ্রহরে আহারের পর ভবানীপুরের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ — গদাধর আশ্রমে গিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, কালীঘাটের মা কালীকে দর্শন করা। তিনি শীঘ্রই কর্মস্থল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে চলিয়া যাইবেন। মাকে দর্শন ও পূজা করিয়া প্রসাদ লইয়া আসিয়াছেন।

শ্রীম শুইয়া আছেন দক্ষিণ-শিয়র ঢুকিবার দরজার কাছে। বিছানা

পশ্চিম দেওয়ালের গায়ে। এখন সন্ধ্যা হয় হয়। ঘরে তেমন আলো নাই। তারপর একটু গুমোট। শ্রীম শুইয়া শুইয়া ইংরাজী দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা পড়িতেছেন। পাশে দুই একটি ভক্ত বসা। অন্তেবাসী মাদুরের উপর ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া বসিলেন। শ্রীম হাত জোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া প্রতি-নমস্কার করিলেন। বলিলেন, বসো, কোত্থেকে এলে এখন? অন্তেবাসী বলিলেন, গদাধর আশ্রম আর কালীঘাট থেকে এসেছি। এই বলিয়া মা কালীর প্রসাদের ডালাটি সম্মুখে রাখিলেন। তিনি একটু সিঁদুর কপালে দিলেন আর বিল্বপত্র ও পুষ্প মাথায় ঠেকাইলেন অতি ভক্তিভরে। ভক্তরা মিষ্টি প্রসাদ পাইলেন। গদাধর আশ্রমের মহন্ত স্বামী কমলেশ্বরানন্দের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছেন।

অত অন্ধকারে কি করিয়া শ্রীম কাগজ পড়িতেছেন, অন্তেবাসী ভাবিতেছেন। তিনি যুবক, তাঁহারই বিরক্তি লাগিতেছে, শ্রীম কি করিয়া পড়িতেছেন? শ্রীম বলিলেন — শোন, খবর শোন। তিনি বড় বড় হেডিংগুলি পড়িতেছেন। ‘মহাত্মা গান্ধী’, ‘কালীপূজা বাগবাজারে’, ‘দরিদ্রনারায়ণ-সেবা’, ‘চণ্ডীর গান’ ইত্যাদি। শ্রীম সংবাদপত্র খুব কম পড়েন। তবে সব সংবাদ রাখেন যাঁহারা পড়েন তাঁহাদের নিকট হইতে জানিয়া। বেশী ইচ্ছা হইলে কখনও নিজে পড়েন হেডিংগুলি। কৌতুহল হইলে দুই একাট প্রবন্ধও পড়েন। তাঁহার দেখাদেখি পাছে ভক্তরাও পড়েন, তাই উনি প্রায় গোপনে পড়েন একা একা। এখন অসুস্থ। তাই মন বদলাইবার জন্য আজ পড়িতেছেন। বলিতেছেন, এই দেখ, দরিদ্রনারায়ণসেবা। স্বামীজীর এই ভাবটা কত প্রচার হয়েছে, এখন সকলেই বলে এই কথা। দেশের লিডাররাও বলে থাকেন। কাগজওয়ালারাও নিয়েছেন। এক একটা কথার সঙ্গে সুগভীর ভাব থাকে। অজানাভাবে কথার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভাব লোকের ভিতর ছড়িয়ে পড়ে। কংগ্রেসের কর্তারাও এখন এই ভাব নিয়েছেন। এইভাবে দেশকে মহাপুরুষরা ওপরে উঠিয়ে দেন। গরীবকে খাওয়ানো-পরানো, রোগে ওষুধ-পথ্য দেওয়া নয় — সেবা। দরিদ্রের ভিতর নারায়ণ আছেন। সেই নারায়ণের সেবা একজন নিজে করতে পারছে না। অপরে করছে যাদের ইচ্ছা, শ্রদ্ধা ও সংস্থান আছে। ইচ্ছা আর শ্রদ্ধাই প্রধান অঙ্গ সেবার — সংস্থান, অর্থাদি আপনা

আপনি লোক দিচ্ছে। এ ভাবটা স্বামীজীর প্রত্যক্ষ অবদান! ঠাকুরের কাছে শিখেছিলেন 'জীব শিব'। এ তারই অভিব্যক্তি! বেদে আছে এই কথা — 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম; নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।' সবই ব্রহ্ম। মানুষও ব্রহ্ম। তার মধ্যে দরিদ্র। ব্রহ্মকেই প্রচলিত কথায় নারায়ণ বলে। এ হলো Practical Vedanta (ব্যবহারিক বেদান্ত)। যখনই মানুষ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে তখনই মহাপুরুষগণ এসে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন সমাজে। নইলে নরসমাজ পশুসমাজে পরিণত হয়ে পড়বে। এখন struggle for existence আর survival of the fittest (কেবল বেঁচে থাকার সংগ্রাম, আর শক্তিমানের বিজয়) এসে দাঁড়াবে। এই পশুভাবের সঙ্গে দেবভাব জড়িত থাকলে তবে মনুষ্যভাবে স্থিতি হতে পারে। তাই ভারতের সমাজপতি ঋষিরা, মানুষের স্বরূপ দেবত্ব — এই সত্যের উপর ভারতীয় জনসমাজের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। যখন পশুভাব প্রবল হয় তখনই বলে কলিকাল। যখন দেবভাব প্রবল হয়, বলে সত্ত্বযুগ বা সত্যযুগ। এইভাবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সমাজের পরিবর্তন হয়। কিন্তু মূল সত্য চিরকাল এক — 'জীব ব্রহ্মৈব নাপরম্,' জীব শিব।

শ্রীম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — চণ্ডীর গান হয়েছিল কাল দক্ষিণশ্বরের কালীবাড়িতে। আজ হবে হরি ঘোষের স্ট্রীটে। আপনারা শুনেছেন?

অন্তেবাসী — আজ্ঞে না। রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে একবার শুনেছিলাম। ঠাকুরকে যে রাজনারায়ণ চণ্ডীর গান শুনিয়েছিলেন, তাঁর ছেলের গান! আপনিও তো তখন শুনেছিলেন। আবার দিগম্বর মিত্রের বাড়িতেও শুনেছিলেন।

শ্রীম — হাঁ। এরা কি ওরাই — কে জানে? আচ্ছা, তুমি এটা পড়। এই বলিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের পূজার 'ক্যানভাস কার্ড' দিলেন। ইহাতে হরিদ্বার, লক্ষ্ণৌ, তাজমহল প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থান ও দ্রব্যের রঙ্গিন ছবি ও সামান্য বিবরণ আছে।

কথা কহিতে শ্রীম-র কষ্ট হইতেছে। তাই বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। অন্তেবাসী ঐ কার্ড দেখিতেছেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে। ভৃত্য আসিয়া হ্যারিকেন দিয়া গেল। শ্রীম বিছানায়

উঠিয়া বসিলেন, আর উঁকি ঝুঁকি মারিতেছেন। অন্তেবাসী অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, ঘরে আলো আনবো কি? শ্রীম বলিলেন — হাঁ, একবার ঠাকুরকে দেখাও। পূর্ব দেওয়ালে ঠাকুরকে আলো দেখানো হইল। বলিলেন, এইদিকে পশ্চিম দেওয়ালে মা। মায়ের ছবি একটা দোকানের বিজ্ঞাপনের উপর, দেওয়ালে সুতা দিয়া টাঙ্গানো।

অন্তেবাসী মা-কে আলো দেখাইতেছেন আর ভাবিতেছেন — কি আশ্চর্য শ্রদ্ধা! এই ছবিতে শ্রীম ঠাকুর ও মাকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। মানুষের কাছে বিজ্ঞাপন। কিন্তু শ্রীম-র নিকট উহা জীবন্ত। হনুমানের হৃদয়ে সীতা-রাম যেরূপ জীবন্ত জাগ্রত ছিলেন, ইঁহাদের হৃদয়েও তাই। শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা সদা জীবন্ত, সদা সঙ্গী।

শ্রীম চারিতলার ঘরের চাবিটি অন্তেবাসীকে দিলেন। বলিলেন, উপরের ঘরে আলো দেখাও। আর ঐ যদি থাকে —। অন্তেবাসী বলিলেন, ধূপকাঠি? — শ্রীম বলিলেন, হাঁ। ও-ও (হাত ঘুরাইয়া দেখাইয়া) দেখাবে। অন্তেবাসী উপরে গেলেন, সঙ্গে খগেন ডাক্তার। ঠাকুরকে আলো ও ধূপ দেখাইয়া ছাদে তুলসীতলায়ও দেখান হইল।

শ্রীম তিনতলায় ধ্যান করিতেছেন বিছানায় বসিয়া। দেখিয়া সকলে চারতলার ছাদে গিয়া বসিলেন। ছাদে যাইবার সময় তিনতলার সিঁড়ির গোড়ায় প্রভাসবাবু অন্তেবাসীকে বলিলেন, দেওঘর গিয়ে বরং চিঠি লিখবেন। (বাবা) যদি যান, ভাল হয়ে যাবে শরীর। এ সময়টা ভাল ওখানে।

অন্তেবাসী, মনোরঞ্জন, সতীনাথ, বলাই, যতীন, খগেন ডাক্তার, স্বামী ধর্মেশানন্দ প্রভৃতি বসিয়া শ্রীম-র সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, অত অসুখেও দেহজ্ঞান নাই। ঠাকুরের চিন্তায় মন ডুবে আছে। কি সরস মন! মুখের উপর একটিও দাগ পড়ে নাই — প্রফুল্লবদন। অবতারের পার্ষদদেরই কেবল সম্ভবে এ অবস্থা। বেদনা এক একবার মনটাকে যেন ক্ষণকালের জন্য ছুঁড়ে নিচে ফেলে দিচ্ছে। আবার মুহূর্তে ওপরে উঠে যাচ্ছে। কত ভালবাসা ঈশ্বরে হলে তবে ঐ ভাব হয় — অত সজাগ, সতেজ ও সরস! এ যেন ঠাকুরের কথায় 'তলতা বাঁশ' — একটু নড়চড় হলেই অমনি একেবারে সিধে হয়ে দাঁড়ায়।

ভক্তগণ সাধুদের মিষ্টিমুখ করাইলেন — সন্দেশ দিলেন খাইতে। তারপর সকলে নিচে গেলেন। এখন সন্ধ্যা ছয়টা পঞ্চাশ।

মনোরঞ্জন উপর হইতে একখানা বই আনিয়া অন্তেবাসীর হাতে দিলেন। উহা শ্রীম-র ঘরে ছিল। অন্তেবাসীর বই (পাতঞ্জল দর্শন)। শ্রীম বলিলেন, কি বই দেখি। শ্রীম বইখানা দেখিয়া অন্তেবাসীর হাতে দিলেন। ইনি বসিবার মাদুরের উপর রাখিয়া দিলেন। শ্রীম শুইয়া ছিলেন, উঠিয়া ঐখানা একটা পাখার উপর রাখিয়া দিলেন। ঈশ্বরীয় শাস্ত্র — পায়ের জায়গায় রাখা উচিত নয়। অত অসুখেও লক্ষ্য সর্বদা আদর্শে।

স্বামী বিরজানন্দের প্রবেশ। তিনি আসিয়াই শ্রীম-র কাছে মাদুরে বসিয়া দুই বাহু ও পিঠ টিপিতেছেন। শ্রীম অপরকে উহা করিতে দেন না। কিন্তু স্বামী বিরজানন্দকে বিনা বাধায় দিলেন টিপিতে। শ্রীম বাল্যাবধি তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করেন। এখন তিনি প্রায় প্রৌঢ়ত্বের সীমানা ছাড়াইয়া চলিয়াছেন। তবুও তাঁহাকে শ্রীম দেখেন যেন পনের-ষোল বছরের ছেলে — প্রথম যেমন দেখিয়াছিলেন। স্বামী বিরজানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক।

স্বামী বিরজানন্দও যেন ছেলেমানুষটি হইয়া যান শ্রীম-র কাছে আসিলে। যেন মায়ের কাছে ছেলে আসিয়াছেন। আধ আধ মধুর অনুনাসিক স্বরে কথা ক'ন, যেমন প্রিয়জনের কাছে সকল বাধা ভাঙ্গিয়া লোকে কথা বলে।

স্বামী বিরজানন্দ বলিলেন, স্বামীজী আমায় শিখিয়েছিলেন এই ম্যাসেজিং। তাঁকে করতুম কিনা এইরকম। বলতেন, এখানে এমনি করে টিপবে। ওখানে জোরে। একটু করে দি'। আপনার ঘুম এসে যাবে। একটুমাত্র আপত্তি না করিয়া শ্রীম সম্মতি জানাইলেন। ভক্তরা দেখিয়া অবাক। শ্রীম প্রায় কাহাকেও গায়ে হাত দিতে দেন না।

শ্রীম শায়িত। স্বামী বিরজানন্দ ডান ও বাম দিক ম্যাসেজ করিয়া পিঠে হাত দিয়াছেন। শ্রীম প্রশান্ত, চক্ষু অর্ধমুদ্রিত — ধ্যাননেত্র, যেন আনন্দসাগরে মনটি ভাসিতেছে। আর মুখে সেই প্রসন্নোজ্জ্বল ভাবের ছটা।

স্বামী বিরজানন্দ টিপিতেছেন আর বলিতেছেন, বেশী কথা না বলা,

আর exert (পরিশ্রম) না করা। মহাপুরুষেরও ঠিক তাই হয়। শ্রীম চক্ষু মেলিয়াই উত্তর করিলেন, temptation resist (প্রলোভন প্রতিরোধ) করতে পারি না। তাঁর অমূল্য কথা — তার তো তুলনা নেই! 'কথয়ন্ত পরস্পরম্।' তিনি কি বস্তু ছিলেন তিনিই জানেন।

রাত্রি সাতটা বাজিয়া পনের মিনিট। অন্তেবাসী প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন। আর বলিতেছেন, দেওঘর যেতে হবে। ওখানে এখন climate (জলবায়ু) খুব ভাল। এসে নিয়ে যাব।

শ্রীম সহাস্যে উত্তর করিলেন, এ শরীরে কি আর যাওয়া হবে? অন্তেবাসী নিবেদন করিলেন, এখনই নয়। একটু ভাল হলে আমরা এসে নিয়ে যাব।

অন্তেবাসী বেলুড় যাইতেছেন। বাসে বসিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতেছেন — শ্রীম বলিলেন সন্দেহের সহিত, এ শরীরে কি আর যাওয়া হবে? তবে কি লীলা শেষ হইতে চলিল? ঠাকুর জানেন।

৪

মর্টন স্কুল। তিনতলা। হেমন্তের সন্ধ্যা। পূর্ব-দক্ষিণ কোণের ঘরে শ্রীম অসুস্থ। অসুখ চলিতেছে কয়েকদিন ধরিয়া। কখনও একটু ভাল, কখনও মন্দ। বাম হাতে ও পিঠে একটা বেদনা হয়। ডাক্তাররা বলেন, 'নিউরালজিয়া'। ঔষধ বড় একটা খান না। কখনও হোমিওপ্যাথিক দুই এক মাত্রা খান পীড়াপীড়ি করিলে। বড় বড় ডাক্তার দেখিতেছেন — ডাক্তার অমিয়মাধব মল্লিক প্রভৃতি। আরও অনেক ডাক্তার চিকিৎসা করিতে প্রস্তুত শ্রদ্ধাভরে। কিন্তু, শ্রীম গ্রহণ করেন না তাঁহাদের অনুরোধ। তিনি বলেন, এসব বিরহবেদনার বহিঃপ্রকাশ। এখন চলে যাওয়ার সময় এসেছে। হরিনাম, ঠাকুরের নামই মহৌষধ এখন। আর 'বৈদ্যঃ নারায়ণোহরিঃ।'

সাধু ভক্তরা সর্বদা দর্শন করিতে আসিতেছেন। সকলের ভয় কখন শরীর চলিয়া যায়। এই সব মহাপুরুষের জীবন শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারলীলার জীবন্ত নররূপী ভাষ্য। ইঁহাদের শরীর মন অবলম্বন করিয়া যুগাবতার শ্রীশ্রী ঠাকুর নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতেছেন। ভারতের

ভিতর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলামহিমা-প্রচারে শ্রীম-র স্থান অতি উচ্চে। শ্রীম-র শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' প্রকাশ ও প্রচার। শ্রীমকে শ্রীশ্রী ঠাকুর এই কাজের জন্য নিজে তৈয়ারী করিয়াছেন। তারপর শক্তির 'চাপরাশ' দিয়া জগতে প্রচার করিতে বলিয়াছেন। তাই শত শত লোক শ্রীম-র মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ-গুণগাথা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁহাদের মন প্রাণ সমর্পণ করিতেছেন। কত যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া শ্রীম-র অনুপ্রেরণায় সন্ন্যাসব্রত ধারণ করিয়াছেন — 'আত্মনঃ মোক্ষার্থম্ জগদ্ধিতায় চ'। শ্রীম-র ভিতর কি আছে যাহা দেখিয়া লোক তাঁহার কথা শুনে? পিতামাতা ও সংসারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সব পরিত্যাগ করিয়া কেন লোক সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিতেছে? শ্রীম তো গৃহে থাকেন, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন লইয়া বাস করেন — তাঁহাকে কেন আচার্যের স্থান দিতেছেন ত্যাগীগণ? গৃহস্থ শ্রীম-র সংস্পর্শে কি করিয়া অত ত্যাগী তৈরী হইতেছে? নিশ্চয় শ্রীম-র ভিতর 'ত্যাগীর বাদশা' শ্রীরামকৃষ্ণ বিরাজমান। শরীরটাই শ্রীম-র। মনপ্রাণ অন্তরাত্মা — সব শ্রীরামকৃষ্ণময়, যেন শ্রীরামকৃষ্ণ! শ্রীম-র আদর্শে গৃহে যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও নামেমাত্র গৃহী। সর্বদা চেষ্টা, কি করিয়া সব ছাড়িয়া তাঁহাকে লইয়া থাকা যায়। ভগবানলাভের জন্য সর্বস্বত্যাগকে তাঁহারা বরণ করিয়া লইয়াছেন শ্রেষ্ঠ উপায়রূপে। তাই ঘরে থাকিলেও তাঁহারা সর্বত্যাগীদের চরণাশ্রিত হইয়া থাকেন। শ্রীম-র নিকট গৃহী ও ত্যাগী, উভয়েই আসেন। তাঁহার জীবন প্রণালী দেখিয়া ভক্তগণ অতীত বৈদিক যুগের মহর্ষি, বশিষ্ঠাদির ধারণা করিতে পারিতেছেন, কিংবা রাজর্ষি জনক আদির। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় শ্রীম স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণের রূপে। ব্যবহারে তাই সম্পূর্ণ নির্মোহ। সাধু ভক্তকে তিনি পরমাত্মীয় মনে করেন। এই অসুখেও সাধু ও ভক্তগণ সর্বদা সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। নিজের পরিজন যেন পর। কিন্তু তাঁহাদের যাহা অধিকার তাহা তাঁহাদের দেন। পরমার্থ সম্বন্ধে সাধু ভক্তগণই শ্রীম-র বন্ধু, সুহৃদ, পরিজন ও আপন জন। সাধু ভক্তরা আসিয়া শ্রীম-তে কি দেখেন যে, এত ছুটিয়া আসিতেছেন সকলে? তাঁহারা দেখেন, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্য অন্তরঙ্গ পার্যদ শ্রীম যেন তাঁহার দ্বিতীয় রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণময়তা দেখিতে আসেন, লইতে আসেন, অর্চনা করিতে আসেন।

একটি সাধু আজ মধ্যাহ্নভোজনের পর বেলুড় মঠ হইতে আসিয়াছেন শ্রীমকে দর্শন করিতে। শ্রীম তিনতলার ঘরে শুইয়া আছেন। এখন সন্ধ্যা হয় হয়। বড় নলিনী দরজার গোড়ায় পাহারা দিতেছেন। অদূরে বারান্দায় সতীনাথ, পূর্ণেন্দু প্রভৃতি ভক্তগণ বসা। পাশের ঘরের বারান্দায় শ্রীম-র জ্যেষ্ঠপুত্র প্রভাস বসিয়া ভক্তদের অভ্যর্থনা করিতেছেন। সাধুটি আসিয়া বারান্দায় বসিলেন।

সন্ধ্যার আলো ঘরে আসিয়াছে। শ্রীম বিছানায় বসিয়া ধ্যান করিতেছেন — সেবকগণ আসিয়া সংবাদ দিলেন। সাধু ভাবিতেছেন, বেশী ধ্যান করিলে মন একাগ্র হয়, আর তাহাতে বেদনা বৃদ্ধি হয়। ধ্যানের আর প্রয়োজন কি? কেবল লোকশিক্ষার জন্য, কতকটা অভ্যাসের ফলস্বরূপ। কয়েকবারই দেখা গিয়াছে, অসুস্থ অবস্থায় যখন মন উপরে তুলিয়া ফেলিতেন অমনি বেদনা শুরু হইয়া যাইত। ধ্যানের ফল তো সমাধি — সাকার বা নিরাকার রূপদর্শন ভগবানের! শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় সে তো তাঁহারা করতলগত আমলকীর মত লাভ করিয়াছেন। তবে কেন আর এ অসময়ে চিন্তা! এই শরীরটি যতদিন আছে, ততদিন জ্ঞান, ভক্তি ভক্তদের করতলগত। শ্রীমকে দেখিলেই লাভ হয় জ্ঞান, ভক্তি। তাই সাধু ও ভক্তগণের সদা ভাবনা, কিসে এ শরীর আরও অনেক দিন থাকে। এই ভাবিয়া সাধু নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীম ধ্যানস্থ বিছানায়, উত্তরাস্য। শ্রীম-র বিছানা পশ্চিমের দেওয়ালের গায়ে। শিয়র দক্ষিণে। বিছানার পূর্ব দিকে দুইখানা মাদুর পাতা। ভক্তরা বসেন। শ্রীম-র গায়ে লংক্লথের পাঞ্জাবী। কোমরে একটা গামছা বাঁধা। বসিতে কষ্ট হয় বলিয়া একটা কোল বালিশ ঠেস দিয়া বসিয়াছেন।

সাধু ঘরে আসিয়া ইচ্ছা করিয়াই একটু শব্দ করিলেন। কিছুক্ষণ পর শ্রীম চক্ষু মেলিয়া হাতে ইঙ্গিত করিলেন বসিতে। সাধু নমস্কার করার পূর্বেই শ্রীম যুক্ত করে সাধুকে নমস্কার করিলেন।

সাধু বসিয়া ভাবিতেছেন, কি সৌভাগ্য আমাদের! যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয় বিগ্রহ আমাদের সামনে বসিয়া আছেন। ত্রিকালজ্ঞ ঋষি, অবতারলীলার অন্তরঙ্গ পার্ষদ মূর্তিমান ধর্ম চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছি। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখি নাই, তাঁহার পার্ষদদের দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে খানিকটা

আভাস পাইতেছি। এই সাক্ষাৎ জীবন্ত জাগ্রত ধর্মমূর্তিটিও চলিয়া যাওয়ার ইঙ্গিত দিতেছেন। আমাদের কি দুর্দিন ইঁহারা চলিয়া গেলে! শরীর তো কাহারও নাই — না ঠাকুরের, না মায়ের, না স্বামীজী প্রভৃতি অন্তরঙ্গদের, তবুও মন মানিতেছে না। মন চাহিতেছে, ইঁহারা সদা আমাদের কাছে থাকুন। যেমন শরীরের ক্লেদ ঘর্মাদি প্রক্ষালন করিতে গঙ্গার শীতল জলে স্নান করিয়া লোক শুদ্ধ হয়, তেমনি ইঁহাদের কাছে বসিলে পাঁচ মিনিটে মনের সব ময়লা ধুইয়া শুদ্ধ নির্মল হইয়া যায়। জ্ঞান ভক্তির ঔজ্জ্বল্যে মন প্রাণ শান্তি সুখে ভরপুর হয়। ঠাকুর, কৃপা করিয়া ইঁহাদের শরীর রাখ আমাদের কল্যাণের জন্য!

সাধু একটু পর জিজ্ঞাসা করিলেন, হাওয়া করবো কি? নাক দেখাইয়া বলিলেন, হাঁ। সাধু নাকের কাছে তালপাতার পাখাতে হাওয়া করিতেছেন। সাধু বসিয়াছেন পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া, শ্রীম উত্তরাস্য। জোরে জোরে নিঃশ্বাস লইতেছেন। নিঃশ্বাস লইতে কষ্ট হইতেছে। কাহারও মুখে কথা নাই। মনোরঞ্জন, নলিনী, সতীনাথ প্রভৃতিও আশ পাশে বসা। সকলেই নীরব। একটু পর শ্রীম ওয়ারফ্লানেলের ধূসর বর্ণের গরম জামাটা দিয়া বুক ঢাকিয়া দিলেন। সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের গরম লাগছে কি? শ্রীম-র মন ধ্যানে মগ্ন। ভিতর হইতে টানিয়া রাখিয়াছে। এক একবার জোর করিয়া মনকে বাহিরে আনিয়া কথা কহিতেছেন। আবার সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল যাবে দেওঘর? সাধু বলিলেন, আজ্ঞে হাঁ। সকাল দশটায় গাড়ী।

সাধু সমানে জোরে নাকের কাছে হাওয়া করিতেছেন। শ্রীম আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কোত্থেকে এলে? সাধু বলিলেন, বিকালে বেরিয়েছি মঠ থেকে। মুক্তারামবাবুর স্ট্রীটে অদ্বৈতাশ্রমে গিয়েছিলাম স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের সঙ্গে দেখা করতে। তারপর ঠনঠনের মা-কালীকে দর্শন করে এখানে। ভাটপাড়ার ললিতবাবুকে মা-কালীর মন্দিরে বসা দেখলাম।

শ্রীম নীরবে শুনিতেছেন। এক একবার চক্ষু মুদ্রিত করিতেছেন। হাওয়া সমানে চলিতেছে। চক্ষু মেলিয়া যেন কি খুঁজিতেছেন। সাধুটি বুঝিতে পারিয়া গামছাখানা হাতে দিলেন। শ্রীম গামছা গলায় জড়াইয়া দিলেন। হাওয়া জোরে চলিতেছে। আরও খানিক বাদে আপাদমস্তক

একখানা চাদরে ঢাকিয়া শুইয়া পড়িলেন। ধ্যানে মন উপরে টানিতেছে, এদিকে শ্বাসকষ্ট। দোটানায় অবসন্ন হইয়াই শুইলেন। মাথায় একটি চতুষ্কোণ বালিশের উপর আর একটি অতি মোলায়েম গোল বালিশ। বিছানা অতি কোমল। শরীর যেন মাখনের মত কোমল। কিছুক্ষণ পর নিজের বাম বাহুর অগ্রভাগ দিয়া তালুতে চাপ দিতেছেন। শ্রীম-র যখন খুব ভাবাবেশ হয় তখন তিনি উহা করিয়া থাকেন। সাধু ও ভক্তরা ইহা দেখিয়া ভয় পাইলেন — কি জানি আবার বেদনা আরম্ভ না হয়।

সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, মাথা গরম বোধ হচ্ছে কি? শ্রীম উত্তর করিলেন জড়িত কণ্ঠে — না, হাওয়াতে ঠাণ্ডা লাগছে। আবার হাওয়া না হলেও নিশ্বাস নিতে পারছি না। সাধু এই কথা শুনিয়া গলা হইতে গামছাখানা খুলিয়া মাথা, মুখ ও গলা ঢাকিয়া দিলেন। কেবলমাত্র নাক খোলা রহিল। বলিতেছেন, রক্ত কম বলেই ঠাণ্ডা লাগে। মনোরঞ্জন এতক্ষণ ধরিয়া শ্রীম-র পায়ে ও গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন। ইহারই ভিতর বলিলেন, জগবন্ধু বাপু অনেকক্ষণ হাওয়া করছেন। (মনোরঞ্জনকে) এখন তুমি কর। এক ঘন্টা ধরে সমানে হাওয়া করছেন। সাধু বলিলেন, না, এক ঘন্টা হয়নি। আমিই করছি। আর কাল তো চলেই যাবো।

শ্রীম-র শিয়রের দিকে একটি আলমারী পুস্তকে পূর্ণ। শিয়রের জানালাটি বন্ধ, খড়খড়ি খোলা।

সাধু শ্রীম-র শিয়রের দিকে গিয়া বাঁ হাতটায় মৃদু হস্তচালনা করিতেছেন। হাতের তলা বেশ গরম। খানিক পর শ্রীম অনেকটা ধাতস্থ হইয়াছেন। ভাব উপশম হইয়াছে। বলিলেন, যাও এবার গিয়ে তোমরা সকলে ছাদে বস। একজন কেবল থাক। দরকার হলে বলবো।

সাধু ও ভক্তরা বাহিরে আসিলেন। কেহ বা ছাদে গেলেন। সাধুকে তাঁহার ঘরের সামনে বারান্দায় সিঁড়ির কাছে বসাইয়াছেন। কথা কহিতেছেন শ্রীম-র বিষয়ে। বলিতেছেন, দেওঘর নিয়ে যেতে যদি পারেন কিছুদিন পর, তবে শরীরটা সারবে। ভক্তরা মিষ্টি আনিয়া দিলেন। খাইতে খাইতে কথা হইতেছে। ভাটপাড়ার ললিতও আসিয়া বসিলেন। সকলেরই ভাবনা শ্রীম-র শরীর কিসে আরাম পায়, আরও দীর্ঘকাল থাকে।

ভক্তদের সামনে দিয়া একটি বিড়াল তাহার তিনটি বাচ্চা লইয়া

চলিতেছে। ছাদে শুকলাল, বড় নলিনী প্রভৃতি নিত্যকার সকল ভক্তদের মজলিশ বসিয়াছে। অন্য কথা নাই, কেবল এক কথা — কিসে শ্রীমকে আরাম করিয়া তোলা যায়। কিসে জ্ঞানভক্তির জীবন্ত বিগ্রহটি দীর্ঘস্থায়ী হয়।

সাধু বেলুড় মঠে যাইবেন। রাত্রি সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। ছাদে শুকলালের সঙ্গে দুই চারিটা কথা কহিয়া বিদায় নিলেন। নিচে তিনতলায় আসিয়া শ্রীমকে যুক্ত করে প্রণাম করিলেন। শ্রীম-র পাশে বড় নাতি, প্রভাসবাবুর বড় ছেলে বসা। বছর পনের বয়স দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। শ্রীম তাহাকে বলিতেছেন, লেখাপড়াও শিখলে না, কিছুই হলো না। কি করবে পরে? বিজড়িত কণ্ঠে আরও কি বলিতেছেন বুঝা যাইতেছে না সব কথা।

ভক্তরা সাধুকে বলিলেন, বলাই আপনাকে একদিন পর একদিন পত্র লিখবেন, এঁর শরীরের কথা।

সাধু আবার প্রণাম করিয়া শ্রীমকে বলিলেন, এবার আমি উঠবো। শ্রীম বলিলেন, আচ্ছা এসো। গিয়ে চিঠি দিও। সাধু করজোড়ে নিবেদন করিলেন, আমি গিয়ে চিঠি লিখবো। একটু ভালো হলে দেওঘরে যেতে হবে। এসে নিয়ে যাবো। বৈদ্যনাথ রয়েছেন — আর সাধুরা আছেন। এ সময়টা খুব ভালো ওখানে। বিদ্যাপীঠ খুব খোলা জায়গায়, অনেক বড় বড় মাঠ সামনে। শ্রীম মৃদু হাস্যে উত্তর করিলেন, এ শরীরে আর কোথাও যাওয়া হবে বলে মনে হয় না।

রাত্রি ৭।৫২ মিনিট। বাগবাজার স্টীমারঘাটে সাধু বসা। পাশে স্বামী অচিন্ত্যানন্দ। শ্রীম-র কথা হইতেছে। সাধুর হৃদয় কম্পিত শ্রীম-র শেষ কথা স্মরণ করিয়া। সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা — ঠাকুর, শ্রীম-র শরীর রাখ। জ্ঞান ভক্তির জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীম।

বেলুড় মঠ।
২৫ অক্টোবর, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বীর তৈয়ার করতে এসেছেন ঠাকুর

১

কলিকাতা। ঝামাপুকুর। ১৩/২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। ঠাকুরবাড়ি। শ্রীম আজ এখানে আছেন। ইহা শ্রীম-র পৈতৃক বাড়ি। এই বাড়িতে শ্রীশ্রীমা নিজে ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাই সকলে উহাকে ঠাকুরবাড়ি বলেন। শ্রীম কখনও ভক্তসঙ্গে এখানে থাকেন। এই বাড়িতে শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণ সর্বদা যাতায়াত করিতেন। মঠের অপর সাধুরাও কখনও থাকেন।

আজ পনেরই মে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ সাল, শুক্রবার। এখন অপরাহ্ন চারিটা। শ্রীম গ্রীষ্মে ক্লান্ত হইয়া শুইয়া আছেন দ্বিতলের ক্ষুদ্র গৃহে। জ্যৈষ্ঠের গরমে পৃথিবী তাপিতা।

দ্বিতলের বারান্দায় একটি সাধু শ্রীম-র জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার হাতে ঁবৈদ্যনাথের প্রসাদী পেঁড়া সওয়া সের। শ্রীম-র তৃতীয় পৌত্র তোতা আসিয়া বলিল, দাদুবাবু ঘরে ঘুমুচ্ছেন। এখনই উঠবেন। বসুন। আর একটি ভক্তও আসিয়াছেন, সরকার মহাশয়। তিনি নূতন আনাগোনা করিতেছেন।

সাধু বেলুড় মঠ হইতে আসিয়াছেন। তিনি থাকেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘরে। এখন গ্রীষ্মের ছুটি। স্টীমারে বাগবাজার। সেখান হইতে মর্টন স্কুলে যান। সাধুর সঙ্গে স্বামী ভদ্রানন্দও শ্যামবাজারের মোড় পর্যন্ত আসেন। তারপর ট্রামে ঠনঠনে। স্কুলবাড়িতে শ্রীমকে না পাইয়া ঠাকুরবাড়িতে আসিয়াছেন।

সাধু বসিয়া আছেন বারান্দায় বেঞ্চিতে, পশ্চিমমুখী। শ্রীম সামনের ডান পাশের ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। সাধুর হাতে প্রসাদী পেঁড়ার একটি পুঁটুলি। তিনি ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য — শ্রীভগবান মানুষ হয়ে এসেছেন

একেবারে দরিদ্রের ঘরে! তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ জন্ম নিয়েছেন কেহ দরিদ্রের গৃহে, কেহ বড় ঘরে। কেহ প্রায় নিরক্ষর, কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী স্নাতক। তাঁরা কি জিনিস লাভ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে, যাতে শরীর মন আত্মা, কুল শীল মান, সর্বস্ব তাঁর পায়ে ঢেলে দিয়েছেন? এই আমার পাশেই তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শুয়ে আছেন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি বিশিষ্ট ছাত্র। সারা জীবন শ্রীরামকৃষ্ণের গুণগান করে কাটিয়ে দিলেন — অবিরাম মহিমাকীর্তনে। আর অত বড় বিদ্বান হয়েও কি নিরভিমান! এই সামান্য ক্ষুদ্র গৃহে পড়ে আছেন। যেন পথিক পান্থশালায় সময়ক্ষেপ করছেন। ধর্মজগতের একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হয়েও যেন লুকিয়ে আছেন এই স্থানে।

সাধু এইসব কথা ভাবিতেছেন আর উদগ্রীব হইয়া ঐ ঘরের দরজার দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন। প্রায় একঘন্টা পর ঘরের দরজা খোলার শব্দে চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, শ্রীম ঘরের বাহির হইতেছেন। পরনে দুই ভাঁজ লালপেড়ে ধুতি, গায়েও তাই। হাতে গামছা। আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রু। ভাসাভাসা দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু। প্রসন্ন বদন। শরীর কাহিল দারুণ গ্রীষ্মে। বয়স সাতাত্তর পার হইয়া গিয়াছে। সাধু আনন্দে অধীর হইয়া ছুটিয়া গিয়া পাদমূলে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। শ্রীম দাঁড়ানো উপরের সিঁড়িতে, দক্ষিণাস্য। সাধু উত্তরাস্য বারান্দায়। হাতে সাধুকে টানিয়া তুলিয়া আহ্লাদে বলিলেন, ওমা, কখন এলে? সাধু বলিলেন, আজ সকালে মঠে এসেছি। এখন মঠ থেকে এলাম। শ্রীম বলিলেন, উপরে গিয়ে ঠাকুরের সামনে বস। আমি হাতমুখ ধুয়ে আসছি। সাধু বলিলেন, বাবা বৈদ্যনাথের প্রসাদ আছে। শ্রীম আনন্দে বলিলেন, দেখি কি প্রসাদ। পেঁড়া — অনেক যে! খানকয়েক এখানে রেখে দেওয়া যাক্। সাধু একটি ছোট বাটিতে ছয়খানা পেঁড়া শ্রীম-র আদেশমত রাখিয়া দিলেন। শ্রীম গেলেন নিচে কলতলায়। সাধু ঠাকুরের সামনে তিনতলায় বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীম তিনতলায় উঠিয়া সাধুর ডান হাতে ছাদের দরজায় পিছন দিয়া ঠাকুরঘরের সামনে বসিয়াছেন বীরাসনে। সাধুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, একে বীরাসন বলে না? সাধু বলিলেন, আজ্ঞে হাঁ। 'রামনামে' আছে, রাম 'বীরাসনে সংস্থিতং'। কিন্তু রামের আসল ছবিতে যেন বীরাসন

নয়। শ্রীম বলিলেন — না, বীরাসনই। আমাদের ওখানে (মর্টন স্কুলে) আছে এই ছবি।

কথোপকথন চলিতেছে।

শ্রীম (সাধুর প্রতি) — কেমন আছ আজকাল?

সাধু — এখন ভাল আছি।

শ্রীম (অভয় দিয়া) — হাঁ। এখন খাবে দাবে বেড়াবে বাপ-মা-ওয়ালা ছেলের মত। এখন strain (কর্মের চাপ) সইবে না। Responsibility (দায়িত্ব) আর নেওয়া চলবে না। মঠ, আশ্রম এই জন্যই হয়েছে। শরীর অসুস্থ থাকলে কাজ থেকে exempt (রেহাই) করে।

সাধু — Laid up (শয্যাগত) না হলে নয়। আর সর্বদা অসুস্থ বললে, একটা complaint (নালিশ) হয়ে দাঁড়ায়।

শ্রীম (সহাস্যে) — হাঁ, authorities (কর্তৃপক্ষ) তাতে অসন্তুষ্ট হয়। কর্মকাণ্ডে থাকলে এইরকম হয়। আমি এই ঠিক করেছি, কেন যাব ভাবতে? যিনি এতকাল দেখে আসছেন, বাকীটাও তিনিই দেখবেন। তবে কখনও চেষ্টা দিলে, সে তাঁরই ইচ্ছা। 'গোবিন্দ ভবনে' গেলাম, আবার বৌদ্ধদের ওখানে (কলেজ স্কোয়ারে), আবার দিনতকত বাগবাজারে উদ্বোধনে, গিরিশ বাবুর বাড়ি, অধর সেনের বাড়ি।

স্বামী রাঘবানন্দের প্রবেশ।

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব। আবার কথা।

শ্রীম — (সাধুর প্রতি) — 'ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য' (গীতা ৩:৩০) — কর্ম আমাতে সমর্পণ করে কর। Benefit (সুবিধা) না নেওয়া। তাই সন্ন্যাস হয়ে যায়। অর্জুনকে শ্রীভগবান বলছেন, 'যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগী' (গীতা ১৮:১১)। আবার বলেছেন, 'স সন্ন্যাসী চ যোগী চ' (গীতা ৬:১)।

কথামৃত উল্টিয়ে দেখলাম — আগাগোড়া সন্ন্যাসের কথা বলছেন। কোথাও ভোগের কথা বলেন নাই। তবে direct (সোজাসুজি) নয়। নিতে পারবে না লোকে।

তিনি যা বলেছেন সব অত্যাশ্রমীর জন্য। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী — অর্থাৎ, আশ্রম সন্ন্যাসী — এদের বিহিত কাজ আছে।

তাকেই বলে ধর্ম। গীতায় যে আছে, ‘স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ’ (গীতা ৩:৩৫)। এখানে ‘ধর্ম’ মানে, এই আশ্রমধর্ম।

কিন্তু ঠাকুর যা বলেছেন তা আশ্রমধর্মের বাইরে। শংকরাচার্য যে সন্ন্যাস প্রবর্তন করেছেন তা আশ্রমধর্মের বাইরে। ঠাকুরের সন্ন্যাসও অত্যাশ্রমী সন্ন্যাস। তাই মঠের সাধুরাও অত্যাশ্রমী সন্ন্যাসী। পৃথিবীর, অর্থাৎ চতুর্দশ ভুবনের ভোগ্য। সব ত্যাগ করার আদর্শটি গ্রহণ। কেবল মাত্র আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান চাই, আর কিছুই নয়। তাই শংকরাচার্য অত্যাশ্রমী সন্ন্যাসের অধিকারীর সাধনচতুষ্টয় প্রয়োজন বলেছেন — নিত্যানিত্য - বস্তু-বিবেক, ইহামূত্র* - ফলভোগ - বিরাগ, ষট্ সম্পদ আর মুমুক্ষুত্ব।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে এই সন্ন্যাসেরই কথা বলেছেন, ‘সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ’ (গীতা ১৮:৬৬) — এই মন্ত্রে। এর অর্থ, সকল ধর্মের বাইরে যে আমি, তাঁরই শরণ লও। তাহলে তোমায় আমি নিশ্চয় রক্ষা করব সকল পাপ থেকে।

পৃথিবীর সব ভোগ যখন আলুনী হয় তখনই এই সন্ন্যাস। যে ভগবান ছাড়া, জ্ঞান ভক্তি ছাড়া অন্য কিছ চায় না, সেই অত্যাশ্রমী সন্ন্যাসী। যেমন যাজ্ঞবল্ক্য — স্ত্রী, ধন, মান সব কিছু ছেড়ে সন্ন্যাসী হলেন।

যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন, তিনিও অত্যাশ্রমী। তার জন্য শাস্ত্রবিধির প্রয়োজন নাই। তিনি গৃহে থাকলেও অত্যাশ্রমী। আর বাহ্য সন্ন্যাসচিহ্ন যিনি পূর্ব থেকেই ধারণ করেছেন তাঁর আর কথা কি!

ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সব ভক্তরাই অত্যাশ্রমী — কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী! তাঁর সব কথা অত্যাশ্রমীর জন্য। নরেন্দ্রকে তাই বললেন, তুই ওদিক সেরে আয় (বাড়ির হাঙ্গাম)। আমি সব করে দেব। যা চাস তাই করে দেব।

মন অশান্ত থাকলে যোগ হবে না। তাই নরেন্দ্রকে ঐ কথা বললেন। সকলকে direct বলেন নাই, ধরতে পারবে না বলে, ভয় পাবে। তাই একটু ঢেকে বলেছেন। যেমন কলার ভিতর কুইনাইন ভরে দেয়। কুইনাইন তেতো। কিন্তু কলার ভিতর ভরে দিলে বুঝতে পারবে না ছেলেরা। তেমনি তাঁর কথার বীজ ঢুকিয়ে দিলেন। পরে সময়ে কাজ হবে। সামান্য একটি কথা, কিন্তু কি জোর! শোনবার সময় মনে হয়

---

* ইহামূত্র (ইহ+অমূত্র)-ইহলোক এবং পরলোক (শঙ্করাচার্যকৃত বিবেক চূড়ামণি)

— বাঃ, বেশ কথাটি তো — patronisingly (মুরুব্বিয়ানা করে) লোকে এরূপ বলে।

যেমন গীতার সার! ‘গীতা’ দশবার বললে যা হয় — নয়বার হয় ‘তাগী’। ‘তাগী’ আর ত্যাগী এক অর্থ। অর্থাৎ সব ছেড়ে, ত্যাগ করে, ঈশ্বরকে ধর। এটাই গীতার সার। দু’বার বললেও একই অর্থ। দশবারের কথা বলেছেন, emphasis (জোর) দেবার জন্য।

গীতাতেও ভোগের কথা একটিও দেখতে পেলাম না। আগাগোড়া ত্যাগের কথা। যখন লোক শোনে তখন বলে — বাঃ, বেশ তো — ‘তাগী তাগী তাগী।’ এ বেশ। জানে না এর ভেতর কি শক্তি রয়েছে।

‘কথামৃতে’ও তাই-ই দেখলাম — আগাগোড়া ত্যাগ। Direct (খোলাখুলি) বলেছেন কতকগুলিকে যারা ধরতে পারবে। ভয় পাবে বলে ঐ রকম করে বলেছেন অন্যদের। এতে সাহস পাবে, কেরমে (ক্রমে) বুঝতে পারবে।

শ্রীম এবার মঠের সাধুদের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন। স্বামী শুদ্ধানন্দের কথা আসিয়া পড়িল। ইনি মিশনের সেক্রেটারী।

শ্রীম (সাধুর প্রতি) — শুনেছি, কাজ থেকে এক বছরের ছুটি নিয়েছেন। বলেছেন, আলাদা থেকে যতটা পারি করবো।

সাধু — ইনি মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষকে একখানা বড় চিঠি দিয়েছিলেন। ভারি সুন্দর। লিখেছিলেন, ইউটোপিয়ান (Eutopion) ideas fulfilled (আকাশকুসুম-কল্পনা পূর্ণ) হবার নয়, এই বুঝেছি। সাধন ভজন দ্বারা আত্মোন্নতি করাই আমাদের উচিত। যতটুকু কাজ এর সহায় হয় ততটুকু করা। আর কাজ কমাবার চেষ্টা করা।

শ্রীম — কতদিন আগে লিখেছিলেন?

সাধু — প্রায় বছর তিনেক আগে।

শ্রীম — এখনও দেখছি ঐ ভাবটি আছে। ঐদিনের কথায় দেখলাম। ওখানে (মর্টন স্কুলে) এসেছিলেন।

২

শ্রীম — অশোকানন্দ রওনা হয়েছেন কি? আজ যাবার কথা।

সাধু — আজ্ঞে হাঁ। মঠের অনেক সাধু তাঁকে see off (বিদায় দিতে) করতে গার্ডেন রীচে গিয়েছেন বারটার সময়। ওখান থেকে জাহাজে চড়বার কথা।

নন্দীর প্রবেশ। নন্দী একটু স্থূলকায় ভালমানুষ, সরল। তারপর আসিলেন একটি নূতন ভক্ত। ইনি কাশী হইতে সম্প্রতি ফিরিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে নিত্যকার ভক্তগণ — শুকলাল, মনোরঞ্জন, বলাই, সতীনাথ, সরকার প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরঘরের সামনে বসিবার ছোট ঘরটি ভরিয়া গেল। শ্রীম ছাদের দোরগোড়ায় বসা। স্বামী রাঘবানন্দ আসিতেই শ্রীম উঠিয়া ছাদে গেলেন — উত্তর দিকে স্থান অল্প বলিয়া ছাদে কম্বল পাতিতেছেন নিজে, সঙ্গে নন্দী। একটি সাধু শ্রীম-র হাত হইতে কম্বল লইয়া নিমেষে পাতিয়া দিলেন। শ্রীম নন্দীকে বলিলেন — দেখুন, কেমন চটপট করে পেতে ফেললেন। ওঁরা দিনরাত সেবা করেন কিনা, তাই। আপনারা তো এতখানি সময়েও সুবিধা করতে পারেন নাই।

শ্রীম ছাদে বসিয়াছেন মধ্যস্থলে, পূর্বাস্য। স্বামী রাঘবানন্দ শ্রীম-র বামদিকে, দক্ষিণাস্য। আর স্বামী নিত্যাত্মানন্দ শ্রীম-র সামনে পশ্চিমাস্য বসিয়াছেন। ভক্তগণ চারিদিকে যে যেখানে পারেন বসিয়া পড়িলেন।

কেষ্টর প্রবেশ। তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া শ্রীম-র সামনে বসিলেন। বেশ গরম, তাই একটু পরে গায়ের জামা খুলিয়া ফেলিলেন।

এখন সন্ধ্যা। ঠাকুরঘরে আরতি হইবে। পূজারী আরতি করেন। পূজারী শ্রীশ্রীমায়ের পিতৃকুলের ব্রাহ্মণ। শ্রীম বলিতেছেন, হারমোনিয়ামের সঙ্গে এই দু'টি নিত্য হবে — 'ভয় হর মঙ্গল' আর 'কনকাম্বর'। স্বামী রাঘবানন্দ বলিলেন, 'কনকাম্বর' বড় খটমটে, প্রার্থনাটি ছোট আছে। শ্রীম উত্তর করিলেন, হাঁ। কিন্তু সুরটি খুব ভাল — ভারি সুন্দর! ঠাকুর বলতেন, সুরে মন স্থির হয়। স্বামী রাঘবানন্দ বলিলেন — হাঁ, ভীমপলশ্রী। শ্রীম বক্তব্য শেষ করিলেন — আচ্ছা, উনি যখন বলছেন তখন উটিও (প্রার্থনাও) হবে। প্রথম — 'খণ্ডন ভববন্ধন', দ্বিতীয় — 'ওঁ হ্রীং ঋতং', তৃতীয় — 'ভয় হর মঙ্গল', চতুর্থ — 'কনকাম্বর', আর পঞ্চম — 'নান্যাস্পৃহা', এই প্রার্থনাটি। আর নিয়ম করেছি এটি নিত্য হবে।

ঘরে আরতি হইতেছে। সতীনাথ হারমোনিয়াম লইয়া ঠাকুরঘরের দরজার সামনে বসিবার ঘরে বসিয়া পশ্চিমাস্য এই প্রথম চারিটি গান গাহিলেন। কমল গাহিলেন প্রার্থনাটি। ভক্তগণও সঙ্গে গাহিয়াছেন। শ্রীম ও সাধুগণ সকলে একসঙ্গে ছাদেই বসিয়া দর্শন ও কীর্তন করিতেছেন।

শ্রীম-র সামনে কেষ্ট বসা, খালি গা। শ্রীম ইঙ্গিত করিলেন গা ঢাকিতে। আরতি ও কীর্তন শেষ হইলে সকলে আসিয়া ছাদে বসিলেন। এবার কথোপকথন আরম্ভ হইল।

শ্রীম (কেষ্টর প্রতি) — সাধু ও ঠাকুরদের সামনে খালি গায়ে বসতে নাই। অন্ততঃ কাপড়ের খুঁটটা টেনে নিয়ে বসতে হয়। সরকার মশায়কেও বলবেন। সাধুদের সেবার সময় গলায় কাপড় দিয়ে করবেন। তা হলে এ সবই নারায়ণসেবা হয়ে যায়।

স্বামী রাঘবানন্দ — যোগীর লক্ষণ কি? শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে,

লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং বর্ণপ্রসাদং স্বরসৌষ্ঠবং চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি।।*

অপর সাধু — এও আছে,

নীহার ধূমার্কানলানিলানাং খদ্যোত বিদ্যুতস্ফটিকশশীনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে।।**

শ্রীম — এগুলি বাহ্য লক্ষণ। ঠাকুর বলতেন, পাখী ডিমে তা দিচ্ছে। ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি। সমস্ত মনটা ভিতরে, ডিমে। বাইরের কথায় আরো বলতেন, রাত তিনটার সময় উঠবে। তাই তো আমরা নিয়ম করেছি, এখানে যাঁরা থাকেন তাঁরা অন্ততঃ চারটার সময় উঠবেন। সাতটা পর্যন্ত যদি ঘুম হয় — মুখে লাল পড়ছে, ভগবান চিন্তা কখন হবে তা হলে?

খাওয়াও কম হবে। বলতেন, দিনে বারুদ-ঠাসা খাবে। রাত্রে সামান্য জল খাওয়া। তবে তো উঠতে পারবে শীঘ্র। আর বলতেন, তলতা বাঁশ

---

*লঘু ও নীরোগ শরীর, বিষয় আসক্তির নিবৃত্তি, শারীরিক কান্তির উজ্জ্বলতা, স্বরের মাধুর্য্য, সুগন্ধ এবং ন্যূনতম মলমূত্র ত্যাগ - ইহাই যোগসিদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ বলিয়া উদ্ধৃত। (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, ২:১৩)।

**যোগাভ্যাসের দ্বারা আদিতে অনুভব হয় - নীহার, ধূম্র, সূর্য, বায়ু, অগ্নি, জোনাকি, বিদ্যুৎ, স্ফটিক এবং চন্দ্রমা - ইহা ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি। (২:১১)

(বঁড়শী) মাছ দিয়ে পেতেছে। যেই মাছটা খেল অমনি একেবারে সিধে হয়ে গেল।

মানুষের মন ভোগে রয়েছে। যখনই ভোগ শেষ হয়ে গেল তখনই বরাবর তাঁর দিকে চলে যায় একেবারে সোজা।

Normal (সাধারণ) অবস্থা মানুষের সমাধিস্থ হয়ে থাকা। কিন্তু সংসারে পড়ে ঐ রকম হয়ে গেছে। আবার তাঁর কৃপায় ভোগ শেষ হলে, ঐ রকম — একেবারে সোজা হয়ে যাবে। তাই ব্রাহ্মমুহূর্তে ওঠা বড়ই ভাল।

সতীনাথ যুবক, ধর্মভাব আছে, বয়স বাইশ হইবে। সরল লোক। মাথায় মেয়েদের মত লম্বা চুল। বেশ প্রসন্ন ভাব। গানের গলা বড় মিষ্ট। ইদানিং মঠে আনাগোনা করিতেছেন। কিছুদিন হইতে ঠাকুরবাড়িতে থাকেন। কখনও বাড়ি যান। কলিকাতার বাহিরে নিকটেই বাড়ি। একটু এলোমেলো।

আরতির গান ভজন হইয়া গেলে সতীনাথ একটু নিচে গিয়াছেন। স্বামী রাঘবানন্দ তাঁহাকে ভালবাসেন। তাঁহার সম্বন্ধে ফষ্টিনষ্টি করিতেছেন শ্রীম-র সঙ্গে। বলিতেছেন হাসিতে হাসিতে, কাপড়টা এমন করে পরে কেন, অসভ্যর মত? ঠাকুর দেবতা গুরুজনদের কাছে অমন করে যাওয়া ঠিক নয়।

ইতিমধ্যে সতীনাথ কাঠের সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আবার কথা শুনাইয়া বলিলেন। আর বলিলেন — আচ্ছা, লম্বা চুল রাখে কেন মেয়েদের মতো? বাউলরাও রাখে। ওর কি বাউল হবার ইচ্ছা নাকি?

সতীনাথ শুনিতেছেন। এবার আসিয়া ছাদে দাঁড়াইয়াছেন! শ্রীমও যোগদান করিয়াছেন এই সস্নেহ সমালোচনায়।

শ্রীম (চোখে দুষ্ট হাস্যের সহিত) — শুনছেন সতীনাথ, কি বলছেন? কাপড়টি একটু ওপরে উঠিয়ে পরবেন। তাহলে ভুঁড়ি বাড়বে না (হাস্য)। এঁরা লম্বা চুলের কথাও বলছেন — মেয়েরা রাখে। (জনান্তিকে, স্বামী রাঘবানন্দের প্রতি) উনি তো বেটা ছেলে। তবে কেন লম্বা চুল? ঠাকুর বলতেন, ধর্মধ্বজা, তাই কি? সতীনাথ অপ্রস্তুত, নির্বাক।

শ্রীম (স্বামী রাঘবানন্দের প্রতি) — ইনি খুব কাজের লোক। একটা

আলগা স্বভাব, এই আর কি (ভক্তদের হাস্য) ! ঠাকুরদের সেবা করছেন খুব। (দুষ্ট নয়নহাস্যে) হুঁ, খুব। আমরা আবার এক একবার warn (সাবধান) করি, বঁটিতে হাত না কেটে ফেলেন। ফল ছাড়ান কিনা ঠাকুরদের। তা আলস্য — এ ঠাকুরসেবা, সাধু ভক্তদের সেবা করলে চলে যাবে। উনি কি কম! মনে করুন, ঠাকুরবাড়ির একজন বড় সেবক। বলতে নেই পাছে অহংকার হয় (শ্রীম-র চোখ মুখ হাসিতে ঢলঢল)। ইনি যেন এখানকার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (সকলের উচ্চহাস্য)। কাল থেকেই দেখবেন, রাত তিনটায় উঠে ধ্যানভজন করবেন। আপনাদের অবাক করে দেবেন।

অনেক দিনের অভ্যাস বেলায় ওঠা। তা খুব মনের জোর। কাল থেকে অন্য লোক হয়ে যাবেন। যোগীরা খুব সকালে ওঠেন কিনা দেখুন না, উনি কতবড় কর্মযোগী! (সতীনাথের প্রতি) হাঁ, সতীনাথবাবু, দাও দেখি দেখিয়ে এঁদের সব একটু কর্মযোগ — সাধুদের আহারের ব্যবস্থা করে। সতীনাথ আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। (বলাই ও মনোরঞ্জনের প্রতি চক্ষুতে ইঙ্গিত করিয়া) আপনারাও একটু করুন না এঁকে (চটপটে)। (ভক্তদের প্রতি) দেখুন, এরই মধ্যে কেমন আলস্য গেছে — একেবারে 'ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ' — যেন কর্মবীর! গীতায় এটাকে সত্ত্বগুণী কর্মীর লক্ষণ বলেছেন — আর 'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ'। কি শ্লোকটা?

একজন সাধু —

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ (গীতা ১৮:২৬)

শ্রীম (শুকলালের প্রতি গম্ভীরভাবে) — শুনছেন শুকলালবাবু, মানুষের মন তলতা বাঁশের মত। ও (ভোগ) হয়ে গেলে একেবারে ঐ (ঈশ্বরের) দিকে। যোগভ্রষ্ট হয়ে পড়ে ভোগেতে।

শ্রীম মাঝে মাঝে অন্য প্রসঙ্গের মধ্যেও শুকলালকে এই কথা বলিতেছেন — 'যোগভ্রষ্ট হয়ে পড়ে ভোগেতে'। আর ফষ্টিনষ্টিও করিতেছেন। রাত্রি সওয়া নয়টা। ভক্তরা অনেকেই বিদায় লইতেছেন। শুকলাল প্রণাম করিতেই শ্রীম বলিলেন, মানুষের মন যেন তলতা বাঁশ। ঠাকুরের এ মহাবাক্যটি ভাবতে ভাবতে বেলেঘাটা যান।

স্বামী রাঘবানন্দ শ্রীম-র কাছেই বাস করেন। অন্য সাধুটিও শ্রীম-র

পদচ্ছায়ায় দীর্ঘকাল বাস করিয়াছেন। এখন বিদ্যাপীঠে থাকেন। মঠে আসিয়াছেন। সেখান হইতে এখানে। আজ ইনিও রাত্রিবাস করিবেন। তাঁহাদের আহার হইয়া গেল। দোকান হইতে লুচি, তরকারি ও মিষ্টি আনিয়া ভক্তগণ তাঁহাদের রাত্রির আহার সম্পন্ন করাইলেন। শ্রীম বসিয়া দেখিতেছেন।

আহারান্তে আবার কথাবার্তা হইতেছে।

স্বামী রাঘবানন্দ — আচ্ছা, চাকনাচূর মানে কি?

শ্রীম — মাথা চূরমার হয়ে যাওয়া, অর্থাৎ বিনাশ, মৃত্যু।

স্বামী রাঘবানন্দ — পশ্চিমের সাধুরা বেশ একটি ছড়া বলে —

ফকিরী ফকরা বহুৎ দূর যেন লম্বা খেজুর।
চড় তো খাও খেজুর, নাহি তো চাক্‌নাচূর॥

শ্রীম — বেশ কথাটি তো!

স্বামী রাঘবানন্দ (সহাস্যে) — ও দিকের সাধুদের কথাগুলি বেশ। ঋষিকেশে একবার আমি গ্রীষ্মকালে কুটীরে কম্বল মুড়ি দিয়ে ধ্যান করছিলাম লম্বা হয়ে। একজন সাধু দেখেই বললেন, চঞ্চল হয়ে — হে মহাত্মা, কিয়া কর রাহা হো, আভি ধ্যান না করো, প্রপঞ্চ উষ্ণ হ্যায়।

শ্রীম (সহাস্যে) — হাঁ, বেশ কথাটি তো — 'প্রপঞ্চ উষ্ণ হ্যায়'।

স্বামী রাঘবানন্দ আমেরিকার লোকদের কথা বলিতেছেন। তাহারা অনেকে খুব ব্যাকুল শান্তির জন্য। এখান হইতে আরও লোক যায়, তাহারা তাই চায়। সারা জাতটা অর্থোপার্জনে ব্যস্ত। ইহারই ভিতর অনেকগুলি লোক শান্তি চায়। স্বামীজীর কাছে ইহারাই আসিয়াছিলেন।

শ্রীম — হাঁ। স্বামীজীর সে ভালবাসা কোথায়? দেখছি, যাদের সঙ্গে মিশেছেন, যেন ভালবাসায় কিনে ফেলেছেন। সেটির দরকার। অনেকে যাচ্ছে তো, আরো যাবে। কিন্তু সে ভালবাসা কোথায়? ভাল না বাসলে কেউ কথা নেয় না।

সাধু দুইজনকে 'নাটমন্দির'-এ শুইতে দিয়া শ্রীম নিচে গেলেন আপন কক্ষে। রাত্রি এগারটা।

ঠাকুরবাড়ি, কলিকাতা।
১৫ই মে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ সাল, শুক্রবার।

ষোড়শ অধ্যায়

মহাপুরুষ-চিত্র

১

ঠাকুরবাড়ি। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। কলিকাতা। গ্রীষ্মকাল। সন্ধ্যার অল্প বাকী। শ্রীম এখন এখানে বাস করিতেছেন। নিত্যকার ভক্তগণ-মধ্যে অনেকেই আসিয়াছেন। শ্রীম দ্বিতলের নিজ কক্ষে রহিয়াছেন। ভক্তগণ কেহ দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া আছেন। কেহ 'নাটমন্দিরে', কেহ ছাদে বসা।

এখন সাতটা। শ্রীম ত্রিতলের ছাদে আসিয়াছেন। কিছুক্ষণ পর আরতি আরম্ভ হইল। আরতির পর শ্রীম অন্তেবাসীকে মহাপুরুষ মহারাজের ডায়েরী পাঠ করিতে বলিলেন। অন্তেবাসী ছয়টার সময় আসিয়াছেন বেলুড় মঠ হইতে।

আজ ১৫ই মে ১৩৩১ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। শ্রীম ছাদে বসিয়াছেন দরজার সম্মুখে। ভক্তগণ ছাদে, কেহ ভিতরে, কেহ বাহিরে। অন্তেবাসী নাটমন্দিরে বসিয়া ডায়েরী পাঠ করিতেছেন।

বেলুড় মঠ। আজ ২২শে জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার। এখন সওয়া ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ খাটে বসিয়া আছেন। প্রণাম করিয়া বড় হীরেন মহারাজ, স্বামী জিতাত্মানন্দ ও নিত্যাত্মানন্দ দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামী সুবোধানন্দের সেবক বীরেন মহারাজ আসিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীমহাপুরুষ কথা কহিতেছেন।

শ্রীমহাপুরুষ — কোথায় গিছলে?

বীরেন — খোকা মহারাজের সঙ্গে কলকাতায়।

শ্রীমহাপুরুষ (চিন্তিত হইয়া) — মেয়েমানুষ আছে ওখানে, দেখো বাবা।

বীরেন মহারাজ — ভেতরে থাকে! আমরা বৈঠকখানায় ছিলাম।

শ্রীমহাপুরুষ — সাবধান, ও বড় ভয়ানক জায়গা! তিনি বুড়ো হয়েছেন, মিশতে পারেন, বসতে পারেন মেয়েদের সঙ্গে। খোকা মহারাজের আগের একজন সেবক মাটি হয়ে গেছে।

স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ আসিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীমহাপুরুষ রহস্যচ্ছলে বলিলেন, কেমন আছ সুরেন? ভাল আছ — বেশ বেশ (একা একা হাস্য)। (সহাস্যে) তোমার কথা আমিই সেরে দিলাম একবারে। আমি বলতাম, কেমন আছ? তুমি বলতে, ভাল আছি। তা একেবারেই সারা গেল (হাস্য)।

শ্রীমহাপুরুষ অফিসে আসিয়া বসিলেন। বিদ্যাপীঠের একজন সাধু ফোন ধরিয়াছেন। কলিকাতা হইতে অপর একজন ব্রহ্মচারী সাধন চৈতন্য ফোন করিয়াছেন। সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ যাবে বিদ্যাপীঠে? ক'টায়? সাধু বলিলেন, এগারটায়। মহাপুরুষ বলিলেন, বড় গরম হয় দিনে। আর কে যাবে? সাধু বলিলেন, কলকাতা থেকে ছেলেরা সাধন চৈতন্যের সঙ্গে যাবে। মাদ্রাজের রামনাথ মহারাজ ও ব্রহ্মচারী দামোদর প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষ সস্নেহে রামনাথকে বলিলেন, যেতে ইচ্ছা হয় না দেশে, দক্ষিণে? বাংলাদেশে ভাল লেগেছে?

পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। আজ ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার, বিল্বষষ্ঠী। বেলুড় মঠে দুর্গোৎসব হইতেছে। শ্রীমহাপুরুষের ঘরের নিচেই দুর্গামণ্ডপ। সাধু ও ব্রহ্মচারীগণ বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে আসিয়াছেন। সকলেই আসিয়া শ্রীমহাপুরুষকে দর্শন ও প্রণাম করিতেছেন। তাঁহার শরীর অসুস্থ বলিয়া অনেকে উদ্বেগের সহিত বাহির কেন্দ্র হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন দর্শন করিতে। দেওঘর বিদ্যাপীঠ হইতেও একজন সাধু আজ আসিয়াছেন সকাল সাতটায়। শ্রীমহাপুরুষ জলযোগের পর বিশ্রাম করিতেছিলেন, তাই সাধু নয়টায় ঘর খুলিলে ভিতরে গিয়া দর্শন ও প্রণাম করিলেন।

শ্রীমহাপুরুষ স্বীয় কক্ষে খাটের উপর বসিয়া আছেন, পশ্চিমাস্য। স্বামী বিরজানন্দ ও বিশুদ্ধানন্দের সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ যেন এলোমেলো হইয়া গিয়াছেন। একটা আনন্দময় ভাবে

তরঙ্গায়িত মন, বুদ্ধি। আঁট নাই, পাঁচ বছরের শিশুর অবস্থা। হাত মুখ নাড়িয়া কথা কহিতেছেন। মুখমণ্ডল আনন্দরসে পরিস্নাত। বাহিরে দেখিলে কেবল মনে হইবে যেন চঞ্চল, অর্ধ উন্মাদবৎ। কিন্তু চক্ষু, মুখমণ্ডল, দৃষ্টি, হাবভাব, হস্তমুখ সঞ্চালনে অপূর্ব এক নিরতিশয় আনন্দের বন্যা অন্তর্মনে প্রবাহিত হইতেছে বুঝা যায়।

সাধুটি প্রণাম করিতেই বলিলেন, ভাল আছ? (সেবকের প্রতি) প্রসাদ দাও, প্রসাদ দাও। সেবক মতি ঘরের বাহিরে ছিলেন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ডাকিতেছেন, মতি প্রসাদ দাও। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, তিনি আবার হুকুম করছেন — এনে দাও। মতি আসিয়া একটি বড় ফেণী বাতাসা দিলেন। আজকাল মহাপুরুষের ইচ্ছায় এই প্রসাদ দেওয়া হয়। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, প্রসাদ আগে। ঠাকুর ঐটি করতেন, প্রসাদ দিতেন। (সাধুর প্রতি) — যাও, এবার গিয়ে সব দেখ, কত দেবতা আসবে।

স্বামী বিরজানন্দ প্রার্থনা করিতেছেন, দুর্গাপূজা যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। শ্রীমহাপুরুষ উত্তর করিলেন, মায়ের ইচ্ছায় সব হয়ে যাবে — সব ভাল থাকবে। উদ্বোধন আর নিবেদিতা স্কুলের সকলে ভাল আছে তো — আর সব ভাল? শ্রীমহাপুরুষের সামনে স্টুলে গড়গড়া। হাঁফানির টান চলিতেছে, শরীর ক্লান্ত। তবুও কথার বিরাম নাই।

মনটি উঁচু পরদায় চড়িয়া আছে আর সেখান হইতে মানুষের অন্তঃস্থিত স্থির ও শান্ত শ্রীভগবানকে যেন সদা দর্শন করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। দুর্গাদেবীর সঙ্গে দেবগণেরও আগমন বুঝি হইয়াছে। শ্রীমহাপুরুষ যেন দেখিতেছেন, সত্য সত্যই ব্রহ্মশক্তি আসিয়া সগণ সদেবতা সর্বত্যাগী সাধুদের প্রেমের পূজা গ্রহণ করিতেছেন।

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমীতে খুব লোকের ভিড় বলিয়া শ্রীমহাপুরুষ নিজের ঘরেই রহিয়াছেন। কখনও বারান্দায় আসেন লোকজন বেশী আসিতে দেওয়া হয় না। সাধুরা যখন যান, নীরবে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসেন।

সপ্তমীর দিন শ্রীমহাপুরুষ শুইয়া আছেন, পাশে স্বামী বিজয়ানন্দ। গরম বোধ হওয়ায় পাখা করিতে বলিলেন। বিজয়ানন্দ হাওয়া করিতেছেন। খানিকপর উঠিয়া বসিলেন খাটের উপর উত্তর পাশে। একটি সাধু

Working Committee-র (কার্য্যকারী কমিটির) ঘরে দাঁড়াইয়া এই দেবমানবকে দর্শন করিতেছেন। সেবক উমেশপুরী উত্তর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন।

দশমীর দিন রাত্রিতে ক্লান্ত বলিয়া শ্রীমহাপুরুষ বিছানায় শুইয়া ছিলেন। কাহাকেও দর্শন ও প্রণাম করিতে দেওয়া হয় নাই। কেহ কেহ দোতলায় সিঁড়ির কাছ হইতে উদ্দেশ্য করিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন।

একাদশীর দিন। সকালে শ্রীমহাপুরুষ খাটে বসা। সাধুগণ প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন।

দ্বাদশীর দিন সকালে শ্রীমহাপুরুষ চেয়ারে উপবিষ্ট — টেবিলের উত্তর দিকে। একজন সাধু প্রণাম করিয়াই বাহিরে চলিয়া আসিতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল আছো?

ত্রয়োদশীর দিন শ্রীমহাপুরুষ বিছানায় বসিয়া আছেন। এখন সকাল বেলা। একজন সাধু প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন। ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য! এই মহাপুরুষের দেহবুদ্ধি যেন অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন আত্মায় অবস্থিত থাকিয়া সঙ্ঘ পরিচালনা করিতেছেন। আলিপুরের একজন ভক্ত ভদ্রলোক আসিয়া প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষ কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, তুমি চা খেয়ে যেও।

শ্রীমহাপুরুষ যেন একেবারে পরমহংস অবধূত! পাঁচ বৎসরের শিশুর মত নগ্ন। সামনে কাপড় দিয়া ঢাকা — বসিয়া আছেন।

সন্ধ্যা সাতটা। একজন সাধু ঠাকুরঘরের বারান্দা হইতে শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করিতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ বিছানায় বাসিয়া আছেন। হাঁফানির টান বাড়িয়াছে। এখন একটু জলযোগ করিতেছেন। স্বামী অপূর্বানন্দ খাবার দিতেছেন। আর স্বামী শিবস্বরূপানন্দ উত্তর দিকে দাঁড়াইয়া আছেন — হাওয়া করিতেছেন। বিছানার সামনে মেঝেতে একটি ট্রেতে দুইটি 'সসার', একটি প্লেট দুইটি চায়ের কাপ।

সাধুটি ভাবিতেছেন — আমার সম্মুখে জীবন্ত ঠাকুর! শ্রীমহাপুরুষের ভিতরে যেন ঠাকুরের আবির্ভাব! তাই একেবারে শিশুর মত আনন্দময় ও নিশ্চিন্ত সরল ব্যবহার! আর প্রেমে ঢলঢল ভাব। সকলের উপর প্রেম

বর্ষণ করিতেছেন। ভাগ্যবান আমরা — এ দৃশ্য দর্শন করিতে পারিতেছি। নিজের ব্রহ্মজ্ঞান-দর্শন কখন হইবে জানি না। কিন্তু সম্মুখে সাক্ষাৎ ব্রহ্মদ্রষ্টা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। সত্যই আমরা ধন্য!

আজ 'উদ্বোধনে' উৎসব। মঠের অনেক সাধু সেখানে গিয়াছেন। তাঁহারা রাত্রিতে আহার করিয়া বরাহনগর মঠে ফিরিলেন! সঙ্গে আছেন স্বামী শর্বানন্দ, শাশ্বতানন্দ প্রভৃতি। বিদ্যাপীঠের সাধুটিও তাঁহাদের সঙ্গে আসিলেন। তাঁহার আসন হইয়াছে বুদ্ধ মহারাজের সঙ্গে প্রেমানন্দ মেমোরিয়েল গৃহের নিচে, দক্ষিণের ঘরে।

শ্রীম — মহাপুরুষ মহারাজের এসব আচরণ দেখে লোক বুঝতে পারবে যে, ব্রহ্মজ্ঞ পার্ষদেরও দেহকষ্ট হয়। কিন্তু মনটি সম্পূর্ণ নীরোগ সতেজ আনন্দময়। সুদৃঢ় বিশ্বাস, আমি ঈশ্বরের আপনার জন, মানুষ নই কেবল! কত উপকার হবে লোকের। শুধু শাস্ত্র পড়ে ব্রহ্মজ্ঞের জীবনের অনুমান ঠিক হয় না। মহাপুরুষের আচরণ দেখে ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে। শোলার আতা — কেবল শাস্ত্র পড়ে অনুমান। এ হলো সত্যিকার আতা ফল, মহাপুরুষের আচরণ ও জীবন!

২

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। আজ ৬ই অক্টোবর, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার। শুক্লা চতুর্দশী। এখন সকাল ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ স্বীয় কক্ষে বসিয়া আছেন খাটের মধ্যস্থলে, পশ্চিমাস্য। উন্মুক্ত দেহ! পিঠের মেরুদণ্ড ভাসা। একটু বাঁকিয়া গিয়াছে শরীর। কখন ডান হাতখানা ডান গালে দিয়া বসিতেছেন, এখন 'উঁ উঁ' করিয়া শারীরিক যন্ত্রণা প্রকাশ করিতেছেন। এত কষ্টতেও উঠিয়া বসিয়াছেন। আর সকল সাধু ব্রহ্মচারীর প্রণাম গ্রহণ করিতেছেন ও অকাতরে কুশল প্রশ্নাদি করিতেছেন, নিজের যন্ত্রণা ভুলিয়া।

একদিন বলিয়াছিলেন, স্বামীজী আমাদের আচার্যের আসনে বসিয়ে গেছেন। তাইতো এত অসুখেও এসব করতে হচ্ছে। যখন কেহ প্রণাম করেন তখন যেন নিজের রোগ ভুলিয়া যান। সুস্থ মানুষের মত তাহার সহিত মিষ্ট আলাপ করেন। কখনও রসিকতা, হাসি ঠাট্টাও করেন। যেন

বহুরূপীর জাত।

বিনয় দক্ষিণে দাঁড়াইয়া হাওয়া করিতেছেন। বিদ্যাপীঠের একজন সাধু আসিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। তাঁহার প্রতি তাকাইয়া দেখিলেন, কিন্তু কোনও কথা বলিলেন না।

স্বামী গঙ্গেশানন্দ গৃহে প্রবেশ করিলেন। মহাপুরুষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন — হাঁ দ্বিজেন, ডাক্তারকে কল (অমর মুখার্জী হোমিওপ্যাথ) দেওয়া হয়েছিল তো? দ্বিজেন 'হাঁ' বলিলে আবার বলিলেন — বাকী ফল, আঙ্গুর সব তোমরা খেয়ে ফেল। দ্বিজেন পুনরায় কহিলেন — একটা বেদানা জিতেন মহারাজকে দেব। শ্রীমহাপুরুষ আনন্দে বলিলেন — হাঁ তা দাও, তোমরাও খেও।

স্বামী অম্বিকানন্দ ও স্বামী শর্বানন্দ গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রণাম করিলেন ভূমিষ্ঠ হইয়া। মহাপুরুষ বলিলেন, এই যে নীরদ মহারাজ। দাও, মোড়াটা দাও ওঁকে বসতে। স্বামী শর্বানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় ছিলে কাল? উদ্বোধনে — উত্তর করিলেন স্বামী শর্বানন্দ। মহাপুরুষ আহ্লাদে বলিতেছেন, বা বা বেশ হলো, এই তো মায়ের বাড়ি। পূর্বেও তাই ছিল। কোথা থেকে যেন সব জুটে ওটাকে কি করে তুলেছিল — বাপ রে! এখন আবার সেই পূর্বের ভাব।

স্বামী শর্বানন্দ বলিলেন, আজ আমি সিলোন (Ceylon) যাব। Direct (সোজা) যাব। মাদ্রাজে halt (যাত্রা ভঙ্গ) করবো না। ধনুষ্কোটিতে বোটে চড়ে সমুদ্র পার হব। এক মাসের মধ্যে আবার ফিরতে হবে।

সকলে দাঁড়াইয়া আছেন। দরজা বন্ধ হইয়া গেল। এবার বিশ্রাম করিবেন মহাপুরুষ। সাধুরা সব বাহিরে গেলেন।

বেলুড় মঠ। আজ ৯ই অক্টোবর, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। সকাল ছয়টা। মহাপুরুষ আজ একটু ভাল। তাই বিছানা ছাড়িয়া গিয়া চেয়ারে বসিয়াছেন দক্ষিণ-পশ্চিম জানালার সামনে পূর্বাস্য, খালি গা। স্বামী বিজয়ানন্দ সামনে দাঁড়াইয়া আছেন।

রাধেশ্যাম আসিয়া প্রণাম করিল। তাহার সহিত ফষ্টি-নষ্টি করিতেছেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ রে, তোর আগের নামটা কি বল না (সকলের হাস্য)। রাধেশ্যামের জন্ম মুশ্লিম কুলে।

এখন সাড়ে ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ উঠিয়া গিয়া খাটে বসিলেন, পশ্চিমাস্য। গায়ে একখানা পাতলা চাদর। একখানা নূতন খাট আসিয়াছে। দরজার বাহিরে রাখা হইয়াছে। তিনি চাহিয়া দেখিতেছেন। বলিলেন, কুঁজোগুলো ভাসবে তো?

একটি সাধু ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন, উনি দেখিতেছেন। সেবক অপূর্বানন্দ বলিলেন — অমুক। উনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, চিনেছি। (সহাস্যে) ওর মাথাটা সামনের দিকে একটু বেড়ে গেছে। স্বামীজী বলতেন, 'তে-এইটে'। আমরাও তাই বলি। (অপূর্বানন্দের প্রতি) তোমরা বল না? — না মহারাজ, আমরা বলি না, বলিয়া অতি বিনয় ও নম্রভাবে অপূর্বানন্দ উত্তর করিলেন। আজকাল শ্রীমহাপুরুষের বালকস্বভাব। মনে যাহা উঠে বালকের মত তাহাই বলেন, কিন্তু আনন্দময়।

অপূর্বানন্দ বলিলেন, ও ঘরে যেতে হবে, খাট বদলানো হবে। মহাপুরুষ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। স্বামী অপূর্বানন্দ আর বৈরাগ্যানন্দ দুই দিকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন। তিনি পা টানিয়া টানিয়া চলিতেছেন আর হেলিতেছেন। খালি গা।

খোকা মহারাজের ছোট ঘরে ঢুকিয়াছেন। সামনে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। খোকা মহারাজকে বলিলেন, কেমন খোকা, জ্বর হয়েছে? খোকা মহারাজ উঠিয়া বসিলেন আর জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেমন আছেন? মহাপুরুষ উত্তর করিলেন, very bad, very bad (খুব খারাপ, খুব খারাপ)। কাল রাত্রে ঘুম হয় নাই — not a wink upto five (A.M.) (ভোর পাঁচটা পর্যন্ত চোখের পাতা বোজে নাই।) খোকা মহারাজ বলিলেন, গায়ে একটা কিছু দিন।

মহাপুরুষ দক্ষিণের বড় ঘরে গিয়া মাঝখানে বসিলেন। ইহা ওয়ার্কিং কমিটির আপিসঘর। উত্তরাস্য চেয়ারে বসিয়াছেন, শরীর সম্মুখে ঝুঁকিয়া আছে। মহাদেববাবু তালপাতার পাখা দিয়া বাতাস করিতেছেন।

শ্রীম — স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ এসব। যাঁর মন ভগবানে সম্পূর্ণ সমর্পিত তাঁর আচরণই স্থিতপ্রজ্ঞের, লক্ষণ — যেমন এই মহাপুরুষ মহারাজের আচরণ। অমন ভাবে শাস্ত্রে দেখা যায় না — খুব দরকার সিদ্ধ মহাপুরুষদের আচরণ লিপিবদ্ধ করা।

৩

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

আজ ১৩ই অক্টোবর ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার।

বেলুড় মঠ। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। সকাল সাড়ে ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ খাটে বসিয়াছেন, পশ্চিমাস্য। নগ্নদেহ। শৈলেশ, বিনয়, হিরণ্ময়, রাখাল, শঙ্কর প্রভৃতি সন্ন্যাসী সেবকগণ ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন। কেহ কাজ করিতেছেন।

একটি সাধু আসিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীমহাপুরুষ তাঁহাকে বলিতেছেন, দেওঘর থেকে এ সময় এয়েছ ভুগতে? অনেক কাল ভোগ নাই। ভুগবার ইচ্ছা হয়েছে? এই জ্বরে পড়লে!

সাধু ধীর স্থির ভাবে উত্তর করিলেন — আজ্ঞে না, আমার তো জ্বর হয় নাই — সর্দি হয়েছে।

শ্রীমহাপুরুষ প্রসন্নভাবে বলিলেন, হাঁ সর্দি — তা কিছু নয়। আমায় বললে কে, তোমার জ্বর হয়েছে। এ সময়টা এখানে ভালও নয়, কার্তিক মাসটা অত্যন্ত খারাপ।

শ্রীমহাপুরুষের এই কথা শুনিয়া সাধুটি ভাবিতেছেন — আমাদের কত ভালবাসেন। অসুখে পড়ে কষ্ট হলে ওঁর উদ্বেগ হয়। তিনি স্থির করিলেন, কালও সকালে যদি দেখা যায় উনি তাঁহার স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছেন তবে চলিয়া যাইবেন দেওঘর। বুঝিতে হইবে তাঁহার বিদ্যাপীঠে ফিরিয়া যাওয়াই ঠাকুরের ইচ্ছা। শ্রীমহাপুরুষ ইচ্ছা করেন, সকলেই সুস্থ শরীরে আনন্দে থাকে, ঠাকুরের নাম চিন্তা করে আর যথাসাধ্য তাঁহার সেবা করে, জীব-নারায়ণে।

স্বগত বলিলেন, নিশ্চয় চলে যাব আগামী কালও ওঁর উদ্বেগ দেখতে পেলে। তবে দুঃখ হয় এই ভেবে — ওঁর শরীরের এই দুরবস্থা, কয়দিনই বা আর তা থাকবে! নিজেই বলছেন, আর বেশী দিন নয়। আহা কি অবস্থা হয়েছে — হাঁপানি, জ্বর, শ্বাসকষ্ট! পেচ্ছাব প্রায় ৭০।৮০ আউন্স। উঠতে পারেন না। সর্বদা বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়, আবার আহার অতি সামান্য।

এই পরমহংস-মূর্তি শ্রীগুরু স্থূল শরীরে কয়দিনই বা আর থাকবেন!

ভাল স্থান, ভাল আহার, ভাল স্বাস্থ্য — সবই ভাল, এর পরেও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই দুর্লভ সুযোগ কি আর হবে? শাস্ত্রে যে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানীর কথা লোক পড়ে, তার সাক্ষাৎ জীবন্ত জাগ্রত উদাহরণ এই মহাপুরুষ। এঁদের না দেখলে শাস্ত্রের বিবরণ পড়ে ব্রহ্মজ্ঞান ও জ্ঞানীর কথা চিন্তা করা, আর শোলার আতা দেখে সত্যিকারের আতার কথা ভাবা, সমান। হাজার অধ্যয়ন ও তপস্যার কঠোর অভ্যাসে যা না হয়, এই জীবন্ত পরমহংস-মূর্তিকে পাঁচ মিনিট দেখে তার শতগুণ অধিক জ্ঞান লাভ হয় — শাস্ত্রের তাৎপর্য হৃদয়ে উপলব্ধি হয়।

আমি তো জেনে শুনেই এসেছি, এ সময় বেলুড় মঠের জলবায়ু খারাপ। মন ও আত্মার সুখ চাইলে দেহের সুখ ছাড়তে হয়। আর দেহের সুখ চাইলে মন ও আত্মার সুখ ছাড়তে হয়। মন ও আত্মার সুখের জন্যই জেনে শুনে এ খারাপ সময়ে এসেছি বেলুড় মঠে।

তাঁকে দিনান্তে একবার দর্শন করতে পারলেও মনে হয়, এই সাক্ষাৎ গুরু, ঈশ্বর, পরমহংস দর্শন। তিনি নিজ মুখে বলেন, আমার জ্ঞান হয়েছে — এই শরীর মন আমি নই। আমি সচ্চিদানন্দ। ঠাকুরের ছেলে, মায়ের ছেলে। মনে হয়, আমাদের জীবন ধন্য — কেন না, এই জীবন্ত পরমহংস-মূর্তি সামনে বিরাজিত।

এত দুর্লভ বস্তু হলেও, যদি দেখি কাল উনি আমার স্বাস্থ্যের জন্য এইরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন, তা হলে নিশ্চয় চলে যাব দেওঘর। ওঁর যদি মনে সুখ হয় আমি গেলে, তবে অবশ্যই তাই করবো। এঁর এই দুর্লভ স্মৃতির অনুধ্যান করে বাকী জীবন কাটিয়ে দেব। কিন্তু কিছুতেই ওঁর অবাধ্য হয়ে মনোকষ্টের কারণ হব না।

বন্ধুরা হয়তো বলবেন, আমি দুর্বল, সাহস করে থাকতে চাই না। তা বলুন। যাঁর ভরসায় এই সন্ন্যাসজীবন নিয়েছি, যাঁর উপর দেবজীবনের ভার, আমি তাঁর কথাতেই চলবো। তাঁর সুখে আমার সুখ। আমি ধর্মপথে অতি নাবালক — আত্মদর্শনের পথে দুগ্ধপোষ্য শিশু। জয় গুরু, জয় গুরু! এই মহাপুরুষের ইচ্ছা, আর ঈশ্বরের ইচ্ছা এক। এতে 'কিন্তু' নাই, এতে কেবলমাত্র বুদ্ধি-বিচারের প্রবেশাধিকার নাই।

শ্রীম — বেশ তো বিচারটি এসেছে এঁর ভিতর! মহাপুরুষ মহারাজ

ভাবিত যদি হন সাধুর অসুখে, তবে তিনি চলে যাবেন। তাঁর আজ্ঞাপালন দর্শনের চেয়েও বড়। এরই নাম ত্যাগ! যেখানে ত্যাগ, সেখানে ঈশ্বর! যেখানে ত্যাগ, সেখানে জীবন্ত ঈশ্বর। ত্যাগই ঈশ্বর।

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

আজ ১৪ই অক্টোবর ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার।

শ্রীমহাপুরুষের ঘর। সকাল ছয়টা। সাধুরা আসিয়া প্রণাম করিতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ নূতন খাটে বসা। আনন্দে সেবকদের বলিতেছেন — দাও ওকে একখানা কাপড় দাও, ওকে ফল দাও। ঠাকুরের সেবার জন্য ইলিশ মাছ এনে দাও। এখানে যেন দানের মেলা চলিতেছে।

কাশীর ধীরেন ('দিরেন') আসিয়া প্রণাম করিতেই আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, এই যে তর্করত্ন — হে তর্করত্ন, কেমন তর্করত্ন। ('হে হে' বলিয়া হাস্য)। গতকালও ধীরেনের বড় শিখা দেখিয়া আনন্দে বলিয়াছিলেন, এই যে পাণ্ডাজী, আগে ছিলে গয়ার পাণ্ডাজী (ভারত সেবাশ্রমের পাণ্ডা), এখন হয়েছ ঠাকুরের পাণ্ডা। মাঝে মাঝে হাই তুলিতেছেন। মুখের কাছে হাতের ইঙ্গিতে সেবক মতিকে বলিলেন, সাধুদের মিষ্টি দিতে।

৪

১৫ই অক্টোবর ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার। সকাল ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ নিজ কক্ষে চেয়ারে বসিয়া আছেন, দক্ষিণ-পশ্চিম জানালার সামনে পূর্বাস্য। খালি গা। মুখ বিবর্ণ। গত রাত্রিতে হাঁপানি বাড়িয়াছিল, নিশ্বাস ফেলিতে পারেন নাই। তবুও সকালে উঠিয়া বসিয়াছেন। সাধুদের কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ডাক্তার স্বামী মহেশ্বরানন্দ (বৈকুণ্ঠ মহারাজ) গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রণাম করিলেন। দরজার পশ্চিম পাশে উত্তর-পশ্চিমাস্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কেমন আছেন?

শ্রীমহাপুরুষ — ভাল না। যত শীঘ্র যায় ততই ভাল।

ডাক্তার — না মহারাজ, যতদিন থাকেন আমাদের কল্যাণ।

শ্রীমহাপুরুষ — কষ্ট পেতে বলছ?

ডাক্তার — আজ্ঞে না। যতটা পারা যায় চেষ্টা করা ভালর জন্য।

শ্রীমহাপুরুষ — নিজেরও কষ্ট, অন্যেরও কষ্ট। কোনও দিন তো কারুকে কষ্ট দিই নি।

শ্রীমহাপুরুষ পা দুইখানা একখানা ছোট গালিচায় রাখিয়া বসিয়া আছেন। স্বামী বৈরাগ্যানন্দ হাঁটু গাড়িয়া পাখার হাওয়া করিতেছেন। দেওঘরের বিদ্যাপীঠের একজন সাধু আসিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। ডাক্তার এইবার মুখে থার্মোমিটার দিলেন। শরীরের উত্তাপ ৯৮.২।

একটু পরে মহারাজ নূতন তক্তাপোষে আসিয়া বসিলেন মধ্যস্থলে, পশ্চিমাস্য। আজকাল ইহার উপরই বিছানায় শয়ন করেন। ডাক্তার দক্ষিণ পাশে দাঁড়াইয়া স্টেথিস্কোপ দ্বারা শরীর পরীক্ষা করিতেছেন।

এবার সকলে বাহিরে চলিয়া গেলেন। কেবল স্বামী বৈরাগ্যানন্দ ঘরে প্রহরায় রহিয়াছেন। তিনি উত্তরের দরজা বন্ধ করিলেন। তাহার শব্দে শ্রীমহাপুরুষ অতি কষ্টে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতেছেন।

একটি সাধু সিঁড়ির সামনে দাঁড়াইয়া প্রারব্ধভোগী পরমহংস-মূর্তি দর্শন করিতেছেন। তিনি ভাবিতেছেন, দেহধারীর দুঃখ জরা মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। অবতার ও তাঁহার পার্ষদগণকে ভুগিতে হইতেছে। বিচিত্র লীলা মহামায়ার! শাস্ত্র বলেন, অবতারের জন্ম কর্মফলে হয় না। তাঁহার প্রারব্ধ নাই। তবুও দেহ ধারণ করিয়া ভুগিতে হয় জীবের দুঃখ, ভক্তগণের কর্মফল নিজ শরীরে গ্রহণ করিয়া।

শ্রীম — হাঁ, শরীর ধারণ করলে দুঃখ অনিবার্য। অবতারের ও পার্ষদদেরও দেহকষ্ট হয়। এসব দেখলে ভক্তদের মন সবল হয় আর দুঃখের বোধ কমে যায়। মন ঈশ্বরে থাকলে দুঃখভোগ সার্থক হয়।

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

১৮ই অক্টোবর ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ। ১লা কার্তিক ১৩৩৭ সাল, শনিবার। কৃষ্ণা একাদশী।

এখন সকাল সওয়া সাতটা। শ্রীমহাপুরুষ হরলিকস্ খাইয়া খাটে বসিয়া আছেন। ঘরের সব জানালা বন্ধ। সামনের দরজায় নীল রং-এর পর্দা। সেবক স্বামী বৈরাগ্যানন্দ, ডাক্তার স্বামী মহেশ্বরানন্দকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তারের হাতে স্টেথিস্কোপ।

শ্রীমহাপুরুষ ডাক্তারকে বলিলেন, এখনই দেখবে? এইমাত্র খেলুম।

একটু পর দেখ। ডাক্তার বলিলেন, তাই ভাল।

বিদ্যাপীঠের একজন সাধু গিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীমহাপুরুষ করুণামাখা স্বরে বলিলেন, ভাল আছ?

শ্রীমহাপুরুষের শরীর উন্মুক্ত। কোমরে মোটা লাল ঘুনসী। দিগম্বর। একখানা কাপড়ে সম্মুখ ঢাকা।

১৯শে অক্টোবর ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। সকাল সাড়ে ছয়টা। উনি তক্তাপোষে বসিয়া আছেন। একটি যুবক আসিয়া প্রণাম করিয়া হাঁটু গাড়িয়া রহিয়াছে। আর মিন্‌মিন্‌ করিয়া কথা কহিতেছে। কিছুই বুঝা যায় না। শ্রীমহাপুরুষ তাই উপহাস করিয়া তাহার মত ঠোঁট নাড়িতেছেন। সহাস্যে স্বামী পরব্রহ্মানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলছে?

স্বামী পরব্রহ্মানন্দ — চণ্ডীপুর আশ্রম থেকে এসেছে।

শ্রীমহাপুরুষ — কি করতে আগে? স্বদেশী দলে ছিলে কি? বিলিতি সাহেবদের মারতে না তো (হাস্য)?

ছেলেটি সবিনয়ে উত্তর করিল — আজ্ঞে না। ছেলেটি অভয় পাইয়া মেষশাবকের মত উঠিয়া গিয়া পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতে যাইতেছে, স্বামী পরব্রহ্মানন্দ বাধা দিয়া বলিলেন — না, না। ওঁর শরীর ভাল না। পায়ে হাত দিও না।

২০শে অক্টোবর ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার।

শ্রীমহাপুরুষ দুধ খাইয়াছেন খাটের উপর বসিয়া। সম্মুখে একটি স্টুল। এখন সকাল সাতটা। স্বামী নিত্যাত্মানন্দ আসিয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীমহাপুরুষ — ভাল আছ? মাস্টার মশায়ের খবর পাও?

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ — আজ্ঞে হাঁ। মাঝে শরীর খুব খারাপ হয়েছিল।

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ, শুনেছি।

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ — পরশু দিনও আবার attack (বেদনার আক্রমণ) হয়েছিল। আমি ঐ সময় ওঁর কাছেই ছিলাম। প্রায় আধ ঘন্টা আমার গলা জড়িয়ে ধরে কেবল বলতে লাগলেন, অধৈর্য্য বালকের মতো — ও জগবন্ধু, ও জগবন্ধু। অসহ্য বেদনা হয়েছিল।

শ্রীমহাপুরুষ (সহাস্যে, অন্তর্দৃষ্টির সহিত) — জগবন্ধু তো ঠাকুর,

ঈশ্বর। তাঁকে বলেছেন কি তোমায় বলেছেন, কে জানে? তুমি তো উপাধি মাত্র।

অসুখ বাড়বে না? কারো কথা শুনবেন না। ডাক্তারের কথাও শুনবেন না। বারণ করেছে, তবুও কথা কইবেন। উপর-নিচ করবেন। পায়খানা ঘরে করবেন না। অসুখও তাই বাড়ে।

টেবিলের উপর দেওয়ালে লম্বমান ঠাকুরের ছবির দিকে তাকাইয়া (যুক্ত করে) — ঠাকুরই জানেন কি ইচ্ছা তাঁর। আমরা কি জানি বাবা! (চক্ষু বুজিয়া প্রার্থনামুদ্রায়) আরো কিছুদিন ঐ শরীর থাকার দরকার হয়ে পড়েছে। আরো কিছুদিন ঐ শরীর থাকুক।

শ্রীম — দেখ কত ভাবনা মহাপুরুষের আমাদের জন্য। আমার অসুখের কথা শুনে অবধি খুবই চিন্তিত, নিজের অত অসুখেও। ঠাকুর বলেছিলেন, ভক্তরা যেন কলমীর দল। একস্থানে টানলে সবটা দলে টান পড়ে।

আজ থাক্। রাত হয়েছে। কাল সকালে শুনা যাবে বাকীটা। এখানে বসে মঠের শ্রেষ্ঠ সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। ঠাকুরই পাঠিয়ে দিচ্ছেন আমাদের মঙ্গলের জন্য।

ঠাকুরবাড়ি, কলিকাতা।
১৫ই মে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার।

সপ্তদশ অধ্যায়

চিত্রাবলী

১

কলিকাতা। গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। ঠাকুরবাড়ির ছাদ। ১৬ই মে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার। এখন সকাল প্রায় ছয়টা। শ্রীম মাঝখানে পূর্বাস্য বসিয়া আছেন মাদুরের উপর। শ্রীম-র সামনে নবীন দিবাকর। হাওয়াটিও আজ বেশ শীতল। শ্রীম-র ডান দিকে ও বাঁ দিকে টবে ফুলের গাছ। একটি বেল ফুলের গাছও আছে, আর একটি তুলসী। আর কয়েকটাতে পুরীর সমুদ্রোপকুলের ফুল ফুটিয়া আছে। সাধু দুইজন ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। এক্ষণে শ্রীম-র কাছে আসিয়া বসিলেন তাঁহার বাম দিকে, দক্ষিণাস্য।

শ্রীম কিয়ৎক্ষণ নবীন ভাস্করের দিকে চাহিয়া ধ্যান করিতেছেন। এইবার ঈশ্বরীয় কথা হইতেছে।

শ্রীম (সাধুর প্রতি) — ঋষিরা এই সূর্যের ভিতর ঈশ্বরকে দেখেছিলেন। সর্বত্রই তিনি আছেন বটে, কিন্তু বস্তুবিশেষে প্রকাশ বেশী। তাই হিন্দুরা সূর্যকে পূজা করে, প্রণাম করে। এঁর ভিতর তাঁকে দেখে বলেছিলেন, ‘যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি’। কেবল দর্শন করেন নাই। নিজের স্বরূপ উহা, এইটি প্রত্যক্ষও করেছেন। জীবের real (সত্যিকার) রূপ ঐ — অর্থাৎ ঈশ্বর, Divine. অন্য ঋষি এইটিকেই অন্যভাবে বলেছেন অংশাংশীভাবে, — ‘অমৃতস্য পুত্রাঃ’। এইটি জানতে পারলে নিজের দৈন্য ঘুচে যায়। তার তো আর কিছু পাবার বাকী নাই! তাই দীনতা হীনতা থাকে না। তাই, আর এক মন্ত্রে বলেছেন, ‘আপ্নোতি স্বারাজ্যং’। সম্রাট হয়ে যায়। লৌকিক দৃষ্টিতে হয়তো দরিদ্র, অকিঞ্চন — কিন্তু, পরমার্থ দৃষ্টিতে রাজার রাজা। এইটি মানুষের birth right (জন্মগত অধিকার)। এই কথাটি বলতে এসেছেন ঠাকুর এখন। বিশ্বাস করলেই

প্রায় সব হয়ে গেল। শাস্ত্রে আছে এসব কথা। কিন্তু লোকের বিশ্বাস হয় না। কারো জীবনে দেখতে চায়। তাই অবতার হয়ে আসেন ভগবান। এসে দেখান যে শোক তাপ, দুঃখ দারিদ্র্য, জরা মৃত্যুতে ‘আমি অভিভূত নই’। মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলেন এই সবের ভেতরও। সংসারের relationship (আত্মীয়তাও) স্বীকার করেন, but in a subordinate sense (কিন্তু গৌণ অর্থে)। তিনি highest value (সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্য) দেন ঈশ্বরে। সংসারের যা value (মূল্য) তাকে বলেন অর্থ। আর ওটি পরমার্থ, অর্থাৎ real value (সত্যিকার মূল্যায়ন) — আমি ঈশ্বরের সন্তান, মায়ের ছেলে। চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গেছেন, তবুও বিশ্বাস হয় না। মহামায়া পথ রুখে দাঁড়ান। তারও উপায় বলে দিয়েছেন। বলেছেন, সর্বদা প্রার্থনা কর — ‘মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।’ সব করে দিয়ে গেছেন। এখন বসে বসে আপনারা এই সব উপভোগ করুন। বলেছিলেন, মাকে — অর্থাৎ তাঁরই কথা তাঁকেই, বিশ্বাস করলে আর কিছুই করতে হবে না।

ভক্তরা অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন — বলাই, মনোরঞ্জন, সতীনাথ প্রভৃতি। শ্রীম এবার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন?

শ্রীম (একজন সাধুর প্রতি) — রাতে মঠে কি খাও?

সাধু — একদিন খেয়েছি দু’খানা রুটি ও চারটি ভাত।

শ্রীম (সহাস্যে) — ঠাকুরের সময় খাওয়ার বন্দোবস্ত ছিল, যারা থাকতো ওখানে (দক্ষিণেশ্বরে) তাদের জন্য — রুটি, একটি তরকারী ও একটু গুড়। গুড়টি চাই-ই। সামনে দাঁড়িয়ে দেখতেন।

সাধু — গুড় হজমী।

শ্রীম — ও-ও, তাই আমি তিন চার দিন খাচ্ছি লেবু দিয়ে।

সাধু (স্বগতঃ) — শ্রীম ঠাকুরের বাহ্য আচরণও অনুকরণ করেন শ্রদ্ধায়।

শ্রীম (সতীনাথের প্রতি) — রাত্রে খুব কম খাবে। দিনে বারুদঠাসা খেয়ে নেবে। আর বলতেন, ঠাকুর দেবতা সাধুদের কাছে চলবার সময় ‘ধপাস্ ধপাস্’ করে শব্দ না হয়।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — একজন দক্ষিণেশ্বরে ছিল রাত্রে হরিশের

সঙ্গে। সারা রাত খালি বিষয়ের কথা কইল। হরিশ সকালে ঠাকুরকে বলায় তিনি বিদায় করে দিলেন।

(ভিতর হাস্যে) আর একজন কাশীপুর বাগানে ছিল। (বাইরেও হাসির তুফান তুলে) সে চার পাঁচ জনের খাওয়া একলাই খেয়ে নিত। বামুন ঠাকুর আবার ভাঁড়ার আনতে গেলে, সব শুনে ঠাকুর বললেন, 'দে বিদেয় করে দে, বিদেয় করে দে! বাবা, রাক্ষস যে! দে রাক্ষস বিদেয় করে দে।'

তিনি বলতেন কিনা — 'বেতালা লোক কাছে রাখতে পারি না।' তাই এই রকম। তিনি এসেছিলেন যোগী তৈরী করতে। বেশী যদি খাও, রাত্রে হজম হবে না। পেট গরম হবে। ঈশ্বরচিন্তা করতে পারবে না। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে পারবে না।

সুরেনবাবু দিতেন দশ টাকা মাসে মাসে। ঠাকুর বলতেন, তা সুরেনেরই লাভ। আমার কি? ভক্তদের সেবার জন্য দিচ্ছে। একটা সতরঞ্চি রেখে দিলেন আর একটা বালিশ ওখানে।

(সুরেনবাবুকে) বাড়িতে (স্ত্রী) বলতেন — দিনে যেখানে খুশি যাও। রাত্রিতে কোথাও থাকা হবে না (উচ্চহাস্যে)। হাঁ, দিনে যাও যেখানে খুশি, রাত্রিতে থাকা হবে না কোথাও (হাসি বিলম্বিত)।

খাওয়া, যারা মাছ খেত তারা মা কালীর প্রসাদ খেত। আর যারা না খেত, তারা বিষ্ণুঘরের প্রসাদ খেত।

রাম চাটুয্যের খুব প্রশংসা করতেন। বলতেন, রাম বড় ভাল, কি সেবাটাই করে ভক্তদের, কত যত্নে খাওয়ানো। আবার কার সামনে? অধর সেন, এঁদের সামনে। Indirectly recommend (প্রকারান্তরে সুপারিশ) করাই হল এঁদের কাছে। তাঁর এমনি ব্যাপার ছিল। মাছের তেলে মাছ ভাজছেন।

তিনি নিজে খেতেন সুজির পায়েস আর খানকয়েক লুচি।

একজন সাধু — বরাবর?

শ্রীম — আমরা যতদিন দেখেছি, ঐ খেতেন। তাঁর ঐ অবস্থা হলো, (দিব্যোন্মাদ) ফিফ্‌টি-সিক্সে (ছাপান্নতে)। আমরা গেছি এইটি-টুতে (আঠার শ' বিরাশিতে)। আমরা বরাবর ঐ খেতেই দেখেছি।

শ্রীম (স্বগত) — কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর আবার কাশীপুর! কামারপুকুরেও অনেক লীলা করেছেন। (সকলের প্রতি) — সন্ন্যাস নিয়ে অনেকে কাজ করে। কেন? কর্ম বাকী আছে যে! গীতায় আছে—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে।। (গীতা ৬:৩)

যে যোগী হতে চায় তার কর্ম প্রয়োজন। নিষ্কাম কর্ম ব্যতীত চিত্ত শুদ্ধ হয় না। তাই মনও স্থির হয় না। তাই নিষ্কাম কর্ম দরকার। চিত্তের অশুদ্ধি কি? বাসনা। নানা বাসনায় চিত্তকে এদিক ওদিকে টেনে নিয়ে যায়। নিষ্কাম কর্ম করলে চিত্তের বাসনাপ্রসূত এই সব বৃত্তির চাঞ্চল্যের নিরোধ হয়। তাই সূত্র করেছেন পতঞ্জলি, 'যোগঃ চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ'।

অধিকাংশ সাধকই আরুরুক্ষ। খুব অল্প লোক যোগারূঢ়। যোগারূঢ়ের অন্য কর্ম নাই। কেবল তাঁকে নিয়ে থাকা।

শ্রীম — (পূর্ব দিকের বাড়ির ছাদে কপোত-কপোতী দেখিয়া ভক্তদের প্রতি) এই দেখ, এরা খালি আহারের চেষ্টায় আছে — কোথায় আহার পাবে। মানুষ কিন্তু তা নয়। তার আরও একটা আছে — ঈশ্বরকে ডাকা।

যে জন্যই তাঁকে ডাক না কেন — তুমি উদার, মহৎ। গীতায় ভগবান এই প্রতিজ্ঞা করেছেন। বলেছেন,

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।। (গীতা ৭:১৬)।

যাঁরা পুণ্যবান 'সুকৃতিনো' তাঁরা তাঁকে ডাকেন। তাঁদের চারটি শ্রেণী — আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী আর জ্ঞানী। এরপরই বলছেন, 'উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্' (গীতা ৭:১৮)। সকলেই সুকৃতিবান, উদার হলেও এঁদের মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। কেন? না, ভগবান বলছেন, জ্ঞানী আমার আত্মা — নিজের স্বরূপ। তাই জ্ঞানীর সেবা, সাধুর সেবা ভগবানেরই সেবা।

জ্ঞানী কেবল আমাকে চায় আর কিছু চায় না — বলছেন ভগবান। আবার অন্য জিনিসের জন্য তাঁকে বলবে না তো কা'কে বলবে? তিনি যে সকলের মালিক! কেউ ডাকে, বিপদ দূর কর। কেউ চিত্তের সংশয় মিটিয়ে দিতে ডাকে। কেউ ডাকে অর্থের জন্য, অর্থাৎ ভোগ্য বস্তুর জন্য।

এরা সকাম ভক্ত। কেরমে (ক্রমে) নিষ্কাম হবে। তখন হবে জ্ঞান। এই জ্ঞানীই তাঁর আত্মা, মানে রূপ। জ্ঞানী মানে, যিনি ভগবানকে চান, আর কিছু চান না। ধন মান যশ পুত্র রাজ্য — কিচ্ছু না। কেবল ভগবানকে চান, যেমন নচিকেতা।

শ্রীম (সতীনাথের প্রতি) — আচ্ছা, তোমাদের হোক না।

সতীনাথ — হারমোনিয়াম নেই যে।

শ্রীম — অমনি হোক্ না। নাই বা হল হারমোনিয়াম।

সতীনাথ সুকণ্ঠ, অগত্যা গাহিতেছেন একটি ভৈরব রাগিণী।

গান। অনুপম-মহিম পূর্ণব্রহ্ম কর ধ্যান,
নিরমল পবিত্র ঊষাকালে।
ভানু নব তাঁর সেই প্রেম-মুখছায়া,
দেখ ঐ উদয়গিরি শুভ্র ভালে।
মধু সমীরণ বহিছে এই যে শুভ দিনে,
তাঁর গুনগান করি অমৃত ঢালে,
মিলিয়ে সবে যাই চল ভগবত-নিকেতনে,
প্রেম-উপহার লয়ে হৃদয়-থালে॥

শ্রীম ধ্যানমগ্ন। সম্মুখে বাল ভানু। আবার গান। এবার রাগিণী আসোয়ারী। এইটি শ্রীম-র ফরমাইসী — ঠাকুরের প্রিয় রাগিণী। দুইটিরই রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গান। জাগো সকলে অমৃতের অধিকারী।
নয়ন মেলিয়া দেখ করুণানিধান, পাপতাপহারী।।
পূরব অরুণজ্যোতি মহিমা প্রচারে, বিহগ যশ গায় তাহারি।
হৃদয়কবাট খুলি দেখ রে যতনে, প্রেমময় মুরতি জনচিত্তহারী;
ডাক রে নাথে বিমল প্রভাতে, পাইবে হৃদয়ে শান্তির বারি।

ছাদে রৌদ্র আসিয়াছে। শ্রীম সাধু ও ভক্তসঙ্গে 'নাট মন্দিরে' গিয়া বসিয়াছেন। অন্তেবাসী শ্রীম-র আদেশে মহাপুরুষের ডায়েরী পড়িয়া শুনাইতেছেন।

২

২১শে অক্টোবর, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার।

আজ মহাপুরুষের শরীর একটু ভাল। তাই তিনি বেশ প্রসন্ন। এখন সকাল সাড়ে ছয়টা। উনি খাটে বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। সম্মুখে ও পাশে সাধুগণে গৃহ পরিপূর্ণ। প্রবেশপথও বন্ধ! তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া আছেন স্বামী মাধবানন্দ, তপানন্দ, রামেশ্বরানন্দ। তক্তাপোশের উত্তর দিকে দাঁড়ান ডাক্তার মহেশ্বরানন্দ। পুণ্যানন্দ, জিতাত্মানন্দ, নিত্যাত্মানন্দ, সেবকগণ অপূর্বানন্দ, শিবস্বরূপানন্দ, বৈরাগ্যানন্দ প্রভৃতিও দাঁড়াইয়া কথা শুনিতেছেন। স্বামী মাধবানন্দ প্রণাম করিয়া উঠিতেই নানা কথা হইতে লাগিল। কথাপ্রসঙ্গে তন্ত্রের কথা উঠিল।

শ্রীমহাপুরুষ (স্বামী মাধবানন্দের প্রতি) — শরৎ মহারাজের বইতে তন্ত্রের কথা আছে বটে ঠাকুরের সম্বন্ধে। কিন্তু শরৎ মহারাজের ঐ ভাব ছিল কি না! এই বই পড়লে মনে হয় যেন তন্ত্রের ভাবই ঠাকুরের বেশি ছিল।

স্বামী মাধবানন্দ — অন্য ভাবও আছে। শাক্ত, বৈষ্ণব, মুসলমান, খ্রীস্টান — সবই আছে।

শ্রীমহাপুরুষ — তা হলেও ঐটেই বেশী।

স্বামী মাধবানন্দ — যেসব materials (তথ্য) তিনি পেয়েছেন সেগুলি সব গুছিয়ে লিখতে বেশী হয়ে গেছে বইতে।

শ্রীমহাপুরুষ — ঠাকুরের শুদ্ধ ভাব — purity, purity, purity (পবিত্রতা, পবিত্রতা, পবিত্রতা) — মাতৃভাব। ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব — pure (বিশুদ্ধ) হতে হবে — to the backbone (আগাগোড়া)। বীরভাব-টাব ও-সব আমাদের এখানে নেই। স্বামীজী একে ভারি ঘৃণা করতেন। তাঁদের pure (বিশুদ্ধ) ভাব।

একজন সাধুর কথা উঠিল।

শ্রীমহাপুরুষ — ও কি করছে ওখানে? খান্‌কি মাগী এয়েছিল। আমি খুব বকে দিলাম, ভাগ্‌ হিঁয়াসে। জিভে লিখে দেয় সে, ঠাকুরের মত। ঠাকুরের অনুকরণ করে। ওর কতকগুলি চেলা ওখানে আছে, মাগীঘেঁষা।

স্বামী মাধবানন্দ — উনি তো এক রকম বের হয়ে যাচ্ছেন। ওঁর কাছে যারা আছে তারাও সঙ্গে সঙ্গে যাবে।

শ্রীমহাপুরুষ — তোমরা এই সব লিখে রাখ। আমার তো লিখবার শক্তি নাই। তোমার লিখে জগৎকে জানাও।

ঠাকুরের শুদ্ধ ভাব, মাতৃভাব। ওখানে ঐ সব (বীরভাব) নাই। মহারাজও condemn (তীব্র নিন্দা) করেছিলেন তন্ত্রের ঐ সব...।

মিস ম্যাকলাউডের কথা উঠিল।

শ্রীমহাপুরুষ — ও বড় ভাল লোক — খোলাখুলি। ক্রিশ্চিন ভিতরবুদে ছিল, ম্যাকলাউড বড় খোলা।

ঠাকুর স্বামীজীর কাছে all purity purity purity (পবিত্রতা পবিত্রতা, একেবারে পবিত্রতা)। All love love love! (প্রেম প্রেম, কেবল বিশুদ্ধ প্রেম)। ব্যস্ (হাততালি)!

একঘর ভর্তি লোক। ডাক্তার মহেশ্বরানন্দ তক্তাপোশের উত্তরে দাঁড়াইয়া আছেন, হাতে স্টেথিস্কোপ।

শ্রীমহাপুরুষ — চেয়ে আছিস, examine (পরীক্ষা) করে করবি কি! শোন্ এই সব কথা শোন্। Mood (ভাব) দেখে বুঝতে পারে না কেমন আছি। শোন্, কথা শোন্ (হাস্য)।

স্বামী মাধবানন্দ — Emotion (উদ্দীপনা) বাড়লে অসুখ বাড়বে। আমাদের ইচ্ছা শরীরটা আরও অনেক দিন থাকে।

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ। হাঁ। এসব কথা নোট কর। লিখে রাখ। পরে কাজ দেবে।

সেবক শিবস্বরূপানন্দ একটি ধোয়া গরদের কাপড় নিয়া ঘরে ঢুকিলেন। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন — দাও, পূজারীকে দাও। আজ পূজা করবে কে?

একজন সাধু — জ্যোতিষ মহারাজ।

শ্রীমহাপুরুষ — ওকে দেওয়া হয়নি?

সেবক অপূর্বানন্দ — হয়েছে।

শ্রীমহাপুরুষ — তবে অন্যদের দাও। যারা পূজা করবে তাদের জন্য এই সব — যারা ধ্যান জপ করবে। বাবুরাম মহারাজ এইভাবে দিতেন।

স্বামী মাধবানন্দ — যারা কাজ করবে তাদের দিতেন।

শ্রীমহাপুরুষ — যারা পূজা পাঠ জপ ধ্যান করবে তাদের তিনি দিতেন।

স্বামী বিরজানন্দ (দক্ষিণের অফিসঘর হইতে) — বাহার হও, বাহার হও। ঘরে খুব ভীড়।

স্বামী রামেশ্বরানন্দ ও তপানন্দ প্রণাম করিলেন। শ্রীমহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন স্বামী তপানন্দকে, কি খেয়েছ?

আজ শ্যামাপূজা রাত্রিতে। ঐ সময় শৈলেশ ও পাটনার বিপিনের সন্ন্যাস হইবে। তাঁহারা উপবাস করিয়া আছেন।

অপরাহ্ন। শ্রীমহাপুরুষকে দর্শন করিতেছেন একজন সাধু দরজার পশ্চিমে দাঁড়াইয়া। শ্রীমহাপুরুষ খাট হইতে উঠিয়া ঘরের বাহির হইতেছেন, অফিসঘরে যাইবেন। সেবক শিবস্বরূপানন্দ ও বৈরাগ্যানন্দ দুই দিকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। সম্মুখে শৈলকে দেখিয়া বলিলেন — বাবা, এ ঠাকুরের সন্ন্যাসী — উপোস-টুপোস নেই এখানে।

রাত্রিতে উত্তরের সোনার বাগানের হলঘরে শ্যামাপূজা হইল। তারপর বিরজা হোম হইতেছে। অনেক সাধু আসিয়া দেখিতেছেন। এখানে সন্ন্যাসী ছাড়া কেহ আসিতে পারেন না, এই বিরজা হোমে। শৈলেশ ও বিপিন বিরজা হোম করিতেছেন — আহুতি দিতেছেন, 'জ্যোতিরহং ভূয়াসং স্বাহা'।

রাত্রি শেষ। নূতন সন্ন্যাসীগণ সকলে শ্রীমহাপুরুষের ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রস্রাব করিয়া আসিয়া ইনি খাটে বসিয়াছেন, সেবক শিবস্বরূপানন্দের সাহায্যে। দিগম্বর। মশারীটি উপরে গুটাইয়া রাখা হইয়াছে, কেবল সামনের দিকটা।

শ্রীম — ঠাকুর ভক্তদের বেশী উপোস করতে দিতেন না। জানেন তো, কলিকালে শরীর মন এমনি দুর্বল। উপোসে আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। তখন ঈশ্বরচিন্তা মোটেই হবে না। তাই মধ্যপন্থা।

শ্রীমহাপুরুষের হাতে কাঁচি, শৈলেশের শিখা ছেদন করিতেছেন। শিখাতে কাঁচি লাগিতেছে না। মহাপুরুষ বলিলেন, দূর শালা ...। সেবক টর্চ ধরিলেন। তখন কাটা হইল। বিপিন খাটের সামনে বসিয়াছেন। তখন

তাঁহার শিখা কাটিলেন।

এইবার নূতন সন্ন্যাসী দুইজন নগ্ন হইয়া বস্ত্র ভিক্ষা করিলেন। শ্রীমহাপুরুষ তাঁহাদিগকে গেরুয়া বস্ত্র ও কৌপীন আর উত্তরীয় দিলেন। তাঁহারা উত্তরের দরজার কাছে কাপড় পরিতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ রহস্য করিয়া বলিতেছেন — দেখ তো, এঁড়ের চামড়া ঢাকা কি না! ওটা ভক্তির চিহ্ন।

তারপর তিনবার প্রেষমন্ত্র বলিলেন। উঁহারাও তিনবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করিলেন। এবার মহাবাক্য শুনাইলেন। বলিলেন, অন্যগুলো তোমরা করে দাও। গায়ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্র স্বামী ওঁকারানন্দ পাঠ করিতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ ও নূতন সন্ন্যাসী দুইজনও আবৃত্তি করিতেছেন সঙ্গে সঙ্গে। এইবার আশীর্বাদ করিলেন — তোমাদের জ্ঞান, ভক্তি, বিদ্যা — সব লাভ হোক্। সব হোক্।

একটু পর শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, কি কৈলাসানন্দ (হাস্য)? শৈলেশের এই নাম হইয়াছে। শৈলেশ মাথা নিচু করিয়া আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন।

বিপিনকে ডাকিলেন — কি মৈথিল্যানন্দ? বিপিন পাটনায় থাকেন, তাই সীতার নামে তাঁহার নাম রাখিলেন।

শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, আজ থেকে এই আশ্রয়ে এলে তোমরা।

স্বামী ওঁকারানন্দও সঙ্গে সঙ্গে এই কথার আবৃত্তি করিলেন, হাঁ মহারাজ, আপনাদের আশ্রয়ে।

শ্রীমহাপুরুষ (প্রতিবাদ করিয়া) — আমাদের আশ্রয়ে কি? প্রথমতঃ ঠাকুর মা স্বামীজীর আশ্রয়ে। তারপর এই সঙ্ঘের আশ্রয়ে — সাধুমণ্ডলীর আশ্রয়ে।

আজ ২৪শে অক্টোবর, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। বেলুড় মঠ। সকাল সাতটা। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। ইনি তক্তাপোশে বসিয়া সামান্য আহার করিলেন হরলিক্স্।

তোতলা নরেন মহারাজ প্রণাম করিতেই শ্রীমহাপুরুষ বালকের ন্যায় আনন্দে বলিয়া উঠিলেন — কি রাঘবেশ্বরানন্দ, তোমার নাম রাঘবেশ্বরানন্দ (হাস্য)?

স্বামী রাঘবেশ্বরানন্দ — ঘুম হয়েছিল?

শ্রীমহাপুরুষ (প্রসন্ন রহস্যে) — হাঁ, ঘুমই, ঐটি আসল। ঐটি না হলে সব গোলমাল।

বিদ্যাপীঠের একজন সাধু আসিয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীমহাপুরুষ — ভাল আছ?

সাধু — আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীমহাপুরুষ — মাস্টার মশায়ের খবর পাও?

সাধু — আজ্ঞে হাঁ। দুই দিন ভাল ছিলেন। কাল আবার সন্ধ্যার সময় ঐ ভাব (বেদনা) হয়েছিল। উনি নিজেই বলেছিলেন, কথা বললেই হয়, কিন্তু কথা বন্ধ হয় না।

শ্রীমহাপুরুষ — ঐ তো মুস্কিল আমাদের! ভক্ত লোক, কথা না বলেই বা কি করেন! ঠাকুরই জানেন। তিনি যুগাবতার ঈশ্বর, তিনিই জানেন। জিভ কাটিয়া মাস্টার মহাশয়ের বেদনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

শ্রীমহাপুরুষ — আমাদের তো এই। লোক আসে, আমরা কি বলি — তাঁর দু'টো কথা বলি। যাক্, এই মাটির ঢেলা যাক্, তুচ্ছ শরীর। এ তো যাবেই, তবে তাঁর কথা বলেই যাক্।

তাঁকে (মাস্টার মশায়কে) আর কি বলবো। তিনি তো সব বোঝেন নিজেই। (সম্মুখের দেওয়ালে বিলম্বিত ঠাকুরের ছবির দিকে তাকাইয়া) যা হয় হবে — তাঁর ইচ্ছা।

সাধু — আজ্ঞে, তিনিও বলেন, কথা বললেই বাড়ে। আবার না বলেই বা কি করি।

ভাস্কর জানা দরজার চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া আছে।

শ্রীমহাপুরুষ — কি জানা, রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন? এঁরা (কর্মকর্তারা) কিছু ঠিক করলেন? কোথাও যাবে তুমি, না এখানেই থাকবে?

ভাস্কর হাসিতেছে দরজায় দাঁড়াইয়া।

শ্রীমহাপুরুষ (দরজার কাছে দণ্ডায়মান বিদ্যাপীঠের একজন সাধুর প্রতি) — কি বলছে?

সাধু — আজ্ঞে, বিশ্বানন্দ স্বামী লিখলেই চলে যাবে।

শ্রীমহাপুরুষ — ও, বম্বে থেকে?

সাধু — আজ্ঞে হাঁ।

৩

২৫শে অক্টোবর, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার।

সকাল ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ নিজের ঘরে নূতন খাটে বসিয়া আছেন। মঠের ভাণ্ডারী বিকাশ মহারাজ আসিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। দরজার বাহির হইয়াছেন, শ্রীমহাপুরুষ ঠিক কিশোর বালকের ন্যায় তাঁহার সহিত ফচ্‌কেমি করিতেছেন। বলিলেন — ঐ পালাচ্ছে, কুত্তায় ধরবে। আয় শুনে যা (খলখল হাস্য)। বিকাশ ঘরে গেলেন।

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ, কি কি হবে বাবার (ঠাকুরের) সেবায়?

ভাণ্ডারী বলিলেন কয়েক প্রকার নাম। তাহার মধ্যে মাছ হইবে শনিবার বলিয়া।

শ্রীমহাপুরুষ (আনন্দে) — হাঁ ভাল করে কর। সাধুদের প্রসাদ খাওয়া। টাকা লাগে আমি দেব। ব্যস্‌।

বিদ্যাপীঠের একজন সাধু প্রণাম করিলেন। উঠিতেই মহাপুরুষ কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীমহাপুরুষ (সাধুর প্রতি) — মাস্টার মশায় কেমন?

সাধু — বড়ই দুর্বল। কথা কইলেই বেড়ে যায় বেদনা (নিউরালজিয়া)।

শ্রীমহাপুরুষ — এই দেখ, আমারও তাই। কথা কইলেই বাড়ে। উনি তাঁর (ঠাকুরের) কথা ছাড়া অন্য কথা ক'ন না। আমি তাঁর কথা কম কই — দু'টো একটা। বাজে কথাই বেশী কই।

একজন সাধুর কথা উঠিল।

শ্রীমহাপুরুষ উত্তেজিত স্বরে বলিতেছেন — ও শালার কথা উঠলেই বাবা, আমার শরীর কেমন হয়ে যায়। বুড়ো বয়সে শালা করছে কি? ঠাকুর জানেন কি হবে।

সেবক কৈলাসানন্দ (কথার স্রোত বন্ধ করিবার জন্য) — মহারাজ, এই নূতন খাটটা ভারি সুন্দর হয়েছে।

শ্রীমহাপুরুষ (বালকের ন্যায় পূর্ব প্রসঙ্গ ভুলিয়া) — হাঁ, আমি ভারি

খুশী হয়েছি। কি দেবে ওকে (মঠের শিল্পশালার কর্মীকে)? তার জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য হোক।

শ্রীম — আহা, মহাপুরুষ কিনা! জানেন অন্য কিছুই থাকবে না। তাই আশীর্বাদ করলেন, জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য লাভ হোক — এগুলি অনন্ত কাল থাকবে।

সাতটার সময় খাটে বসিয়া অবিনাশের ছোট গীতা খুলিয়া সপ্তম অধ্যায় পাঠ করিতেছেন। উচ্চারণ অস্পষ্ট ও বিজড়িত।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।। (গীতা ৭:১৯)।

জিহ্বা দিয়া শব্দ করিয়া দুর্লভত্ব প্রকাশ করিয়া মহাপুরুষ বলিলেন, ঈশ্বরদর্শন অতি দুর্লভ জিনিস! ঠাকুর এই দুর্লভ জিনিস আমাদের হাতে ধরে অনায়াসে দিয়েছেন। তিনিই স্বয়ং ঈশ্বর।

শ্রীম — (জিভে তিনবার শব্দ করিয়া) হাঁ, অহেতুক কৃপাসিন্ধু ঠাকুর। সত্যিই, আমাদের হাতে ধরে ঈশ্বরকে দেখিয়ে দিয়েছেন। বিনা চেষ্টায় লাভ হয়েছে ঈশ্বরকে ভক্তদের।

২৬শে অক্টোবর, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার।

সকাল সওয়া ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষের ঘরের দরজা বন্ধ। সেবক মতি গৃহকর্ম করিতেছেন বাহিরে। ঘরের ভিতর শব্দ শুনা যাইতেছে স্বামী বিজয়ানন্দের। নীলকণ্ঠ মহারাজও আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। বিদ্যাপীঠের একটি সাধু পূর্ব হইতেই দাড়ানো। দরজা বন্ধ দেখিয়া তাঁহারা গৃহে প্রবেশ করেন নাই। সেবক মতি বলিলেন, যান না ভিতরে। স্বামী মাধবানন্দের সম্বন্ধে কথা হইতেছিল।

সাধুরা প্রণাম করিলেন ভূমিষ্ঠ হইয়া। কথাবার্তা হইতেছে।

একজন সাধু — আজ বিদ্যাপীঠে যাব। কাল খুলবে।

শ্রীমহাপুরুষ — তুমি চা খাও?

সাধু বুঝিলেন স্বামী বিজয়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাই জবাব দেন নাই।

স্বামী বিজয়ানন্দ বলিলেন — না।

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ, তুমি তো দেওঘরের লোক। বেশ যাবে, এসো।

কালকে মাস্টার মহাশয়ের কাছে গিছলে?

সাধু — আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীমহাপুরুষ — কেমন আছেন?

সাধু — ভাল না, বড়ই দুর্বল। কথা কইতে কইতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়।

শ্রীমহাপুরুষ — এই, আমারও তাই। দুর্বল, তা তো হবেই। ঠাকুর জানেন। এসব ঠাকুরের লোক। তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে। কি বল?

স্বামী বিজয়ানন্দ — আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীমহাপুরুষ (সাধুর প্রতি) — আচ্ছা এসো। সেবক মতিকে মুখে হাত দিয়া বলিলেন, দাও।

সেবক মতি বাহিরের মিট্‌সেফ হইতে একটি হলুদ রং-এর কৌটাভর্তি সন্দেশ দিলেন। পূর্বেই মতিকে সাধু বলিয়াছিলেন, কর্তার একটু প্রসাদ যেন দেওয়া হয় কালকে। তাই মতি পূর্ব হইতেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। সাধু শ্রীমহাপুরুষের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

সকাল সাড়ে আটটা। মঠের সাধুদের খাবার ঘরের চালায় বসিয়া বিদ্যাপীঠের একজন সাধু ও স্বামী প্রজ্ঞানন্দ এক থালায় ভাতে ভাত আহার করিতেছেন। সেবক বৈরাগ্যানন্দও খাইতেছেন। ইনিই বিদ্যাপীঠের সাধুর জন্য রান্না করিয়াছেন।

সাধু যাত্রা করিবেন। মনে বাসনা, আর একবার যাইবার আগে শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন ও প্রণাম করিবেন। এই সঙ্কল্প লইয়া দ্বিতলে গিয়া দেখিলেন, দরজা বন্ধ। বুঝিলেন, তিনি খাটে শুইয়া আছেন। পাশে সেবক হিরণ্ময় দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন। এক-পা দুই-পা করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন সাধু। দেখিলেন, সেবক শৈলেশও দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন। শৈলেশ ডাকিলেন, আসুন।

শ্রীমহাপুরুষ — কে?

সাধু — আমি জগবন্ধু, দেওঘর রওনা হচ্ছি।

শ্রীমহাপুরুষ — আচ্ছা বাবা, এসো। কখন যাবে, কয়টায় গাড়ী?

সাধু — নয়টা পঁচিশে।

শ্রীমহাপুরুষ — খাবে কোথায়?

সাধু — এখান থেকে ভাতে ভাত খেয়ে যাচ্ছি।

শ্রীমহাপুরুষ (আহ্লাদে) — বেশ বেশ যাও, এসো।

সাধু — আশীর্বাদ করবেন যেন জ্ঞান ভক্তি লাভ হয়।

শ্রীমহাপুরুষ — তা তো রয়েছেই। হাঁ, খুব জ্ঞান ভক্তি হোক, খুব হোক। জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস সব হোক, ব্যস্।

শ্রীমহাপুরুষ — বাবা বৈদ্যনাথকে আমার প্রণাম জানাবে। আর প্রার্থনা করবে শরীরটা যাতে ভালয় ভালয় যায়, কষ্ট না হয়। আর ঐ —

সাধু — কি, মাস্টার মশায়ের জন্য?

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ। যাতে ঐ শরীরটাও ভালয় ভালয় যায়। তিনি শুনলে হয়। তিনি স্বতন্ত্র, কারো কথায় চলেন না। নিজের ইচ্ছায় চলেন — স্বতন্ত্র। তবুও আমাদের তো একটা কর্তব্য আছে! তাই প্রার্থনা করবে আমার জন্য, আর মাস্টার মশায়ের জন্য।

সাধু — আজ্ঞে প্রার্থনা করবো।*

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ করবে। পায়ে হাত দিয়ে আর কাজ নেই, বাবা।

সাধু চলিয়া যাইতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ বলিতেছেন, খুব জ্ঞান ভক্তি হোক বাবা, খুব হোক। আশ্রমের সব ছেলেদের আমার আশীর্বাদ দিও।

সাধু আবার দোরগোড়া হইতে খাটের কাছে গেলেন।

শ্রীমহাপুরুষ — দিও আশীর্বাদ।

সাধু — আজ্ঞে হাঁ, দিব।

সাধু দরজার কাছে গিয়াছেন।

শ্রীমহাপুরুষ — একটু প্রসাদ নিয়ে যাও।

সাধু আবার খাটের কাছে আসিলেন।

শ্রীমহাপুরুষ — ওরা তো বাবা বৈদ্যনাথের প্রসাদ পাঠিয়ে দেয়। তুমিও বাবা, রামকৃষ্ণের প্রসাদ নিয়ে যাও (বালকের ন্যায় খিলখিল করিয়া হাস্য)। হাঁ, নিয়ে যাও।

সাধু — আজ্ঞে হাঁ, নিয়ে যাচ্ছি।

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ, যা হোক বাতাসা-টাতাসা — যা হোক কিছু।

---

* পরবর্তী চারি বৎসর, প্রত্যহ সন্ধ্যায় বৈদ্যনাথ মন্দিরে গিয়া সাধু উক্তরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

এইখান থেকে নিয়ে যাও, আমাদের এইখান থেকে।

শৈলেশ বাহিরে গেলেন। মিট্‌সেফ হইতে প্রসাদ বাহির করিলেন, সন্দেশ।

শ্রীমহাপুরুষ — তা হলে এসো। ট্রেনটায় বেশ দিনে দিনে যাওয়া যায়। দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা।

শ্রীমহাপুরুষ খাটের মধ্যস্থলে শয়ান চিৎ হইয়া, যেন ছোট ছেলে। শরীর কংকালসার। গত কাল বিকালে ও রাত্রিতে শরীর খুব খারাপ গিয়াছে।

সাধু ঘরের মেঝেতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন খাটের পাদস্পর্শ করিয়া। স্বামী বৈরাগ্যানন্দ সঙ্গে গিয়া হেম পালের গলিতে বাসে উঠাইয়া দিলেন। হাওড়া স্টেশনে যখন পৌঁছিলেন — মাত্র দুই মিনিট বাকী।

ডায়েরী পাঠ শেষ হইল। শ্রীম ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এতে লোকের খুব কল্যাণ হবে। আমরা শুনে লাভবান হলাম। অপরেরও তা হবে। এ যেন চিত্রাবলী! তুলিতেই কি কেবল চিত্র হয়? কলমেও হয়। কালিদাসের কলম-চিত্র অতুলনীয়।

ইনি আমাদের এ অমৃত পরিবেশন করলেন। আমরা আর কি দিতে পারি! এই নিন, বলিয়া খাবারের ঠোঙ্গা সাধুর হাতে তুলিয়া দিলেন। সকলেই প্রসাদ পাইতেছেন। প্রচুর নিমকি আসিয়াছে।

ভক্তগণ আনন্দে প্রসাদ পাইতেছেন। সতীনাথ বলিলেন, নুন কম। তৎক্ষণাৎ শ্রীম উত্তর করিলেন — ক্রাইস্ট বলেছিলেন, 'Ye are the salt of the earth' (জগতের নুন যে তোমরা) অর্থাৎ ভক্তগণ। সংসারভোগে যখন অরুচি আসে তখন সাধু ভক্তের সঙ্গ করলে চিত্তের রুচি ফিরে আসে। তখন 'নুন' অর্থাৎ ভগবানের প্রেমরস সিঞ্চিত হয় মনে। নূতন মন হয়। নূতন জগৎ। নূতন উদ্যম। এটি ভাগবৎ জীবন।

অন্তেবাসী এবার ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্রীমকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। তিনি মঠে যাইবেন। বরানগর পর্যন্ত সঙ্গে গেলেন স্বামী রাঘবানন্দ।

বেলুড় মঠ।
১৬ই মে, ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার।

অষ্টাদশ অধ্যায়

এই শেষ কথামৃত-পাঠ

১

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। এখন অপরাহ্ন পৌনে সাতটা। শ্রীম কিছুকাল নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। বাহিরে ছাদে ভক্তরা কেহ কেহ বসিয়া আছেন শ্রীম-র অপেক্ষায়। পূর্ণেন্দু, ঘোষ মশায় প্রভৃতি আসিয়াছেন।

গ্রীষ্মকাল। আজ ৮ই জুন ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ সাল, সোমবার। অন্তেবাসী আসিয়া ভক্তদিগের সঙ্গে মিষ্টালাপ করিতেছেন। তিনি বিগত দুই দিন গৌরীপুরে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোমে। আজ নূতন চশমা লইয়া ডাক্তারের নিকট হইতে আসিয়াছেন।

ইতিমধ্যে শ্রীম ছাদে আসিয়া উপস্থিত। সাধু ও ভক্তগণকে শ্রীম যুক্ত করে 'নমস্কার নমস্কার' — এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া অভিবাদন করিলেন। শ্রীম-র ইহাই রীতি, স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মত। সকল মানুষে, সকল জীবে শ্রীভগবানের অধিবাস বলিয়া সকলকে নমস্কার করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত একেই উত্তম ভক্তের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীম আসন পরিগ্রহ করিলে সাধু ও ভক্তগণ শ্রীমকে প্রতিনমস্কার করিয়া বেঞ্চির উপর বসিলেন। শ্রীম-র বামহাতে জোড়া বেঞ্চিতে বসিয়াছেন অন্তেবাসী। ভক্তরা সামনে ও ডান দিকে বেঞ্চিতে বসা।

শ্রীম-র পরনে সাদাপেড়ে ধুতি। গায়ে একখানা দুই ভাঁজ করা বস্ত্র। সেই বস্ত্রের উপর বক্ষস্থলে একখানা ওয়ার-ফ্লানেলের ধূসর রঙ্গের গরম পাঞ্জাবী। শরীর ভাল নয়। দারুণ গরমে আরও খারাপ। চেহারা রুক্ষ। প্রশান্ত গম্ভীর বৃহৎ সুমুখ-ঠেলা চক্ষু দুইটিতে দৈহিক যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি। অন্তেবাসীর কষ্ট হইতেছে এই চেহারা দেখিয়া। এবার কথাবার্তা আরম্ভ

হইয়াছে।

অন্তেবাসী — আপনার শরীর কি বড্ড খারাপ আজ?

শ্রীম — দুপুরে বড়ই গরম। ঘরে থাকা যায় না। তাতে আবার ঘরে পশ্চিমের রোদের চাপ। তাই এখানে (সিঁড়ির ঘরে) ছিলাম।

শ্রীম (অন্তর্মুখী মনে অন্তর হাস্যে) — এমন helpless (অসহায়) অবস্থা। তা দেখে মানুষ কি করে বলে 'আমি কর্তা'?

নিজের ইচ্ছায় কি মেঘ বা বৃষ্টি করতে পারছে? তা'তে তো হচ্ছে না। তবে 'কর্তা' কোথায়?

স্ত্রী-পুরুষ একত্র হলো। এখন তারা ইচ্ছা করলেই কি ছেলে জন্মাতে পারছে? যখন একত্র হয় তখন যদি মনে করে ছেলে হোক — ও মা, হয়ে পড়লো মেয়ে!

(বিজ্ঞ হাস্যে) মানুষ বলছে, 'আমি কর্তা'। অমনি ঈশ্বর তাকে শুনিয়ে বলছেন — 'না, আমি কর্তা' — 'পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ (গীতা ৯:১৭)।' কেবল তাই নন্, নিজের পরিচয় আরও দিচ্ছেন।

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।। (গীতা ৯:১৮)।

নিজের সর্বব্যাপিত্ব প্রকট করে আবার বলছেন, আমি কেবল কারণই নই — সর্বকার্যও আমি —

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্।। (গীতা ৯:১৬)

'মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যম্' বলিয়াই শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, এরপর কি? অন্তেবাসী উত্তর করিলেন — 'অহমগ্নিরহম্ হুতম্'। শ্রীমও সঙ্গে সঙ্গে এই চরণাংশ আবৃত্তি করিলেন।

শ্রীম — আরও শোন কি বলছেন ঈশ্বর — আমাকে ছেড়ে ব্রহ্মাণ্ডে কিছুই নাই।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।। (গীতা ৭:৭)।

শ্রীম — যেমন সকল মণির আশ্রয়স্থল সূত্র, তেমনি ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুর আশ্রয়স্থল আমি। আমাকে ছেড়ে কারও অস্তিত্ব নাই। আমিই কারণ, আমিই কার্য। কার্যের সম্বন্ধে আরও বলছেন —

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মাণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।। (গীতা ৪:২৪)

সকল কর্মও তিনি, সকল বস্তুও তিনি। সকলের কারণও তিনি 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ' (গীতা ১০:৪২)। আমিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, বাক্য মনের অতীত। আবার আমিই জগৎরূপে প্রতিভাত। (সকলের প্রতি) এই সব ঈশ্বরের মহাবাক্য — তাঁর দাবী। আর তুমি নিজেও দেখছো, এই নিদারুণ গরমে জ্বলে যাচ্ছ। ইচ্ছা করছ মেঘ হোক, বৃষ্টি হোক, কিন্তু তা করতে পারছ না। আবার পুত্রৈষণায় উন্মাদ। কিন্তু পুত্রোৎপাদন হচ্ছে না তোমার ইচ্ছায়। এই মুরোদ নিয়ে তুমি কি করে বল 'আমি কর্তা'?

দুই কর্তা নেই — কর্তা এক। তোমার কর্তাগিরি যখন টিঁকছে না বিচারে এবং তোমার কাছে তোমার শক্তিহীনতায়, তখন উচিত তোমার আত্মসমর্পণ করা। থাক তা হলে — যেমন বড়ঘরের দাসী থাকে, তেমনি। ঠাকুর তো এই বিরুদ্ধ দুই ভাবের সমন্বয় করেছেন এই প্রক্রিয়ায়। তোমার কর্তৃত্ববুদ্ধি যখন যাচ্ছে না, অথচ কর্তার মত হুকুম করে এই গ্রীষ্মে সুখদায়ক বৃষ্টি আনতে পারছ না, তখন ঠাকুরের ব্যবস্থা গ্রহণ কর, তাতে তোমার অহংকারের স্থান হবে, তোমার কর্তাগিরির মান রক্ষা হবে। ঈশ্বরের কর্তৃত্বের সঙ্গে তোমার নগণ্য কর্তৃত্বের মিলন করে দাও। দাসের কর্তৃত্ব, ভক্তের কর্তৃত্ব, পুত্রের কর্তৃত্ব নিয়ে থাক। পরমানন্দে থাকবে। যিনি এই দুষ্ট অহংকারটা সৃষ্টি করেছেন, তিনিই একে বশে আনবার পথও বলে দিয়েছেন। 'আমি কর্তা তুমি দাস' — তাঁর এই ব্যবস্থা মাথায় তুলে নাও যাবৎ দেহেতে 'আমি' বুদ্ধি থাকে। গরল অমৃত হয় এতে।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — আমরা একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম — আচ্ছা, দয়া — তাও তো বন্ধনের কারণ? ঠাকুর উত্তর করলেন, দয়ারূপেই যে তিনি লোকের ভিতর রয়েছেন। তিনিই দয়া।

একজন ভক্ত (স্বগতঃ) — তাহলে কি দয়া আদি গুণসমূহ চাপা উচিত নয়, তাদের স্বাভাবিক বিকাশ করা উচিত?

শ্রীম (একটু ভাবনার পর) — সবই যদি তুমি, আমি কোথায় দাঁড়াই তা হলে? Where then do I go in, man (তা হলে বাপু আমি যাই কোথায়)? (হাস্য) Punch-এ (পাঞ্চ পত্রিকায়) বেশ একটা news (সংবাদ) বের হয়েছিল। Punch (পাঞ্চ) মানে ভোটরঙ্গ।

ও দেশে (ওয়েস্টে) একজন গর্ভনর ছিল । তার বাপ বুড়ো হয়েছে। ছেলের বাড়িতে গেছে। ছেলে বাড়ির সব ঘর দেখাচ্ছে — এই ঘর আমার ড্রইং রুম। এটা ডাইনিং রুম। এটা ড্রেসিং রুম। এটা পড়বার ঘর। আর এটা বেড-রুম। অর্থাৎ, সব ঘরই occupied (অধিকৃত)। ছেলের ইচ্ছা, বুড়ো ওখানে না থাকে। থাকলেই সেবা করতে হবে। তখন বাপ বলল, Where then do I go in, man (তা হলে বাপু আমি যাই কোথায়)? (হাস্য)। সবই যদি তুমি, আমার স্থান কোথায় তা হলে?

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ও, সন্ধ্যে যে হয়ে গেছে। যান্, আপনারা ঘরে গিয়ে ঠাকুরদর্শন করুন। তারপর তুলসীতলায় বসে ধ্যান করুন।

সাধু ও ভক্তগণ শ্রীম-র সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেয়ালে বিলম্বিত শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য-সংকীর্তন, শ্রীঈশা প্রভৃতি নরদেবতাদের ছবি। সপার্ষদ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও ছবি আছে। আর আছে শিব-পার্বতী, সপ্তর্ষি, পাণিহাটির শ্রীচৈতন্যমহোৎসব প্রভৃতির ছবি। শ্রীম এই সকল ছবির প্রত্যেকটিকে হ্যারিকেনের আলো দেখাইতেছেন আর নাম করিয়া একে একে সকলকে প্রণাম করিতেছেন। ভক্তগণও শ্রীম-র অনুকরণ করিতেছেন। সপ্তর্ষির ছবি দেখাইয়া বলিলেন, এই দর্শন করুন সপ্তর্ষি। এঁরা আদি ঋষি। এঁরা হিমালয়ে তপস্যা করেছিলেন। দেয়ালে একটি খোলও টাঙ্গান রহিয়াছে। শ্রীম নিত্য সন্ধ্যার সময় উহাতে দুই হাতে চাঁটি দিয়া বাদ্য করেন। আজও তাহা করিলেন।

এইবার শ্রীম ছাদে পুষ্পকাননে তুলসীমঞ্চের সম্মুখে ধ্যানমগ্ন। সাধু ও ভক্তগণ শ্রীম-র পশ্চাতে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন।

২

আটটার সময় শ্রীম উঠিয়া আসিয়া দক্ষিণ দিকে নিজের আসনে চেয়ারে বসিলেন উত্তরাস্য। সাধু ও ভক্তগণ নিজ নিজ আসনে বসিলেন। সাধুরা বসিয়াছেন শ্রীম-র বাম হাতে জোড়া বেঞ্চিতে সতরঞ্চির উপর।

স্বামী রাঘবানন্দও আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। মস্তক মুণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীম তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই অন্ধকারে। জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি ওয়েলিংটন (অদ্বৈতাশ্রম) থেকে এসেছেন? অন্তেবাসী বলিলেন, আমায় জিজ্ঞাসা করছেন? শ্রীম উত্তর করিলেন, না। ইতিমধ্যে স্বামী রাঘবানন্দকে চিনিতে পারিয়াছেন, বলিলেন, ও। স্বামী রাঘবানন্দ বলিলেন, চুল ফেলে দিয়েছি। বড় গরম। শ্রীম হাসিয়া বলিলেন, তাই আমি চিনতে পারি নি।

একথা সেকথার পর সংস্কারের কথা উঠিল।

স্বামী রাঘবানন্দ — সংস্কার দেখা যায় না মহামায়ার প্রভাবে। কিন্তু অনুমান করা যায় কার্যে — একথা বেদান্ত বলেন। পতঞ্জলী বলেন, দেখা যায়।

শ্রীম (কিঞ্চিৎ অপ্রীতির সহিত) — ঠাকুর যে বলতেন সংস্কার সত্য। তা হলে মানতে হবে। এতে বিচার কি?

স্বামী রাঘবানন্দ — পতঞ্জলীর ভাব — সংস্কার বিভূতি দিয়ে বৃদ্ধি করা যায়। তখন দেখা যায়, যেমন সম্পাতি। তার দৃষ্টিতে সীতাকে অশোক বনে দেখতে পেল। অপরে দেখতে পায় নাই। তেমনি যোগবিভূতি দিয়ে ঐশ্বর্যের বৃদ্ধি হয়। একেই বলা হয়, দেখা যায়। এইরূপে পূর্বজন্ম স্মরণ করা যায়।

শ্রীম — ও, আপনি জাতিস্মরত্বের কথা বলছেন? তা অর্জুনের ছিল না, অত বড় লোক হয়েও। ভগবান বলছেন —

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মামি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ (গীতা ৪:৫)

অর্জুন, তোমার ও আমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি সে সবের কথা জানি — 'তান্যহং বেদ সর্বাণি'। কিন্তু তুমি জান না, 'ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ'। এ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত।

(প্রতিবাদের স্বরে) — That question therefore does not arise at all (তাই যদি হয় তবে জাতিস্মরত্বের কথা মোটেই আসছে না)।

আবার ঠাকুরকে দেখ। তিনি ওদিক দিয়েই যান নাই। বলছেন, 'আমি অষ্টসিদ্ধি চাই না মা, আমি শতসিদ্ধি চাই না মা' — কেবল তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি চাই — শুদ্ধা, অমলা, অচলা ভক্তি। এ তাঁর মুখের কথা। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, এসব বিভূতির ঐশ্বর্য দিয়ে সংসারে বড় হতে পারবে, কিন্তু আমায় পাবে না। অর্জুন এই কথা শুনে আর তা নিতে চান নাই।

এ দিয়ে তাঁকে লাভ না হলে, এর দাম কি? যদি ধরে নেওয়াও যায় সংস্কার দেখা যায়, বিভূতি দিয়ে বাড়িয়ে সম্পাতির দৃষ্টিশক্তির মত, তাহলেও এতে লাভ কি? এতে কি ঈশ্বর দর্শন হবে?

স্বামী রাঘবানন্দ — কেন, ঠাকুরের তো বিভূতি ছিল, প্রকাশ করেন নাই।

শ্রীম (নিবিড় অপ্রীতির সহিত প্রতিবাদের সুরে) — হাঁ, থাকবে না কেন? তিনি যে ঈশ্বর! (আকাশ ও তারকা দেখাইয়া) এগুলি কি তা হলে? ঈশ্বরের ঐশ্বর্য থাকবে না? তবে একটা বিশিষ্ট message (বার্তা) দেবার জন্য মানুষদেহ ধারণ করে এসেছেন। সেইটের জন্য বললেন — 'মা, তোমার পাদপদ্মে আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।' তিনি (ঠাকুর) কি মানুষ? তাঁকে মানুষবুদ্ধি করলে কিছুই হবে না। তিনি ঈশ্বর।

তিনি কেন এই প্রার্থনা করলেন? তা না হলে সব লোক এইসব নিয়ে মত্ত হয়ে যাবে আর তাঁকে ভুলে যাবে। তখন আরও বেশী গোলমালে পড়বে। তাই ওসব কথা — বিভূতির কথা বললেনই না। তার জন্যই — that question does not arise at all (ঐ প্রশ্ন, বিভূতির কথা একেবারেই আসছে না)।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — মানুষ কি নিয়ে রয়েছে — toys, play things (খেলনা, ক্রীড়নক) সব নিয়ে আছে। ঠাকুর এসে বললেন, 'আমার ঈশ্বর-বৈ কিছুই ভালো লাগে না।' তাই স্বামীজী, as an interpreter of him (ঠাকুরের উপযুক্ত ভাষ্যকাররূপে) ও দেশে

(পাশ্চাত্ত্যে) বলতেন, তোমরা একে life বলছো — একটু থিয়েটার, একটু ড্যান্স! একে কি life (জীবন) বলে? যা দিয়ে eternal peace, everlasting joy (শাশ্বত শান্তি, শাশ্বত সুখ) লাভ হয় তাই life (জীবন)। স্বামীজীর কথা ওরা বুঝতে পারে নি। কি করে বুঝবে — immersed in materialism (বিষয়ানন্দে যে ডুবে আছে)!

Christianity without Christ! (ক্রাইস্টহীন খ্রীস্টধর্ম) যা ক্রাইস্ট বারণ করলেন তাই তারা করলে। তিনি বললেন, what does it profiteth thee if ye gain the whole world and loseth thy soul (আত্মাকে বিসর্জন করে জগতের অধীশ্বর হয়েই বা কি লাভ)? 'Whole world' মানে ঐশ্বর্য, ভোগের বস্তু। 'Soul' মানে ঈশ্বর। তারা সেইটে নিলে 'the whole world' (বিষয়ানন্দ, কামিনী কাঞ্চন)। ক্রাইস্ট life-টা (জীবন) ঠেলে ফেলে দিয়েছেন। আজকাল আবার higher criticism (উচ্চস্তরের) সমালোচনা হয়েছে — অর্থাৎ ক্রাইস্ট ছিলেন কি না — এ সম্বন্ধে বিচার। (সহাস্যে) আচ্ছা, lower criticism (নিম্নস্তরীয় সমালোচনা) আবার কোনটা?

শ্রীম (জনৈক সাধুর প্রতি) — ঠাকুর বলতেন, স্বামীজী এ কথাটা ওদেশের লোককে সর্বদা শোনাতেন — পাশের ঘরে সোনা রয়েছে, solid ruggets of gold (নিরেট সোনার ঢেলাগুলো)। চোর একথা জানতে পেরেছে, কিন্তু ঢুকতে পারছে না ঘরে। তার যেমন ব্যাকুলতা, তেমনি ব্যাকুলতা থাকলে তাঁকে পাওয়া যায়। কিছুই ভাল লাগছে না। সব আছে, তবুও ছট্‌ফট্ করছে।

তেমন ব্যাকুলতা হয় না কেন? ও গুলোতে (ভোগের জিনিসে) মন রয়েছে। Toys (খেলনা) নিয়ে যেমন ছেলেরা থাকে, তেমনি দেহেতে মন রয়েছে। অন্য দিকে চেষ্টা থাকা উচিত নয়। কিসে তাঁকে লাভ হয় — এই এক চিন্তা, এই চেষ্টা।

আগে তাঁকে লাভ, তারপর সিদ্ধাই ফিদ্ধাই যা চাইতে হয়, চাও। তাঁকে লাভ, তাও বলে গেছেন, তিনি প্রত্যক্ষ হন চোখের সামনে, আবার কথা ক'ন।

অতএব যতক্ষণ না তাঁকে লাভ হচ্ছে ততক্ষণ অন্য question-ই

(প্রশ্নই) নাই। That question does not arise at all (বিভূতি সিদ্ধাইয়ের কথা মোটেই আসছে না)।

জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি — এই তিন অবস্থার পারে তিনি। ঠাকুর এই message (দিব্যসংবাদ) দিতে এসেছিলেন মানুষশরীর ধারণ করে।

একজন ভক্ত — ঠাকুর তো আবার আসবেন।

শ্রীম (এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া) — দেখ না, কি প্রেম! এক বছর কি যন্ত্রণা! মাঝে মাঝে বলছেন, মৃত্যুযন্ত্রণা। তার ভিতরই ভক্ত তৈরী হচ্ছে।

স্বামী রাঘবানন্দ — আচ্ছা, রোগ হলে অনেকে যন্ত্রণা চেপে রাখে। অনেকে আবার 'গেলুম ম'লুম' করে। এ করা উচিত কি?

শ্রীম — চেপে রাখবে কতক্ষণ? যন্ত্রণা বের হয়ে পড়বে।

স্বামী রাঘবানন্দ — হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) বলতেন আমাদের, ও আমার একটা স্বভাব — চেপে থাকা। রোগের সময় আমরা একটু কিছু করলে বলতেন, একটু সহ্য কর — অত কেন?

শ্রীম — আমার personal question (নিজের কথা) বলি। বিছার কামড়ে আমি তো চেঁচামেচি করে সাতবাড়ির লোক জড় করলাম। ঠাকুরকে স্মরণ করতেই — ওমা, কোথায় সব চলে গেল!

ওতে আর কি হয় — 'গুণাগুণেষু বর্তন্তে'।

স্বামী রাঘবানন্দ — কেন আঙ্গুলহাড়ার সময় কত সইলেন।

শ্রীম — তাঁর সওয়ার মতো! নিজমুখে এক একবার বলতেন — যেন যমযন্ত্রণা।

স্বামী রাঘবানন্দ — চেষ্টা করা উচিত সইতে।

শ্রীম — চেষ্টাও যে তিনি হয়ে রয়েছেন।

অন্তেবাসী (আস্তে আস্তে স্বামী রাঘবানন্দের প্রতি) — বললেন যে আগে, চেষ্টা করে পতি-পত্নী কি পুত্রসন্তান উৎপাদন করতে পারেন? কিংবা দারুণ গ্রীষ্মে কি মানুষ বৃষ্টি আনতে পারে?

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — কি বলছো?

অন্তেবাসী — পতি-পত্নীর চেষ্টায়ই কেবল পুত্র হয় না। গরমে ইচ্ছা করলেই বৃষ্টি হয় না।

শ্রীম — হাঁ, মানুষের চেষ্টায় কেবল হয় না। এই সঙ্গে তাঁর ইচ্ছা মিলিত হলে হয়।

৩

শ্রীম পুনর্বার বলিলেন পতিপত্নীর কথা, গ্রীষ্মের বৃষ্টির কথা। বলিলেন, সবই যে তিনি। আমি কোথায়? আবার Punch-এর গল্পটা বলিলেন — where then do I go in man' (তাহলে বাপু, আমি যাই কোথা)?

শ্রীম হাস্য করিতেছেন। আবার কথা।

শ্রীম (একজন সাধুর প্রতি) — ঠাকুরকে দেখেছি রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতেন। আবার এরই ভেতর সমাধি মুহুর্মুহুঃ। তখন আর এক মানুষ! মুখকমল যেন প্রস্ফুটিত কমল! ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার দেখে তো অবাক। ক্যানসারের রোগীর একি আনন্দময় দৈবী অবস্থা! ঠাকুর এক একবার রহস্য করে বলতেন ডাক্তারকে — কিগো, এ বুঝি তোমার সায়েন্সে নাই!

বলতেন, 'মা আমাকে বালকের অবস্থায় রেখেছেন। আমি যে মায়ের ছেলে — তাই এ ছটফট। বালকের মা চাই।'

একদিন রাখাল ঠাকুরের ভাঙ্গা হাতটা লুকিয়ে রেখেছে। হাতে 'বার' বাঁধা। হাতটা একটা চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছে। কে একজন এয়েছে। অমনি ঠাকুর হাত খুলে তাকে বলছেন — এই দেখ, হাত ভেঙ্গেছে, বড় যন্ত্রণা (সকলের হাস্য)।

ঠাকুরের ঐ অবস্থা আদর্শ — বালকস্বভাব। বৃহদারণ্যকে আছে, সকল জেনে বালক হয়ে যায় — 'বাল্যে তিষ্ঠাসীৎ'। ভগবানদর্শনের পর হয় ঐ অবস্থা।

আমাদের বালকের স্বভাব নয়। তাই অন্য ব্যবস্থা। আমাদের শাস্ত্র মেনে চলা — তিতিক্ষাদি অভ্যাস করা উচিত!

জনৈক শ্রোতা বলিলেন, ঠাকুর যে বলেছেন শাস্ত্র চিনিতে-বালিতে মেশান। কোন্‌টা ত্যাজ্য কোনটা গ্রাহ্য? কি করে বুঝবে লোক?

শ্রীম — ঠাকুর তারও উপায় বলেছেন। বলেছেন, গুরুমুখে শাস্ত্র শুনতে হয়। গুরু মানে — সিদ্ধ গুরু, সৎ গুরু, মন্ত্রদ্রষ্টা। তাঁর কাছে পড়লে ঠিক ঠিক অর্থ বোঝা যায়। তা নইলে চিত্তভ্রমের কারণ হয়

শাস্ত্রপাঠ।

অবতার যখন আসেন তখন হয় শাস্ত্রের ঠিক ঠিক interpretation (ব্যাখ্যা)। ইদানীং ঠাকুর এসে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর জীবনটা, তাঁর প্রতিটি কাজ শাস্ত্রের ভাষ্য।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি) — 'কথামৃত'খানা (চার পার্ট একত্রে বাঁধান) আনুন তো।

শ্রীম নিজে কথামৃত পড়িতেছেন — তৃতীয় ভাগ, চতুর্দশ খণ্ড। ঠাকুর বলরাম মন্দিরে। ভক্তের মজলিশ বসিয়াছে। ঠাকুর নিজের সাধনের অলৌকিক অবস্থা সব বর্ণনা করিতেছেন। ভক্তগণ অবাক হইয়া ঐ বর্ণনা শুনিতেছেন।

সাধু ভক্তগণ অনেকদিন পর শ্রীম-র নিজ মুখে কথামৃত পাঠ শুনিতেছেন পরমানন্দে। নিজেই পাঠক, নিজেই ব্যাখ্যাতা। প্রথম অধ্যায় পাঠ হইলে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ঠাকুর বলছেন, ধ্যানের সময় একজন শূল হাতে করে বসে থাকতো। ভয় দেখাচ্ছে। মন ভগবানের পাদপদ্মে না রাখলে শূলের বাড়ি মারবে। বলছেন, 'সে সাধনের সময় মন কখনও লীলায় নামিয়ে আনতেন মা। তখন সীতারাম-রূপ দর্শন হতো। কখনও রাধাকৃষ্ণ, কখনও গৌরাঙ্গের ভাবে থাকতাম।' গৌরাঙ্গে দুই ভাবের মিলন — অন্তরে কৃষ্ণ, বাইরে রাধা।

আবার কখনও লীলা থেকে নিত্যে মা নিয়ে যেতেন মনকে। লীলা ভাল লাগতো না — 'লীলাতে বিচ্ছেদ আছে'। তখন ঘরের সব দেবীদের ছবি সব খুলে নামিয়ে রাখতেন। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, যিনি বাক্য মনের অতীত, তাঁতে মন ডুবে যেতো। যেমন নুনের পুতুল সমুদ্রে মিশে গেল। আবার কখনও সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চিন্তা করতেন — সেই পুরুষকে। তখন নিজেকে ঠাকুর মনে করতেন, সেই পুরুষের দাসী।

নিরাকার নির্গুণ, নিরাকার সগুণ, আর সাকার সগুণ — এই তিন অবস্থায় যেন বাচ খেলতেন — যেমন নৌকোর বাচ খেলে লোক।

কখনও ষট্‌পদ্মে আত্মার রমণ দেখাতেন মা। কুণ্ডলিনীযোগে সিদ্ধি, মানুষ কত চেষ্টায় লাভ করে। ঠাকুরের পক্ষে যেন জলবৎ তরল। পরমাত্মা

ঠাকুরের রূপ ধারণ করে ঠাকুরের ভিতর প্রবেশ করলেন। আর মূলাধার মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ আত্মা ও সহস্রার সবগুলি পদ্মের সঙ্গে রমণ করলেন। নিম্নমুখ পদ্মগুলি ঊর্ধ্বমুখ হয়ে গেল। সহস্রারে গেলে কি হয় তা মুখে বলা যায় না।

হাজার লেক্‌চারে যা না হয় দু'টি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ায়, ধ্যান কি — এ বোঝা আর কঠিন রইল না।

যেমন ব্যাধ পাখীর দিকে তাক করেছে। পাশ দিয়ে বরযাত্রী বাজনা বাজিয়ে চলে যাচ্ছে। তার খবর নাই। কিংবা যখন একজন মাছ ধরে বঁড়শিতে। তার সবটা মন ফাতনাতে। পথিক কতো ডাকছে, ওদিকে হুঁশ নাই। গভীর ধ্যানে বাহ্যজ্ঞান থাকে না।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দেখুন, সিদ্ধাই তিনি চাইতেন না। ব্যারাম ভালো করা, মোকদ্দমা জেতানো, জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলা — এসব করতে পারতেন না। (সহাস্যে) হৃদয়ের কথায় একদিন চাইলেন কালীঘরে কিছু সিদ্ধাই। মা দেখিয়ে দিলেন, তা বেশ্যার গু — হীন, অতি অপবিত্র জিনিস!

সিদ্ধাই দেখিয়ে অনেকে গুরুগিরি করে। তাকে বললেন বেশ্যাগিরি। কে পারে একথা বলতে ঠাকুর ছাড়া, যিনি মা বৈ কিছু জানেন না?

বেলতলায় ধ্যানে পাপ-পুরুষকে দেখলেন। টাকাকড়ি, মান, ইন্দ্রিয়সুখ, নানারকম শক্তি দিতে চাইলো পাপপুরুষ। ঠাকুরের ভয় হলো। জগদম্বাকে ডাকতে লাগলেন। তিনি এলে তাঁকে দিয়ে ঐ পাপপুরুষকে কেটে ফেলা হল। মায়ের তখনকার ভুবনমোহিনী রূপ। চাউনিতে জগৎ কাঁপছে! ক্রাইস্টকে চল্লিশ দিন এই পাপপুরুষ প্রলোভন দেখিয়েছিল।

বলছেন, এসব অতি গুহ্য কথা। আর বলতে দিচ্ছেন না মা। মুখ চেপে ধরে রেখেছেন। যতটা লোক নিতে পারবে ততটা বলাচ্ছেন মা ঠাকুরের মুখ দিয়ে।

একেই বলে revelation (দৈবলব্ধ জ্ঞান)। এরই নাম বেদ। বেদ এইভাবে প্রকাশ হয়েছিল।

কিছুক্ষণ নীরব, পুনরায় কথা।

শ্রীম — মা আর ঠাকুর এখন আলাদা। বস্তুতঃ ঠাকুরই মা, মা-ই

ঠাকুর। লীলায় এসেছেন, তাই দু'টি। একটি ছেলে, একটি মা। ঠাকুরের দেহ মনটা দিয়ে জগদম্বা বায়স্কোপের মত আধ্যাত্মিক অলৌকিক সব ছবি দেখাচ্ছেন।

নিজে credit (বাহাদুরী) নেবেন না কিছুতেই। মানুষের ঠিক বিপরীত। সব credit (বাহাদুরী) মা-র। তাই ভক্তদের শিক্ষার জন্য বললেন, 'হ্যাঁ গা, আমার কি অপরাধ হল এসব গুহ্য কথা বলায়?' আবার নিজেই উত্তর করলেন — 'না, অপরাধ কেন হবে? আমি লোকের বিশ্বাসের জন্য বলেছি।' কিসে বিশ্বাস? শাস্ত্রে, অবতারে বিশ্বাস।

যাদের বলছেন, তাদের চোখের সামনে যেন মাকে নিয়ে এসেছেন। আহা, কি জিনিসে তৈরী ঠাকুরের শরীর মন! যার ভুবনমোহন রূপে জগৎ কম্পিত, কোটি বিজলী চমক যার, সেই জিনিস ঠাকুর নিজের শরীর মনে ধারণ করেছেন!

জনৈক (স্বগত) — ঠাকুরের কথা যে শ্রীম-র প্রাণজল, যেমন মাছের প্রাণ। এই দারুণ গরমে লণ্ঠনের আলোতে চশমা ছাড়া কি করে পড়ছেন? মনে হয়, শ্রীম-র যেন দেহবুদ্ধি নাই এ সময়। আর এক কথা — অত বড় বই, কত কথা, কি করে সব মনে রাখলেন? লোকে যে বেদব্যাস বলে শ্রীমকে, ঠিকই বলে।

স্বামী রাঘবানন্দ — ঠাকুর বলছেন, 'কিন্তু তোমাদের সাকার রূপে (রামসীতা, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতিতে) বিচ্ছেদ আছে।' তা'হলে এসব রূপ কি অনিত্য?

শ্রীম — না। অনন্তকাণ্ড কিনা। নিত্য কৃষ্ণ, নিত্য ভক্ত আছে আবার।

শ্রীম আরও দুই অধ্যায় পাঠ করিলেন। হ্যারিকেনের আলো চোখে লাগে তাই একজন এক টুকরা কাগজ দিয়া উহা ঢাকিয়া দিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ বছরের কথা এসব! কিন্তু মনে কি impression (রেখাপাত) করে দিয়েছেন, যেন কাল হয়ে গেল, মনে হচ্ছে।

একজন ভক্ত — ঠাকুরের ধ্যানের সময় বললেন, 'যেন বারবাড়িতে কপাট পড়লো'। এর মানে কি?

শ্রীম — রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ — এ গুলিতে মন নাই। মন

নিবিষ্ট ভগবানের পাদপদ্মে। বিষয় থেকে মন উঠে গেলে আর কি!

অমৃত — গুরুগিরিকে বেশ্যাগিরি বললেন। কুলগুরুরাও কি তাই?

শ্রীম — না। যারা কুলগুরু, হয়তো তাদের কেউ আদেশ পেয়েছে। ঐ আদেশেরই কাজ চলছে। ঠাকুর বলেছেন আদেশ পেলে লোকশিক্ষা হয়। যারা কেবল লোকমান্য, অর্থলাভের জন্য শিষ্য করে তাদের নিন্দা করা হয়েছে এতে। যে মন দিয়ে ঈশ্বরলাভের চেষ্টা করবে, সে মন বিষয়ভোগে লাগানো উচিত নয়, এই কথাই বলছেন।

একজন ভক্ত — গিরিশবাবু ঠাকুরকে বললেন, আপনারও তো বিয়ে আছে — এর মানে কি?

শ্রীম (সহাস্যে) — সংসারের নিন্দা করলেন কিনা! 'হাজার শ্যেয়ানা হও গায়ে কাদা লাগবে', বললেন। 'পাঁকাল মাছের মতো' থাকতে বললেন। 'কলঙ্ক-সায়রে সাঁতার দেবে, তবুও কলঙ্ক গায়ে লাগবে না'। গিরিশবাবুর অভিপ্রায় — আপনার গায়েও কি কলঙ্ক লাগে, আপনি তো বিয়ে করেছেন? হাঁ, এ একটা interesting point (মজার বিষয়) বটে!

তাই ঠাকুর উত্তর দিলেন — 'বিয়ে করলেও আমার সংসার করা হয় নাই। কোন দেহসম্পর্ক নাই।' বিয়ে কেবল সংস্কারের জন্য। দেহেতে মন নাই। মন মায়ের পাদপদ্মে সর্বদা। তা'হলে সংসার কি করে হবে! নজীর বললেন — এক মতে, দেবীভাগবতের মতে আছে শুকদেবেরও বিয়ে হয়েছিল সংস্কারের জন্য।

স্বামী রাঘবানন্দ — শুকদেবের বিয়ে হয়েছিল বললে লাটু মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) মারতে যেতেন (হাস্য)।

অন্তেবাসী — মহাভাব আর নির্বিকল্প সমাধি কি এক?

শ্রীম — ঠাকুর বলেছেন, শুদ্ধাভক্তি আর শুদ্ধজ্ঞান এক। অর্থাৎ, উভয়ের গন্তব্যস্থল ঈশ্বর। সম্ভোগও একই বস্তুর — ব্রহ্মানন্দের। শুদ্ধাভক্তির শেষ অবস্থা ভাবসমাধি। এ জীবকোটির হয়। এ ভাব আরও ঘনীভূত হয়ে সুগভীর হয়ে, হয় প্রেম। প্রেমের পরাকাষ্ঠা মহাভাব। মহাভাব ঈশ্বরকোটির হয়। শ্রীরাধার ও চৈতন্যদেবের হয়েছিল। ঠাকুরের হয়েছিল। দেশকাল বোধ থাকে না। জ্ঞানপথের শেষ অবস্থা নির্বিকল্প সমাধি, নিরাকার নির্গুণে মন বিলীন। এটা জীবকোটির হয় জ্ঞানপথে। এরই

পরিপক্ক, আরো গম্ভীর অবস্থা জড়সমাধি। ঠাকুর ছয়মাস এতে ডুবে ছিলেন। ঠাকুরের দুই অবস্থাই হয়েছিল, মহাভাব ও জড় নির্বিকল্প অবস্থা। চৈতন্যদেবেরও দুই অবস্থা ছিল। কিন্তু একটানা মহাভাবে ছিলেন শেষের দ্বাদশ বৎসর।

অন্তেবাসী — 'খুঁটি মিললো' — এর মানে কি?

শ্রীম — যারা আসবে হিসাব ছিল, সকলে তারা এসেছে। পূর্ণর আসায় সেই সংখ্যা পরিপূর্ণ হল।

(সহাস্যে, ভক্তদের প্রতি) — 'তুই গোলাপকে ধর' — কেন ঠাকুর এ গল্পটি বললেন? বোঝাতে, সকলেই 'মেগের দাস'। ঠাকুর বলতেন, কামিনী-কাঞ্চনই সংসার। কামিনীই সংসার। কাঞ্চন কামিনীর সেবার জন্য দরকার।

আজ বড়বাবু বললে, কর্ম খালি নাই। গোলাপ সুপারিশ করায় কর্ম খালি হল। উমেদারকে সে কর্মে ভর্তি করলো। আর বড় সাহেবকে বললো, এ ব্যক্তি উপযুক্ত। একে নিয়েছি। এর দ্বারা অফিসের অনেক লাভ হবে। স্ত্রীর কথায়, 'গোলাপের' কথায়, মিথ্যা সত্য হয়, মন্দ ভাল হয়। এটি তাঁর অবিদ্যামায়ার খেলা।

তাই ঠাকুর বললেন ভক্তদের, এটা জেনে সংসার কর। তখন হবে বিদ্যার সংসার। কামিনী-কাঞ্চন ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, এটা জেনে সংসার করা। একেই বলে বিবেক। বললেন, এ যেন জল ছাঁকা দিয়ে জল ছেঁকে নেওয়া।

সকল মানুষের প্রিয় কামিনী-কাঞ্চন। ঠাকুর বলছেন, 'মাইরি বলছি, ঈশ্বর বৈ আর কিছুই জানি না। আমার ঈশ্বর বৈ আর কিছুই ভাল লাগে না।' কে পারে একথা বলতে — ঈশ্বর ছাড়া, অবতার ছাড়া? এ কথাটি নিয়ে যদি কেউ সারা জীবন পড়ে থাকে সে সিদ্ধ হয়ে যাবে।

কেন ঠাকুরকে আদর্শ করা? এই জন্য। তিনি জানতেন একথা ষোল আনা। তাইতো বলতেন, 'আমাকে ধ্যান করলেই হবে।' একেবারে সম্পূর্ণ শুদ্ধ পবিত্র। আবার, কারণও বলতেন — 'মা, আমি তো দেখছি আমার দেহ মন বুদ্ধি সবই তুমি — জগদম্বাময়, ঈশ্বরময়'। একেবারে 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' ঠাকুর।

একজন ভক্ত — কেবল সত্যকে ধরে থাকলে ঈশ্বরলাভ হবে, ধ্যান জপ করতে হবে না?

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন তো, সত্য কথা কলির তপস্যা। সত্যে থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায়। কলিতে লোকের মন দুর্বল, শরীরও দুর্বল। কৃচ্ছ্রসাধন হয় না। তাই সহজ সাধন বললেন, সত্যকে ধরে থাকা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বললেন, কেশব সেন সত্যকে ধরে ছিলেন। বাপের ঋণ সব শোধ করেছিলেন — কোনও লেখাপড়া ছিল না, তবুও।

একজন ভক্ত — সীতাপতি মহারাজের আহারের দেরী হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীম — আচ্ছা, আজ থাক্ পাঠ এখানেই। অন্যদিন হতে পারবে।

রাত্রি সাড়ে নয়টা। শ্রীম পৌনে এক ঘন্টা পাঠ করিলেন।

শ্রীম (নিদ্রালু অমৃতের প্রতি চাহিয়া) — কি পড়া হলো বলুন (সকলের হাস্য)।

(সহাস্যে অন্তেবাসীর প্রতি) — আজ ঠাকুরবাড়ি থেকে এলে আপনাকে সতীনাথবাবুর চুল দেখাব।

স্বামী রাঘবানন্দ — সতীনাথ বড় রাগ করেছে আমার ওপর, চুলের কথা বলায়।

শ্রীম — তা'হলে ওকথা বলা হবে না। ওটা vulnerable point (মর্মঘাতী)।

অন্তেবাসী আজ ঠাকুরবাড়িতে রাত্রিবাস করিবেন। মনোরঞ্জনের সঙ্গে ঠাকুরের পদস্পৃষ্ঠ তীর্থস্থানগুলি দর্শন করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন নববিধান ব্রাহ্মসমাজ, রাজা দিগম্বর মিত্রের প্রাসাদ, ঠাকুরের বড় দাদার সংস্কৃত পাঠশালার স্থান ও রাজেন মিত্রের বাড়ী। ঠাকুরবাড়িতে আসিলেন রাত্রি দশটায়।

ঠাকুরবাড়ি, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা।
৮ই জুন, ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ সাল। সোমবার।

ঊনবিংশ অধ্যায়

কমল কানন

১

আজ ৯ই জুন ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার। অন্তেবাসী এখানে রাত্রিবাস করিয়াছেন। সকাল ছয়টার সময় শ্রীম ঠাকুরবাড়িতে আসিয়াছেন মর্টন স্কুল হইতে। অন্তেবাসীকে বলিলেন, ডায়েরী শোনাও। তিনি ডায়েরী পড়িতেছেন।

আজ ১৪ই মে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার।

বেলুড় মঠ। বৈশাখ সংক্রান্তি। সকাল সাতটা। দেওঘর বিদ্যাপীঠ হইতে একজন সাধু এইমাত্র আসিয়াছেন। সঙ্গে ঢাকার ভক্ত গায়ক নীরদবাবু। সাধু ঠাকুরঘরে গিয়া প্রথমে প্রণাম করিলেন। তারপর ওখান হইতে জানালা দিয়া শ্রীমহাপুরুষকে দর্শন করিলেন।

খানিক পরে আবার শ্রীমহাপুরুষ দর্শন, ঘরের উত্তর দরজা দিয়া। সামনের দরজায় নীল পরদা। শ্রীমহাপুরুষ খাটের উপর উপবিষ্ট, উত্তরাস্য। সেবক মতি খাটের উত্তর দিকে দাঁড়াইয়া আছেন, আর শৈলেশ দক্ষিণ-পশ্চিমে। পশুপতি সম্মুখে।

সাধু মতির হাতে বাবা বৈদ্যনাথের পেঁড়া প্রসাদ দিলেন। গত বৎসর গ্রীষ্মের সময় শ্রীমহাপুরুষ বৈদ্যনাথের প্রসাদ এই সাধুর নিকট চাহিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, কই, বাবা বৈদ্যনাথের প্রসাদ? সাধু তাই প্রসাদ আনিয়াছেন এবার শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের জন্য সওয়া সের পেঁড়া, আর শ্রীমাস্টার মহাশয়ের জন্য সওয়া সের। (পরবর্তী তিন বৎসরও প্রসাদ আনিয়াছিলেন)।

সেবক মতির হাতে প্রসাদ দিয়া হাত ধুইয়া শ্রীমহাপুরুষকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন সাধু।

শ্রীমহাপুরুষের গলদেশে লাল তাগায় একটি মাদুলী ঝুলিতেছে।

প্রসন্ন বদন, দুশ্চিন্তার নামগন্ধও নাই। যেন আনন্দময় বালক, মাতৃক্রোড়ে সমাসীন। আধ আধ বাণী অস্পষ্ট।

সাধু প্রণাম করিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল আছিস্? ছুটি হয়েছে কতদিন?

সাধু — দেড় মাস।

শ্রীমহাপুরুষ (তর্জনী দিয়া চক্রাবর্তন করিয়া) — ঘুরে ঘুরে দেখ সব। মাস্টার মশায়ের ওখানে যাবে।

আরও কিছু বলিলেন, কিন্তু বুঝা গেল না। দুই একদিন হয় হাঁফানি বাড়িয়াছে।

প্রসাদ সমস্তটাই মতি সম্মুখে ধরিলেন। শ্রীমহাপুরুষ অঙ্গুলিতে সামান্য গ্রহণ করিয়া বলিতে লাগিলেন আনন্দে — বাবা বৈদ্যনাথের প্রসাদ! বড় শক্ত প্রসাদ! এতে রোগ সেরে যায়।

এই বলিয়া খাইতে লাগিলেন অতি ভক্তিভরে। মনে মনে যেন কি ভাবিতেছেন।

আবার বলিলেন, আজ তো সকাল থেকে কিছু খাই নি, দাও আর একটু। মতি আর একটু দিলেন।

শ্রীমহাপুরুষ খাইতেছেন আর বলিতেছেন — এ বড় শক্ত প্রসাদ!

শৈলেশ — সকালের সন্দেশ খাবেন?

শ্রীমহাপুরুষ — না। প্রসাদ দাও বাবা, বৈদ্যনাথের প্রসাদ। এর বড় গভীর মাহাত্ম্য। এতে শরীর মন ভাল হয়ে যায়। এ বড় জবর প্রসাদ!

মুখে হাত দিয়া সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইঙ্গিতে, কিছু খেয়েছ কি? সাধুকে দেখাইয়া সেবকদের প্রতি ইঙ্গিতে মুখে হাত দিয়া প্রসাদ দিতে বলিলেন। সাধু বাহিরে গেলেন প্রসাদ লইবার জন্য।

এখন সকাল সাড়ে আটটা।

স্বামী অশোকানন্দ প্রচারের জন্য আমেরিকা যাইতেছেন, তাই আজ মঠে ভাণ্ডারা। সন্ধ্যায় মঠপ্রাঙ্গণে তাঁহার বিদায়সভা। তখন শ্রীমহাপুরুষ নিজের ঘর হইতে জানালা দিয়া উঁকি দিয়া একবার সভা দর্শন করিলেন।

বেলুড় মঠ। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। সকাল পৌনে ছয়টা। সাধুগণ অনেকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। শ্রীমহাপুরুষ খাটের উপর উপবিষ্ট। শরীর রুগ্ন,

খুব দুর্বল। হাঁফানির কষ্ট। রাত্রিতে প্রায় নিদ্রা নাই। গরম, তাই খালি গা।

তিনি গঙ্গা দর্শন করিবেন। তাই একখানা চেয়ার ঘরের দক্ষিণের টেবিলের কাছে রাখা আছে। পূর্ব দিকের 'মহারাজের' ঘরের দরজা দুইটি খুলিয়া দিয়াছে। গঙ্গা দর্শন হইতেছে।

আজ ১৫ই মে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ। ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ সাল, শুক্রবার।

ঘরে এখন আছেন যোগেশ মহারাজ, শাশ্বতানন্দ, গিরিশ, বুদ্ধ, জগবন্ধু আর কয়েকজন সাধু। জগবন্ধু প্রণাম করিতেই বালকের ন্যায় খেলাচ্ছলে হাসিয়া বলিলেন, নীলকণ্ঠ!

জগবন্ধু — না, জগবন্ধু।

শ্রীমহাপুরুষ (পুনরায় হাসিয়া) — তা আমি জানি।

রোগে পূর্বের গম্ভীর ভাব আর নাই, কৌতুকপ্রিয় বালক যেন সময় সময়। সাধুদের এখন আর ভয় ভয় ভাব নাই। প্রেমময় মহাপুরুষ! সিংহতুল্য ভাব অন্তর্হিত। মাতৃস্নেহের উৎস মহাপুরুষ! বালক পরমহংস মহাপুরুষ!

যোগেশ আজ আমেরিকা যাইবেন। প্রণাম করিতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ (হাতের ইশারায় গিরিশের প্রতি) — কে?

গিরিশ — যোগেশ মহারাজ, অশোকানন্দ মহারাজ।

শ্রীমহাপুরুষ (ইঙ্গিতে আবার জিজ্ঞাসা) — কে?

গিরিশ (পুনরায়) — অশোকানন্দ মহারাজ।

শ্রীমহাপুরুষ (এবার বুঝিতে পারিয়া সহাস্যে) — অশোকানন্দ স্বামী! ও-ও, চিনতে পারি নি। আজ যাবে? যাও, দুর্গা বলে লাফ দাও — জয় দুর্গা বলে। জয় রাম বলে লাফ দাও। স্বামীজী জয় রাম বলে লাফ দিয়েছিলেন। স্বামীজীকে ঠাকুর বলেছিলেন, তোকে এর (সাগরের) পারে যেতে হবে — পণ্ডিচেরীতে। কি জানি ঠাকুর কি না। (স্মরণ করিয়া) না ঠাকুরই বলেছিলেন। তারপর তিনি মার কাছে চিঠি লিখলেন। জান তো চিঠির কথা? মা লিখলেন, 'নরেন আমার জগজ্জয়ী হবে।' তোমরা তো স্বামীজীর কাজেই যাচ্ছ? ঠাকুর স্বামীজীকে বলেছিলেন, 'আমার নাম প্রচার করতে হবে'। তোমরা তো তাঁর নাম প্রচার করতে যাচ্ছ। Success sure, success sure (সাফল্য নিশ্চয়, সাফল্য নিশ্চয়)।

যা, চলে যা — দুর্গা বলে চলে যা। সর্বত্রই তাঁর ভক্ত। সিঙ্গাপুর প্রভৃতি সব জায়গা দেখবে, আদর পাবে। তাঁর ভক্ত সব জায়গায় আছে।

রোগে ও ঈশ্বরীয় ভাবে মহাপুরুষ মহারাজের সব এলোমেলো হইয়া গিয়াছে। 'তুই, তুমি' ভেদ উঠিয়া গিয়াছে। লৌকিক ব্যবহারের ঊর্ধ্বের অবস্থা — আনন্দময় নিশ্চিন্ত ভাব। যেন মায়ের কোলে শিশু!

পূর্ব দিকের দরজা দিয়া রৌদ্র আসিতেছে।

মতি — বন্ধ করে দেব গঙ্গার দিকের বারান্দার দরজা?

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ (এই বলিয়া যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিতেছেন) জয় মা পতিতপাবনী — মা ভবতারিণী।

কি মধুর স্বর, কি আবেগ, কি প্রেম, কি হৃদয়মাখা কথা! এই দেবদৃশ্য দেখিয়া সাধুদের হৃদয়ে গঙ্গাভক্তি জাগরিত হইল।

শ্রীমহাপুরুষ (স্বামী অশোকানন্দের প্রতি সস্নেহে) — এখনই কি যাবে?

স্বামী অশোকানন্দ — না, আধঘন্টা পরে।

শ্রীমহাপুরুষ (পুনরায়) — স্বামীজী গঙ্গাজল এক বোতল পাঠাবার জন্য লিখেছিলেন। আমরা হিন্দু কি না!

যা, তোর success sure (বিজয় নিশ্চয়)। আর তুমি তো স্বামীজীর কাজের (লোক) — মনে আছে সেই আশীর্বাদ?

স্বামী অশোকানন্দ — হাঁ।

শ্রীমহাপুরুষ — রোঁমা রোলাঁ তোমাকে হয়তো নিমন্ত্রণ করবেন।

যেমন সকলে মনে করে স্বামীজীর প্রভাবে ঠাকুর বড়, স্বামী অশোকানন্দও তাই মনে করিতেন। মাদ্রাজে তাঁহার এই ভ্রম শ্রীমহাপুরুষ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। সেই কথাই আজ স্মরণ করাইয়া দিলেন। বলিয়াছিলেন, ঠাকুর যুগাবতার আর স্বামীজী তাঁর প্রধান সেবক — অবতার নন, অবতারপ্রায়।

শ্রীমহাপুরুষ — শরীরটা তিনি ভাল রাখুন। আর, তাঁর যতদিন কাজ, ভাল রাখবেনও। এই দেখ, এই শরীর — কিছুই নেই এতে, খেতেও পারি না, কিন্তু কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।

আমার বাবা, বিদ্যা বুদ্ধি বল ভরসা, সব ঠাকুর। তাঁর পায়ে আশ্রয়

দিয়েছেন, এই ভরসা। বিদ্যা বুদ্ধি এই ('না'-সূচক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন)। বিদ্যাবুদ্ধি আমার কিছুই নেই। ঠাকুর, মা, স্বামীজী আমার ভরসা, তাঁরা আমার ভরসা।

স্বামীজীর কাজের জন্য স্বামী অশোকানন্দের শরীরটা ভাল যাহাতে থাকে তাহার জন্য শ্রীমহাপুরুষ প্রার্থনা করিলেন — ঠাকুর-মা-স্বামীজীকে। দুই বৎসর পূর্বে একজন সাধুর অসুখের সময়ও স্বামীজীর ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া শ্রীমহাপুরুষ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ঠাকুর এই শরীরটা ভাল করে দাও — ঠাকুর, মা, স্বামীজী, ভাল করে দাও।

সেই সাধুটি ভাবিতেছেন, তা'হলে কি আমায়ও কাজ করতেই হবে স্বামীজীর? কিন্তু আমার মনে যে আছে সাধনভজন করার কথা — সঙ্গে সামান্য কাজ!

স্বামী অশোকানন্দ আবার ভূমিষ্ঠ হইয়া বিদায়ের প্রণাম করিলেন। তিনি 'মহারাজের' ঘর দিয়া বাহির হইয়া গিয়া খোকা মহারাজকে বারান্দায় প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন। সেবক মতি আসিয়া তাঁহাকে প্রসাদ দিলেন।

২

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। সকাল ছয়টা। গ্রীষ্মকাল। গরম পড়িয়াছে। শ্রীমহাপুরুষ নিজ কক্ষে বসিয়া আছেন চেয়ারে, দক্ষিণ-পশ্চিম জানালার সম্মুখে গঙ্গা দর্শন করিতেছেন। আর যুক্ত করে 'জয় গঙ্গে পতিত পাবনী মা গঙ্গে' বলিয়া প্রণাম করিতেছেন। খালি গা। আজ গরম বেশী বলিয়া তাঁহার ঘরের ও সংলগ্ন পূর্বদিকের 'মহারাজের' ঘরের সব জানালা দরজা সেবকগণ খুলিয়া দিয়াছেন। গঙ্গার শীতল বায়ু কখনও গৃহে প্রবেশ করিয়া যেন চামর দোলানোর মত শ্রীমহাপুরুষের গায়ে ব্যজন করিতেছে। তিনি বালকের মত আনন্দে এক একবার বলিতেছেন — আঃ, কি শীতল বায়ু! কি পবিত্র! এতে কেবল শরীর নয় — মন প্রাণ অন্তরাত্মা, সব শুদ্ধ হয়ে যায়!

মঠবাসী সাধুগণ প্রতিদিনের মত আসিতেছেন আর ভূমিষ্ঠ প্রণাম

করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন কুশলপ্রশ্নাদি অতি আনন্দে। এখন বিদ্যাপীঠের একজন সাধু আসিয়া প্রণাম করিতেই সহাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল আছ বাবা? গিছলে একদিন মাস্টারমশায়ের কাছে? কি বললেন তিনি, ভাল আছেন তো? পরপর এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর সাধু দিতেছেন। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন — আহা, ভাল থাকুন তিনি! ঠাকুরের লোক। কলির বেদব্যাস। 'চাপরাশ'-প্রাপ্ত লোক! ঠাকুর সঙ্গে করে এনেছেন, লোককে 'ভাগবত' শোনাতে। কত লোকের উপকার হচ্ছে। জগতের লোকের উপকার হচ্ছে তাঁর লেখা কথামৃতে। কত লোক সাধু হচ্ছে ঐ কথামৃত শুনে।

সাধুরা আসিতেছেন যাইতেছেন। এইবার কাশীর স্বামী হরানন্দ এবং মঠের কেহ কেহ বাহির হইয়া গেলেন।

আজ ১৭ই মে, ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ। ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ সাল, রবিবার।

পরের দিন সোমবার। গতকালের মত আজও সকাল ছয়টার সময় শ্রীমহাপুরুষ নিজ কক্ষে চেয়ারে বসিয়া আছেন দক্ষিণ-পশ্চিম জানালার সম্মুখে। গরম অতিরিক্ত। তাই গৃহের সব জানালা দরজা উন্মুক্ত। পূর্ব দিকের 'মহারাজের' (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) কক্ষেরও জানালা দরজা উন্মুক্ত। গঙ্গার শীতল বায়ু অবাধে প্রবাহিত। শ্রীমহাপুরুষ আনন্দময়, গরমে কষ্ট হইলেও। নগ্নদেহ। সাধুগণ আসিতেছেন, প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। কাহারও সঙ্গে সহাস্য প্রসন্ন বদনে দুই চারিটা কথা কহিতেছেন।

বিদ্যাপীঠের সাধু আসিয়া প্রণাম করিতেই আজও জিজ্ঞাসা করিলেন, গিছলে মাস্টার মশায়ের কাছে এক আধ দিন? দুই হাতে মোটাত্বের অভিনয় করিয়া বলিলেন, ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল? সাধু বলিলেন — কে শুকলাল বাবু? মহাপুরুষ আনন্দে জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ দেখা হয়েছিল? সাধু উত্তর করিলেন, আজ্ঞে হাঁ। ওখানেই মাস্টার মশায়ের কাছেই দেখা হয়েছিল। রোজ আসেন ওখানে বেলেঘাটা থেকে। মহাপুরুষ বিস্ময়ানন্দে উত্তর করিলেন — রোজ? এখানটা অনেক দূর। তাই আসতে পারে না অত। আবার মোটা মানুষ। এই সাধুর সঙ্গে অনেক পূর্বে শুকলাল রায় মঠে আসিতেন। তাই মনোবিজ্ঞানের Law of

Association (সঙ্গনীতি) অনুসারে সাধুকে দেখিলে শুকলালবাবুর কথা মনে পড়িয়া যায়।

রাত্রি নয়টা। শ্রীমহাপুরুষ নিজের পালঙ্কের উপর উপবিষ্ট। নৈশ আহার করিতেছেন। সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র টেবিল। তাহার উপর রহিয়াছে কাপ, সসার ও ন্যাপকিন। আহার অতি সামান্য — দুধ এক কাপ ও একটি সন্দেশ! সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন সেবক শৈলেশ ও মতি (স্বামী কৈলাসানন্দ ও শিবস্বরূপানন্দ)।

শরীর খুব রুগ্ন। কিন্তু আনন্দময় বালকের ভাব। চামচ দিয়া একটু একটু সন্দেশ ভাঙ্গিয়া লইতেছেন আর মুখে দিতেছেন। আর মাঝে মাঝে এক চামচ দুধ খাইতেছেন। আবার হাতে চামচ। অকারণ হাসিতেছেন। এটা বুঝি পরমহংসের হাসি! ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের ছোট খাটে বসিয়া এরূপ অকারণ আপন মনে হাসিতেন।

সাধু আনন্দ ঠাকুরঘরের দক্ষিণের বারান্দায় বসিয়া জপধ্যান করিতেছিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইতেই সম্মুখে দেখিলেন এই দেবদৃশ্য। মহাপুরুষ অকারণ নিজের মনে হাসিতেছেন, হাতে চামচ। আনন্দ ভাবিতেছেন, জগতে সুদুর্লভ এই বস্তু — ব্রহ্মদ্রষ্টা পরমহংস। আবার অবতারের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। কেবল শাস্ত্র পড়িয়া অথবা সাধন করিয়া ব্রহ্মদ্রষ্টা সম্বন্ধে ধারণা হয় না, চোখে না দেখিলে। মহাপুরুষের দেহে অত কষ্ট। কিন্তু মন ব্রহ্মলীন, আনন্দময় ধামে বিচরণ করিতেছে। এদিকে আবার দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ। দেহে আবদ্ধ, আবার অন্তরে মুক্ত — মহামায়া জগদম্বার এই বিচিত্র খেলা দেখিয়া বুঝি বাহ্য দৃষ্টিতে অকারণ এই পরমহংসের হাসি!

আজ ১৯শে মে, ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ নিজ কক্ষে বসিয়া আছেন, খাটের উপর পশ্চিমাস্য। শরীর খুব খারাপ। হাঁফানি বাড়িয়াছে। সারারাত্রি নিদ্রা নাই। এরই মধ্যে যথারীতি মঠবাসী সাধুগণের প্রণাম গ্রহণ করিতেছেন। রাত্রিতে অত কষ্ট, কিন্তু সকালে প্রণাম গ্রহণ করিবার সময় যেন কষ্ট নামমাত্র। বলেন, স্বামীজী আমাদের আচার্যের স্থলে অভিষিক্ত করে গেছেন। সকলকে দেখতে হয় তাঁর স্থলবর্তী হয়ে। কখনও বলেন, ঠাকুর কৃপা করে তাঁর শ্রীচরণে স্থান দিয়ে এখানে রেখেছেন তাঁর আশ্রিত সন্তানদের দেখাশুনা করতে, আশ্রমবাসী

সকলের সংবাদ নিতে। কখনও বা বলেন, আমি মঠবাসী সকলের দাস, সেবক। কখনও কেলোকে (কুকুরকে) দেখাইয়া বলেন, এটা এটার (নিজের) কুত্তা। আর এটা (নিজে) ওটার (ঠাকুরঘর দেখাইয়া) কুত্তা। কখনও বলেন, আমি এখানকার (মঠের) চৌকিদার।

শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এরই মধ্যে সকালে আচার্য ভাব! সাধুরা ঘরে আসিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। এখন সকাল পৌনে ছয়টা। একজন সাধু দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন গৃহে প্রবেশ করিবেন কি না। গৃহমধ্যে মহাপুরুষ কাশিতেছেন। মুখ দিয়া কফ নির্গত হইতেছে। আর রুমাল দিয়া নিজেই মুছিতেছেন। চোখে মুখে জল। কষ্ট অসহনীয়। কণ্ঠস্বর বিজড়িত। শৈলেশ ইঙ্গিতে গৃহে প্রবেশ করিতে বলিতেছেন। সাধু গৃহে প্রবেশ করিলেন। মহাপুরুষ মুখ তুলিয়া সাধুকে দেখিয়া বলিলেন কষ্টসূচক অস্পষ্ট স্বরে — এসো বাবা, প্রণাম করে যাও। ভাল আছ তো?

আজকাল মহাপুরুষের স্বভাব বালকবৎ অধীর। এই তুষ্ট, এই রুষ্ট। কিন্তু ভাববিপর্যয়ও চিত্তাকর্ষক আনন্দময় ও ব্রহ্মভাবোদ্দীপক।

সকাল ছয়টা। জ্যৈষ্ঠ মাস। একদল সাধু শ্রীমহাপুরুষের অনুমতি লইয়া দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ-রজঃস্পৃষ্ট স্থানগুলি দর্শন করিবেন, এই সংকল্প। এই দলের গাইড হইলেন একজন সাধু, যিনি পূজ্যপাদ শ্রীম-র সঙ্গে, অথবা তাঁহার নির্দেশে এইসকল পবিত্র তীর্থস্থল অনেকবার দর্শন করিয়াছেন।

সাধুরা খেয়া নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া পদব্রজে চলিয়াছেন উত্তর দিকে। এই দলে ছয়জন সাধু চলিয়াছেন। কাশী অদ্বৈতাশ্রমের স্বামী জগদানন্দ ও হরানন্দ। ঢাকা মঠের স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, বেলুড় মঠের স্বামী গোপালানন্দ আর দেওঘর বিদ্যাপীঠের স্বামী নিত্যাত্মানন্দ ও ব্রহ্মচারী সাধন চৈতন্য।

সাধুগণ প্রথম দর্শন করিলেন ঈশান কবিরাজের বাড়ি বরানগরে। ইনি শ্রীম-র ভগিনীপতি। ইঁহার বাড়িতে থাকিয়াই শ্রীম প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করেন। কবিরাজ মহাশয় ঠাকুরের চিকিৎসক। তারপর দর্শন করিলেন জয় মিত্রের গঙ্গারঘাট ও মণি মল্লিকের বাগানবাড়ি। এবার দর্শন করিলেন

নটবর পাঁজার তেলের কলের স্থান আলমবাজারে। নটবর ঠাকুরকে ভালবাসিতেন। বালক কালে তিনি অপরের গরু চরাইতেন। তখন কালীবাড়িতে ঠাকুরের কাছে বসিতেন। স্বহস্তে তামাক সাজিয়া ঠাকুরকে খাওয়াইতেন, আর নিজেও খাইতেন। পরে ঠাকুরের কৃপায় বড়লোক হন এবং তেলের কল করেন। রাস্তার উপরই শম্ভু মল্লিকের বাগানবাড়ি। ইনি ঠাকুরের দ্বিতীয় রসদদার। মথুরবাবুর শরীরত্যাগের পর ইনি ঠাকুরের সেবা করিতেন। ইনিই ঠাকুরকে বাইবেল শুনাইতেন। ইঁহার গৃহ হইতে অঞ্চলে আফিং বাঁধিয়া দিলে এই বাগানেই ঘুরিতে থাকেন ঠাকুর। তখন বলিলেন, 'এটা খুলে নেও।' খুলিয়া লইতেই শান্ত। কালীবাড়িতে গেলেন। পূর্ণ সন্ন্যাসের অবস্থা ছিল তখন। বাহিরে ও ভিতরে ত্যাগ, সম্পূর্ণ ত্যাগ! এবার দর্শন করিলেন যদু মল্লিকের বাগানবাড়ি। যদুবাবুর সখ্য ভাব ছিল। এখানে প্রায়ই মল্লিক মহাশয় আসিতেন। তখন ঠাকুরকে ডাকিয়া লইতেন। এই বাড়িতে বৈঠকখানায় ক্রাইস্টকে জীবন্ত দর্শন করিয়াছিলেন ঠাকুর। দেওয়ালে বিলম্বিত ক্রাইস্টের ছবি জ্যোতির্ময় রূপ ধারণ করিয়া ঠাকুরের দেহে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন। এবার সাধুগণ ফটকে প্রণাম করিয়া প্রবেশ করিলেন দক্ষিণেশ্বর তপোবনে, যেখানে ভবতারিণী কালী ত্রিশ বৎসর জ্যোতির্ময় দিব্যদেহে ঠাকুরের সঙ্গে অগণিত লীলাবিলাস করিয়াছিলেন। কখনও মা, রাম, কৃষ্ণ, শিব, কালী প্রভৃতি সাকার রূপে বিলাস করিতেন। কখনও নিরাকার নির্গুণ সচ্চিদানন্দরূপ অরূপে বিলাস করিতেন।

মাতা ভবতারিণী, রাধাকান্ত ও ঠাকুরের বাসগৃহ এবং শিবমন্দিরে প্রণাম করিয়া সাধুগণ মায়ের বাসস্থান ন'বত, পঞ্চবটি ও বটতলা কুঠি এবং বেলতলা প্রভৃতি স্থান দর্শন ও প্রণাম করিয়া ঠাকুরের সাধনস্থল সিদ্ধপীঠ বটতলায় বসিয়া ধ্যান করিলেন। তন্ত্রসাধনের সিদ্ধপীঠ বেলতলায়ও ধ্যান করিলেন।

সাধুগণ রামলাল দাদাকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি মা ভবতারিণীর প্রধান সেবক ও ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র। দাদা সাধুগণকে দেখিয়া পরম আত্মীয়ের মত তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন হর্ষানন্দে। কুশলপ্রশ্নাদির পর ঠাকুরের লীলামৃত

সম্বন্ধে কথোপকথন হইতে লাগিল।

সাধুগণ — দাদা, আমাদের ঠাকুরের সম্পর্কে কিছু শোনান।

দাদা — ঠাকুর ছিলেন সময়ে দিনরাত কাজ করতুম তাঁর আজ্ঞায়। কালীঘর ও বিষ্ণুঘরের পূজা, ঠাকুর ও ভক্তদের সেবা। তাঁদের বাসস্থান ও আহারের ব্যবস্থা। শৌচাদির স্থাননির্দেশ। নৃত্যগীত রঙ্গরসাদির অভিনয়, কত কি! অত পরিশ্রম দিনরাত্রি, কিন্তু কষ্টবোধ মোটেই হতো না। তাঁর সান্নিধ্যে সকলের মন যেন সদা আনন্দসাগরে ভাসমান থাকতো। কি আনন্দময় পুরুষ যে তিনি ছিলেন, তা তো ভাই সব বর্ণনা করতে পারবো না! আমার সে ভাষা নেই। কিন্তু হৃদয় এখনও পরিপূর্ণ হয়ে যায় সেই আনন্দে, স্মৃতিমাত্রেই! কেবল আমারই নয়, সকলেরই — যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে আসতেন, এরূপ আনন্দময় ভাব হতো। এ সবই তাঁর উপস্থিতিতে। তিনি নিজে আনন্দময়, তাই ওখানে সদানন্দের হাট।

একজন সাধু — আচ্ছা দাদা, ঠাকুরের নিত্যসেবা কি করতেন?

দাদা — সব কথা তো অনন্ত। তবে মোটামুটি দু'চারটে বলছি। ঠাকুরকে প্রসাদ খাইয়ে তামাক সেজে দিতাম। তারপর খেতে যেতাম। ফিরে এসে দেখতাম তামাক খেয়ে ঠাকুর হুঁকো ঠিকস্থানে রেখে দিয়েছেন। কখনও আহারের পর পায়ে হাত বুলাতে হতো। হাত বুলোচ্ছি, কিছুক্ষণ পর ঠাকুর পা তুলে নিয়ে বলতেন, 'যা যা, তুই একটু গড়াগে যা।' শরীর থেকে আলস্য তুলে নিয়ে গিছলেন ঠাকুর। দিনরাত খাটুনি, অনবরত খাটুনি, কিন্তু বিন্দুমাত্র ক্লান্তিবোধ নাই। এখন বেশ বুঝতে পারছি আমার শক্তিতে কাজ করি নাই। তাঁর শক্তিতে এই শরীরে কাজ করেছি।

সাধু — দাদা, এখন আপনার বয়স কত? ঠাকুরের সময় কত ছিল?

দাদা — এখন বাহাত্তর তিয়াত্তর। তখন ছিলাম আঠার উনিশ বছরের ছোকরা।

সাধু — কয় বছর সেবার সুযোগ পেয়েছিলেন?

দাদা — প্রায় বছর পনের।

সাধু — রাণী রাসমণি ও মথুরবাবুকে দর্শন করেছিলেন কি?

দাদা — না। এক দেড় বছর হয় তাঁরা দেহ রেখেছেন, তখন যাই। জগদম্বা, দ্বারকা ও ত্রৈলোক্যকে, (মথুরের পত্নী ও পুত্রদ্বয়) এঁদের

দেখেছি।

সাধু — ঠাকুরের সঙ্গে আপনার কথাবার্তা কি কিছু মনে আছে?

দাদা — হাঁ। কখন বলতাম আপনার স্বরূপ দেখিয়ে আবার ঢেকে ফেলেন কেন? সর্বদাই ঐ ভাব থাকুক না! ঠাকুর হেসে বলতেন, 'তাহলে আমার হাগার জল দেবে কে? তুইও এমনি (ভাবস্থ) হয়ে থাকবি।' আবার কখনও বলতেন, 'কি করবি তুই আর? এখানকার সেবা করছিস্, ভক্তদের সেবা করছিস্। এমন মা ভবতারিণী — সাক্ষাৎ চিন্ময়ী চৈতন্যময়ী মা রয়েছেন, তাঁর সেবা করছিস্, আর কি চাস্?' এইসব কথা হতো।

সাধু — এই বাড়িতে মা-ঠাকরুণ এসেছিলেন কি?

দাদা — হাঁ। তখন বাড়ি শেষ হয়েছে মাত্র — সব অপরিষ্কার। তাতেই আসেন। যোগীন মা, গোলাপ মা, মাস্টার মশায়ের স্ত্রী, শরৎ মহারাজ ও মাস্টার মশায় — মাকে অগ্রগামিনী করে ঢোকেন। আমি পিছু পিছু ঢুকলুম্।

লক্ষ্মী বলতো — দাদা, ভগবান এখানে আমাদের দু'টি জিনিস দিয়েছেন — মা গঙ্গা আর মা কালীর ধ্বজাদর্শন। এখানকার মধ্যে এ দু'টিই সার। কলিতে সর্বপাপনাশিনী গঙ্গা। তা, আমাদের দর্শন হয় দোতলার ছাদ থেকে।

সাধুগণ দাদাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। এখন বেলা সাড়ে আটটা। যে পথে গিয়াছিলেন সেইপথেই তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন কুঠিঘাটে। খেয়ায় গঙ্গা পার হইয়া মঠাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন সাড়ে এগারটায়।

৩

২৩শে মে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার।

পাঁচদিন শ্রীম-র পদচ্ছায়ায় বাস করিয়া অন্তেবাসী বেলা দশটায় বেলুড় মঠে ফিরিয়াছেন।

এখন রাত্রি নয়টা। একজন সাধু ঠাকুরঘরের পূর্ব বারান্দায় বসিয়া ধ্যানজপ করিয়াছেন। এখন তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সম্মুখে এক অপরূপ দৃশ্য দেখিলেন তিনি। ঠাকুরঘরের পূর্বদিকে মঠভবনের উত্তর-

পশ্চিম অঞ্চলে শ্রীমহাপুরুষের বাসগৃহ। মহাপুরুষ নিজের পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া সেবকদের সাহায্যে মেঝেতে দাঁড়াইয়া আছেন। দিগম্বর শিশু — পরমহংস-মূর্তি, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ! গলদেশে কবচসংযুক্ত ঘুন্‌সি ঝুলিতেছে।

২৪শে মে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার।

সকাল ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ পালঙ্কোপরি উপবিষ্ট একা, উত্তরাস্য। মেরুদণ্ড কিঞ্চিৎ বাঁকিয়া গিয়াছে, বয়স ও রোগের প্রতিক্রিয়ায়। একজন সাধু দক্ষিণ দিকের দরজায় দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন। উদ্দেশ্য প্রণাম করা। সেবক শংকর ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন — কে দাঁড়িয়ে? শংকর উত্তর করিলেন, জগবন্ধু। এই সুযোগে ইনি গিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। অত কষ্টেও করুণামাখা স্বরে বলিলেন — ও জগবন্ধু, জগবন্ধু ভাল আছ? কথা অস্পষ্ট ও বিজড়িত। কথা মাত্র দুইটি। কিন্তু করুণায় সিঞ্জিত। এইটিই বুঝি চিহ্ন পরমহংস বিদেহী মহাপুরুষদের! তাঁহাদের অন্তরাত্মা দেহজ্ঞানের বহু উর্ধ্বে। মন বুদ্ধি উহাতে নিমজ্জিত প্রায় সবটা। অল্পমাত্র দেহে।

২৫শে মে, ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার।

বেলুড় মঠ। সকাল ছয়টা। গরম চলিতেছে। শ্রীমহাপুরুষ নিজের খাটে বসিয়া আছেন। সেবক শংকর ও শৈলেশ খাটের উত্তর দিকে দাঁড়াইয়া আছেন। ঢাকার হেম মহারাজ ও মঠের নীলকণ্ঠ মহারাজ টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া। সাধুগণ প্রণাম করিতেছেন, আর মঠের কাজে চলিয়া যাইতেছেন। ইহাতেই সাধুগণের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছে। একজন সাধু ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, কে রে? সাধু মাথা তুলিতেই হাসিতেছেন।

সাধুও হাসিতেছেন। সেবকদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, লোক ভাল। বি.এ, বি.এল, পড়েছে। মনে মনে হাসিতেছেন আর প্রসন্নভাবে কি বলিতেছেন। কথা অস্পষ্ট, কেহ বুঝিতে পারে না। আজকাল কথা মুখ দিয়া সব বাহির হয় না। কতক কথা অস্পষ্ট, আর কিছু কথা নিজে নিজে বিড়বিড় করিয়া বলেন। যাহা বলিতে চান, তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না। বালকের স্বভাব। কিন্তু মুখমণ্ডলের দিব্য ছবি অন্তরের

সরস করুণাময় ভাব প্রকাশ করে।

১লা জুন ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার।

বেলুড় মঠ। সকাল সওয়া ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষের গৃহের সম্মুখে একজন সাধু দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি পরমহংসমূর্তি দর্শন করিতেছেন। আজ মহাপুরুষের শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল। তিনি চেয়ারে বসিয়া আছেন দক্ষিণাস্য, নগ্নদেহ আর গলায় ঘুনসীতে কবচ বাঁধা। তাঁহার পিছনে আলমারী আর ডান হাতে পাথরের টেবিল। টেবিলের উপর কথামৃত সাজান রহিয়াছে।

মঠবাসী সাধুগণ আসিতেছেন আর প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। মহাপুরুষ সকলকেই কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ভাল আছ? প্রসন্ন ভাব — আনন্দময় বালক। এইবার উঠিয়া গিয়া বিছানায় বসিলেন পশ্চিমাস্য। একজন সাধু প্রণাম করিতেছেন ভূমিষ্ঠ হইয়া। মুখ তুলিলে তিনি বলিলেন — ভাল আছিস? আর অভয় মুদ্রায় হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিতেছেন।

স্বামী ব্রজেশ্বরানন্দ সম্মুখে দাঁড়ান। তাঁহাকে বলিতেছেন, লিচু আম সব নিয়ে যাও। কল্যাণেশ্বরকে পূজো দাও। হাঁ, খুব ভাল করে পূজো দাও। ঐ আসল। হাঁ, লিচু বেশী করে নিয়ে যাও। মুজঃফরপুরের লিচু। হাঁ, ন্যাও — বেশী করে ন্যাও। ভাবে গদগদ শ্রীমহাপুরুষ।

ঠাকুর-ভাণ্ডারের সেবক গঙ্গাচরণের প্রবেশ। তাহাকে দেখিয়া প্রসন্নভাবে বলিলেন, এই এক বুড়ো — এমন করে থাকে (হাস্য)। গঙ্গাচরণ স্পষ্টবাদী, কথায় পরিপক্ক। ভক্তিমান লোক।

এখন রাত্রি নয়টা। একজন সাধু আরতির পর ঠাকুরঘরের দক্ষিণের বারান্দায় জপধ্যান করিতেছেন পশ্চিমের দরজার কাছে, উত্তরাস্য। রাত্রির ভোগ উঠিয়াছে, দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

সাধু উঠিয়া আসিয়া পূর্ব বারান্দায় দাঁড়াইলেন জানালার কাছে। সম্মুখে মঠভবন। তাহার উত্তর-পশ্চিম কোণে মহাপুরুষ মহারাজের গৃহ। তাহার পর গঙ্গা। সাধু মহাপুরুষকে দর্শন করিতেছেন।

মহাপুরুষ আহার করিতে বসিয়াছেন খাটে, পশ্চিমাস্য। আহার্য অতি সামান্য। সামনে একটি ছোট টেবিলে শুভ্র বস্ত্রে আবৃত। তাহার উপর এক

কাপ মনাক্কামিশ্রিত দুধ সসারের উপর। আর একটি চামচ। কখনও চামচ দিয়া দুধ তুলিয়া মুখে দিতেছেন। কখনও বা কাপ তুলিয়া চুমুক দিয়া খাইতেছেন। কখনও মুখ হইতে মনাক্কার বীচি চামচ দিয়া ফেলিতেছেন সসারে।

আজ কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথি। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, প্রায় পূর্ণ। এখন মঠভবনের ঠিক উপরে। মাঝে মাঝে মেঘের দুই একটা টুকরা চাঁদকে ঢাকিতেছে, আবার মুক্ত করিতেছে। কৃষ্ণ মেঘের রসক্রীড়া চলিতেছে শুভ্র চন্দ্রিমার সঙ্গে। মনোহর দৃশ্য। মঠভবনের সংলগ্ন পশ্চিম দিকে একটি আম্রবৃক্ষ। ইহার ছায়াতলে 'স্বামীজী', 'মহারাজ', বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতি মঠবৃদ্ধগণ সর্বদা বসিতেন। বৃক্ষটি যেন একটি জীবন্ত জীব। কর্মবশে এই বৃক্ষ-শরীর ধারণ করিয়া আছে বেদের সিদ্ধান্ত অনুসারে — 'স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্' (কঠোপনিষৎ ৫:৭) — ভাগবতের যমলার্জুনের ন্যায়। এবার ইহার বিমুক্তি নিশ্চয়। তাই তো এই আম্রবৃক্ষ এই মুক্তক্ষেত্রে অবস্থিত। এই পুণ্যভূমি অবতার ও পার্ষদগণের চরণরজঃসমৃদ্ধ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের দ্বারা অধ্যুষিত। তাঁহাদের পবিত্র স্পর্শ ও সপ্রেম দিব্যদৃষ্টি উহার উপর নিপতিত। ধন্য বৃক্ষ! এই বৃক্ষের ঘন পত্রাচ্ছাদিত একটি শাখা যেন মস্তকোত্তোলন করিয়া উপরে উঠিয়া তাহার বিমুক্তির সংবাদ চন্দ্রমাকে আনন্দে জ্ঞাপন করিতেছে। আনন্দধাম এই বেলুড় মঠ!

এই আনন্দময় ধামে আনন্দমূর্তি শ্রীমহাপুরুষকে দর্শন করিতেছেন একটি সাধু ঠাকুরঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া। গৃহে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে। সেবক মতি কখনও হাতপাখায় বাতাস করিতেছেন মহাপুরুষকে। কখনও দক্ষিণ-পশ্চিম জানালায় দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন হাওয়া চলিতেছে কিনা, শ্রীমহাপুরুষের অনুজ্ঞায়।

গৃহের উত্তর পশ্চিমের জানালার একটি পাট ভেজান রহিয়াছে। জানালার উপরে একটি ছোট পর্দা গুটান রহিয়াছে।

শ্রীমহাপুরুষের খাটে মশারী খাটান হইয়াছে। কিন্তু তাহা উপরে খাটদণ্ডে তুলিয়া রাখা হইয়াছে। খাট উত্তর-দক্ষিণ লম্বমান — গৃহের পূর্ব দেয়াল ঘেঁষা। খাটের পাশে পূর্ব দেয়ালে মাতা মেরীর একটি বাঁধান ছবি

দেখা যাইতেছে। আর স্বামী ব্রহ্মানন্দের গৃহের পশ্চিম দরজার উপর পূর্ব-দক্ষিণ কোণের দিকে ভগবান বিষ্ণুর ছবি দেয়ালে লম্বমান।

ঠাকুর মন্দিরে ঠাকুর আহার করিতেছেন, সুজির পায়েস ও লুচি। ইহাই ঠাকুরের রাত্রির আহার। সব দরজা বন্ধ। পূজারী দক্ষিণ বারান্দায় পায়চারী করিতেছেন আর উত্তরীয়ের ভিতর বক্ষস্থলে জপমালায় ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন। মঠ-আঙ্গিনার পূর্ব দিকে মা গঙ্গা আনন্দে প্রবাহিতা। সব নীরব ও নিস্তব্ধ। এক অপূর্ব প্রাণস্পর্শী বাতাবরণ! এক দিব্য প্রশান্ত গম্ভীর ভাব!

সেবক গঙ্গাচরণ ঠাকুরের জন্য সুগন্ধ তাম্রকূট লইয়া আসিয়াছেন। পূজারী দরজা খুলিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আর তাম্রকূট নিবেদন করিলেন। দরজা পুনরায় বন্ধ। মন্দিরের চারিদিকে মৃদু অন্ধকার। বাহিরে চাঁদের আলো। গঙ্গার জলে চন্দ্রকিরণ পড়িয়াছে। জল গলিত রৌপ্যের ন্যায় ঝকমক করিতেছে। অল্পক্ষণ মধ্যে মন্দিরের পূর্ব দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বারান্দা আলোকিত হইল।

নিম্নে অঙ্গনে স্বামী জগদানন্দ দাঁড়াইয়া আছে। তিনি এক একবার ঠাকুরমন্দিরে, এক একবার শ্রীমহাপুরুষের গৃহে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। এইবার তিনি মঠভবনের পশ্চিমের চায়ের বারান্দা দিয়া পূর্ব দিকের গঙ্গার বারান্দায় চলিয়া গেলেন।

ঠাকুরমন্দিরের পূর্ববারান্দায় দাঁড়াইয়া একটি সাধু আনন্দে ভাবিতেছেন, এখানে আহার করিতেছেন ভগবান ঠাকুর, আর ওখানে আহার করিতেছেন তাঁহার প্রিয় সন্তান, সিদ্ধ পরমহংস বালক শ্রীমহাপুরুষ।

সাধু আবার ভাবিতেছেন, যথার্থ শান্তিসুখ পাইতে হইলে মানুষকে নিজের অহংকারটাকে কাহারও পায়ে নমিত করিতে হইবে। যতদিন শরীর শক্ত থাকে ততদিন সাধক 'আমি আত্মা' 'আমি ব্রহ্ম' — এই ভাব নিয়া জন্মগত বহির্মুখী সংস্কারের সঙ্গে সংগ্রাম করে। যখন শরীর বৃদ্ধ ও অবসন্ন হয় তখন ভক্তের ভাবে ভগবানের মহামায়ার শরণাপন্ন হয়। ভগবানের বিগ্রহে, ছবিতে ভগবানের আবির্ভাব ভাবিয়া তাঁহার কাছেও শরণাগত হয়, মাথা নিচু করে। ভগবানের চরণে মস্তক নমিত করিলে, দুঃখ কষ্ট নিবেদন করিলেই শান্তি। ঠাকুর নিজমুখে বলিয়াছেন, 'আমার চিন্তা কর, আমায়

ধর, আমি সব করে দেব।' 'কর্তা সাজ, শান্তি পাবে না। শরণাগতিতে শান্তি।'

শান্তির সকল প্রকার আয়োজন মঠে বেশ বিদ্যমান। ঠাকুর-মা-স্বামীজী যেন জীবন্ত রহিয়াছেন। শ্রীমহাপুরুষ ও ঠাকুরের অন্য পার্ষদ কেহ কেহ সশরীরে রহিয়াছেন। পাশে মা গঙ্গা। আর অতগুলি উচ্চকোটি সাধক সাধু রহিয়াছেন। সবই উদ্দীপক।

দেওঘর বিদ্যাপীঠে এসবের অভাব। তবে বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরে জমাটবাঁধা শান্তি রহিয়াছে। কিন্তু মঠে ঠাকুর নিজের কথায় নিজে বাঁধা। স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন, 'আমায় মাথায় করে যেখানে বসাবে সেখানে থাকবো।' আর অগণিত সাধু ভক্তের শ্রদ্ধাভক্তিতেও ঠাকুর বাঁধা। সাক্ষাৎ জীবন্ত দেবমানবে, ছবিতে বা প্রতিমাতে ভক্তিভরে ব্যাকুল প্রাণে মস্তক নত করিলেই শান্তি। এটাই সহজ পথ।

দেবমানব শ্রীমহাপুরুষকে ও মঠের দিব্যদৃশ্য দর্শন করিতে করিতে, আর এই সকল দিব্যভাবনা মনে ভাবিতে ভাবিতে সাধু মন্দির হইতে অবতরণ করিলেন ও গঙ্গার বারান্দায় গিয়া বেঞ্চিতে বসিয়া রহিলেন।

সম্মুখে পতিত পাবনী গঙ্গা। চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিতা। প্রেমাস্পদমিলনে আনন্দচঞ্চলা।

৩রা জুন ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার।

বেলুড় মঠ। সকাল সওয়া ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ নিজের খাটে বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। সাধুরা আসিতেছেন আর প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। সকলেরই কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কাহারও সঙ্গে রঙ্গরস করিতেছেন। এখন স্বামী ওঁকারানন্দ গৃহে প্রবেশ করিলেন। তারপর মালাবারের বালকৃষ্ণণ। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি.এ. পাশ করার পর তাহার মাতা তাহাকে মঠে লইয়া আসেন এবং শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পায়ে সমর্পণ করেন এই বলিয়া — 'এটি আমার বৃক্ষের প্রথম ফল। শ্রীগুরু মহারাজের (ঠাকুরের) সেবায় সমর্পণ করিলাম।' আহা, কিরূপ দেবী মা! কোন মা কাঁদেন ছেলে সাধু হইলে। আর এই মা পরমানন্দে পুত্রকে শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ করিলেন। বালকৃষ্ণণ শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিয়া উঠিল। তাহার সহিত তিনি রঙ্গরস

করিতেছেন। বলিলেন, ‘পের এন্না’ (কি নাম তোমার)? (হাস্য)।

শ্রীম — মঠ যেন জীবন্ত নাট্যশালা! নটরাজ হলেন ঠাকুর, অবতার। তাই মঠের সব সংবাদ দেবত্বের সংবাদ। সর্বস্ব ছেড়ে সাধুরা অবতারের আশ্রয় নিয়েছেন। মঠের ধূলিকণা পবিত্র।

শরণাগতি কাকে বলে মহাপুরুষের জীবন দেখলে বোঝা যায়। অত অসুখ কিন্তু কর্মের বিরাম নাই। সকলের কল্যাণ চিন্তা করছেন। রোগ যন্ত্রণায় সারারাত নিদ্রা নাই। কিন্তু এরই মধ্যে সকালে বসে সাধুদের স্নেহাশিস্ বিতরণ করছেন। সকলের সংবাদ নিচ্ছেন। আবার নিষ্কাম কর্মের দৃষ্টান্তও মহাপুরুষ। শরীর যায় যাক্, তবুও ঠাকুরের নাম প্রচার করছেন। অত বড় সঙ্ঘ, তার মঙ্গল চিন্তা করছেন। এই সবই ঠাকুর আসায় দেখা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে।

ঠাকুরবাড়ি। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা।
৯ই জুন ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার।

বিংশ অধ্যায়

পরীক্ষা

১

মর্টন স্কুল। পঞ্চাশ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীট। অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটা। গ্রীষ্মকাল; বেশ গরম। আজ যেন গুমোট গরম। অন্তেবাসী বেলুড় মঠ হইতে আসিয়াছেন। শ্রীম নিজকক্ষে অর্গলবদ্ধ হইয়া বিশ্রাম করিতেছেন।

আজ ১৮ই জুন ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ। ৩রা আষাঢ় ১৩৩৮ সাল, বৃহস্পতিবার।

শ্রীম সাড়ে ছয়টায় ছাদে আসিলেন। একজন সাধু ও কয়েকজন ভক্ত বসা। সকলে উঠিয়া শ্রীমকে অভিবাদন করিলেন যুক্ত করে। শ্রীম ঘর হইতে বাহির হইয়া যুক্ত করে 'নমস্কার, নমস্কার' বলিতে বলিতে ছাদে আসিলেন। আপনারা একটু বসুন, এই বলিয়া পুনরায় তিনতলায় নামিতেছেন। হাত মুখ ধুইয়া ছাদে উঠিলেন সাতটায়!

শ্রীম আবার গৃহে প্রবেশ করিতেছেন। পূর্ণেন্দু আগে আগে লণ্ঠন লইয়া যাইতেছেন। ঘরের দেওয়ালে বিলম্বিত দেবদেবীর ছবিকে আলো দেখাইতেছেন পূর্ণেন্দু। আর শ্রীম যুক্ত করে একে একে সকলকে নমস্কার করিতেছেন। দেওয়ালের গায়ে একটি খোল টাঙ্গানো আছে। শ্রীম উভয় হস্তে তাহাতে মৃদু চাঁটি দিতেছেন।

এবার ছাদের উত্তর প্রান্তে পুষ্পকাননে তুলসী তলায় প্রণাম করিয়া একটি আসনে উত্তরাস্য বসিলেন। ধ্যান করিতেছেন। শ্রীম-র পশ্চাতে বসিয়া আছেন একটি সাধু। তিনি আপন মনে ভাবিতেছেন, কাল আমি চলিয়া যাইব দেওঘর বিদ্যাপীঠে। আহা, আজ কি সৌভাগ্য আমার, ঠাকুর! আপনার স্বহস্তে নির্মিত একজন বিশেষ পার্ষদ আমার সম্মুখে বসিয়া আছেন! তিনি অতি প্রবীণ, পূজনীয় ও প্রিয়।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দুই এক বিন্দু বারিপাত হইতেছে। সাধু উঠিয়া

গিয়া শ্রীম-র ঘর হইতে ছাতা লইয়া আসিলেন। খানিকপর শ্রীম উঠিয়া গিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিলেন চেয়ারে, দরজার পাশে দক্ষিণাস্য। ইতিমধ্যে অনেকগুলি ভক্ত আসিয়া জুটিয়াছেন। স্বামী রাঘবানন্দ ও স্বামী ধীরাত্মানন্দও আসিয়াছেন। মহীশূরের ভক্ত শ্রীমুদালিয়ার আজও আসিয়াছেন।

অন্তেবাসী শ্রীমকে মহাপুরুষ মহারাজের ডায়েরী শুনাইতেছেন।

১০ই জুন ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার।

বেলুড় মঠ। গ্রীষ্মকাল। সকাল ছয়টা বিশ। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের গৃহ। মহাপুরুষ খাটে বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। একটি সাধু গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়াছেন। শ্রীমহাপুরুষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন — ভাল? (কথা জড়াইয়া যায় — অস্পষ্ট) এই কয়দিন কোথায় ছিলে? ততক্ষণ সাধু দরজার নিকট আসিয়াছেন। তিনি খাটের নিকট পুনরায় আসিয়া উত্তর করিলেন — কলকাতায়, স্টুডেন্টস্ হোমে দু'দিন—। বাকী কথা শেষ হইবার পূর্বেই শ্রীমহাপুরুষ উত্তর করিলেন, বেশ বেশ! কথামাত্র দুইটি, কিন্তু নিবিড় করুণামাখা। শ্রোতার মনপ্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ। গৃহে মাতাপিতার স্নেহমাখা কথায়ও এই দৈবী করুণা ও অভয় স্পর্শের অভাব।

১১ই জুন ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার।

বেলুড় মঠ। শ্রীমহাপুরুষের গৃহ। সকাল পৌনে ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ পশ্চিম-দক্ষিণ জানালার কাছে চেয়ারে বসিয়া আছেন পূর্বাস্য। 'মহারাজের' ঘরের দুইটি দরজা খোলা। তিনি গঙ্গা দর্শন করিতেছেন। পা দুইখানি অল্প স্ফীত, কার্পেটের উপর স্থাপিত। বাহ্য চক্ষু দুইটি মা গঙ্গার উপর নিক্ষিপ্ত। কিন্তু অন্তর্চক্ষু বুঝি ব্রহ্মলীন। মুখমণ্ডল দিব্য রশ্মিতে মণ্ডিত। একটি সাধু দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া মহাপুরুষের আননে প্রতিফলিত দৃশ্য ও অদৃশ্য, জগৎ ও ব্রহ্মের একত্র সংযোগ একই সময়ে একই আধারে বিস্মিত হইয়া দর্শন করিতেছেন। সাধু ভাবিতেছেন, এই তো ব্রহ্মদর্শন! আমরা সত্যই মহা ভাগ্যবান। অবতার আসায় এই দুর্লভ দৃশ্য অতি সহজে অনায়াসে দর্শন হইতেছে।

একজন সাধু প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। গৃহে কেহ নাই। কিন্তু

মহাপুরুষের এই দিব্যভাব দেখিয়া তিনি উহা উপভোগ করিতেছেন। একজন সেবক গৃহে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি বলিলেন — আসুন প্রণাম করে যান। তাঁহার এই কথায় মহাপুরুষের উন্মনা সমাধি ভঙ্গ হইল। সাধু গৃহে প্রবেশ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষ বলিলেন — জগবন্ধু, ভাল আছ? হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় গিছলে এই কয় দিন? গতকালও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সাধু উত্তর করিলেন, কলকাতায় অদ্বৈতাশ্রমে ও স্টুডেন্টস্ হোমে। উনি আজও বলিলেন, বেশ বেশ, ভাল।

সাধু বলিলেন, পুরী থেকে শশী ব্রহ্মচারী পত্রে আপনাকে প্রণাম জানিয়েছেন। শ্রীমহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন — ভাল আছে তো, বেশ বেশ। অনেক ভুগেছে। আমি বলেছি, পুরীতেই থাক, শরীর ভাল থাকুক বা খারাপ থাকুক। জগন্নাথের ধ্যান করতে করতে শরীর যায় যাবে। পুরীতেই থাক। সাধু বলিলেন, আমাকেও আপনার এই আদেশের কথা লিখেছিলেন। মহাপুরুষ আবার বলিলেন, হাঁ, পুরীতেই থাক্ — শরীর যায় যাবে, থাকে থাক্।

১৬ই জুন ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার।

বেলুড় মঠ। আজ মহাপুরুষ মহারাজের শরীর বিশেষ অসুস্থ, সকালে সাধুগণ প্রণাম করিতে আসেন নাই। বেলা সাড়ে এগারটা। এখন একটু ভাল বোধ করিতেছেন। তাই সেবক রাখালের (স্বামী বৈরাগ্যানন্দের) সাহায্যে বিছানা হইতে উঠিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম জানালার কাছে দাঁড়াইয়া শ্রীমহাপুরুষ বাহিরের সব দৃশ্য দর্শন করিতেছেন। মুখমণ্ডল উজ্জ্বল। শরীর অসমর্থ, কিন্তু মন জাগ্রত। মুখমণ্ডল ব্রহ্মদর্শনের আভায় উদ্ভাসিত।

একজন সাধু ঠাকুরঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া এই দেবদৃশ্য দর্শন করিতেছেন। ভাবিতেছেন, শ্রীমহাপুরুষ কি সর্বভূতে শ্রীভগবানকে দর্শন করিতেছেন?

আজ পায়েস ভোগ হইবে। তাই ঠাকুরের মধ্যাহ্ন ভোজন একটু দেরীতে হইবে।

১৭ই জুন ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ। ২রা আষাঢ় ১৩৩৮, বুধবার।

বেলুড় মঠ। সকাল ছয়টা। মহাপুরুষের ঘর। শ্রীমহাপুরুষ খাটে বসিয়া

আছেন পশ্চিমাস্য। সাধুগণ আসিতেছেন আর প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। খুব গরম, তাই মহাপুরুষের শরীর নগ্ন।

একটি সাধু প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষ বলিলেন, ভাল আছ? সাধুর বুক পকেট হইতে একটি ব্রাস পড়িয়া গেল মেঝেতে। সাধু উহা উঠাইয়া লইয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলেন। মহাপুরুষের সেবক স্বামী গঙ্গেশানন্দ গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীমহাপুরুষ তাঁহার সহিত রঙ্গরস করিতেছেন। বলিলেন, হেগে এলে, হাগা হয়েছে — বৃষ্টিতে? (উচ্চহাস্য)

শ্রীম-র কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিশোরী গুপ্ত দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত। শেষ বয়সে এক বাড়িতে একলা থাকিতেন তপস্যার ভাবে। সেইস্থানেই দেহ যায়। তখন কাছে কেহ উপস্থিত ছিল না। কোন ব্যাধিও ছিল না।

অন্তেবাসী শ্রীখোকামহারাজকে এই সংবাদ বলিলেন। খোকা মহারাজ ও কিশোরীবাবু সমবয়সী এবং প্রতিবেশী। প্রথমে বাল্যবন্ধু পরে গুরুভাই। খোকামহারাজ শুনিয়া খুব দুঃখ প্রকাশ করিলেন। আর মহাপুরুষ মহারাজকে জানাইবেন বলিলেন।

আরও বলিলেন, ঠাকুর ভালবাসতেন তাঁকে। ঠাকুর যাদের দীক্ষা দিতেন তাদের জিভে আঙ্গুল দিয়ে লিখে দিতেন বীজমন্ত্র। পল্টু, চুনী, কিশোরী গুপ্ত, কিশোরী রায়, মাস্টার মশায় — এদের সকলের জিভে লিখে দিয়েছিলেন। ভক্তদের — মহিলাদের ভিতর অন্য কারো নয় কেবল মা ঠাকরুনের জিভে লিখে দিয়েছিলেন।

(প্রশ্নের উত্তরে) তুলসী মহারাজ স্বামীজীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। বলরামবাবুর বাড়ির কাছে ওঁদের বাড়ি ছিল। ওখানে ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন। অনেকেই চলে যাচ্ছেন। আমরা দুই বুড়ো এখানে পড়ে আছি এখনও। যাও, এখনই মহাপুরুষকে গিয়ে বল।

শ্রীমহাপুরুষকে বলিলে তিনিও প্রচুর দুঃখ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, একে একে সবাই চলে যাচ্ছেন — যাঁরা ঠাকুরের ভালবাসা পেয়েছিলেন।

ঠাকুরই সত্য আর সব অনিত্য। এ দেহও যাবে। কিশোরীবাবু অনেক বুড়ো হয়েছিলেন। আমাদের সকলেরই আলাপ পরিচয় ওখানেই ঠাকুরের

কাছে। ধন্য কিশোরীবাবু! তিনি ঠাকুরের স্নেহ কৃপা পেয়েছিলেন।

ডায়েরী পাঠ শেষ হইল। শ্রীম বলিলেন, এসব পরে ইতিহাসে স্থান পাবে। শ্রীম কিছুকাল নীরব রহিলেন। শ্রীম-র কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিশোরীবাবুর জন্য নূতন করিয়া শোক হইল বুঝি!

স্বামী ধীরাত্মানন্দ অদ্বৈতাশ্রম হইতে আসিয়াছেন। সেখানে কর্ম করেন। শ্রীমকে ঠাকুরের একটি নূতন ফটো উপহার দিলেন। শ্রীম ফটো মাথায় ঠেকাইয়া আনন্দে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — এ ছবিটি খুব ভাল হয়েছে, একেবারে ঠিক। একটি চক্ষু অর্ধনিমীলিত — সমাধির লক্ষণ।

অন্তেবাসী (শ্রীম-র প্রতি) — কোন্ সালে তোলা হয় এটি?

শ্রীম — সম্ভবতঃ এইটিন-এইটিটুতে। শিব মন্দিরের সিঁড়ির উপর ঠাকুর বসা। ভবনাথ এনেছিলেন একজন ফটোগ্রাফার।

স্বামী ধীরাত্মানন্দ — কাশীর প্রমদা মিত্র দিয়েছেন এই ছবিখানা। স্বামীজী তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন এ'খানা।

শ্রীম পূর্ণেন্দুর হাতে ছবিখানা দিলেন বাঁধাইতে। একজন নবাগত ভক্ত উহার দাম প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিয়া রসভঙ্গ করিতেছেন। অন্তেবাসী দৃঢ় স্বরে বলিলেন, অদ্বৈতাশ্রম থেকে এ সব জেনে নেবেন।

মুদালিয়ার শ্রীমকে কতকগুলি আপেল উপহার দিলেন।

শ্রীম এইগুলি ঠাকুরের সেবার জন্য ঠাকুরবাড়ি পাঠাইবেন। তিনি ভক্তদের সকলের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। একজন ভক্ত বেশ মোটা। তাঁহাকে বলিলেন — ঘোষমশায়, আপনারা বুঝি অনেকদিন ধরে ঠাকুরবাড়ি যান নাই? (হাস্য)। ঘোষ মহাশয় উত্তর দিলেন — আজ্ঞে, তিনদিন হল যাই নাই। শ্রীম পুনরায় সহাস্যে বলিলেন, তা'হলে একবার যাওয়া উচিত (সকলের হাস্য), এই আপেলগুলি নিয়ে যান।

স্বামী জিতাত্মানন্দের প্রবেশ। তিনি প্রণাম করিয়া বসিলেন।

শ্রীম (স্বামী জিতাত্মানন্দের প্রতি) — বিনয় মহারাজ, চন্দ্র মহারাজের (স্বামী নির্ভয়ানন্দের) খবর কি?

স্বামী জিতাত্মানন্দ — গতকাল দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গিছলেন নৌকো করে। সঙ্গে অনেক সাধু গিছলেন।

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ — আগামী সোমবার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে (দেওঘর) যাচ্ছেন।

শ্রীম — দেখ কি মনের জোর! যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ অচল, একজনের সাহায্য ছাড়া হাতের একটি অঙ্গুলী ওঠাতে পারেন না, তিনি কত তীর্থ দর্শন করে বেড়াচ্ছেন এই শরীরে। যাদের শরীর সচল, তারাও অত তীর্থ ভ্রমণ করতে পারে না। তাই স্বামীজী বলেছিলেন, 'The spirit is omnipotent' — মনের জোরই আসল কথা।

অন্তেবাসী বলিলেন, তিনি কিশোরীবাবুর দেহত্যাগের কথা খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ) ও মহাপুরুষ মহারাজকে (স্বামী শিবানন্দকে) বলিয়াছেন। তাঁহারা অনেক সংবাদ লইলেন।

শ্রীম — হাঁ, তাঁর (ঠাকুরের) সঙ্গে যেটুকু সম্বন্ধ তাই ঠিক। আর সব মিছে — রাবিশ। তবে পাঁকের ভেতর থেকে যেমন পদ্মফুল ফোটে তেমনি এর একটু relative value (আপেক্ষিক মূল্য) আছে। ব্যস্, এই পর্যন্ত। তাঁর (অবতারের) সঙ্গে দেখা এটাই ঠিক, এটাই অমূল্য — এইটুকুই real life (সত্যিকার জীবন)।

স্বামীজী তখন হিমালয়ে। তাঁর একখানা চিঠি দেখেছিলাম। লিখেছেন, ‘আমি এই মায়াপাশ ছিন্নভিন্ন করে ফেলবো।’ সে সময়টা বৃন্দাবনের দিকে একা একা ভ্রমণ করছেন।

উঃ, কি কথা — বীরের ন্যায়! আমি এই মায়াপাশ ছিন্নভিন্ন করে ফেলবো — আর তার ভেতর থেকে বের হয়ে যাব! দিল্লীর ওদিকে গেছেন, সঙ্গে গুরুভাইরা কেউ কেউ। সকলেই তাঁর সঙ্গে থাকতে চান। ‘যা তোরা সব; আমি একা থাকবো’ — এই বলে সবাইকে সরিয়ে দিলেন। একাকী বিচরণ করবেন সিংহের ন্যায়! ঠাকুরও একাকী বেড়াতেন নাটমন্দিরে, যেন প্রদীপ্ত সিংহ! (একজন ভক্তের প্রতি) আচ্ছা, সিংহ বুঝি একলা থাকে? (সহাস্যে) খুদেগুলি সব gregarious (যূথপ্রিয়)।

আজ শ্রীম-র মন বড় একাগ্র, একেবারে যেন জমাটবাঁধা ভাব। স্বামীজীর কথা বলিতে বলিতে যেন সশরীরে প্রত্যক্ষ করিতেছেন সেই বীরকেশরীকে। সচ্চিদানন্দ-সাগরে নিমজ্জমান শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিটিকেও

আজ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন ভক্তহৃদয়ে।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব, পুনরায় কথা হইতেছে।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি) — 'গড্ডলিকা প্রবাহ' একটা আছে জান? ধাড়ী একটা লাফ দিলে। অমনি আর যতগুলি ছিল সবাই দিচ্ছে একটি করে লাফ। লাফ দেওয়ার কোন কারণ ছিল না, তবুও লাফ। অন্যগুলি একবার দেখবেও না, কেন দিচ্ছে লাফ। আগেরটা যেমনি চলেছে তেমনি চললো সব (হাস্য)।

২

স্বামীজী নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটী, মহাত্যাগী মহাপুরুষ। এই বীরকেশরীর এইটিই প্রকৃত স্বরূপ। বাকী সব অবান্তর ঘটনা। স্বামীজীর নিজস্ব রূপটি চক্ষুর সম্মুখে কি বাহির করিয়া ধরিলেন শ্রীম, ঘটনাপুঞ্জের গভীর অরণ্যানী হইতে আনিয়া?

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ও দেশে (আমেরিকায়) বরফ পড়ছে। এদিকে fountain dry, ট্যাঁকে পয়সা নাই, গায়ে কাপড় নাই। কি খাবেন তার ঠিক নাই। বসে পড়লেন রেলের একটা ওয়াগনের ভিতর মরণপণ করে। আর একবার বসেছিলেন রাস্তায় ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়িত হয়ে। তখন বুঝি কে একটি মেম (মিসেস হেল) এসে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে।

তাই গীতায় আছে, — 'পৌরুষং নৃষু'। এই পুরুষকারও শ্রীভগবানের একটি রূপ।

স্বামী রাঘবানন্দ — শাস্ত্রে বলে, পুরুষকারও শেষে যায়। এতেও তাঁকে লাভ হয় না।

শ্রীম — যে পুরুষকার তিনি দেন তাতেই তিনি লভ্য। তাকেই লক্ষ্য করে বলা হয়েছে 'পৌরুষং নৃষু' (গীতা ৭:৮)।

নেপোলিয়ান সমগ্র ফ্রেঞ্চ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি। যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। তিনি বলেছিলেন শেষের দিকে সেন্ট হেলেনাতে, 'ইনি (ক্রাইস্ট) যা যা করলেন তাই থাকবে অনন্ত কাল। আমার কথা কিছুই রইল না আমার জীবিত কালেই।' প্যালেস্টাইনের ম্যাপ দেখিয়ে

বলেছিলেন এই কথাটি — 'তাঁর (ক্রাইস্টের) কাজই ঠিক'। Abbot's Life of Nepolean-এ আছে এ কথা।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ঠাকুর clearly (স্পষ্ট করে) বললেন কাশীপুর বাগানে, 'ছেলে জন্মানো আর ঈশ্বরলাভ — এই দু'টোই কি সমান?' যে পুরুষকার তিনি দেন, কেবল তা'তে তাঁকে পাওয়া যায়। এই-ই অর্থ — 'পৌরুষং নৃষু'র। পুরুষকারের সাম্রাজ্য লাভ হয়। তার নিধনে লাভ হয় ঈশ্বর। ঈশ্বরলাভার্থ পুরুষকার। বীরেশ বিবেকানন্দের সেই পুরুষকার। তাই এই বীরবাণী — 'আমি মায়াপাশ ছিন্নভিন্ন করে ফেলবো।'

কঠোপনিষদ তাই অত ভালবাসতেন স্বামীজী! বীরেন্দ্র নচিকেতা কিছুই নেবে না। যম যত বলছেন, এটা ন্যাও, ওটা ন্যাও — সাম্রাজ্য, গাড়ী, ঘোড়া, সুন্দরী রমণী, সুবর্ণ, দীর্ঘায়ু — 'মরণং মানু প্রাক্ষী'। সব প্রত্যাখ্যান করলেন নচিকেতা — বললেন, 'বরস্তু বরণীয়ঃ স এব' — কেবল আত্মজ্ঞান চাই। জাগতীয় কিছুই নয় কাম্য।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন, আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — (একজন ভক্তের প্রতি) — আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে। যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে।। (গীতা ৬:৩)

কর্মযোগ, যার মন স্থির হয় নাই, তার জন্য। যার মন স্থির হয়েছে তার জন্য ধ্যানযোগ। আবার কর্ম করারও কৌশল বলে দিচ্ছেন — 'মামনুস্মর যুধ্য চ' (গীতা ৮:৭)। কেবল যুদ্ধের কথা তো বলেন নাই। 'মামনুস্মর', আমাকে স্মরণ কর সদা। আগে আমার স্মরণ, তারপর যুদ্ধ, কর্ম। একেই বলে কর্মযোগ — কর্মদ্বারা যুক্ত হওয়া তাঁর সঙ্গে। প্রথম স্মরণ, তারপর কর্ম, তারপর আবার স্মরণ ও সমর্পণ। আগে পিছে তাঁর স্মরণ — মাঝখানে কর্ম। এরই নাম কর্মযোগ।

কি বীর স্বামীজী! ঠাকুর বলছেন, 'নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি', 'সপ্তর্ষির এক ঋষি', 'অখণ্ডের ঘর', 'আমার শ্বশুরঘর'। দেখ তাঁর জীবন, আগেও সমাধিবান পুরুষ, পরেও তাই। মাঝখানটা কয়েকদিন ঐ করলেন - কর্ম। তাঁর কর্মে আসক্তি নাই, প্রত্যাদিষ্ট কর্ম — লোকশিক্ষার জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য। কর্ম তো উদ্দেশ্য নয় — উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।

আহা, কি বীরাগ্রণী — কি বীরবাণী!

(উত্তেজিতভাবে দুই হাতে ছিন্ন করার অভিনয় করিয়া) — ‘আমি মায়াপাশ ছিন্ন করে ফেলবো।’ এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীম নিজকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। সাধুরা ভাবিতেছেন, কোনও কাজে গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। অন্তেবাসী ও স্বামী জিতাত্মানন্দ কহিলেন, আমরাও উঠি, মঠে যেতে হবে। স্বামী রাঘবানন্দ বলিলেন, প্রসাদ নিয়ে যাও। অপেক্ষা কর। তিনি বের হোন।

গৃহমধ্যে শ্রীম বিছানায় ছট্‌ফট করিতেছেন, নিউরালজিক বেদনায়। স্বামী রাঘবানন্দ সকলকে মানা করিলেন ঘরে যাইতে। অন্তেবাসী সবেগে গৃহে প্রবেশ করিয়া হ্যারিকেনের আগুন সেঁক দিতে লাগিলেন। বিনয় মহারাজ (স্বামী জিতাত্মানন্দ) ও স্বামী রাঘবানন্দও ঘরে প্রবেশ করিলেন। ধীরে ধীরে সকলেই গৃহমধ্যে সমাগত — কৃষ্ণ, অমূল্য, সুখেন্দু, যতীন, সতীনাথ, বিষ্ণু, হিমাংশু, অমৃত, মোটা সুধীর, মনোরঞ্জন, ঘোষ মহাশয়, বলাই গুহ, পূর্ণেন্দু প্রভৃতি। তিনতলায় সংবাদ গেল। শ্রীম-র জ্যেষ্ঠপুত্র প্রভাস আসিলেন, সঙ্গে শ্রীম-র দৌহিত্র গোপেন ও লালু আর পৌত্র অরুণ ও অজয়। কয়লার আগুন করিয়া সেঁক চলিতেছে।

অন্তেবাসীর গলা জড়াইয়া যন্ত্রণায় অস্থির শ্রীম। বলিতেছেন আর্তস্বরে, ও জগবন্ধু — ও জগবন্ধু! স্বামী জিতাত্মানন্দকে বলিতেছেন, এখানে সেঁক দাও, ওখানে সেঁক দাও। উহু-হু-উহু-হু। বালকের মতন অতিষ্ঠ। অন্তেবাসী গায়ে মুখে হাত বুলাইয়া বুঝাইয়া বলিতেছেন, এই এক্ষুনি সেরে যাবে। অন্তেবাসী পরিশ্রান্ত, বাহিরে ছাদে গিয়াছেন দুই মিনিট হয়। অমনি ছটফট করিতে করিতে বিছানায় বসিয়া বলিতেছেন — ও জগবন্ধু, এসো না, কোথায় গেলে? তিনি আসিয়া আবার বিছানায় বসিলেন। শ্রীম গলা জড়াইয়া কখনও এ-কাঁধে মাথা রাখিতেছেন, কখনও ও-কাঁধে। সেঁক চলিতেছে। কোনও ঔষধে কাজ হয় নাই। রাত্রি এগারোটা বাজিল। ভক্ত ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষ সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন। অদ্বৈতাশ্রমের সাধুরাও আসিলেন।

তিনঘন্টা সমানে সেঁকের পর কিছু উপশম হইল। রাত্রি বারটা। শ্রীম

বলিলেন, একটু ঘুমাবো। সকলে নিচে গেলেন। দুই চারজন মাত্র কাছে রহিলেন। অন্তেবাসী ও বিনয় মহারাজ বেলুড় মঠে যাইতে পারিলেন না। মঠে টেলিফোন করিয়া শ্রীম-র অসুখের কথা জানানো হইল। বিনয় নিত্য শেষ রাত্রে মহাপুরুষ মহারাজের সেবায় উপস্থিত হন। আজ তাহা করিতে পারিলেন না — শ্রীম বিনয় ও জগবন্ধুকে ছাড়িলেন না। তাঁহারা কাছে থাকিলে বুঝি প্রসন্ন হন। শ্রীম রাত্রিতে কিছু আর আহার করিলেন না। সাধুদের প্রভাসবাবু আহার করাইলেন। শ্রীম-র কক্ষে শুইলেন যতীন ও বলাই। সিঁড়ির ঘরে স্বামী রাঘবানন্দ ও স্বামী জিতাত্মানন্দ। আর দোতলায় সিঁড়ির পূর্ব পাশের বসিবার ঘরে শুইলেন স্বামী নিত্যাত্মানন্দ। পরদিন ভোর চারিটায় উপরে গিয়া অন্তেবাসী দেখিলেন, শ্রীম গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

সকালে অন্তেবাসী গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোমে ৭ নম্বর হালদার লেনে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের কর্মী। আজই সেখানে রওনা হইবার কথা। বিদ্যাপীঠের অনেকগুলি বিদ্যার্থীও যাইবে। অন্তেবাসীর ইচ্ছা আরও দুই চার দিন পরে যান, শ্রীমকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিয়া। স্বামী বোধাত্মানন্দ বলিলেন, টিকিট সব কেনা হয়েছে। অন্তেবাসীকেও যেতে হবে। তিনি পুনরায় শ্রীম-র কাছে মর্টন স্কুলে আসিলেন। শ্রীম তখন দৈনিক 'অমৃত বাজার পত্রিকা' পড়িতেছেন। অন্তেবাসী শ্রীমকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, বিদ্যাপীঠে যেতে হবে। শ্রীম বলিলেন, আজই তোমাদের যেতে হবে? ক'টায় গাড়ী? 'দশটায়' বলায় পুনরায় বলিলেন, ও-ও যেতেই হবে। আচ্ছা, তবে এসো।

বেলুড় মঠের শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ঘর। এখন বেলা নয়টা। মহাপুরুষ মহারাজ খাটে বসা। সেবক শৈলেশ মেঝেতে বসিয়া 'স্টেট্সম্যান' দেখিতেছেন। অন্তেবাসী গৃহে প্রবেশ করিতেই মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন শৈলেশকে, শোন কি বলে (শ্রীম-র অসুখের কথা)। সব শুনিয়া মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন — যা, মাস্টার এ যাত্রায় বেঁচে গেলেন — হাঁ, এবার বেঁচে গেলেন।

সম্মুখস্থ দেয়ালে বিলম্বিত ঠাকুরের ছবিকে যুক্ত করে চক্ষু বুজিয়া প্রণাম করিতেছেন। অন্তেবাসী ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। বলিলেন, দেওঘর

যাব এখন। তিনি আনন্দে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, যাও — ভাল।

১০টা ২৪ মিনিটে গাড়ী ছাড়িল। অনেকগুলি বিদ্যার্থী, সঙ্গে স্বামী বোধাত্মানন্দ ও ব্রহ্মচারী অমূল্য। ব্রহ্মচারী যতীনও আজ নূতন বিদ্যাপীঠে সেবকরূপে যাইতেছেন।

অন্তেবাসী গাড়ীতে বসিয়া শ্রীম-র অসুখের কথা ভাবিতেছেন। অত বড় অসুখটা গেল, কিন্তু কর্মের কি বক্র গতি। এঁকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে। যিনি মায়ের মত ধর্মজীবনের জন্ম দিয়েছেন এবং সুদীর্ঘকাল পালন করেছেন তাঁকে অসুস্থ রেখে যেতে হচ্ছে কর্মস্থলে। বিচিত্র ব্যাপার এ জগতের! 'গহনা কর্মণো গতিঃ' (গীতা ৪:১৭)। শ্রীম-র কথা ভাবিয়া এক একবার বিষণ্ণ হইতেছেন। এক একবার সব ভাবনা ঠাকুরে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণমিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর (বিহার)।
২০শে জুন ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ। ৫ই আষাঢ় ১৩৩৮ সাল, শনিবার।

একবিংশ অধ্যায়

মহাযাত্রার পথে

১

আজ ৮ই মে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ। বৈশাখ ১৩৩৮ সাল, রবিবার, অক্ষয় তৃতীয়া।

ঠাকুরবাড়ি। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। কলিকাতা। এখন সন্ধ্যা হয় হয়। শ্রীম নিজের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া দ্বিতলের সিঁড়ির কাছে যাইতেছেন। অন্তেবাসী সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া শ্রীমকে পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীম বলিলেন, হাত মুখ আবার ধুয়ে কুলকুচো করে ওপরে ঠাকুরঘরে গিয়ে বসো। অন্তেবাসী আবার নিচে গিয়া হাতমুখ ধুইয়া আসিলেন। শ্রীম সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াইয়া আছেন। অন্তেবাসীকে সস্নেহে বলিলেন — পায়ে হাতটা ঠেকেছিল কি না, তাই ঐ কথা বললাম।

সাধুদের পায়ে ভক্ত কিন্তু হাত দিলে সাধুরা হাত ধুইতে বলেন, শ্রীম বারণ করেন। বলেন — না, মাথায় হাত দাও। তাতেই শুদ্ধ হবে। শিরে গঙ্গা রয়েছেন। কিন্তু তাঁহার পায়ে হাত দিয়া জোর করিয়া স্পর্শ করিলে তিনি হাত মুখ ধুইতে ও কুলকুচো করিতে বলেন। কি জ্বলন্ত বিশ্বাস, সাধু সাক্ষাৎ নারায়ণ!

অন্তেবাসী দেওঘর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে থাকেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে কাল বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। আজ শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি অমূল্য, হিমাংশু ও স্বামী জিতাত্মানন্দের সঙ্গে খেয়া পার হইয়া বরাহনগর হইতে বাসে করিয়া আসিয়াছেন। স্বামী জিতাত্মানন্দ বাগবাজার নামিয়া গেলেন।

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে শঙ্কর ঘোষের লেনের মোড়ে সকলে ট্রাম হইতে নামিয়া ঠাকুরবাড়িতে প্রবেশ করিলেন।

অমূল্য উপরে গেলেন। অন্তেবাসী অমূল্যর হাত দিয়া বাবা বৈদ্যনাথের

পেঁড়া প্রসাদ শ্রীম-র কাছে পাঠাইলেন। তিনি হাত মুখ ধুইতেছেন নিচে। শ্রীম অন্তেবাসীর আগমন সংবাদ পাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ির কাছে যাইতেছিলেন।

তিনতলার ছাদে অন্তেবাসী বসিয়া আছেন স্বামী রাঘবানন্দের সঙ্গে। শ্রীমও আসিয়া পাশে বসিলেন। আরতি আরম্ভ হইবার অল্প বিলম্ব।

শ্রীম অতি আদরের সহিত অন্তেবাসীকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বলিলেন — ভয় হয়, পাছে শরীরটা ভেঙ্গে না পড়ে। প্রায়ই শুনছি কিনা অসুখ। অন্তেবাসী বলিলেন, শরীর তো প্রায় ভেঙ্গেই পড়েছে।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন।

শ্রীম — ক'টা case (কেস) দেখলাম। নিজেকে রক্ষা করতে পারে নাই। সাধুজীবন 'বেওয়ারিস মাল', রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বলতেন। ক'জনের দেখলাম অল্প বয়সে শরীর গেল। কাজকর্ম আবার আছে। অরগ্যানিজেশনে (সঙ্ঘে) থাকলে ওসব করতে হয়। কারো কারো ওসব সুট (suit) করে না। একটা গাছ বেশ বাড়ছিল। তার নিচে ভিয়ান বসালে। ওমা, অমনি আর সে তেজ নাই। মরমর হয়ে পড়েছে।

বলাই — বৈদ্যনাথের প্রসাদী এই পেঁড়া এনেছেন ইনি (শ্রীম প্রণাম করিলেন)।

অন্তেবাসী — এতে মঠের প্রসাদও রয়েছে। (শ্রীম পুনরায় যুক্ত করে প্রণাম)।

শ্রীম নীরব। শরীর শীর্ণ। মুখে বেদনার ছায়া।

অন্তেবাসী। আপনার শরীর কেমন?

শ্রীম — এই চলছে। বেদনাটা যা কষ্ট দিচ্ছে। সেই যে দেখে গিছলে (পূজার ছুটিতে) তারপর থেকে চলছেই। তুমি তো দেখে গিছলে?

দারুণ বেদনায় শ্রীম দেড় ঘন্টা আর্তনাদ করিয়াছিলেন অন্তেবাসীর গলা জড়াইয়া সেই দিন।

অন্তেবাসী — আজ্ঞা হাঁ। পরদিনই বিদ্যাপীঠে যেতে হয়েছিল।

শ্রীম — সেইটাই চলছে।

অন্তেবাসী — আজ আবার খাটুনিও হয়েছে। ও বাড়িতে (মর্টন স্কুলে) যেতে হয়েছিল। আজ তো মটকোর (জ্যেষ্ঠ পৌত্র অরুণের) বিয়ে। আগে

জানলে আজ আসতাম না।

শ্রীম — না, তেমন খাটুনি নেই। তবে এই বইটা (কথামৃত পঞ্চম ভাগ) বের হচ্ছে। এটাতে খুব খাটুনি।

অন্তেবাসী — শরীরে যদি সহ্য না হয়, তবে কি কাজ এই বই বের করার?

শ্রীম — ঐ সব চিন্তা (বের করার চিন্তা) করলে বেড়ে যায়। তখন আর কিছুই মনে থাকে না।

আরতি আরম্ভ হইল। শ্রীম উঠিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। ভক্তরা গাহিতেছেন, 'খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়।' তারপরে গাহিতেছেন প্রণাম —

স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

এইবার ঠাকুরের ভোগ নিবেদন করা হইতেছে। শ্রীম প্রণাম করিয়া নিচে চলিয়া গেলেন, বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। অল্প অল্প বেদনা চলিতেছে।

ভোগ শেষ হইলে ভক্তরা পুনরায় গাহিতেছেন, 'ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেঢ্য' — এই স্তব। এরপর দেবী প্রণাম — 'সর্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে'। তারপর 'ভয় হর মঙ্গল দশরথ রাম' ও 'কনকাম্বর কমলাসন - জনকাখিল ধাম'। তারপর প্রণাম —

'আপদামপহর্তারং দাতারং সর্বসম্পদাম্।
লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্॥
রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥'

শ্রীম দোতলার ঘরে শুইয়া আছেন। ডান হাতে অল্প অল্প বেদনা। আরতি শেষ হইলে একজন ভক্তকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, জগবন্ধু মহারাজকে বেশ করে খাইয়ে দাও। পর পর তিনজনের দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন একই কথা — ভাল করিয়া খাওয়াইতে। আর বলিলেন — বড়ই দুঃখ হচ্ছে, তাঁর খাওয়াটা আমরা দেখতে পেলাম না। হিমাংশু বেশ পরিতোষ করিয়া ভোজন করাইলেন সাধুকে বাজার হইতে লুচি, তরকারী, মিষ্টি, আম কিনিয়া আনিয়া।

শ্রীম নিজ কক্ষের মেঝেতে বসিয়া আহার করিতেছেন। ভক্তরা আসিয়া অন্তেবাসীকে দোতলায় লইয়া গেলেন আহার-রত শ্রীমকে দর্শন করিবেন। তিনি বারান্দায় বসিয়া দেখিতেছেন। ভক্তরাও কেহ কেহ বারান্দায় বসা। হিমাংশু কেবল শ্রীম-র ঘরে।

শ্রীম-র পরনে একখানা গামছা। শ্রীম খাইতেছেন দুধ আর রুটি। হিমাংশু হ্যারিকেনে নুনের পুঁটলি গরম করিতেছেন। শ্রীম বাঁ হাতে ঐ পুঁটলি লইয়া ডান হাতের কুনুই-এ সেঁক দিতেছেন।

একটা টিফিন কেরিয়ারের বাটিতে শ্রীম একটা ল্যাংড়া আম রাখিয়া খাইতেছেন, আর হিমাংশুর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করিতেছেন।

শ্রীম — 'ঘায়েল কী দরদ ঘায়েল বোঝে অন্যে না বোঝে কই?' (ঘায়ল কী গতি ঘায়ল জানে অউর ন জানে কোয় - মীরার ভজন)। আচ্ছা, ঐ যে গেলেন তাঁর মুখে ভারি সুন্দর শোনায়। আজকাল যেন কোথায় থাকেন?

হিমাংশু — আপনাকে চিঠি লিখেছিলেন তো?

শ্রীম — হাঁ। বেদনায় সব ভুলিয়ে দেয়, কিছু মনে থাকে না। কোথায় ঢাকার ওদিকে থাকেন। ওঁর মুখে বেশ হয় — 'ঘায়েল কী দরদ ঘায়েল বোঝে অন্যে না বোঝে কই।'

বেদনায় সব ভুলিয়ে দেয়। এর মানে অন্য চিন্তা করতে দেবেন না। এক চিন্তা নিয়ে থাক। নানান্ খানা করতে আর দেবেন না।

শ্রীম আম চুষিয়া খাইতেছেন।

হিমাংশু — ঐ বুড়ো ডাক্তারটি খুব ভাল। দেখালে হয়। বললেই আসবেন।

শ্রীম — না। তাঁকে এনো না। বুড়ো মানুষ। ওষুধ বলে দিলেই হবে। আমটা খেতে বেশ। বেশ মিষ্টি। বেদনা কম লাগে (হাস্য)।

হিমাংশু — একজন ডাক্তার বলেন, ল্যাংড়া আম রোগীর আহার, রাত্রে জলে ভিজিয়ে রেখে সকালে খেলে।

শ্রীম — (সহাস্যে) দেখ দিকিন্ আছে কিনা আর, তুমি যেকালে এতো recommend (গ্রহণযোগ্য বলে প্রশংসা) করছো।

হিমাংশু প্রসাদী আমের একটি আঁটি ও দুইটি চাক্‌লা দিলেন। সামনেই পাতায় দোকানের আলুর তরকারী রহিয়াছে। শ্রীম উহা হইতে খানিকটা

মুখে দিলেন চাট্‌নীর মত।

শ্রীম — এটা নোনতা, বেশ খেতে।

শ্রীম-র আহার শেষ হইলে পুরানো ঘি গরম করিয়া ডান হাতে মাখান হইল।

হিমাংশু — যেদিন মঠে গিয়েছিলেন সেদিন একজন ডাক্তার একটা ওষুধ দিছলেন। কোথায় সেটা?

শ্রীম স্মরণ করিতে পারিতেছেন না।

মনোরঞ্জন (বারান্দা হইতে) — ঐ যে এক ভদ্রলোক আপনার হাতে দিলেন।

তবুও শ্রীম-র স্মরণ হইতেছে না। খানিকপর স্মরণ হইল।

শ্রীম — ও-ও! হাঁ ঈশান কবিরাজের (শ্রীম-র ভগ্নীপতি, ঠাকুরের চিকিৎসক) বাড়ি থেকে দিছলো। দেখ, সব ভুলে গেছি। টেবিলে রয়েছে বটে।

একজন সাধু তিনতলার ছাদে বসিয়া আছেন অন্ধকারে একা। ভাবিতেছেন, শ্রীম বলেন ঠাকুর কৃপা করে তাঁর সব রূপ দেখিয়ে দিয়েছেন — সাকার নিরাকার উভয়ই। তাঁর এই রূপ দেখে ভক্তদের ধাঁধাঁ লেগে যেতো। এদিকে প্রহেলিকা — বাইরে পূজারী ভিতরে জগদীশ্বর!

এখন বলেন, 'বেদনায় সব কিছু ভুলে যাই, মনে থাকে না।' আবার বলেন, 'এখন কেবল ঠাকুর ও তাঁর কথামৃত মনে থাকে। নাম-রূপ সব ভুল হয়ে যাচ্ছে।'

কখনও দেখা যায় বেদনার সময় কথামৃত লিখিতে বসিয়াছেন। বারণ করিলে বলেন — না, ঠাকুরের কথামৃতের চিন্তায়, তার আনন্দে, বেদনা ভুল হয়ে যায়।

শ্রীম কখনও বলেন, যে কাশী দেখেছে তার ভিতরে কাশীর জ্ঞান জাগ্রত থাকে, বাইরে যদিও দেখা যায় নানা কাজে ব্যাপৃত। কাশী মানে ঈশ্বর, ব্রহ্ম।

শ্রীম ভগবান অবতারের অন্তরঙ্গ শক্তিশালী বিশিষ্ট পার্ষদ। ঠাকুরের চৈতন্যাবতারেরও লীলাসহচর। অতএব নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি। এক সত্তা, 'চাপরাশ'-ধারী, 'ভাগবতের পণ্ডিত' শোক-দুঃখসন্তপ্ত জীবগণকে ঠাকুরের

'কথামৃত' বর্ষণ করিয়া ব্রহ্মানন্দ প্রদানকারী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শ্রীম।

সাধু ভাবিতেছেন — শ্রীম একবার বলছেন, 'সবকিছু ভুল হয়ে যায় বেদনায়'। আবার বলেন, 'কথামৃতের আনন্দে বেদনা ভুল হয়ে যায়'। এ দু'টি বিরুদ্ধ ভাব নিশ্চয়, আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ। বেদনায় জগতের জ্ঞান, দেহজ্ঞান থাকে। ঠাকুরের 'কথামৃতে'র চিন্তায়, ব্রহ্মচিন্তায় বেদনা ভুল হয়ে যায়।

শ্রীমতে দেখছি, ভুল ও ব্রহ্মচেতনা একাধারে একসঙ্গে। ব্রহ্ম ও মায়া একাধারে, একটি স্বচ্ছ পর্দার ব্যবধান মাত্র। এটা কি নিরন্তর জাগ্রত সমাধি? এই ব্রহ্ম ও মায়া একাধারে একসঙ্গে ঠাকুরের জীবনে সর্বদা দর্শন হতো।

সাধু আবার ভাবিতেছেন, পার্ষদদেরও যদি এই অবস্থা, আমাদের দশা কি হবে? মনের ভিতর হইতেই উত্তর আসিল — শরণাগতি আর প্রার্থনা। আর শ্রীম-র অভয়বাণী বাপ-মাওয়ালা ছেলের মত থাকবে আনন্দে নিশ্চিন্তে। ঠাকুর সদা ভক্তসঙ্গে বিরাজ করেন। সাধু সকাতরে প্রার্থনা করিতেছেন, ঠাকুর সদা দেখো, সদা রক্ষা করো, তোমার অভয় পদে মন রেখো।

পূর্ণেন্দু ও এটর্নী বীরেন বসুর প্রবেশ। তাঁহারা অন্ধকারে সাধুকে দেখিতে পান নাই। একজন ভক্তের মুখে সাধুর নাম শুনিয়া বীরেন সাধুর কাছে আসিলেন এবং অতি ভক্তিভরে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। আর আত্মীয়ের মত সাধুর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বলিলেন, আপনাদের দেখলে ভরসা হয়। মনে হয়, বন্ধুবান্ধবরা কোথায় রয়েছেন ঈশ্বরের জন্য সর্বস্ব ছেড়ে! আমাদের কথা কখনও একটু স্মরণ করবেন। সংসারে কোথায় পড়ে আছি। ঘরের কথা, বড় ছেলের পড়ার কথা কহিলেন। আবার সপ্রেম ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। ভাবটি বড়ই মধুর। একটু পর গুহ মহাশয় আসিয়াও প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

সাধু ছাদে বসিয়া ভাবিতেছেন, ঠাকুর বুঝি এবার আমাদের অনাথ করবেন। শ্রীম-র শরীরের যা অবস্থা। নিজে বলেছেন, 'দুর্গা বলে যাত্রা করে বসে আছি'। হায়, আমাদের কি দুর্দিন হবে! সাধু আর ভাবিতে পারিলেন না।

রাত্রি প্রায় এগারটা। বলাই, মনোরঞ্জন ও সুখেন্দু আর সাধু বসিয়া

শ্রীম-র অসুখের কথা আলোচনা করিতেছেন। একটানা আট মাস ধরিয়া বেদনা চলিতেছে। সকলেই চিন্তিত।

এগারটার পর ভক্তরা শুইলেন ছাদে। সাধু শুইলেন 'নাট মন্দিরে' ঠাকুরের মন্দিরের পাশে।

পরের দিন সকালে ভক্তগণ ছাদে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। অন্তেবাসীও আছেন। শ্রীম দ্বিতলের নিজের কক্ষ হইতে আসিয়াছেন। এখন সকাল ছয়টা। মঠের কথায় মহাপুরুষ মহারাজের কথা উঠিল। শ্রীম খুব ভাবিত। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিতেছেন যাহাতে মহাপুরুষ মহারাজ সুস্থ থাকেন। বলিলেন, যতদিন এঁদের শরীর থাকে ততই জগতের কল্যাণ, বিশেষ করে আমাদের ও মঠের কল্যাণ। এঁরা ঠাকুরের link (যোগসূত্র)। এঁদের দেখলে ঠাকুরের কথাই মনে হয়। (অন্তেবাসীর প্রতি) তুমি যে লিখছ ডায়েরীতে মহাপুরুষের কথা এ খুব ভাল, পরে অমূল্য ধন হবে এসব কথা। অন্তেবাসী বলিলেন — একটু লেখা শুনুন, বাকী আছে। শ্রীম বলিলেন, শোনাও। অন্তেবাসী পড়িতেছেন—

১৯শে জুন ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। বেলুড় মঠ। সকাল প্রায় সাতটা। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। তিনি পালঙ্কের উপর বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য, প্রায় দিগম্বর। সেবক শৈলেশ ঘরের মেঝেতে বসিয়া 'স্টেটস্‌ম্যান' কাগজের সব হেডিং পড়িয়া শুনাইতেছেন।

একটি সাধু গৃহে প্রবেশ করিলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন পাদস্পর্শ করিয়া। মহাপুরুষ শৈলেশকে বলিলেন, 'দেখ কি খবর। শ্রীমাস্টার মহাশয় সম্প্রতি স্নায়ুশূল বেদনায় হঠাৎ আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হন নাই। তাই শ্রীম-র সম্বন্ধে সব সংবাদ লইতে শৈলেশকে আদেশ করিলেন। সাধু নিজেই মহাপুরুষ মহারাজকে তাঁহার সংবাদ বলিলেন। তিনি সব শুনিয়া আনন্দে বলিতেছেন, অস্পষ্ট আধ আধ স্বরে — মাস্টার বেঁচে গেলেন, মাস্টার মশায় বেঁচে গেলেন। যা, ঠাকুর এ টালটাও সামলিয়ে নিলেন। বেশ হয়েছে, আচ্ছা।

সাধু বলিলেন, আজ আমি দেওঘর যাব। মহাপুরুষ প্রসন্নভাবে উত্তর করিলেন — বেশ যাও, আচ্ছা যাও বাবা। খুব ভাল। এই সাধুর শরীর এখানে আসিলেই খারাপ হয়। তিনি নিচে নামিয়া গেলেন। ব্রহ্মচারী

রাধেশ্যাম ভাতে ভাত রাঁধিয়াছেন। সাধু আহার করিয়া হাওড়া স্টেশনে রওনা হইলেন। এখন সওয়া নয়টা, সঙ্গে অমূল্য। হেম পালের গলিতে এক ঘন্টা অপেক্ষা করিবার পর বাস আসিল।

রেল গাড়ীতে বসিয়া সাধু আপন মনে ভাবিতেছেন, মঠ আনন্দধাম। ঠাকুর, মা, স্বামীজী প্রভৃতির এখানে জীবন্ত ও নিত্য আবির্ভাব। এখন শ্রীমহাপুরুষাদি পার্ষদগণের বাসস্থান। এমন স্থান কোথায় পাওয়া যায়!

মঠে আনন্দে থাকিতে পারেন তিনি , যাঁহার শরীর সুস্থ ও কার্যক্ষমতা প্রচুর। কিন্তু যাঁহার শরীর অসুস্থ ও দুর্বল তাঁহার পক্ষে কষ্টকর। আমার শরীর অসুস্থ। এই এক মাস মঠের বিশেষ সেবা করিতে পারি নাই। তাহাতে মন সঙ্কুচিত হয়। অপরেও কেহ কেহ বিরক্ত হন। ইহাতে মন আরও খারাপ হয়। কিন্তু ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিলে অপরের বিরক্তি ও নিজের সঙ্কোচ দূর হইয়া যায়।

মঠে আসা কেন? ঠাকুরের নিত্য আবির্ভাব এখানে! ইহার ফলস্বরূপ জমাটবাঁধা আনন্দ এখানে। এই আনন্দ ও শান্তি অতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে উপভোগ করা যায়। আর সর্বদাই ঠাকুরের সন্তানগণকে এখানে দর্শন হয়, আর সাধুসঙ্গ লাভ হয়। এখনও মহাপুরুষ ও খোকা মহারাজ বিদ্যমান। আমার তো বরাবর ইচ্ছা এখানেই স্থায়ীভাবে থাকি। অসুস্থ শরীরের জন্য সম্ভব হয় না। এখানে সেবা করার স্থান, সেবা লইবার স্থান নহে। অবশ্য শয্যাশায়ী হইলে সেবা লইতে বাধ্য হয়।

ঠাকুর সহায়! তিনিই আমাদের একমাত্র ভরসা — সকল সাধুগণের! তিনি যখন যেভাবে যেখানে রাখেন সেখানেই তাঁহার শরণাগত হইয়া থাকিতে হইবে। তাঁর কৃপাতে সর্বত্র সর্বদা শান্তি ও আনন্দলাভ হয়। তিনিই আমার ও সকলের একমাত্র ভরসা! জয় রামকৃষ্ণ!

শ্রীম — বাঃ, কি উদ্দীপক এই বিবরণ! ভবিষ্যতে মঠের ইতিহাসে এসব জীবন্ত ছবি থাকবে। কত লোকের উপকার হবে এই ডায়েরীতে। তত্ত্বকথার চাইতে এসব জীবন্ত বিবরণ অধিক মূল্যবান সাধকদের কাছে।

২

অপরাহ্ন একটা। গঙ্গাগর্ভ। দুইজন সাধু — স্বামী ভাস্করেশ্বরানন্দ ও

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ খেয়া নৌকাতে গঙ্গা পার হইতেছেন। সঙ্গে ভক্ত বলাই। তাঁহারা বেলুড় মঠ হইতে কলিকাতা যাইবেন। কুঠিঘাটে নামিয়া বরাহনগর পোস্ট অফিসে একটা তার করিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ পুরীর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের উৎসর্গ-উৎসবে আনন্দ প্রকাশ ও শুভ কামনা করিতেছেন। তারপর বাসে সকলে শ্যামবাজার পর্যন্ত গেলেন।

আজ ১৪ই মে শনিবার, ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনস্থ শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ি। ফটকের ঘরে উকীল ললিত ব্যানার্জি বসা। তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে অন্তেবাসী 'নমঃ ভক্তেভ্যঃ' বলিয়া অভিবাদন করিলেন। দেখিবার ইচ্ছা ছিল, দেখা হইল। তাহাতেই উভয়ের আনন্দ।

দ্বিতলে উঠিয়া অন্তেবাসী শুনিলেন শ্রীম নিজের ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া 'কথামৃতে'র পঞ্চম ভাগ লিখিতেছেন। সাধু ও ভক্তেরা তাই তিনতলার ছাদে বসা। অন্তেবাসী ঠাকুর প্রণাম করিলেন। এখানে শ্রীশ্রী ঠাকুরের পাদুকা নিত্য পূজা করা হয়। শ্রীশ্রীমা এই পূজার প্রতিষ্ঠা করেন।

আজ শনিবার বলিয়া বহু ভক্ত সমাগম হইয়াছে। ভাটপাড়ার ললিতবাবু প্রভৃতি প্রাচীন ভক্তগণও আসিয়াছেন। দুইজন ব্রহ্মচারী আসিলেন। উভয়েরই নাম নগেন (পরে স্বামী কৃপানন্দ ও মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ)। সাধু ও ভক্তগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্রীম-র অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। এখন সন্ধ্যার খানিক বাকি।

সংবাদ আসিল লেখা শেষ করিয়া শ্রীম একা বসিয়া আছেন দোতলার ক্ষুদ্র কক্ষে। অন্তেবাসী নিচে নামিয়া গেলেন। শ্রীম মাদুরের উপর দক্ষিণমুখী বসা। পাশেই খাট বিছানা। চাদর ময়লা। পূর্ব প্রান্তে টেবিল, তাহাতে অনেক পুস্তক। পশ্চিমে রান্নার সরঞ্জাম। কুকার, এনামেলের বাসন প্রভৃতি। দক্ষিণের জানালার পাশে জলের কুঁজো আর গ্লাস।

শ্রীম-র শরীর কৃশ, চেহারা রুক্ষ। পরনে সাদাপাড় ধুতি, গায়ে লংক্লথের পাঞ্জাবী। গলায় সোয়েটার জড়ান। হাতে নিউরলজিক পেন। পোশাকও ময়লা। অন্তেবাসীকে দেখিয়া শ্রীম সস্নেহে আহ্বান করিলেন — আসুন জগবন্ধুবাবু, আসুন। অন্তেবাসী পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলেন। তারপর শ্রীম-র দক্ষিণ বাহুমূলে ও পিঠে হাত বুলাইয়া ব্যথিত স্বরে বলিলেন — আহা, কি রকম শুকিয়ে গেছে সব। বরাবর শ্রীম-র শরীর দীর্ঘ ও হৃষ্টপুষ্ট। শ্রীম স্বাভাবিক প্রশান্ত বদনে উত্তর করিলেন — এর এই অবস্থাই হবে।

তাই হয়ে আসছে চিরকাল। এর ভেতর যিনি আছেন, তিনিই কেবল অজর অমর অভয় সচ্চিদানন্দ। যতদিন শরীর তত দিনই দুঃখ। ষড়বিধ বিকার ধর্ম এর।

জীবের, ভক্তের এইটিই স্বরূপ। এইটে জেনে সংসারে থাকা। এইটিকে লক্ষ্য করে ঠাকুর বলেছিলেন, ‘অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে সংসারে থাকা’।

অন্তেবাসী (অনুযোগের স্বরে) — এই সন্ধ্যের অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, এখনও নাকি লিখছিলেন?

শ্রীম (স্নেহের শাসন মানিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে) — হাঁ। এতে ভালই লাগছিল। যেমন মাছ মরমর হয়েছে। আর জল পেয়েছে। অমনি সোঁ করে দৌড়। লিখতে লিখতে সব ভুলে গিছলাম — বেদনা।

এখন অত্যন্ত গরম। তাহাতে আবার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। অন্তেবাসী তালপাতার পাখা লইয়া শ্রীমকে হাওয়া করিতেছেন। একটু পর শ্রীম বলিতেছেন — থাক্ থাক্ সন্ধ্যে হয়েছে থাক্।

দুই জন নূতন ভক্তের প্রবেশ। তাঁহারা কেলনার কোম্পানীতে কাজ করেন। প্রণাম করিয়া বসিলে তাঁহাদের সঙ্গে দুই চারিটি কথায় কুশল প্রশ্ন করিলেন।

এইবার অন্তেবাসীকে বলিলেন, যান্ এবার এদের নিয়ে উপরে। এখন আরতি হবে।

তিন তলায় আরতি হইতেছে। ভক্তগণ নাটমন্দিরে ও ছাদে বসিয়া যন্ত্রসহায়ে গাহিতেছেন, ‘খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়’।

শ্রীম ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন — গায়ে নামাবলী। ভিতরে গরম বলিয়া আরতি শেষ না হইতেই বাহির হইয়া আসিলেন।

একজন স্বগত ভাবিতেছেন শ্রীমকে দেখিয়া, বৃহদারণ্যকের ‘বালাকি-অজাতশত্রু’ সংবাদের কথা মনে পড়ছে। গৃহস্থাশ্রমী জনক। তাঁর কাছে গৃহী, সন্ন্যাসী সকলে যায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য। প্রতিবেশী ঈর্ষান্বিত হইয়া ‘জনেকায় জনেকায়’ বলিয়া উপহাস করে। জনক ত্যাগী শিরোমণি শুকদেবেরও গুরু। ব্রহ্মজ্ঞানে ত্যাগী গৃহী অভেদ।

অন্তেবাসী রাত্রিবাস করিলেন ‘নাট মন্দিরে’ বলাই ও সুখেন্দুর সঙ্গে। শ্রীম-র কক্ষের পাশে দ্বিতলে শুইলেন স্বামী রাঘবানন্দ ও মনোরঞ্জন।

৩

শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ি। প্রভাত চারিটা। ঠাকুরঘরের পাশে 'নাট মন্দিরে' রাত্রিবাস করিয়াছেন একজন সাধু, বলাই ও সুখেন্দু। তাঁহারা এখন শয্যায়। গত রাত্রিতে অনেক দেরীতে শুইয়াছিলেন। শ্রীম অতি প্রত্যুষে দ্বিতল হইতে উপরে আসিয়াছেন। নাট মন্দিরে বিছানার পাশ দিয়া ছাদে যাইতেছেন কণ্ঠধ্বনি করিয়া। সাধু ও ভক্তরা লজ্জিত হইয়া হুড়মুড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

আজ ১৫ই মে, ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার।

শ্রীম দ্বিতলের ব্রিজে দাঁড়াইয়া আছেন, শরীর শীর্ণ। গলদেশে আধখানা লালপাড় বস্ত্র জড়ানো। একজন সাধু দ্বিতল হইতে তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন। শ্রীম মনোরঞ্জনকে বলিতেছেন, লোহার কড়ির 'জঙ্গ' ছাড়িয়ে রং দেওয়াতে হবে। সাধুটি শ্রীমকে দর্শন করিতেছেন আর ভাবিতেছেন — কি আশ্চর্য প্রায় অশীতিবর্ষীয় শ্রীম। কিন্তু brain কি active! মনের জোর অফুরন্ত! এত উপর নিচ করছেন। বাড়ি মেরামত হচ্ছে — তার খুঁটিনাটি সব ভাবছেন, দেখছেন। অবাধিত ব্রহ্মলীনতা আর কর্মতৎপরতা একসঙ্গে এই বৃদ্ধ বয়সে কি করে সম্ভব হয়? বিচিত্র জীবন অবতার পার্ষদগণের! এত বয়সেও কিরূপে 'মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ' (গীতা ১৮:২৬)।

একটু পরেই শ্রীম নিজ মনে গান ধরিলেন —

গান। অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি॥
কালীনাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি।
এই দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গানাম কিনে এনেছি॥
দেহের মধ্যে সুজন যে জন, তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি॥
এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে দেখাব ভেবে রেখেছি॥
সারাৎসার তারা নাম আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে, দুর্গা ব'লে যাত্রা করে বসে আছি॥

অন্তেবাসী প্রাতঃকৃত্য সমাপনের জন্য নিম্নতলে নামিতেছেন। শ্রীম-র

কণ্ঠস্বর শুনিয়া ফটকের ঘরে দাঁড়াইয়া নিবিষ্ট মনে শ্রীম-র গান শুনিতেছেন। শ্রীম-র মনপ্রাণ যেন শেষের চরণটির সহিত বিলীন হইয়া গেল — 'রামপ্রসাদ বলে, দুর্গা বলে যাত্রা করে বসে আছি'। কি নিশ্চিন্ত আনন্দময় করুণ কণ্ঠস্বর! অন্তেবাসীর প্রাণ কম্পিত হইল। তিনি ব্যাকুলভাবে ভাবিতেছেন — হায়, তবে কি শ্রীম-র দিন ফুরিয়ে এল? আমাদের সৌভাগ্যের রবি কি অস্তমিতপ্রায়? (একুশ দিন পরেই শ্রীম মহাসমাধিমগ্ন)।

আবার গাহিলেন রামপ্রসাদী সঙ্গীতের কয়েকটি চরণ। মনকে ব্রহ্মশক্তি কালীতে লীন করিতেছেন।

গান। আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরুমূলে রে চারিফল কুড়ায়ে পাবি।।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
বিবেক নামে তাঁর বেটা, তত্ত্বকথা তায় শুধাবি।।

অন্তেবাসী ভাবিতেছেন কম্পিত হৃদয়ে, শ্রীম আমাদের ছাড়িয়া ব্রহ্মপুরে চলিলেন। আমাদের জন্য রাখিয়া যাইতেছেন 'নিবৃত্তি' আর 'বিবেক'। এই নয়নদ্বয় সহায়ে কি চলিতে বলিতেছেন আমাদের এই তমসাচ্ছন্ন সংসারপথে?

ঠাকুরবাড়ির ছাদ। স্বামী রাঘবানন্দ, স্বামী নিত্যাত্মানন্দ ও হরি পর্বত বসিয়া আছেন। তাঁহারা বলাবলি করিতেছেন, বর্তমান সময়ে কলিকাতাই তীর্থশ্রেষ্ঠ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নরশরীরে অবতীর্ণ হইয়া এই স্থানেই সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর অবতারলীলা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীচরণ-রজঃসিঞ্চিত স্থানগুলি মহাতীর্থ, দর্শন করিলে হয় সবগুলি একে একে আবার।

হরি পর্বত স্বামীজীর কৃপাপ্রাপ্ত প্রাচীন ভক্ত। তিনি নিচে নামিয়া গেলেন। খানিকপর সংবাদ আসিল, শ্রীম তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন দ্বিতলে। অন্তেবাসী নামিয়া গেলেন। তিনি বারান্দায় বেঞ্চিতে বসিলেন হরি পর্বতের পাশে। শ্রীম নিজ কক্ষে খাটের উপর বসিয়া আছেন। জানালা দিয়া শ্রীম-র দর্শন ও কথা শ্রবণ করিতেছেন সাধু ভক্তগণ। অন্তেবাসীকে দেখিয়া শ্রীম বলিলেন, পুষ্কর তীর্থের কথা হচ্ছে। ব্রহ্মা তপস্যা করেছিলেন ওখানে। এসব তীর্থস্থান সংসাররূপ জ্বলন্ত অনলে যেন oasis (মরূদ্যান)!

ভক্তগণ গিয়ে শান্তিলাভ করবে। তাই তিনি আগে থাকতে করে রেখেছেন, দক্ষিণেশ্বর, মঠ, কলিকাতা — এসব নূতন তীর্থ। আবার কামারপুকুর, জয়রামবাটি। সংযত চিত্তে এই সব তীর্থে কিছুদিন বাস করলে শান্তিলাভ হয়।

অন্তেবাসীর মন আজ ব্যাকুল। শ্রীম-র মুখ হইতে 'দুর্গা ব'লে যাত্রা করে বসে আছি' — সঙ্গীতের এই কলি শুনিবার পর হইতেই মন এই ভাবনায় মগ্ন। তাই শ্রীম-র কথায় মনোযোগ সামান্যই দিতে পারিলেন।

স্বামী রাঘবানন্দ আসিয়া বেঞ্চিতে বসিলেন। নানারূপ কথোপকথন হইতেছে। ভারতীয় রাজন্যবর্গের ভক্তির কথা হইতেছে। স্বামী রাঘবানন্দ একজন ভক্তিমান রাজার কথা বলিলেন। হরিবাবু বলিলেন অপর একজন জয়পুরের রাজার ভক্তির কথা। অন্তেবাসী বলিলেন, বরদার বালক রাজা তাঁহার মায়ের সঙ্গে উটকামণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গিয়াছিলেন একদিন ঠাকুরদর্শন আর সাধুদর্শন করিতে।

শ্রীম — তা, আসবেন না? দাঁড়ায় কোথায় মানুষ যদি সাধুদের না ধরে? সাধু হলেন ব্রিজ — মানুষ আর ভগবানের মাঝে। সাধুরা ভগবানকে ধরে রয়েছেন। মানুষ তাঁদের ধরে থাকলে সংসারে নির্ভয়ে চলতে পারে। বুদ্ধি দিয়ে ভগবানের সঙ্গে সংযোগ না রাখলে শান্তি নাই। শান্তিহীন সুখ আর মায়া-মরীচিকা সমান। গীতায় ভগবান এই কথা স্পষ্ট করে বলেছেন, 'ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্' (গীতা ২:৬৬)। ঠাকুর তাই বলেছেন, 'ভগবানের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে সংসারে থাক — যেমন পিতা মাতা।' সাধুরা এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। কারণ তাঁদের সম্পর্ক ঈশ্বরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য। সাধু মানেই যে জগতের সম্পর্ক ছেড়ে ঈশ্বরের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে সংবদ্ধ। এদিকের মন ওদিকে নেওয়া। তারপর ছাদে উঠলে অর্থাৎ তাঁর দর্শন হলে দেখে তিনিই সব হয়ে রয়েছেন — তাই 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং'। ঠাকুর স্বচক্ষে এই দৃশ্য সর্বদা দেখতেন। একদিন নয় — সর্বদা — সারাজীবন।

ঠাকুর নিজে বলেছেন, 'এ শরীরে ভগবান অবতীর্ণ'। কতকগুলিকে আবার এ তত্ত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা তাঁকে ধরেই এই সংসারে রয়েছেন। এঁরাই সাধু, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল। তিনি এঁদের ঈশ্বর দর্শন করিয়ে

দিয়েছেন। এঁদের ধ'রে থাকলে আর ভয় নাই। এখানেও শান্তি সুখ আনন্দ, পরেও তাই। এই কথাই বলতে এসেছেন ঠাকুর। তাঁকে ধরে যাঁরা আছেন — তাঁরাই সাধু। আবার তাঁদের ধ'রে অপরে চলছে। এইরূপ যুগে যুগে হচ্ছে। যখনই ধর্মের গ্লানি হয় অমনি তিনি আবার এসে সাধু তৈরী করেন। এই প্রবাহ নিত্য। একদিকে জীবকে সংসারে বদ্ধ করেছেন তাঁর অবিদ্যাশক্তি দিয়ে, অপর দিক থেকে কতকগুলিকে মুক্ত করে দিচ্ছেন সংসারবন্ধন থেকে তাঁর বিদ্যাশক্তি দিয়ে। অনন্তকাল চলছে এই খেলা। মুক্তি সকলেরই হবে, আগে আর পরে। তবে মুক্তির পথ এই — সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা। এই দেশে লোক রাজ্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হয় তাই।

স্বামী রাঘবানন্দ — হাঁ, এদেশেই এ সম্ভব। ওদেশে (ওয়েস্ট) Medieval Age-এরও (মধ্যযুগের) অমন সব কথা শোনা যায়।

শ্রীম — হাঁ। ওদেশেও hero-worship (বীরপূজা) আছে। শেষে এটাই অবতারপূজায় দাঁড়ায়। এদেশে এটা সর্বত্র, সর্বদা। অবতারের সকল আচরণ অমূল্য। চৈতন্যদেবের কথায় শোনা যায়, ভাবে তিনি হাত পা ছুঁড়ছেন। ভক্তরা পা ধরে ফেলতেন (হাতে দেখাইয়া) এমন করে। একে ওঁরা বলতেন প্রহার প্রসাদ (হাস্য)।

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ। চৈতন্যদেবের মন মহাকারণে লীন হতো। তাকে বলে মহাভাব। তখন দেশ কাল, অর্থাৎ জগতের জ্ঞান অন্তর্হিত হতো। জড়বৎ পড়ে থাকতেন। ঠাকুরের এই অবস্থা হয়েছিল। ব্রাহ্মণী এসে চিনেছিলেন। এর নিচের অবস্থা, ভাব। তখন ভক্তি ঘনীভূত হয়েছে। তখনই হাত পা ছুঁড়তেন। এর নিচে সূক্ষ্মাবস্থা। এতে নাম-সংকীর্তন, ঈশ্বরীয় গুণগান, কীর্তন, এসব চলে। স্থূল তার নিচে। অবতারে স্থূলদৃষ্টি নাই।

হরি পর্বত — শুনেছি ভগবানদাস বাবাজী ঠাকুরকে চৈতন্যদেব বলে চিনেছিলেন। কলুটোলায় চৈতন্যসভায় চৈতন্যদেবের আসনে ঠাকুর ভাবে বসেছিলেন। একথা শুনে বাবাজী প্রথমে খুব ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন।

শ্রীম — অবতারলীলায় এরূপ হয়। পরে চিনতে পারে বহিরঙ্গ ভক্তগণ। অন্তরঙ্গগণকে পূর্বে চিনিয়ে দেন। ভগবানদাস বাবাজী পরে কত ভক্তি করলেন ঠাকুরকে, তাঁর আশ্রমে যখন গিছলেন। ঐ স্থানটি

কুলটোলায় আর বের করতে পারলেন না। একবার তো আপনি আমাদের নিয়ে গিছলেন। রাস্তা ঘাট সব বদল হয়ে গেছে। জোড়াসাঁকোর হরিসভার স্থানটিও বের হলো না। নূতন শহর হয়ে গেছে।

৪

হরি পর্বত — দেবীসূক্তে পড়ি, 'অপ্‌সু অন্তঃ সমুদ্রে'। এটার অর্থ বুঝতে পারি না।

স্বামী রাঘবানন্দ — 'সমুদ্রে' অর্থ করেন টীকাকাররা 'পরমাত্মায়'। 'অপ্‌সু' মানে জলে, বুদ্ধিবৃত্তিতে, 'অন্তঃ' মানে ভিতরে, মধ্যে। বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যস্থিত যে পরমাত্মা, ব্রহ্মচৈতন্য —তা-ই আমার উৎপত্তিস্থল, অর্থাৎ কারণরূপ।

শ্রীম — এই মন্ত্রের direct (সহজ) অর্থ নেওয়াই মনে হয় ভাল। বাক্‌দেবী আত্মসাক্ষাৎকার করে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেন। বড় বড় কতকগুলি বস্তু ও ব্যক্তির সঙ্গে একাত্মভাব প্রকাশ করে এই মন্ত্র বলছেন। নিজের জন্মদাতা পিতার সঙ্গে একাত্মভাব প্রকাশ করছেন — 'অহং সুবে পিতরং'— আমি পিতাকে প্রসব করেছি, এই বাক্যে। 'অহং অস্য মূর্দ্ধন' — আমি এই জন্মদাতার, পিতারও 'মূর্দ্ধন' — মানে মস্তকে, উপরে। লৌকিক দৃষ্টিতে পিতাই থাকেন উপরে, মানে পূজনীয়রূপে। কিন্তু পরমব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যাবার পর দেখেছেন দেহধারী পিতারও কারণ তিনি। অতএব, পূজ্য পিতারও পিতা তিনি। আর 'মম যোনিঃ', নিজের অধিষ্ঠান বা উৎপত্তিস্থল বলেছেন 'অপ্‌সু অন্তঃ সমুদ্রে'। সমুদ্রে, জলের ভিতরে। অর্থাৎ অতি গভীর স্থানে, লৌকিক দৃষ্টির বাইরে অতিশয় গুহ্য স্থানে। শাস্ত্রে 'গুহাহিতং', 'গুহায়াং' — এসব কথা দিয়ে ব্রহ্মচৈতন্যের নির্দেশ আছ। ব্রহ্মচৈতন্যই আমি।

পিতার দেহ লক্ষ্য করে, আর নিজের আত্মস্বরূপ লক্ষ্য করে এই উক্তি। পরের মন্ত্রাংশের সঙ্গেও সঙ্গতি থাকে এই ভাবে। আমি সমস্ত বিশ্বের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছি অন্তর্যামী রূপে। বৃহদারণ্যকের অন্তর্যামী ব্রাহ্মণের সঙ্গে এর সঙ্গতি রয়েছে। দেবীসূক্তের এই অংশের সঙ্গে আমি সমগ্র বিশ্বের অন্তর্যামী — 'ততো বিশ্বা ভুবনা অনুবিতিষ্ঠে'। এতে ভিতরের

দিকের একাত্মভাব দেখান হয়েছে। এখন বাইরেও 'আমিই' সর্বব্যাপী, এটাই দেখাচ্ছেন। 'উত অমূং দ্যাম্' আর ঐ স্বর্গ, আমি 'বর্ষ্মনা উপস্পৃশামি' — শরীর দিয়ে স্পর্শ করে আছি। অর্থাৎ চতুর্দশ ভুবন ব্যাপ্ত হয়ে আছি। এই বিশ্বের অন্তরেও আমি বাহিরেও আমি।

সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মা। সৃষ্টির পর সর্বভূতের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে পরমাত্মা। আবার সকল সৃষ্ট পদার্থেও পরমাত্মা।

'সদেব সৌম্য ইদমগ্রে আসীৎ', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' — এসব কথার সঙ্গেও মিল রয়েছে।

ঠাকুরও বলেছেন, অন্তরে বাহিরে, মা। আমি দেখছি, বিচার করবো কি? 'Before Abraham was I am' — এব্রাহামের জন্মের পূর্বেও আমি থাকব, বাইবেলে আছে।

একজন সাধু — এই ব্রহ্মাত্মকতা কি সর্বদা থাকে?

শ্রীম — এসব তো intellectual (বোধগম্য) বিষয় নয়। ঠাকুর বলতেন, 'মা দেখিয়ে দিয়েছেন এসব'। বলতেন, 'আগে এ চক্ষে সব দেখতাম, এখন ভাবে দেখি'। এতেই বোঝা যায় সর্বদা intensity (ভাবের গভীরতা) আসে না। মন যেন নৌকোর বাচ খেলা। ঠাকুরের দেখা যেতো — এই পরমব্রহ্মে লীন, আবার ভক্তদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছেন — যেন সাততলা থেকে একতলায় নেমে এলেন।

একজন সাধু — ব্রহ্মজ্ঞানে তো সকলেরই সমান অধিকার — স্ত্রী-পুরুষের?

শ্রীম — হাঁ। তবে ঠাকুর বলতেন, স্ত্রীলোকদের প্রায় জ্ঞান হয় না। বিদ্যাশক্তিদের হয়। সে খুব অল্প, আঙ্গুলে গোনা যায়।

জগৎটা তো রাখতে হবে! মা না থাকলে জগৎ চলে না। তাই স্ত্রীতে জ্ঞান কম — অজ্ঞান, মায়া, স্নেহ, মমতা বেশী। নইলে জগৎ পালন করবে কে? কখন কখন তিনি দু'চার জনকে এর ভেতর থেকে বের করে নেন। এই দেবীসূক্তের দ্রষ্ট্রী বাক্‌দেবী যেমন। আরও কত হয়েছে, হচ্ছে, হবে। ওদেশেও (ওয়েস্টে) জ্ঞানী হয়েছে এমনতর স্ত্রীলোক আছে।

স্বামী রাঘবানন্দ — শাস্ত্রে 'কারণসলিলের' কথা আছে। ওটা কি?

শ্রীম শুনিতে ভুল করিয়াছেন। তাই তিনি কারণশরীরের ব্যাখ্যা

করিতেছেন।

শ্রীম — শরীর, অর্থাৎ এখনও differentiation (ভেদ ভাব) ভিতরে আছে। (বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীদের ভাব আরোপ করিয়া) আমাদের মনে কর ‘নেতি নেতি’ মার্গ। আমরা ‘নেই’ বললেই তো আর ‘নেই’ হয়ে গেল না।

ঠাকুর যা দেখেছেন তাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, কারণ, মহাকারণ, এসব আছে। মহাকারণ যেখানে সব বিরাম — ‘নেতি নেতি যথা বিরাম’।

স্বামী রাঘবানন্দ — কারণশরীর নয় ‘কারণসলিল’।

শ্রীম — ঐ যে পুরাণে আছে, সৃষ্টির সময় সব জলময় ছিল।

স্বামী রাঘবানন্দ — এটা symbolical (প্রতীকমূলক)। কিন্তু কিসের, তা বোঝা গেল না। ঠাকুর নাকি দেখেছিলেন মা-কালীর ঘরে ঐরূপ জল ঢেউ খেলছে।

শ্রীম — জলরাশিকে কেউ কেউ বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে তুলনা করেন। পরমাত্মা-সমুদ্রে বুদ্ধিরূপ জলরাশি।

পরব্রহ্ম, ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট — এই চারটে অবস্থা। সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর মায়াযুক্ত হন। তারপর সৃষ্টির সকল জ্ঞান এসে যায়। বুদ্ধিরাশি, সমষ্টিবুদ্ধির সমাবেশ হয়। তারপর স্থূল জগতের কারণ বিরাটের সৃষ্টি। এই থার্ড stage-কে লক্ষ্য করে একথা বলতে পারেন — ‘কারণসলিল’।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ঠাকুরের কি দৃষ্টি! একদিন বললেন, সব দেখছি মড়া — এই সারা জগৎটা। আমি তার ভিতরে বসে আছি। ‘মৃত্যুঃ সর্বহরং চাহং’ — গীতায় আছে (১০:৩৪)। যা সৃষ্ট তাই মরণধর্মী। কেবল ভগবানই অমর।

আমাদের কি করে রেখেছেন, দেখ না! এই রাত্রি, অনন্ত starry sky (নক্ষত্রখচিত আকাশ)! কি grand mystery (চমৎকার প্রহেলিকা)! দেখছি তো! ভাবছি, এ তো রোজই হচ্ছে। কে করেছেন এ সব, কেন করেছেন — এ ভাবনা নাই। ও মা, সব যে ভুলিয়ে দিচ্ছেন মহামায়া! (আকাশে লক্ষ্য করে) দেখ না, ঐ আকাশ অনন্ত।

একজন ভক্ত — ভক্তরা এই বিরাটের চিন্তা করে নিজের ক্ষুদ্র অহঙ্কারকে ঈশ্বরের দাস বলে মনে করে।

শ্রীম — আর একদিন ঠাকুর বললেন, এই বিশ্বটা একটা শালগ্রাম।

আর তোমার চক্ষু দু'টি তাঁর চক্ষু। তার ভিতর দিয়ে সব দেখছি।

স্বামী রাঘবানন্দ — এর অর্থ কি?

শ্রীম — এর অর্থ, শালগ্রামের ভিতর থেকে সব আসছে। শালগ্রাম তো তাঁরই একটি বিশেষ রূপ!

ঠাকুরের কি সব অবস্থা হতো। কখন কচের কথা দিয়ে নিজের অবস্থা বোঝাতেন। কচ সমাধিস্থ। নিচে মন এলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কি দেখছো? তিনি বললেন, সব ব্রহ্ম দেখছি, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। ঠাকুরও নিচে নেমে এসে বলতেন, দেখছি তিনিই সব হয়ে রয়েছেন, মা।

একজন ভক্ত — ঠাকুর দেখেছিলেন সবই মোম দিয়ে ঢাকা — মোমের বাগান, গাছপালা বাড়িঘর, মানুষ — সব মোম দিয়ে তৈরী।

শ্রীম — হাঁ, মোম মানে ব্রহ্মচৈতন্য, সচ্চিদানন্দ। চৈতন্যদেবের অমন যে শরীর, তাও ভুল হয়ে যেতো ঐ অবস্থায়! কতখানি ভালবাসা হলে ভগবানের জন্য, ওরূপ হয় — শরীর ভুল হয়ে যায়! কখনও সমুদ্রে পড়ছেন, কখনও ভাবে রাস্তায় পড়ে আছেন, দেহের জ্ঞান নাই।

একজন ভক্ত — দেহ ভুল হলেই সংসার ভুল হয়। তখন ঐ অবস্থা, ব্রহ্মলীনতা।

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, ঐ অবস্থায় শরীর একুশ দিন থাকে। তাই শরীর রাখবেন বলে মন নিচে নামিয়ে আনতেন। সকলে ফিরে আসতে পারে না।

৫

জিতেন্দ্রনাথ সেনের প্রবেশ। ভক্তরা তাঁহাকে বড় জিতেনবাবু বলেন। অন্তেবাসী বেঞ্চি ছাড়িয়া তাঁহাকে বসিতে দিলেন। উনি নিজে শ্রীম-র ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিয়া ঘরের পিঁড়ায় বসিলেন। শ্রীম বলিলেন, ওখানে না। নিচে আসন পেতে বসো! এই আসন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — আপনাদের বাড়িতে ছেলেদের পৈতে হল?

বড় জিতেন — আজ্ঞে হাঁ। দু'জনের হল। আর তিনটি বাকী। এদের একজন অষ্টম গর্ভের। ওদের মা বলছেন — না, অন্য দু'ভাই আসুক,

তবে হবে। ঘটা করে কান ফুঁড়ে দেব।

শ্রীম — যেমন ঘটা করে চিকিৎসা, ঠাকুর বলতেন। (সহাস্যে) মেয়েদের ওসব না হলে ভাল লাগে না। লোকজন আসবে। ঢাক ঢোল পিটবে। খাওয়ান দাওয়ান, এসব হবে। পরে ঐ গল্প করবে পৈতেতে পাঁচশ' লোক খাওয়ান হল।

অরুণ (শ্রীম-র জ্যেষ্ঠ পৌত্র) আমার কাছে একদিন গায়ত্রীর অর্থ জানতো এলো। আমি বললাম, হাঁ বলবো। তবে তিনদিন আলুভাতে ভাত, আর গাওয়া ঘি, আর দুধ খেয়ে এসো। তারপর বলবো। আরও সাতদিন করো, (হাস্য) তবে আমি অর্থ বলবো। (সকলের হাস্য)।

(সকলের প্রতি) গায়ত্রী নেওয়ার যখন বিধান আছে তখন নেওয়া ভাল। (একজন সাধুর প্রতি) গায়ত্রী সকালে কুমারী, দুপুরে যুবতী সাবিত্রী, আর সন্ধ্যায় বৃদ্ধা কি?

এবার অন্য কথা হইতেছে।

বড় জিতেন — এবার পেনসন্ নেবো, আর দুই তিন মাস পর।

শ্রীম — কেন? Extension (কর্মকাল বৃদ্ধি) নেবেন না? অমৃতবাবুও নাকি নেবেন শুনছি।

বড় জিতেন — না, আমার নিতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

শ্রীম (রহস্য করিয়া) — মুর্গী খাই না। কেন, না পাই না। (উচ্চহাস্য)।

বড় জিতেন — বড় সংসার। কেউই ছেলেরা লায়েক হয় নাই। ভাইটিও চলে গেল। তাই অভাব।

শ্রীম — অভাবের কিন্তু শেষ নাই। এ নিজের সৃষ্টি। স্বামী বিবেকানন্দকে ঠাকুর বলেছিলেন — ডাল ভাত হতে পারে। ধরেছিলেন কি না মাকে (জগদম্বাকে) বলে দিতে বাড়ির লোকদের খাওয়া পরার ব্যবস্থার জন্যে। দু'চার দিন পরে এসে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, কি হলো? তখন ঠাকুর বললেন, 'বলেছিলাম। মা বললেন, ডাল ভাত পর্যন্ত হতে পারে। এর বেশি হয় না।'

'এর বেশী হয় না' — এর অর্থ কি, না শরীরধারণের জন্য যতটুকু নেহাৎ দরকার তাই হবে। এর বেশী না।

ঠাকুর বলতেন — life simple (জীবনযাত্রা সরল) না করলে

ধর্মজীবনযাপন হয়না। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য তাঁকে ডাকা। তার সময় হয় না যদি life simple (জীবনযাত্রা সরল) না হয়।

মানুষ নানান্‌খানাতে জড়িয়ে অভাবের সৃষ্টি করে, আর উদ্দেশ্য ভুলে যায়। 'সমাধৌ ন বিধীয়তে।' (অন্তেবাসীর প্রতি) 'যামিমাং' — কি আছে?

অন্তেবাসী — যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥ (গীতা ২:৪২)
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্‌।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি॥ (২:৪৩)
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ (২:৪৪)

শ্রীম — 'স্বর্গপরা' অর্থাৎ স্বর্গাদি ভোগের জন্য কর্ম করে। আর তাতেই জড়িত হয়ে যায়, আর উদ্দেশ্যের ভুল হয়ে যায়। ঈশ্বরদর্শন উদ্দেশ্য। হরি মহারাজ বলেছিলেন, হচ্ছে না কেন? অমনি ঠাকুর উত্তর করলেন, 'তুমি জান তুমি কে?' তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। তুমি আবার কে? যদি কর্ম প্রকৃতিতে থাকে, তবে নিষ্কামভাবে ঐ কর্ম কর। তাহলে এতে বন্ধন আসবে না। তাঁকে লাভ করতে পারবে — 'ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি' (গীতা ২:৩৮)।

কেউ সত্ত্ব, কেউ রজঃ কেউ তমতে আবদ্ধ। ব্রহ্মা সৃষ্টি নিয়ে ব্যস্ত। ঋষিরা — সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, সনাতন তাঁর কাছে গেলেন ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশের জন্য। তাঁদের দেখে ব্রহ্মা বললেন, এ সময় আমি কর্মে ব্যাপৃত আছি। তোমরা বসো। তাঁদের সামনেই ধ্যান করতে লাগলেন চক্ষু বুজে। একেবারে সমাধিস্থ। তখন হংসশরীর ধারণ করে এসে তাঁদের উপদেশ করলেন। এই থেকে হংস-উপনিষদের জন্ম।

বিষয়চিন্তা করলে তাঁকে ভুলিয়ে দেয়। বিষয় মানে, এইসব — বাড়িঘর, স্ত্রীপুত্র। আবার রূপ রস গন্ধাদি। এই দুই ত্যাগ হলে তবে তিনি দেখা দেন।

বড় জিতেন (হতাশভাবে) — আর ম'শায় হচ্ছে না। এখন আপনারই ভরসা। বিষয় মনের গোড়ায় ঢুকে রয়েছে।

শ্রীম (ভরসা দিয়া) — না, হবে। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তিনিই করছেন।

তিনিই আবার গুরুরূপে এসে বলে গেছেন, 'তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না। শুধু এই ভাবলেই হবে, আমি কে আর তোমরা কে। ব্যস্। তারপর একটা সম্বন্ধ করে আমার সঙ্গে থাক — দাস, সেবক কি সন্তান।' যদি তাঁর সন্তান মনে করা যায়, তবে তাঁর মত চলতে চেষ্টা করবে।

বড় জিতেন (দুঃখ করিয়া) — 'আমি'-টা গেলে হয়।

শ্রীম (সস্নেহে) — কেন, 'আমি'-টা রেখে দিয়েছেন? না, তবে সৃষ্টি হবে। তাই তো তিনি বললেন।

একজন ভক্ত (স্বগত) — আমার ভাব — আমি নাবালক সন্তান। তিনি পিতা, সব ভার নেবেন।

শ্রীম — শ্রীবাসকে চৈতন্যদেব বললেন — শ্রীবাস, তুমি কার চিন্তা করছো? শ্রীবাস ধ্যান করছিলেন দেখে ঐ কথা বললেন। অর্থাৎ, তুমি যার চিন্তা করছো সেই 'আমিই' তোমার সামনে এসে উপস্থিত। তবে আর কার চিন্তা করছো?

একজন সাধু (স্বগত) — ঠাকুর শ্রীমকে চৈতন্যের দলে দেখেছিলেন। শ্রীম কি শ্রীবাস? উভয়েই পণ্ডিত ও গৃহস্থাশ্রমী। আবার কেহ কেহ বলেন — মুরারী গুপ্ত। শ্রীম ও মুরারী গুপ্ত, উভয়েই শ্রীভগবানের অমৃতবাণীর রক্ষক।

শ্রীম — আবার তিনিই সব করছেন। আবার যুগে যুগে অবতীর্ণ হচ্ছেন। হয়ে তাঁর message (মহাবাণী) দিয়ে যাচ্ছেন।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে॥ (গীতা ৪:৭-৮)

যখন ধর্মের গ্লানি হয়, তখনই আসেন। এসে সব message (উপদেশ) দেন। আবার গ্লানি হয়। আবার আসেন। এইরূপে যুগে যুগে আসেন। গ্লানি হয় কেন? তা না হলে যে আবার আসবার পথ হয় না, তাই।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — কিছুই করতে হবে না। কেবল তাঁকে চিন্তা করা। কি করবে তোমার চিন্তাদ্বারা? কেবল প্রার্থনা — এই উপায়।

যদি বল, তা হলে কিছুই করবার নেই? তার উত্তর, তিনি যদি চেষ্টা

দিয়ে করিয়ে নেন। তা’ তাঁর কাজ। তোমার দ্বারা নয়। তোমার কি সাধ্য? তুমি তাঁকে ধর। চেষ্টাও তাঁরই। সত্ত্ব রজঃ তমঃ, এই তিন গুণে সব আসক্তি। কেউ রজঃতে, কেউ তমেতে। তাই তাঁকে ভুলে যায়। এই সবই বিষয়ের অন্তর্গত।

তিনি অবতীর্ণ হয়ে বলেছেন, ‘আমাকে ধর, ভয় নাই’। দেখ কি রকম কাণ্ড! তিনি এসে কথা ক’ন।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব।

বড় জিতেন — আহারটা বড্ড কমিয়ে দিয়েছেন শুনছি। এক পয়সার রুটি তরকারী রাতে। দুপুরে দেড় ছটাক চালের ভাত। আধ ছটাক ডালসিদ্ধ একটু হলুদ দিয়ে, আর দু’টি পটল, দুধ।

শ্রীম (কথাপ্রসঙ্গ উল্টাইয়া দিয়া) — কাল বেদনা কত! ওমা ‘কথামৃত’ লিখছিলাম, সব ভুলে গেলাম। যেমন মাছটা মরমর, জলে পড়তেই সোঁ করে ছুটে পালাল।

স্বামী রাঘবানন্দ — নিজের element-এ থাকলে ঐরূপ হয়।

শ্রীম — তাই বলে, 'For man shall not live by bread alone' (অন্নই বেঁচে থাকার একমাত্র উপকরণ নয়)।

একজন ভক্ত (স্বগত) — ব্যস্, শ্রীম বলছেন ঈশ্বরকে চিন্তা করতে পারলে আর কিছু চিন্তার দরকার হয় না। সংসার বলে তাদের পাগল, মূর্খ। বস্তুতঃ তারাই পণ্ডিত।

হরি পর্বত প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

স্বামী রাঘবানন্দ (শ্রীম-র প্রতি) — চিঁড়েটা ভিজান আছে, খেয়ে নিলে হয়।

শ্রীম চিঁড়া খাইতে নিচে নামিলেন বিছানা হইতে।

অন্তেবাসী — Double strain (দ্বিগুণ পরিশ্রম) হয় না যদি লেখাটা অন্যে করে।

শ্রীম — হাঁ, যখন আমার সুবিধা, তখন অন্যের হয় না। অন্যের সুবিধার সময় আমার সুবিধা হয় না।

স্বামী রাঘবানন্দ — কেন, আপনি আমাকে ডাকবেন। এ তো আমার সৌভাগ্য! মনে থাকবে, আমি এই বই (কথামৃত) লিখেছিলাম।

শ্রীম ঘরে চিঁড়া খাইতেছেন।

৬

ঠাকুরবাড়ির দ্বিতলের বারান্দায় একটি বেঞ্চিতে উপবিষ্ট স্বামী রাঘবানন্দ ও স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, পূর্বাস্য। সামনের বেঞ্চিতে বসা বড় জিতেন, মনোরঞ্জন ও সুখেন্দু।

বড় জিতেন — জগবন্ধু, তোমাকে খাওয়াতে ইচ্ছে করছে। কি খাবে বল। (স্বামী রাঘবানন্দের প্রতি) এঁদের দেখলে খাওয়াতে ইচ্ছে হয়। এঁরা সব কি হয়ে গেছেন! এমন একটি অবস্থা হয়েছিল, তখন জগবন্ধুকে বললাম এ কর, নয় ত ও কর। বলছে, কিছুই ভাল লাগছে না, জিতেনবাবু। যেন পাখিটা উড়ে উড়ে tired (ক্লান্ত)। তারপর মঠে গিয়ে শান্ত। মাস্তুল পাওয়া গেল।

বড় জিতেন মনোরঞ্জনকে টাকা দিলেন, বড় রসগোল্লা আর ল্যাংড়া আম আনিতে।

সকাল আটটা। চিঁড়া খাইয়া শ্রীম ঘর হইতে বাহির হইতেছেন দক্ষিণমুখী দরজা দিয়া, কথা কহিতে কহিতে।

শ্রীম — ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ উপদেশ ... life simplify (জীবনযাত্রা সরল) করতে হবে। এই হলো তাঁর সব চাইতে বড় কথা।

শ্রীম বারান্দায় বড় জিতেনের সঙ্গে বেঞ্চিতে বসিলেন দক্ষিণ প্রান্তে, পশ্চিমাস্য। তাঁহার সম্মুখে সাধুগণ।

শ্রীম — কি সব কথা হচ্ছিল?

বড় জিতেন — জগবন্ধুকে খাওয়াতে ইচ্ছে হয়েছে। এখানে থেকে থেকে এরা সব কি হয়ে গেল।

শ্রীম — কি বললেন? খাওয়াবেন? বলুন, প্রসাদ খাওয়াবেন। 'জগবন্ধু' — তা, ঠিক। জগবন্ধু মানে ঈশ্বর।

বড় জিতেন (যুক্তকরে) — মশায়, মাফ করুন। ভাষায় গোলমাল।

শ্রীম (সহাস্যে) — তাই 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব' (গীতা ২:৫৪)।

মনোরঞ্জন আম ও রসগোল্লা আনিয়াছেন। শ্রীম তিনতলায় ঠাকুরঘরে পাঠাইয়া দিলেন।

শ্রীম (স্বগত) — কিন্তু ঠাকুরের প্রধান উপদেশ plain living and high thinking. Life simple (সরল জীবন, উন্নত মনন। জীবনযাত্রা সরল) করা, নইলে ধর্মজীবন যাপন হয় না।

‘পারি না’, ‘কি করে হয়’, ‘বড়ই কঠিন’ — এর উত্তর হল, অভ্যাস করতে হয়! Repetition, repetition-এর (অভ্যাস, অভ্যাসের) দরকার।

অর্জুনকে বলেছিলেন দু’টি কথা, — ‘অভ্যাস’ আর ‘বৈরাগ্য’। অভ্যাসের বড়ই দরকার। আমি এটা করবো, ওটা করবো না — এ বলবার যো নাই। তোমার প্রকৃতি তোমায় করাবে। ‘প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষতি’। তবে উপায় আছে। ভক্তদের কল্যাণের জন্য শিখিয়েছিলেন কালীঘরের সামনে চাতালে নিয়ে (শ্রীমকে)। ‘আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়’। প্রার্থনা করেছিলেন, ‘মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না’। ভক্তদের কল্যাণের জন্য তিনি এই পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

একজন ভক্ত (স্বগত) — ঠাকুর, এখন যেমন করিয়ে নিচ্ছ সর্বদাই তা যেন মনে থাকে।

শ্রীম — এই প্রার্থনা repetition (জপ) করতে হয় সর্বদা — ‘মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।’ নিজে শিখিয়ে দিচ্ছেন, lead (পরিচালনা) করছেন।

‘এই দেখ আমি খাচ্ছি’, ব্রাহ্মণী বলেছিলেন ঠাকুরকে। মড়ার মাংস। ‘এই আমি খাচ্ছি’ (হাস্য)! এসব অতি গুহ্য কথা, বলতে নেই। তন্ত্রের সাধনের সময় ব্রাহ্মণী lead (পরিচালনা) করছেন নিজে খেয়ে।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — দেখ, প্রথমে বললেন, ‘প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষতি’। আবার বলছেন, ‘সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ’ (গীতা ১৮:৬৬)।

‘মা শুচঃ’ বলছেন, তুমি ভেবো না প্রকৃতি জয়ের পথ দেখাবেন।

একজন ভক্ত (স্বগত) — আমি দেখেছি, প্রকৃতি যখন প্রবল হয় তখন তাঁর শরণাগত হলে সুফল ফলে। আর কি আশ্চর্য! সাত বছর বয়সে

গীতা ও চণ্ডীকে পবিত্র মনে করতাম। দশ বছরের সময় গীতার শ্লোক মুখস্থ আরম্ভ করি। আরও মনে আছে, ‘চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ’ — এই একটি আর তার উত্তর ‘অভ্যাসেন তু’। আর ‘যো মাং পশ্যতি সর্বত্র’। এখন এইগুলিই আমার সাধন। ঈশ্বরই অন্তর্যামীরূপে এটা করিয়েছেন। তিনি সর্বদা সঙ্গে, তবে ভয় কি?

শ্রীম (স্বগত) — Our Father which art in heaven,
Hallowed be Thy name.
Thy kingdom come. Thy will be done
in earth, as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our debts, as
we forgive our debtors.
And lead us not into temptation, but
deliver us from evil. For Thine is the
Kingdom, and the Power, and the Glory,
for ever, Amen.

শ্রীম — 'Lead us not into temptation' — ঐ, ‘মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।’

একজন ভক্ত (স্বগত) — শ্রীম-র বয়স প্রায় আশী। কত কাজ করেন। কিন্তু কি অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ও মেধা! কি সুন্দর comparative (তুলনামূলক) চিন্তা! তাই মহাপুরুষ। আগে আমাদেরও হতো। এখন

হে স্বর্গনিবাসী জগৎপিতা, তোমার নাম মহিমামণ্ডিত হউক।
এই বিশ্বে তোমার ধর্মরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হউক।
স্বর্গের ন্যায় এই ধরাধামে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।
তোমার কৃপায় যেন আমরা প্রতিদিন আহারপ্রাপ্ত হই।
হে পিতঃ; মানুষ যেমন মানুষের অপরাধ মার্জনা করে,
তুমিও সেইরূপ আমাদের সকল অপরাধ মার্জনা কর।
তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় আমাদের মুগ্ধ করো না প্রভো,
আর সকল অশুভের হাত থেকে সদা রক্ষা কর।
পিতঃ, তুমি বিশ্বের অধিপতি, তুমি সর্বশক্তিমান, তুমি মহামহিম।
ওঁ শান্তি।

আর ওরূপ হয় না।

শ্রীম — ভক্তদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন ঠাকুর, 'মা, এদের তুমি এক একবার দেখা দিও মা। নইলে কেমন করে সংসারে থাকবে মা।'

বড় জিতেন (খেদের সহিত) — তাতো হলো। 'তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি।' — তার কি হবে?

শ্রীম (সহাস্যে) — তাইতো সর্বদা ওই প্রার্থনার কথা বলেছেন। আর কি আছে — 'কালী নামে দাও রে বেড়া'।

বড় জিতেন — 'ফসল তছরূপ হবে না।'

শ্রীম (গান গাহিয়া) — মন রে কৃষিকাজ জান না।

এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা॥
কালী নামে দাও রে বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁষে না॥
অদ্য কিংবা শতাব্দান্তে, বাজাপ্ত হবে জান না।
এখন আপন একতারে, মন রে, চুটিয়ে ফসল কেটে নে না॥
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে, ভক্তিবারি সেঁচে দে না।
একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না॥

শ্রীম (সকলের প্রতি) — গুরু যা বলেছেন পালন করতে হয়। মন্ত্র নিলাম — ওমা, আর কিছু নেই? সব হয়ে গেল? একমাস অন্ততঃ কর পালন।

বড় জিতেন — এইবার retire (অবসর গ্রহণ) করবো। কোথায় থাকলে ভাল হবে?

একজন সাধু — কেন, কাশীতে থাকবেন।

বড় জিতেন — এখানকার মত কি কাশী! এখানে যে সব আছে!

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, এক পোয়া দূরে একটু ভজনের জায়গা করতে হয়।

স্বামী রাঘবানন্দ — এক পোয়া কি quarter of a mile (সিকি মাইল)?

শ্রীম — না, Half a mile (অর্ধ মাইল)।

বড় জিতেন — তীর্থে ফীর্থে কী হবে? এমন সব রয়েছেন। আপনি আছেন। এখানকার মত স্থান কোথায়?

শ্রীম — এইখানে (ঠাকুরবাড়িতে) ঠাকুর রয়েছেন। তা যদি এখানেই সাধন করে কেউ, তাঁকে দেখতে পারে। তাহলেই এই তীর্থ। তবে যদি সর্বত্যাগী ডাকেন তবে হয়। যেখানে অনেক লোক তাঁকে দর্শন করেছেন, কেউ দর্শনের জন্য ডাকছেন, তাকেই বলে তীর্থ।

স্বামী রাঘবানন্দ — আমরা কিন্তু একটা স্থানে স্থির হয়ে বসতে পারলে বাঁচি। সর্বদাই মন যেতে চাইছে।

শ্রীম ও স্বামী রাঘবানন্দ (একসঙ্গে) — আবার আলস্য এরূপ হয় নড়তে চায় না (শ্রীম-র হাস্য)।

বড় জিতেন (করজোড়ে) — বলুন, আমার হউক।

বড় জিতেনের হৃদয়ে অপূর্ব বিশ্বাস! শ্রীম বলিলেই তাঁহার শান্তি লাভ হইবে।

বড় জিতেন প্রদত্ত আম ও রসগোল্লা ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া মনোরঞ্জন দোতলায় লইয়া আসিয়াছেন।

শ্রীম (মনোরঞ্জনের প্রতি) — দিন, হাতেই দিন। জগবন্ধুকে আগে দিন। এ বড় আমটা আগে দিন।

জগবন্ধু (স্বামী রাঘবানন্দকে দেখাইয়া) — এঁকে দিন।

শ্রীম — না, তুমি ন্যাও।

জগবন্ধু (মনোরঞ্জনের প্রতি) — এঁকে দিন।

শ্রীম (দুঃখিত হইয়া) — ফ্রেণ্ডদের কথা শুনতে হয়। বুড়োদের কথা শুনতে হয়। 'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্'।

স্বামী রাঘবানন্দ আমটা হাতে লইয়া জগবন্ধুর হাতে দিলেন। জগবন্ধুর তখন চৈতন্য হইল। লৌকিকতার অনেক ঊর্ধ্বে শ্রীম-র দৃষ্টি। বড় জিতেনের আন্তরিক ইচ্ছা জগবন্ধুকে খাওয়ান। শ্রীম তাই তাঁহাকে উহা আগে দিতে বলিলেন। মহাপুরুষদের আদেশের উপরও নিজের লৌকিকতাকে স্থান দিয়াছেন বলিয়া জগবন্ধু মর্মাহত। তিনি ভাবিতেছেন, 'স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত' — এই মহাবাক্য আমি পালন করতে পারলাম না।

সাধুরা আম খাইতেছেন। জগবন্ধুর হাত হইতে রসগোল্লার রস মেঝেতে পড়িতেছে। তিনি উহাতে চঞ্চল হইয়াছেন। শ্রীম তাঁহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন, ও আমরা করে নেব।

সকলের হাতেই আম ও রসগোল্লা।

শ্রীম (সহাস্যে) — যিনি বাঁটেন তাঁকে কেউ বলে না, তুমি নাও। তাই পাণ্ডারা খুব হুঁশিয়ার। যদি কেউ ভোগ দেয়, নিজের ভাগটা আগে রেখে তারপর তাকে প্রসাদ দেয়।

বড় জিতেনবাবুর একটি ছেলে আসিয়াছে শ্রীমকে প্রণাম করিতে। শ্রীম সাধুদের দেখাইয়া বলিলেন — এঁদের প্রণাম করো। কল্যাণ হবে। ছেলে প্রণাম করিল।

বড় জিতেনবাবুর ছেলেরা কেহ কেহ লায়েক হইয়াছে, কিন্তু কেহই কোন কর্ম করে না এখনও। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া কথা বলিতেছেন শ্রীম।

শ্রীম (জনান্তিকে) — মা একজনকে বলেছিলেন, ছেলেরা কুলি খেটে খাক্ না — ঘরে বসে বসে খাচ্ছে দেখে। বলেছিলেন, তুমি কেন ভগবানের পথ থেকে বিচলিত হবে এদের খাওয়ানোর জন্য? বড় হয়েছে, এখন কাজ করুক। নয়তো কুলি খেটে খাক্। (হাস্য)। (ছেলের প্রতি) কি বল তুমি?

ছেলে — তা হলে যে সকলেই কুলি হয়ে যাবে।

শ্রীম (হো হো হাস্যে) — সকলেই কুলি হয়ে যাবে! সে ভয় নাই। কিন্তু যারা ভগবানের পথে যাবে তাদের বলেছেন। সকলকে বলেন নাই।

বড় জিতেন জুতা মোজা লইয়া শ্রীমকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিতেছেন। স্থূল শরীর, ঘর্মাক্ত কলেবর।

শ্রীম (ছেলের প্রতি) — তুমি যাও না উপরে, প্রণাম করে এসো ঠাকুরকে। কষ্ট হয়, তাই উনি উঠতে পারেন না।

স্বামী রাঘবানন্দ —কেন আপনি তো যান।

বড় জিতেন — বড় ভারী শরীর।

স্বামী রাঘবানন্দ — আবার সিঁড়ি ভেঙ্গে না পড়ে (সকলের হাস্য)।

শ্রীম (সহাস্যে) — দুটি considerations (বিবেচ্য বিষয়) একটা — যিনি উঠবেন, আর একটা — যার (কাঠের সিঁড়ির) উপর উঠবেন। (সকলের উচ্চ হাস্য)।

বড় জিতেন সিঁড়ির গোড়ায় প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীমকে বলিতেছেন — আচ্ছা, আমি যদি ওখান থেকে (বাড়ি থকে) আপনাকে

প্রণাম করি তা' হলে হবে? শ্রীম উত্তর করিলেন, হাঁ হবে। আমাদের কেন, ঠাকুরকে। বড় জিতেন বলিলেন — হাঁ আপনারা, ঠাকুর, সবই।

সকাল নয়টা। শ্রীম স্নান করিতে নিচে নামিলেন। অন্তেবাসী বিদায় লইতেছেন। শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাবে? উনি উত্তর করিলেন, বেলেঘাটা। শুকলালবাবুকে দেখতে যাব। অসুখের সময় পত্র লিখেছিলেন দেওঘরে। আসতে পারি নাই। শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন পুনরায়, ওখানেই খাবে? অন্তেবাসী বলিলেন, আজ্ঞা হাঁ। শ্রীম পুনরায় বলিলেন, বেলা হয়ে গেল। অন্তেবাসী বলিলেন, মনোরঞ্জনের সঙ্গে রিক্সা করে চলে যাব। অন্তেবাসী ও মনোরঞ্জন ডাক্তার বি. রায়ের বাড়ি হইয়া রিক্সাতে বেলেঘাটা পৌঁছিলেন সওয়া দশটায়।

রাত্রি আটটা। ঠাকুরবাড়িতে আরতি হইতেছে। ভক্তগণ গাহিতেছেন, 'কনকাম্বর কমলাসন'। শ্রীম ছাদে বসা। আরতি শেষ হইলে শ্রীম নিজ হাতে দুইটি পাতায় প্রসাদী ফলমিষ্টি রাখিলেন। একটা পাতা নিজ হাতে স্বামী রাঘবানন্দকে দিলেন। অপর পাতাটি হাতে লইয়া পিছনে পূর্ব দিকে ফিরিয়া বলিতেছেন, কই জগবন্ধু সাধু মহারাদের সেবা হোক্। জগবন্ধু দাঁড়াইয়া জোড় হাতে প্রসাদের পাতা লইলেন। আর মাথায় ঠেকাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ তো মহামৃত! কি সৌভাগ্য আমাদের! শ্রীভগবানের পার্ষদ নিজ হস্তে এই স্থূল প্রসাদের সঙ্গে দিচ্ছেন ভক্তি বিশ্বাস, অভয় ও অহেতুক ভরসা।

শ্রীম বলিলেন, সকলকে দেওয়া হয়েছে প্রসাদ? একজন বলিলেন, কমলবাবু বাকী, আহ্নিকে আছেন। শ্রীম সাহাস্যে উত্তর করিলেন, তিনি ধ্যানে আছেন বুঝি? (সকলের হাস্য)। ধ্যান করতে গিয়ে এদিক যে হয়ে যাচ্ছে।

অন্তেবাসী রাত্রিতে শুইলেন 'নাটমন্দিরে', ঠাকুরের সামনে। স্বামী রাঘবানন্দ বলাই ও সুখেন্দু শুইলেন ছাদে। আজ বড় গরম।

ঠাকুরবাড়ির ছাদ। প্রভাত। সাধু ও ভক্তগণ বিছানায় বসিয়াই ধ্যান করিতেছেন। শ্রীম আসিয়া 'নাটমন্দিরে' দাঁড়াইলেন। ঠাকুরঘরের ভিতর হইতে একটা ছোট নর্দমা নাটমন্দিরের পশ্চিম গা দিয়া দক্ষিণ দিকে যায়। উহা মেরামত করা হইয়াছে। শ্রীম দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, আচ্ছা এখানে

জল দিলে যাবে কি, কে জানে? সুখেন্দু খানিকটা জল আনিয়া ঢালিয়া দিলেন। শ্রীম বলাইকেও বলিলেন — বলাইবাবু, দাও না একটু জল। বলাইও জল ঢালিলেন। সুখেন্দু ছাদের উপর ও অন্য এক স্থানে দুই তিনবার জল ঢালিলেন। ছাদের সঙ্গেও নর্দমার যোগ আছে।

শ্রীম — রাত্রি একটা দুটো থেকে কেবল ঐ ভাবছি, ছাদের নর্দমার কি হলো? সারারাত ঘুম নাই।

অন্তেবাসী — আচ্ছা, এ কি জন্য হয় — old age বলে, না অন্য কিছু কারণে?

শ্রীম (অর্ধ উপহাসের সহিত) — মন যে রঙে ছোপাবে, সেই রঙে রঙিন হবে। ধোপাঘরের কাপড়!

অন্তেবাসী (স্বগতঃ) — সে তো কাঁচা মনের। আপনাদেরও কি তাই? (প্রকাশ্যে) মায়ের সেবকদের কাছে শুনতে পাই, মা রাধুর নানা কাজ নিয়ে থাকতেন। তাতে কেউ কিছু মন্তব্য করলে ভারি অসন্তুষ্ট হতেন। ভক্তরা এর অর্থ করেন, তাঁদের মন অতি উচ্চে সর্বদা থাকে। লোককল্যাণের জন্য সামান্য বিষয় অবলম্বন করে তা নিচে নামিয়ে রাখেন।

শ্রীম (সহাস্যে) — হাঁ, আবার —

'ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে॥ (গীতা ৪:১৪)

আবার আছে — যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥
(গীতা ৩:২৩-২৪)

এও আছে।

সুখেন্দু (ঠাকুরঘরের পাশের নর্দমাটা দেখাইয়া) — এ স্থানটা একটু নিচু করলে হয়।

শ্রীম — না, তাহলে বেশী বিল করবে। কাজ নেই।

জল আটকাইয়া আছে। অন্তেবাসী হাতে জল সরাইতেছেন।

শ্রীম — এই রকম করলে তো যাবে। কিন্তু, আপনা আপনি যাওয়া চাই।

সমস্ত বাড়ি মেরামত করা হইতেছে। ভাই ভূপতির একজন ভক্ত, কন্ট্রাক্টার।

শ্রীম ছাদে দাঁড়াইয়া আছেন, মধ্যস্থলে পূর্বাস্য। শ্রীম-র সামনে দাঁড়ানো অন্তেবাসী দক্ষিণাস্য, নর্দমার সম্মুখে। শ্রীম বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, ঐ দেখুন! অন্তেবাসী চকিতে পিছনে তাকাইয়া দেখিলেন, আকাশের গায়ে বালসূর্য উঁকি মারিতেছে। গোলাকার মণ্ডল। উপরের দিকটা সামান্য চ্যাপটা। সূর্যমণ্ডলের উপর নিবিড় কৃষ্ণ মেঘমালা বিস্তৃত। নিচে দূরে তিনটি খেজুর বৃক্ষ।

একজন সাধু — কি আশ্চর্যময় এই মহাপুরুষদের চরিত্র। নিজে বলছেন, এ কাজের চিন্তায় রাত্রিতে নিদ্রা নাই। আবার ঐ সঙ্গেই দৃষ্টি পরব্রহ্মে সমাসীন।

শ্রীম সোজাসুজি একতলায় নামিয়া গেলেন। ভৃত্য জীবকে দিয়া ফটকের পাশের ঘরের সমস্ত রাবিশ পিটাইয়া সমান করাইতেছেন। একজন সাধু আসিয়া এই স্থানে দাঁড়াইলেন। শ্রীম তাঁহাকে দেখিয়া বলিতেছেন, ওপরে বড্ড গরম দুপুর বেলায়। ভাবছি, এখানে এসে থাকবো তখন।

দুইজন সাধু ছাদে বসিয়া ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন। তাঁহারা শ্রীম-র অপেক্ষা করিতেছেন, সকালে শ্রীম ঈশ্বরীয় কথা কহিবেন আশায়। পরে শুনিলেন, আজ উপরে আসিবেন না। অমনি একজন সাধু নিচে নামিয়া গেলেন। সিঁড়ির পাশে একটি ছোট জলের চৌবাচ্চা। সাধু দেখিলেন, শ্রীম সেই চৌবাচ্চার জলে হাত ডুবাইয়া কি যেন খুঁজিতেছেন। চৌবাচ্চাটি চুন-বালিমিশ্রিত জলে বার আনা পূর্ণ। দেড় হাতের বেশী জল। সাধুকে দেখিয়া শ্রীম বলিলেন, এটা কি ফুটো হয়ে গেল নাকি? জল বেরিয়ে যাচ্ছে। সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করতে হবে। বস্তা কোথায় সিমেন্টের? সুখেন্দু পাশে বারান্দায় বসিয়া ঠাকুরপূজার বাসন মাজার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

সাধু শ্রীমকে বলিলেন, আপনি হাত উঠিয়ে নিন, আমি দেখছি। শ্রীম হাত উঠাইয়া লইলেন। শ্রীম-র বাম হাতের কনুইয়ের কাছে গরম কাপড় জড়ান। নিউরলজিক ব্যথা হয়। কালও হইয়াছিল।

সাধু জলে হাত ডুবাইয়া দেখিলেন, নিচে প্রায় আধ হাত পুরু বালির একটা স্তর। তারও নিচে হাত দিয়া দেখিলেন, চৌবাচ্চার জল বাহির হইবার ছিদ্রটা খোলা, বালিতে ঢাকা। ঐ পথে জল বাহির হইতেছে চুঁয়াইয়া । শ্রীমকে এই কথা বলায়, তিনি বলিলেন, আমিও ভাবছি কি হলো। এখন এটা উঠালে হয়।

সাধু — একটা টিন চাই।

শ্রীম — ঐ যে রয়েছে একটা।

সাধু (এক টিন পূর্ণ করিয়া সুখেন্দুর প্রতি) — তুমি ধর আমি একা পারছি না উঠাতে।

শ্রীম পাশেই দাঁড়াইয়া আছেন। বলিলেন, ঐখানে রাখ।

শ্রীম (সুখেন্দুর প্রতি) — কুলকুচো করে আসুন। হাতে পায়ে জল দিন। এতে আছে কিছু গোলমাল।

সুখেন্দু হাতে পায়ে জল দিয়া, কুলকুচো করিয়া পূজার বাসন মাজিতে বসিলেন।

শ্রীম (বালকের ভাবে সাধুর প্রতি) — সুখেন্দুবাবু বলেন, আমার বড় ছুঁচিবাই। সাধু হাসিতেছেন। সুখেন্দুবাবু বড় কর্মের লোক! চটপট সব করতে পারেন। তাড়াতাড়ি করেন, এইজন্য হাতটাত লেগেছে।

(সহাস্যে) সাধুদের প্রহার, পদপ্রহার, প্রসাদ খেলে ভাল। (সুখেন্দুকে একটি সাধু ঠাকুরবাড়িতেই প্রহার করিতে গিয়াছিলেন। তিনিও ওখানে থাকেন।)

সুখেন্দু — ভক্তি চটে যায়।

শ্রীম — না, ওতে ভাল। মা'র কাছে সর্বদাই আদর পায়। বাপ শাসায়। মা লুকিয়ে খেতে দেয়।

এতক্ষণ সুখেন্দুর মনে সুনামের প্রলেপ দিলেন। এখন কর্মরত সাধুর মনে ঐ প্রলেপ দিতেছেন।

শ্রীম (সুখেন্দুর প্রতি) — জগবন্ধুর ইচ্ছা না হলে গাছের পাতাটিও নড়ে না। এই দেখ না, জগবন্ধু এসে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। (সাধু বালি উঠাইতেছেন)

একটা গল্প আছে। শুনেছি একজনের খুব পেটের অসুখ। ভক্ত

লোক। বাহ্যে যাচ্ছে, জল তুলবার ক্ষমতা নেই। একটি সুপুরুষ এসে জল দিচ্ছেন। ভক্তটি বললেন, আপনি কে আমায় জল দিচ্ছেন? লোকটি বললেন, তুমি যার চিন্তা কর দিনরাত, আমি তিনিই। ভক্ত বললেন, যদি এতই কষ্ট করছো, তবে রোগ সারিয়ে দিলেই তো হয়ে যায়। ঠাকুর বললেন — তা হবে না বাবা! তা হয় না। (শ্রীম-র উচ্চ বিলম্বিত হাস্য)। রোগ সারবে না। ও ভুগতে হবে।

নারদ রামকে বললেন, তুমি রাবণবধ করতে এসেছো, তা করছো না। অন্য সব কাজ করছো। রাম হেসে বললেন, দাঁড়াও রাবণের কর্ম একটু বাকী আছ, তা হয়ে যাক।

একটি সাধু (স্বগতঃ) — শ্রীম কি নিজের কথা বলিতেছেন। তিনি ছুটি চান। পাইতেছেন না। একজনকে দুঃখ করিয়া পুরীতে বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুর বলেছিলেন, মা আমায় বলেছেন তোমাকে তাঁর একটু কাজ করতে হবে। পঞ্চাশ বছর ধরে কাজ করছি। এখনও ছুটি দেন না।'

সাধু (প্রসন্নভাবে শ্রীম-র প্রতি) — এই রুগ্ন ভক্তটি কে — মাধুদাস, জগন্নাথী মাধুদাস কি?

শ্রীম — শুনেছি, নাম জানি না।

সাধু — ভক্তমালে আছে এ গল্পটি। আবার জগন্নাথ কাঁঠাল গাছে তুলে বেদম মার খাইয়েছিলেন। (শ্রীম-র দীর্ঘ হাস্য)।

শ্রীম (সহাস্যে) — গাছে তুলে বেদম প্রহার!

সাধু — কিন্তু পাণ্ডাদের স্বপ্নে বললেন জগন্নাথ, আমাকে আজ মেরেছে। তাতে জ্বর হয়ে গেছে। আজ আর খাওয়া হবে না। এতেও দেখালেন, ভক্ত ও ভগবান এক।

দুই টিন বালি উঠিয়াছে। আর এক টিনের দরকার।

সাধু (শ্রীম-র প্রতি) — কোন্ টিন নেবো?

শ্রীম — 'বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা — যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা'।

সাধু একটা ড্রামে ভিজা বালি চুন উঠাইতেছেন।

শ্রীম (সহাস্যে) — কল্যাণানন্দকে মঠ থেকে পাঠিয়েছিল। সে মঠে লিখলে, মশায় আমি স্থূল কাজ করতে পারি না। এই চন্দন ঘষা প্রভৃতি কাজ করতে পারি। হাঁড়ি মাজতে দিছলো (হাস্য)।

সাধু — এখন তো সব স্থূল নিয়ে আছেন।

শ্রীম (রহস্য করিয়া) — অনুলোম বিলোম আছে না? তাই। আর একজন বলে, আমি সূক্ষ্মেতে থাকবো, ধ্যানে। তার স্থূলেতে মন থাকতে চায় না। (হাস্য)।

সাধু — একটু স্থূলেতে মন রাখা ভাল।

শ্রীম — তা আর বলতে! উটি (খাওয়া) হবে কি করে নইলে — চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়? তবে সাধুরা নিজে খান না — তাঁকে খাওয়ান!

সাধু একটা শাবল দিয়া খুঁটিয়া সব চুন বালি বাহির করিলেন। চৌবাচ্চা পরিষ্কার। সব জল বাহির হইয়া গিয়াছে। নল খুলিয়া শুদ্ধ জলে ধোওয়া হইয়াছে।

শ্রীম (সহাস্যে) — যাও, এবার তুমি যাও। এবার গিয়ে সূক্ষ্মে থাক।

সাধু স্বামী রাঘবানন্দের ঘরে গেলেন দোতলায়। ভক্ত নববাবু দুইটি ডাব আনিয়াছেন। একটি ঠাকুরের সেবার জন্য, অপরটিতে সাধুসেবা হবে। ইতিপূর্বে স্বামী রাঘবানন্দ সাধুকে ডাকিয়াছিলেন ডাব খাইতে। উনি কাজ ছাড়িয়া আসেন নাই। সাধু ডাব খাইবেন। কিন্তু কলতলায় উঁকি দিয়া দেখিলেন, শ্রীম-র হাতে চৌবাচ্চার জলের পাইপ। উনি ধরিয়া রাখিয়াছেন। একটি কুলি নারিকেলের ছোবড়া দিয়া ঘষিয়া সাফ করিতেছে। সাধু ডাব খাইলেন না, নিচে নামিয়া গিয়া শ্রীম-র হাত হইতে পাইপটা লইলেন। বলিলেন, আপনার হাতে এখনও বেদনা চলছে — ফ্ল্যানেল বাঁধা রয়েছে। শ্রীম বলিলেন — এতে কি হবে, কত হচ্ছে। যাহা বাহান্ন তাহা তিপান্ন। শ্রীম গিয়া বারান্দায় বসিলেন। বলিলেন, কর্তা হলে এসব করতে হয় — এই এত সব!

নববাবু নিচে আসিয়া পাইপ ধরিলেন। সাধুকে উপরে গিয়া ডাব খাইতে বলিলেন। শ্রীম জোর করিয়া সাধুকে উপরে পাঠাইলেন। চৌবাচ্চা আবার সাফ করাইতেছেন।

একটি সাধু শ্রীম-র ঘরে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখেই ঠাকুরের কথার ডায়েরী পড়িয়া আছে। তিনি ১৮৮২-৮৩ খ্রীস্টাব্দের কিছু লেখা দেখিলেন। ঠাকুরের শরীরত্যাগের পরের ঘটনাও কিছু লেখা আছে। কিন্তু সব বুঝিবার উপায় নাই। নিজের আবিষ্কৃত বাংলা শর্টহ্যাণ্ডে লেখা। গতকালের লেখা পাঁচ পৃষ্ঠার কথামৃতও দেখিলেন।

অন্তেবাসী এবার বেলুড় মঠে যাইবেন। ঠাকুর প্রণাম করিয়া তিনি নিচে শ্রীমকে প্রণাম করিতে গেলেন। শ্রীম ফটকের পাশের ঘরের মেঝে ঠিক করাইতেছেন। খুব ধূলা। অন্তেবাসী চট করিয়া শ্রীম-র পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলেন। উনি পায়ে হাত দিতে দেন না। তাই বাধা দিয়া বলিতেছেন — না, না।

শ্রীম-র জ্যেষ্ঠ পৌত্র অরুণ প্রবেশ করিলেন। অরুণ অন্তেবাসীর পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। সাত দিন হয়, তাহার বিবাহ হইয়াছে। শ্রীম বলিলেন অরুণকে — অমনি না, সাষ্টাঙ্গ। সাষ্টাঙ্গ পার?

অরুণের গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী। সে বিনীতভাবে বলিল, চেষ্টা করছি। শ্রীম বলিলেন, সাষ্টাঙ্গ মানে জান কি? আট অঙ্গ দিয়ে প্রণাম — দুই হাত, দুই পা, দুই জানু — এই ছয়, আর বক্ষ আর মস্তক — এই আট অঙ্গ।

অরুণ বড় ফাঁপরে পড়িল। নূতন বিবাহের ট্যাক্স দিতে গিয়া সুন্দর নতুন ধবধবে সিল্কের পাঞ্জাবীসহ রাবিশের ধূলায় হাঁটু পর্যন্ত গাড়িয়া প্রণাম করিল।

শ্রীম বলিলেন, না না — হলো না। এই কনুই দুটি লাগবে মাটিতে। অরুণ অগত্যা তাই-ই করিল। তাহার দুই হাতের জামা কনুই পর্যন্ত ধূলায় ধূসরিত। শ্রীম-র চোখে মুখে বালকের দুষ্ট হাসি। অরুণকে বলিতেছেন, সাধুদের এই রকম প্রণাম করতে হয়। আজকাল আবার জুতো পায়ে দিয়েই প্রণাম করে পায়ে হাত লাগিয়ে।

শ্রীম অন্তেবাসীকে বলিলেন— আচ্ছা, আসুন আপনি।

অন্তেবাসী ঠনঠনে কালীতলায় প্রণাম করিয়া উঠিয়া দেখিলেন, যতীন শ্রীম-র কাছে যাইতেছেন, সঙ্গে কাশ্মীরের ভক্ত অমরনাথ। তিনি কাল সবে মঠে আসিয়াছেন জয়রামবাটী দর্শন করিয়া।

অন্তেবাসী বাসে শ্যামবাজার, তারপর এটর্নি বীরেন বসুর বাড়ি হইয়া বরানগর দিয়া কুঠিঘাটে আসিলেন। খেয়ায় স্বামী ধীরানন্দও পার হইতেছেন। খেয়ায় আরও সাধুরা ছিলেন। কানাই চন্দ্রকিশোর ও রমেশ বিদ্যাপীঠ হইতে আসিয়াছেন। আর প্রিয়নাথ আসিয়াছেন কাঁথি হইতে। স্বামীজীর মন্দিরের পিছনে সাধুরা খেয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন।

বেলুড় মঠ।
১৬ই মে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ, বৈশাখ ১৩৩৮ সাল, সোমবার।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

নবীন তীর্থ

১

কলিকাতা, গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ি। অপরাহ্ন চারটা। নিচের তলার কলতলায় শ্রীম নগ্ন গায়ে গামছা পরিয়া হাতমুখ ধুইতেছেন। আজ ২৫শে মে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার।

একজন সাধুর প্রবেশ। শ্রীমকে যুক্ত করে তিনি প্রণাম করিলেন। শ্রীম বলিলেন — এই যে আসুন, উপরে গিয়ে বসুন। সাধু বহুকাল পর শ্রীম-র নগ্ন শরীর দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, আহা এই শরীর কি হয়ে গেছে — অর্ধেক একেবারে! শ্রীম পুনরায় বলিলেন, হাঁ তুমি ওপরে গিয়ে বসো।

আড়াইটায় সাধুটি বেলুড় মঠ হইতে খেয়া নৌকায় ব্রহ্মচারী বিজয়ের সঙ্গে পার হইয়া কুঠিঘাটে আসেন। তারপর তিনি ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত পুণ্যস্থানগুলি দর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

প্রথম দেখিলেন বরানগর মঠ। বরানগর মঠের মাটি মাথায় করিয়া সাধু ভাবিলেন, কি পবিত্র ভূমি! এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের apostle-রা (অন্তরঙ্গরা) বাস করেছিলেন প্রথম অবস্থায়। তাঁদের কি বৈরাগ্য! ঈশ্বর সম্বল, জগতের জ্ঞান নাই। ব্রহ্মানন্দে মগ্ন। এখানে পূর্বের ঐ ভাব নিয়ে একটি মঠ হলে বেশ হয়। কৌপীন সম্বল। অনাহারে, অর্ধাহারে ভগবৎধ্যানে সকলে মগ্ন।

তারপর দেখিলেন কাশীপুর শ্মশান। শ্মশানে আগুন জ্বলিতেছে। সাধু ভাবিলেন — কি পুণ্যভূমি এই স্থান! কালে হয়ত মহাতীর্থে পরিণত হবে এই স্থান, যেমন বুদ্ধদেবের দাহস্থান কুশিনারা। এইখানে ভগবানের নরকলেবর অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি, তারপর গঙ্গা। অপর পারে বেলুড় মঠ!

কাশীপুর উদ্যান দেখিলেন বাহির হইতে। এখানে একজন আর্মেনিয়ান সাহেব থাকেন। এখানেই মহাসমাধিতে মগ্ন হইয়াছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ।

সাধু বাসে আসিলেন শ্যামবাজার। তারপর গেলেন ৫৫ নম্বর শ্যামপুকুর। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ হইয়া চিকিৎসার জন্য প্রথম কয়েক মাস ছিলেন।

সাধু পায়ে হাঁটিয়া শ্যামপুকুর হইতে চলিতেছেন কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট দিয়া। মানিকতলা স্কোয়ারে ললিতবাবুর সঙ্গে দেখা হইল। তারপর আসিলেন ঠাকুরবাড়ি।

ঠাকুরবাড়ির দোতলার বড় ঘরে সাধু ও ভক্তের মজলিশ বসিয়াছে। স্বামী রাঘবানন্দ, স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, বলাই, খগেন ডাক্তার প্রভৃতি বসা। এরই পশ্চিমের ক্ষুদ্র কক্ষে শ্রীম বসিয়া আছেন একা। এখন পৌনে পাঁচটা। রাজামুণ্ড্রির ভক্ত শিক্ষক কৃষ্ণমূর্তির প্রবেশ। অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। শ্রীম খগেন ডাক্তারকে ডাকিয়া আনাইলেন। কথামৃত লেখা হইবে এখন। সাধুরাও সঙ্গে উঠিয়া পাশের ঘরে গেলেন।

শ্রীম খাটের উপর পূর্বাস্য বসিয়া আছেন, হাতে ডায়েরী। এক কোণে খগেন, অপর কোণে স্বামী রাঘবানন্দ বসিয়াছেন। একজন সাধু শ্রীম-র পিছনে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি দেখিলেন, শ্রীম ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী, বাংলা ১২৪৪ সাল বাহির করিলেন, একটি বড় কপি বুক হইতে। তিনি বিস্ময়ে ভাবিতেছেন! কি আশ্চর্য — এই সামান্য লেখা থেকে কি বিরাট development (সম্প্রসারণ)! অবাক হতে হয় দেখে। মনে হয়, এই অদ্ভুত মহাপুরুষটিকে দৈবী মেধা ও স্মৃতিশক্তি দিয়ে তৈরী করে ঠাকুর সঙ্গে করে এনেছেন। এ যেন ফটোগ্রাফের স্লাইড। যা শুনেছেন তাই মস্তিষ্কে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে। আরও মনে হচ্ছে, শ্রীম কথামৃত লেখার সময় ঠাকুরের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন মনে। সেই শুদ্ধ সমাহিত মনে যা উদয় হচ্ছে তাই লিখছেন পূর্বে রক্ষিত নোট অবলম্বন করে। স্বামীজী ঠিক বলেছেন এই কথাই — 'It has been reserved for you this great work. He is with you evidently' (কথামৃত-রচনারূপ মহাকার্যটি পূর্ব হইতেই আপনার জন্য রক্ষিত ছিল। ইহাতেই প্রমাণিত হয় শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার ভিতর বিরাজিত)। মা-ও বলেছেন, ‘তোমার নিকট

তাঁহার যে সমস্ত কথা আছে তাহা সবই সত্য। একদিন তোমার মুখে শুনিয়া বোধ হইল, তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন। এক সময় তিনিই তোমার কাছে এ সকল যাহা বলিয়াছিলেন এক্ষণে আবশ্যকমত তিনিই তাহা প্রকাশ করাইতেছেন।'

এখন লেখা হইতেছে, শিমুলিয়া ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুর আসিয়াছেন। সভক্ত কেশব সেন উপস্থিত। আর আসিয়াছেন নরেন্দ্র, রাখাল, বলরাম, মাস্টার প্রভৃতিও।

সাধু দেখিলেন, শ্রীম-র খাতায় তাঁহার নিজের আবিষ্কৃত বাংলা শর্টহ্যাণ্ডে লেখা — 'কামারশালের নোয়া'। ইহা হইতে শ্রীম সৃজন করিলেন এইরূপ — 'সংসারে হবে না কেন? মন কামিনীকাঞ্চনে বন্ধক হয়েছে। মন যেন কামারশালের নোয়া। যতক্ষণ আগুনে ততক্ষণ লাল, টেনে আনলেই যেই নোয়া সেই নোয়া। নিঃসঙ্গ, নয়ত সাধুসঙ্গ। নিঃসঙ্গে মন অনেক শুকিয়ে যায়। যেমন ভাঁড়ের জল শুকিয়ে যায়। তবে যদি গঙ্গাজলের জালায় ভাঁড় থাকে শুকোয় না।'

রাত্রি আটটা। কেশব সেন সব ভুলিয়া গেলেন। উপাসনা হইতেছে না। ঠাকুর পদ্ধতি অনুসরণ করিতে বলিলেন। কেশব ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ। কেশব সেন ঠাকুরকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, পড়িয়া না যান। তারপর দুপুর রাত পর্যন্ত কীর্তন ও নৃত্য।

সাধুটি প্রথমে দাঁড়াইয়া শ্রীম-র নোট দেখিতেছিলেন, সৃজনী বাণী শুনিতেছিলেন। তারপর মেঝেতে হাঁটু গাড়িয়া বিছানায় ঝুঁকিয়া ঐরূপ করিতেছেন। শ্রীম সহাস্যে বলিলেন, আপনি বসুন। এতে অনেক সব secrets (গোপনীয় কথা) রয়েছে। সাধু দেখিলেন, ডায়েরীর সওয়া পাতা হইতে শ্রীম চার পাতা সৃজন করিলেন। ঠাকুরের মহাবাণীর প্রথম প্রসিদ্ধ অংশটুকু কেবল নোট করা আছে।

শ্রীম-র হাতে হঠাৎ বেদনা আরম্ভ হইল। মন বেশী একাগ্র করিলেই বেদনা বাড়ে। তিনি বলিলেন, শুয়ে পড়ব। সাধু হাত পাখাতে হাওয়া করিতে লাগিলেন মাথায়। শ্রীম পাখাটি চাহিয়া লইয়া গেলেন। সাধু বলিলেন, আগুনে সেঁক দি। শ্রীম বলিলেন — না, শুয়ে পড়লেই সেরে

যাবে।

স্বামী নিগমানন্দ, স্বামী গদাধরানন্দ, দুইজন বন্ধুসহ রমণী, বলাই প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত। সাধু ও ভক্তেরা সামনের বারান্দায় বসিয়া আস্তে আস্তে কথা বলিতেছেন। শ্রীম-র ঘরের দরজা ভেজান।

সন্ধ্যা হইয়াছে। পুরোহিত ধুনুচি লইয়া দোতলার পূর্ব ও উত্তরের ঘরের দেওয়ালে বিলম্বিত ঠাকুর, মা, স্বামীজী, ঠাকুরের মহাসমাধি, দুর্গা, লক্ষ্মী, চৈতন্য-সংকীর্তন প্রভৃতি দেবদেবী ও নরদেবতার ছবিতে দেখাইতেছেন। শ্রীমও নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া সাধু ও ভক্তসঙ্গে দর্শন ও প্রণাম করিতেছেন।

এবার তিনতলায় আরতি হইতেছে। শ্রীম ঠাকুরঘরে উত্তরপাশে দাঁড়াইয়া যুক্ত করে দর্শন করিতেছেন। পরনে সাদাপাড় ধুতি। গায়ে ধূসর রঙের ময়লা গরম পাঞ্জাবী। তাহার উপর 'হরে কৃষ্ণ' ছাপের নামাবলী। শ্রীম-র পিছনে স্বামী নিগমানন্দ। ভক্তগণ 'নাটমন্দিরে' বসিয়া হারমোনিয়াম প্রভৃতি যন্ত্রসংযোগে সমস্বরে গাহিতেছেন, 'খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়।'

একজন সাধু ঠাকুরঘরের দরজার বাহিরে দক্ষিণাংশে দাঁড়াইয়া গৃহমধ্যস্থ শ্রীমকে দর্শন করিতেছেন। তিনি ভাবিতেছেন, ইংরেজী শিক্ষিত 'ইংলিশম্যানের' ভিতর এই জ্ঞান ও ভক্তি কি করে এলো — প্রহ্লাদ ও হনুমানের মত। গায়ে আবার নামাবলী! ভক্তির চাপে বিদ্যার অহংকার একেবারে অন্তর্হিত। কি চোখ, কি মস্তিষ্কের শক্তি! ঠাকুর তাঁর চক্ষুদুটিকে তাই শালগ্রামের চক্ষু বলেছিলেন। আর তাতে তিনি বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন।

এইবার 'নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত মনবচনৈকাধার' গানটি গাহিতেছেন। গরমের জন্য শ্রীম বাহির হইয়া আসিলেন এবং দরজার পাশে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তারপর ছাদে গিয়া বসিলেন পূর্বাস্য। স্বামী রাঘবানন্দ ও কয়েকজন ভক্ত শ্রীম-র সম্মুখে বসা।

'ওঁ হ্রীং ঋতং,' 'সর্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে' ও জয়ধ্বনির সহিত আরতি শেষ হইল। এইবার রামনাম হইতে স্তব, 'ভয় হর মঙ্গল', 'কনকাম্বর' ও 'আর্তানাম্' প্রমুখ শ্লোকগুলি গীত হইয়া সব সমাপ্ত হইল।

শুকলাল, মনোরঞ্জন, সুখেন্দু, বড় অমূল্য, হিমাংশু, জগদীশ প্রভৃতি বহু ভক্ত আজ আসিয়াছেন।

এবার প্রসাদবিতরণ হইতেছে। 'এই দাও, গয়ার সাধুকে (স্বামী নিগমানন্দকে) আম দাও। জগবন্ধু, সীতাপতি মহারাজদের দাও।'

দুইটি ঠোঙ্গা আনিয়া খগেন ডাক্তার জগবন্ধু মহারাজকে দিলেন। জগবন্ধু মহারাজ একটিতে লক্ষ্য করিয়া গণ্ডূষ করিলেন। আর একটি পড়িয়া রহিল। পরে অপর ঠোঙ্গাটি দেওয়া হইল স্বামী রাঘবানন্দকে। খগেনের এই অনবধানতার জন্য শ্রীম বলিলেন, সব দেখে দিতে হয়। তাড়াতাড়ি করতে নেই। একটু পর স্বামী রাঘবানন্দকে শ্রীম নিচে পাঠাইয়া দিলেন রাত্রির ভোজনের জন্য। ইনি এখানেই থাকেন।

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পাতা হাতে লইয়াছেন ফেলিবার জন্য। শ্রীম উহা লক্ষ্য করিয়া লম্বা করিয়া বলিলেন, না — এত সেবক থাকতে—। সাধু পাতা ফেলিয়া আসিয়া দেখিলেন, ভোজনস্থানে একজন ভক্ত জল বুলাইতেছেন। শ্রীম বলিতেছেন, 'আমার ভক্তি যে বা পায় সে যে সেবা পায় হয়ে ত্রিলোকজয়ী।' সেবা কি কম! সেবক হওয়া বড় কঠিন।

শ্রীম (স্বামী নিত্যাত্মানন্দের প্রতি) — হাঁ, জগবন্ধুবাবু তখন মিছরি খেয়ে একটু জল খাওয়াতে বেদনা কমে গেল। মিছরি তো stimulantও (শক্তিপ্রদায়ী) বটে।

সাধু — আজ্ঞে হাঁ। আপনার হাতের ব্যথাটা আগেও ছিল কি? হাত তো আগেও মাথার ওপর রেখে চাপতেন।

শ্রীম — না, হাতে বেদনা ছিল না। Date আমার মনে থাকছে না এখন।

মাদ্রাজের ভক্ত কৃষ্ণমূর্তি (ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া) — To-morrow I will go to the Belur Math. Shall I be able to see Guru Maharaj (Swami Shivananda)? For him I have come here. [কাল বেলুড় মঠে যাব। গুরু মহারাজের (স্বামী শিবানন্দের) দর্শন হবে কি? এইজন্যেই আমি এখানে এসেছি।]

M. — If once you don't succeed, try, try again. You will be going from day to day until you see him.'

(একবার চেষ্টায় সফল না হলে বারবার চেষ্টা করা উচিত সফল না হওয়া পর্যন্ত।)

Krishnamurti — Yes, for him alone I have come. (আজ্ঞে হাঁ, ওঁকে দর্শন করবার জন্যই আমি এসেছি)।

কৃষ্ণমূর্তির প্রস্থান।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — মহাপুরুষ মহারাজের শরীর কেমন, দীক্ষা চলছে?

অন্তেবাসী — দীক্ষা, দেখা, কথা — সবই চলছে। আজকাল কথা জড়িয়ে যায়, টেনে বার করতে হয়। তবে সকালে সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত যখন সকলে প্রণাম করতে আসেন, তখন অন্য লোক। তখন পূর্বের ন্যায় সহাস্য বদন, কুশল জিজ্ঞাসা, ঠাকুরের কথা, হাসি ঠাট্টা, ফষ্টি নষ্টি সবই হয়। তারপরই এলিয়ে পড়েন।

শ্রীম — খোকা মহারাজ কেমন, আর temperature (তাপমাত্রা) কত ছিল?

অন্তেবাসী — ওঁর কাছে আমরা নিত্য যাই না। গেলেই কথা খুব বেশী বলেন। কিন্তু ডাক্তারের মানা কথা বলা। (সহাস্যে) পেটে কয়দিন অম্বল হচ্ছে, কিন্তু বলবেন না, পাছে খেতে না দেয়। তাই আজকাল রাত্রে কিছু খেতে দেখলাম না।

স্বামী রাঘবানন্দের ভোজনান্তে আগমন।

২

অন্তেবাসী (শ্রীম-র প্রতি) — সুকুমার মহারাজ (স্বামী সৎস্বরূপানন্দ) আপনাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিয়েছেন।

শ্রীম — কে?

অন্তেবাসী — যিনি আগে বিদ্যাপীঠের হেডমাস্টার ছিলেন, এখন তপস্যায় গেলেন।

শ্রীম — ও-ও! কোথা থেকে লিখেছেন?

অন্তেবাসী — রাজপুর অম্বিকা মন্দির থেকে। কিষণপুর আশ্রমে এসেছেন। এবার স্বর্গাশ্রম, ঋষিকেশে গিয়ে বসবেন।

অন্তেবাসী — আপনি তাঁকে যেসব কথা বলে দিয়েছেন যাবার আগে, সেসব কথা কি shape (আকার) নেবে এখনও তিনি বুঝতে পারছেন না, লিখেছেন। লিখেছেন, আসনটা পেতে বসতে পারলে তখন বুঝতে পারা যাবে।

শ্রীম — কি লিখেছেন?

অন্তেবাসী — আপনি ওঁকে বলেছিলেন তো, 'ঋষিকেশে গিয়ে গঙ্গাতীরে বসে কেবল ঠাকুরের কথা চিন্তা করা, তাঁকে নিয়ে থাকা। It is a sight for the gods to see! (ইহা দেবদৃশ্য)।' এই সব কথা!

শ্রীম (সহাস্যে) — ও-ও! আসন গেড়ে বসে —।

স্বামী রাঘবানন্দ — বিশ্বানন্দ আপনাকে প্রণাম জানিয়েছেন।

শ্রীম — আর কি লিখেছেন?

স্বামী রাঘবানন্দ — বুদ্ধ উৎসব দেখেছেন, লিখেছেন।

শ্রীম — কোথায়?

স্বামী রাঘবানন্দ — তা জানি না।

শ্রীম — তিনি তো অনেকটা এগিয়ে পথে (বম্বে) রয়েছেন। একবার বেড়িয়ে দেখে এলে হয় বিলেত!

অন্তেবাসী — একবার কথা হয়েছিল Geneva-তে যাবার।

শ্রীম — কন্‌ফারেন্সে? গেলেন না কেন?

অন্তেবাসী — কি জন্য গেলেন না, জানি না।

শ্রীম — আমাদের ছেলেবেলায় সাধ হয়েছিল (আই. সি. এস্-এর জন্য)। ছেলেবেলা এসব হয়। ও মা, রাত্রিতে স্বপ্ন দেখছি, লণ্ডন সব fog-এ (কুয়াসায়) ঢাকা। Fog (কুয়াসা) পর্যন্ত দেখেছি (হাস্য)। আমাদের স্বপ্নেই সাধ মিটে গেছে।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি — তিনটাই প্রায় একরকম।

ঠাকুর বলেছিলেন একটা গল্প। একজন চাষার একটি ছেলে মরেছে। সে কাঁদে নাই। পরিবার তাকে তিরস্কার করছে। সে বললে, আমি রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম সাত ছেলের বাবা হয়েছি। আর রাজা হয়েছি। ঘুম ভাঙ্গলে দেখি, কিছুই নাই। তাই ভাবছি, এক ছেলের জন্য কাঁদবো, কি সাত ছেলের জন্য কাঁদবো।

স্বামী রাঘবানন্দ ও স্বামী নিত্যাত্মানন্দ (সমস্বরে) — চাষীটি একটু জ্ঞানী ছিল (শ্রীম ও সকলের হাস্য)।

শ্রীম কিছুকাল নীরব রহিলেন।

শ্রীম — স্বপ্নে এমন impression (রেখাপাত) হয় যে চিরকাল মনে থাকে। আবার জাগ্রত অবস্থার কত ঘটনা fade (ক্রমে ক্রমে বিলীন) হয়ে যায়। তাহলেই হলো, সবগুলিই একরকম।

অন্তেবাসী — ঠাকুরের কথা আছে 'স্বপ্নসিদ্ধ'।

শ্রীম — 'সিদ্ধ' মানে ভগবানদর্শন। স্বপ্নে ভগবানদর্শন। স্বপ্নে কারো কারো ভগবানদর্শন হয়।

বড় অমূল্য — 'নদের নিমাই'-এর অভিনয় হচ্ছে। সিনগুলি মনে যেন অঙ্কিত হয়ে যায়।

শ্রীম — আবার নিত্য দেখলে ভাল লাগে না। এই যে আরতি হয়, গান হয়, নিত্য দেখলে শুনলে একরকম হয়ে যায়। স্তবগুলি নূতন হয় তো বেশ হয়। প্রথম কয়দিন বেশ লাগে। ঠাকুর বলেছিলেন কিনা, change (পরিবর্তন) ভাল। একেঘেয়ে না হয়।

স্বামী রাঘবানন্দ — তা হলে change of scene (দৃশ্য পরিবর্তন) করা দরকার। কিন্তু তাঁর নিজের কথা তো বলতেন না!

শ্রীম — না, তা বলতেন না। বলতেন ঈশ্বরকে যত দেখ তত দেখতে আকাঙ্ক্ষা হয়। নিবৃত্তি নাই। তাই তো ভক্তরা দৌড়ে দৌড়ে যেত। এত বকুনি, তিরস্কার — তবুও যাচ্ছে। যাবে না, দাঁড়াবে কোথায়? তাঁর সম্বন্ধে ও কথা বলতেন না!

একজন ভক্ত — আচ্ছা, তাঁর কাছে সকলেই ঈশ্বরবুদ্ধিতে যেতেন?

শ্রীম — অনেকে যেতেন। যাঁরা ওরূপ যেতেন না তাঁদেরও কাজ হয়ে যেত। তিনি বলতেন, 'লঙ্কা না জেনে খেলেও ঝাল'।

স্বামী রাঘবানন্দ — তা হলে change of scene (দৃশ্য পরিবর্তন) করা আমাদের দরকার।

শ্রীম — তা আপনাদের কি, যাঁদের গুরুলাভ হয়েছে? তাঁদের গুরুকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। গুরু বলবেন, কি করতে হবে, কি না?

একজন সাধু (স্বগত) — গুরুর শরীর না থাকলে?

শ্রীম — গুরু মানে সচ্চিদানন্দ। গুরুতে মানুষবুদ্ধি করলে কিছুই হবে না। কি সব আছে, গুরুতে মানুষবুদ্ধি, প্রতিমাতে মাটিবুদ্ধি — এ না করা। গুরুলাভ হলে তিনি সব বলে দেবেন। তা নইলে যেমন নৌকো এদিক একবার, ওদিক একবার করছে — যার হাল নাই, দাঁড় নাই। গুরুলাভ হলে মানুষ steady (সুস্থির) হয়ে যায়। গুরু আর কেউ নন, সচ্চিদানন্দ গুরু।

একজন ভক্ত — কুলগুরু নয়?

শ্রীম — গুরুতে মানুষবুদ্ধি করতে নাই। গুরু সচ্চিদানন্দের একটি রূপ।

'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ি যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।।'

স্বামী রাঘবানন্দ — আমাদের change of scene (দৃশ্য পরিবর্তন) করা দরকার তাহলে?

শ্রীম নিরুত্তর।

শ্রীম — আচ্ছা, ঠাকুর কি কথাই বলে গেছেন — যেখানে মন বুদ্ধি থৈ পায় না! মন বুদ্ধি খবর করতে না পেরে ফিরে এলো। এখন মানুষ দাঁড়ায় কোথায়? তাই গুরুবাক্যে বিশ্বাস। বিশ্বাসের আবার ভেদ আছে, তিনি বলেছিলেন। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। 'খেয়েছে' মানে, তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে।

আর তিনি বলেছেন, ঈশ্বর কৃপা করে 'শুনা'-বিশ্বাস থেকে 'দেখা', 'খাওয়া'-বিশ্বাস করে দেবেন ক্রমে। শ্রীম কি ভাবিতেছেন।

অমৃতের প্রবেশ। অনেকক্ষণ যুক্ত করে দাঁড়াইয়া ঠাকুর ও শ্রীম-র উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — রাস্তায় জল আছে আজও?

দুই তিনদিন ধরিয়া প্রবল জল ঝড় হইয়া গিয়াছে।

অমৃত (কপালে যুক্ত কর সংলগ্ন রাখিয়াই) — আজ্ঞে, অল্প অল্প কোথাও আছে।

শ্রীম — এর ভিতরেই একটু শুনে নিয়েছেন (শ্রীম ও ভক্তদের উচ্চ হাস্য)।

শ্রীম (স্বামী রাঘবানন্দকে লক্ষ্য করিয়া) — অমৃতবাবু কাল জলে এসেছিলেন। আমরা বললাম, আসবেন না। তিনি বললেন, না এলে কি হয় গুরুদর্শন করা! আমরা বললাম, গুরু তো ওখানেও আছেন। বললেন, আছেন মা, ঠাকুর। জিজ্ঞাসা করলাম, ধূপ দেওয়া হয়? বললেন, আজ থেকে দিতে হবে। বাড়িতে কেউ নাই। মা সেদিন (চলে) গেলেন। পরিবার নাই। তা দেখে কে? আমরা বললাম, আমাদের কথা তো শুনতে হয় (বৃষ্টিতে না আসেন)।

অমৃত সাব-রেজিস্ট্রার।

শ্রীম (অমৃতের প্রতি) — আপনার আবার ট্রানস্‌ফার কোথায় হল — বগুড়া না, কোথায়?

অমৃত — আজ্ঞে হাঁ। আর টোয়েনটিফাইভ ইয়ার্স সার্ভিস হলেই পেনসান পায় না। আরও কিছু wait (অপেক্ষা) করতে হবে।

শ্রীম (সহাস্যে) — একে বলে মর্কট-বৈরাগ্য। ঠাকুর একটি গল্প বলেছিলেন এ সম্বন্ধে। একজনের চাকুরী নাই, গেরুয়া পরে কাশী গেল। কিছুদিন পর লিখলো, তোমরা ভাবিত হয়ো না। আমার একটি কর্ম হয়েছে। (হাস্য)। দিলে ছুঁড়ে ফেলে গেরুয়া (শ্রীম ও সকলের উচ্চ হাস্য)।

অমৃত — ভারত গভর্নমেন্টে হয়েছে। বেঙ্গল গবর্নমেন্টেরও কমিটি বসেছে। এই কিছুদিন wait (অপেক্ষা) করতে হবে।

শ্রীম (নয়নহাস্যে) — তা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যখন করেছেন তখন বেঙ্গল গভর্নমেন্টও করবেন অবশ্য। তবে মর্কট-বৈরাগ্য থেকেও আসল বৈরাগ্য হয়। ঠাকুরকে একজন (মহেন্দ্র মুখুজ্যে) বলেছিলেন, এবার ওদের হাতে সব দিয়ে সরে পড়বো। ঠাকুর বললেন, কাপ্তেনও বলে। কিন্তু পারে কই? (তীব্র গম্ভীরভাবে) Jesus knew what was in man (মানুষের সব দুর্বলতার কথা যীশু অর্থাৎ অবতার জানেন)। কত রকম করে তিনি বেঁধে রেখেছেন।

স্বামী রাঘবানন্দ — আবার যাদের বের করে আনেন, তাদেরও, কতরকম করে আনেন। স্বামীজী চাকরী পান না। যদিও বা পেলেন, তা বদনাম দেওয়ালে ছেলেদের দিয়ে — পড়াতে পারেন না।

শ্রীম — যেখানেই যায় সেখানেই থাকতে পারছে না। লক্ষ্মীর বিয়ে হচ্ছে, হৃদয় বললেন ঠাকুরকে। তিনি অমনি উত্তর করলেন, লক্ষ্মী যে রাঁড় হবে। হৃদয় তাঁর মুখ চেপে ধরতে যাচ্ছে এই বলে — বল কি, বল কি! লক্ষ্মীকে যে তুমি অত ভালবাস। ঠাকুর বললেন, আমি কি করবো। আমি কি বলি? মা-ই বললেন।

একে বলে দেখা-বিশ্বাস — মা বললেন, আমি কি করবো?

'সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে' — এই nice distinction (সূক্ষ্ম প্রভেদদৃষ্টি) সদ্‌গুরুর।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — একজন বলেছিলেন, from his (Christ's) mouth shall flow out rivers of living waters. (একজন বলেছিল, ক্রাইস্টের মুখ থেকে অমৃতপ্রদায়ী জলের কত নদী প্রবাহিত হবে।)

স্বামী রাঘবানন্দ — এখন সাড়ে নয়টা, আপনার আহারের সময় হয়ে গেছে।

শ্রীম যুক্ত করে সাধু ভক্তদের নমস্কার করিয়া দ্বিতলে গেলেন। অন্তেবাসী আজ ঠাকুরবাড়ি রহিয়া গেলেন, বেলুড় মঠে গেলেন না। রাত্রির আহারের পর বলাই ও মনোরঞ্জনের সঙ্গে তিনি ঠনঠনিয়ায় মা-কালীকে প্রণাম করিয়া আসিলেন। রাত্রি বারটা পর্যন্ত জাগিয়া আজের বিবরণ ডায়েরীতে লিখিলেন। বাহিরে জল ও ঝড় হইতেছে।

৩

ঠাকুরবাড়ি। সকাল ছয়টা। 'নাট মন্দিরে' শ্রীম দরজার কাছে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। অন্তেবাসী একতলা হইতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া ঠাকুর ও শ্রীমকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু শ্রীম চিন্তাকুল। এদিকে লক্ষ্য নাই। আজ ২৬শে মে, ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার।

স্বামী রাঘবানন্দ আসিলেন। শ্রীম বলিতেছেন, রাত্রিতে জল হয়েছে। এই জানালাটা আর ঠাকুরঘরের এই ধার দিয়ে জল পড়েছে। ছাদেও জল জমা হয়েছে। অন্তেবাসী বলিলেন, সুখেন্দু নালিতে বালি দিয়েছে। শ্রীম

বলিলেন, এতে আরও worse (খারাপ) হয়েছে. শ্রীম ঠাকুরঘরের নর্দমার কথাই ভাবিতেছেন।

শ্রীম দোতলায় নামিয়া গেলেন। বারান্দায় বসিয়া আছেন। এখন সাড়ে ছয়টা। অন্তেবাসী দাঁতের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার বিপিন রায়ের বাড়ি যাইতেছেন। শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েছে দাঁতে? অন্তেবাসী বলিলেন — রক্তপূঁজ পড়ছে। শ্রীম বলিলেন, তাহলে দেখান উচিত। ডাক্তার রায়ের সঙ্গে অন্তেবাসী মেডিক্যাল কলেজে গেলেন। ইনি দন্তবিভাগের ইন -চার্জ। দাঁত দেখাইয়া অন্তেবাসী ইউনিভার্সিটিতে ম্যাট্রিকের ফল দেখিয়া আসিলেন। বিদ্যাপীঠের ছাত্র চারজন পরীক্ষা দিয়াছিল প্রাইভেটে — বব (অমিতাভ), ঋষিকেশ, পৃথ্বীশ ও ছক্কো (চক্রবর্তী) — পাস হইয়াছে সকলে।

পৌনে দশটা। শ্রীম দোতলার নিজকক্ষে বসা। অন্তেবাসী ফিরিয়া আসিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন — ডাক্তার কি বলেছেন? অন্তেবাসী বলিলেন, দুপুরে আবার যেতে বললেন।

অন্তেবাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন শ্রীম-র সেবার কিছু কাজ করতে পারেন কিনা। শ্রীম বলিলেন, না। এই দেখ সব তৈরী, কুকার বসানো হয়েছে। শ্রীম আজকাল কুকারের রান্না খান।

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ আসিয়াছেন। সঙ্গে একটি যুবক ছাত্র। ইনি বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ। অন্তেবাসী শ্রীম-র সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। বলিলেন — ইনি স্বামী বিশ্বানন্দ, স্বামী সদ্ভাবানন্দের সমসাময়িক। শ্রীম বলিলেন, উপরে গিয়ে বসুন ঠাকুরের সামনে।

শ্রীম-র ভোজন দশটার সময় আরম্ভ হইল। অতি সামান্য আহার। তাহাতেও আবার এখন সংযম — 'কথামৃত' লিখিতেছেন, তাই। দুধ আর ভাতই প্রধান খাদ্য মধ্যাহ্নে। দেড় ছটাক চালের ভাত। একটি পটলসিদ্ধ ও একটি আলুসিদ্ধ। আর একটু মুগডালসিদ্ধ। তাহাতে সামান্য হলুদ ও লবণ। শ্রীমকে কুকার খুলিয়া আহার করাইয়া অন্তেবাসী তিনতলায় আসিলেন। বেলা এগারটার সময় অন্তেবাসী ও স্বামী রাঘবানন্দ আহার করিতে বসিলেন দোতলার বড় ঘরে। বলাই বাড়ি হইতে কিছু আহার্য আনিয়াছেন। তিনিই পরিবেশন করিতেছেন।

আহারান্তে শ্রীম বিশ্রাম করিতেছেন। অন্তেবাসী ও স্বামী রাঘবানন্দ একটি লিস্ট তৈয়ারী করিতেছেন — কলিকাতায় যে সকল স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুর শুভাগমন করিয়াছিলেন। কয়েকজন সাধু ও ভক্তদ্বারা অন্তেবাসী বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়াছেন এইরূপ একটি লিস্ট তৈয়ার করার জন্য।

বেলা আড়াইটার সময় নিচে হইতে ডাকাডাকির শব্দ আসিল। শ্রীম রেলিংএ দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কে ডাকছেন? অন্তেবাসী বাহিরে আসিয়া শ্রীমকে বলিলেন — আপনি ঘরে যান, আমি দেখছি কে। তিনি নিচে নামিয়া গিয়া দেখিলেন, একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও সঙ্গে যুবতী বধূ, কোলে শিশুপুত্র। জিজ্ঞাসা করিয়া উপরে আসিতে একটু দেরী হইল। আসিতেই শ্রীম বলিলেন — কই, বললে না কি হলো? সব শুনিয়া শ্রীম ভাবিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, সতীনাথ নাই? অন্তেবাসী বলিলেন, বলুন আমিই করছি। কি করতে হবে? উনি বলিলেন, ওদের আট আনার পয়সা দিতে হবে। টাকা ভাঙ্গাইতে অন্তেবাসী বাহির হইয়া গেলেন। পাঁচ ছয়টি দোকানে মিলিল না। শেষে কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটে মিঠাই-এর দোকান হইতে টাকা ভাঙ্গাইয়া ঐ বৃদ্ধকে আট আনা দিয়া উপরে আসিলেন।

শ্রীম-র হাতে সামান্য বেদনা আরম্ভ হইল। ইহা লইয়াই শুইয়া শুইয়া অন্তেবাসীকে বলিলেন, 'এঁর নাম পণ্ডিত পঞ্চানন শিরোমণি। পুত্রবধূ সঙ্গে। পুত্র রেঙ্গুনে গিছলো কর্ম করতে। সেখানে একটা বর্মী মেয়ের সঙ্গে পড়ে গেছে। চিঠি লেখেন, কিন্তু সে আসে না। চেঁচামেচি করেন, দোষ কি! হয়তো খাওয়া হয় নাই। Collection-এ (চাঁদা তুলতে) বের হন মাসে মাসে রিকসো করে।

শ্রীম সাহাস্যে বলিলেন, আপনার রেঙ্গুনে যাবার ইচ্ছা হয় কি?' অন্তেবাসী বলিলেন, না। মিশনের সোসাইটিতে যাবার কথা হয়েছিল। আমি বারণ করেছি। শ্রীম বালকের মত হাসিতে লাগিলেন আর বলিলেন —খবরদার, রেঙ্গুনে যাবেন না।

অন্তেবাসী ডাক্তারের বাড়িতে গেলেন তিনটায় আর ফিরিয়া আসিলেন ছয়টায়, দাঁত স্ক্র্যাপ করাইয়া। আজ অর্ধেক কাজ হইল মাত্র। তিনি দেখিলেন শ্রীম 'কথামৃত' লিখিতেছেন। বেদনা হইয়াছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই।

আরতি হইতেছে। শ্রীম তিন তলায় আসিয়া আরতি দর্শন করিলেন। ভজন শেষ হইলে নিচে আসিলেন। দ্বিতলের ঘরে খাটে বসিয়াছেন। গদাধর আশ্রম হইতে স্বামী গদাধরানন্দ আসিয়াছেন। তাঁহাকে শ্রীম নিজের বিছানায় বসাইলেন। একথা সেকথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন — মহন্ত ললিত মহারাজ কেমন? কে কে আশ্রমে আছেন, ইত্যাদি। স্বামী গদাধরানন্দ বলিতেছেন, ব্যাকুলতা স্থায়ী হয় না। হয় আবার চলে যায়। শ্রীম বলিলেন, সঙ্ঘে থাকলে এইরূপ হয়। একটানা ভাব থাকে না। পাঁচ জনের সঙ্গে থাকা। কেউ হয়তো পড়া ভালবাসে, কেউ পূজা, জপ, ধ্যান। কেউ কর্ম, লেকচার। তাই অনেকে তপস্যা করেই জীবন কাটায়। তখন একটানা একটা ভাব নিয়ে পড়ে থাকতে পারে। স্বামী গদাধরানন্দ বলিলেন, আমিও যাব ভাবছি তপস্যায়। শ্রীম উত্তর করিলেন — হাঁ, তপস্যায় মাঝে মাঝে যাওয়া খুব দরকার। তখন মনে হয়, কেন বাড়িঘর বাপ-মা ছেড়ে এখানে এসেছি। নইলে কাজের ভীড়ে ভুলে যায় উদ্দেশ্য। ঈশ্বরলাভের জন্য সাধু হওয়া।

তাছাড়া মন সর্বদা সজাগ থাকে না। যখন জাগ্রত হয়, তখন খুব করে নিতে হয়। তখন যদি পাঁচটি কাজে আটকে যায়, কি করে আর ব্যাকুলতা থাকে! উঠে পড়ে লাগতে হয়। ঠাকুর বলেছিলেন, সোনা গলাতে বসে যদি ডাক্তারবাড়ি যায়, বাজার যায়, তবে আর সোনা গলান হয় না। স্বামী গদাধরানন্দ বলিলেন, কেহ কেহ বলে, পড়। পড়ে একটা উপাধি লাভ কর, যেমন তর্কতীর্থ। শ্রীম বলিলেন — বেদান্তবাগীশ ন্যায়বাগীশ হয় নি কেউ? 'তর্কতীর্থ' এতে আর কি তেমন? (হাস্য)।

স্বামী গদাধরানন্দ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে আবার ডাকিলেন। মিষ্টি মুখ করাইয়া বিদায় দিলেন।

রাত্রি দশটা। অন্তেবাসী পাশের ঘরে বসিয়া হ্যারিকেনের আলোতে ডায়েরী লিখিতেছেন। শ্রীম নিজকক্ষে বিছানায় শুইয়া 'হাউ হাউ' করিতেছেন বেদনায়। সারা রাতই এইরূপ চলিল। প্রায় রোজই এরূপ হয়। অন্তেবাসী ভাবিতেছেন, অবতারের পার্ষদ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষেরও বেদনা যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি নাই। অথচ কিছু করবারও উপায় নাই। কি প্রহেলিকা!

৪

ঠাকুরবাড়ি। কলিকাতা। ১৩/২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। সকাল ছয়টা। শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ি মেরামত ও চুনকাম হইতেছে. একতলায় শ্রীম-র স্নানঘরের দেয়াল খানিকটা ভাঙ্গা হইয়াছে। শ্রীম সেই রাবিশ সরাইতেছেন। সারারাত হাতের ব্যথায় কষ্ট পাইয়াছেন। এখনও বাম হাতে ফ্ল্যানেল বাঁধা।

অন্তেবাসী বলিলেন — আপনি ইঁট ছাড়ুন, আমি সরাচ্ছি। শ্রীম বাধা না মানিয়া বলিলেন, না ছাড়। আমি যা পারি আমিই করব।

আজ ২৭শে মে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের কয়েকজন প্রবীণ সাধু ও অনেক ভক্তের অনুরোধে অন্তেবাসী ঠাকুরের পদস্পৃষ্ট কলিকাতা মহানগরীর স্থানসমূহ দর্শন করিতেছেন। লিস্ট করিয়া প্রতি মহল্লায় যাইতেছেন। আর প্রাচীন নাম, নম্বর ও বিবরণ লইতেছেন এবং নূতন সব পরিবর্তনও লিপিবদ্ধ করিতেছেন।

শ্রীমকে এই সংকল্পের কথা অন্তেবাসী নিবেদন করিলেন। শ্রীম প্রথমে ইহাতে অনুমতি দেন নাই, বরং বিরক্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, ভক্তরা হয়তো পুস্তক ছাপাইবেন এই সব বিবরণ দিয়া। অন্তেবাসী বলিলেন, সর্বদা ধ্যান জপ বা কাজে মন থাকে না। কখনও তীর্থভ্রমণে মন যায়। তখন যদি এই সব পবিত্র স্থান দেখে বেড়ান যায়, তাহলে মনে আনন্দ হয়। শ্রীম এই কথা শুনিয়া পরমানন্দে অনুমতি দিলেন। আর আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন — হাঁ, এ অতি উত্তম পরিকল্পনা। তাড়াতাড়ি সেরে নাও। অন্তেবাসী বলিলেন, এতে আপনার পরামর্শ ও উপদেশ দরকার। কোথা থেকে আরম্ভ করা হবে? শ্রীম বলিলেন, এই পাড়া থেকেই আরম্ভ কর। (১) এই রাস্তার মোড়ে আর. মিত্রের বাড়ি। ঠাকুর এখানে এসেছিলেন। কেশব সেনও তাঁকে দর্শন করতে এসেছিলেন। (২) ঠনঠনে কালীবাড়ি। এখানে বসে ঠাকুর মাকে গান শোনাতেন। তখন বয়স ষোল সতের — রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ি পূজো করতেন। (৩) ঠাকুরের দাদার বেচু চ্যাটার্জির স্ট্রীটের টোল। সেখানে মুড়ি মুড়কির দোকান হয়েছিল পরে। এখন রাধাকৃষ্ণের ঠাকুরবাড়ি। (৪) ঐ লাইনে এর একটু পূর্বে তিন

চারখানা বাড়ি ছাড়িয়ে ঠাকুরের বাসা ছিল — খোলার বাড়ি, লাহাদের বাড়ির উল্টো দিকে রাস্তার উত্তরে। এখন সেখানে হেয়ার প্রেস।* এগুলি বেচু চ্যাটার্জির স্ট্রীটে। (৫) ঝামাপুকুর লেনে রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে পূজারী ছিলেন। (৬) ঐখানেই ঐ লেনে ২৭ নম্বর বাড়িতে মেছুয়াবাজার যেতে বাঁ হাতে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী থাকতেন। তাঁর অসুখ হয়। তাঁকে দেখতে ঐ বাড়িতেও এসেছিলেন। (৭) মেছুয়াবাজার নববিধান ব্রাহ্মসমাজে প্রায়ই আসতেন। ঐ রাস্তায়ই দিগম্বর মিত্রের বাড়ি ছাড়িয়ে একই ফুটপাথে ঈশান মুখুজ্জ্যের বাড়ি। ওখানে এসে ভোজন করেছিলেন। (৮) মেছুয়াবাজার আর সার্কুলার রোডের মোড়ে কেশব সেনের বাড়ি 'লিলি কটেজ'। সেখানে কয়েকবার এসেছিলেন। ওপরের ঠাকুরঘরে কেশববাবু ঠাকুরের পা পুজো করেছিলেন। (৯) বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগর মশায়ের বাড়ি। ওখানে তাঁকে দেখতে এসেছিলেন তাঁর দয়ার কথা শুনে। (১০) কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। নরেন্দ্রকে দেখতে ওখানে এসেছিলেন। (১১) সিমুলিয়া নরেন্দ্রদের বাড়িতে এসেছিলেন। (১২) রামবাবুর বাড়িও ওদিকেই — অক্সফোর্ড মিশনের পেছনে। ও বাড়ি ভেঙ্গে রাস্তা হয়েছে। (১৩) সিমলা স্ট্রীটে মনমোহনবাবুর বাড়ি। (১৪) ও পাড়াতেই আর একস্থানে ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে নরেন্দ্রকে প্রথম দেখেন। (১৫) হ্যারিসন রোডে কাশী মল্লিকের ঠাকুরবাড়ি। ওখানে সিংহবাহিনীকে দর্শন করেন। (১৬) সিন্দুরিয়াপট্টিতে মণি মল্লিকের বাড়ি। ওখানে ব্রাহ্ম সমাজের অধিবেশনে এসেছিলেন। এখন সেখানে জৈন মন্দির। (১৭) সুতাপট্টীতে লক্ষ্মীনারায়ণ মারোয়াড়ীর বাড়ি। (১৮) কলুটোলার চৈতন্যসভা। (১৯) জানবাজারে রাণী রাসমণির বাড়ি। (২০) গির্জায়ও গিছলেন ওদিকে (মেথডিস্ট চার্চে)। বাইরে থেকে 'ম্যাস' দেখেন। (২১) কালিঘাটে মা-কালীকে দর্শন করেছেন। (২২) ভবানীপুরে একজন উকিলের বাড়ি গিছলেন। সেটা locate (বের) করা গেল না। (২৩) গঙ্গার ঘাট — জগন্নাথ ঘাটে নেমেছিলেন। (২৪) কয়লাঘাটেও

---

*এখন সে সব ভেঙ্গে বড় পাকা বাড়ি হয়েছে। রাস্তার উপর ফুটপাথে একটা জলের কলের পাশ দিয়ে আগে রাস্তা ছিল।

নেমেছিলেন। (২৫) মিউজিয়াম দেখেছিলেন। (২৬) গড়ের মাঠে সার্কাস দেখেছিলেন। (২৭) লাট সাহেবের বাড়ি হৃদয় দেখালে বললেন, হাঁ, দেখছি মাটির ঢিপি। (২৮) বড়বাজার রতন সরকার স্কোয়ারে যেখানে গঙ্গাসাগর যাত্রী জমায়েত হয়, তার গায়ে জয়গোপাল সেনের বাড়ি। (২৯) যদু মল্লিকের বাড়ি পাথুরিয়াঘাটা। (৩০) চিৎপুর আদি ব্রাহ্ম সমাজ। (৩১) জোড়াসাঁকোতে দেবেন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি। (৩২) জোড়াসাঁকোতে হরিসভায়ও গিছলেন। (৩৩) হরতকীবাগানে এক ভক্তের বাড়ি। (৩৪) কাঁকুড়গাছি রামবাবুর বাগান। (৩৫) ঐখানে সুরেশবাবুর বাগান।। (৩৬) শ্যামবাজারে ডাক্তার কালীর বাড়ি। (৩৭) শ্যামপুকুরে অসুস্থ হয়ে ছিলেন এক বাড়িতে। (৩৮) বাগবাজার নন্দ বসুর বাড়ী। (৩৯) ব্রাহ্মণীর বাড়ি। (৪০) বলরাম মন্দির। (৪১) গিরিশবাবুর বাড়ি। (৪২) সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি। (৪৩) মদনমোহন মন্দির। (৪৪) শ্যামপুকুরে কম্বলীটোলায় আমাদের বাসায় গিছলেন। (৪৫) দেবেন মজুমদার ম'শায়ের বাসায়। (৪৬) স্টার থিয়েটার — বিডন স্ট্রীটে ছিল। সেখানে চৈতন্যলীলা দেখেছিলেন। (৪৭) শোভাবাজারে অধর সেনের বাড়ি। (৪৮) অসুখের সময় বাগবাজারে প্রথম একটা বাড়িতে কিছুকাল ছিলেন, গঙ্গার ধারে। সেখান থেকে বলরামবাবুর বাড়ি চলে আসেন। ছোট বাড়ি ছিল বলে পছন্দ হয় নাই। (৪৯) বাগবাজার খালের পুলের কাছে ভট্চার্যের বাড়িতে মথুরবাবুর সঙ্গে এসেছিলেন। (৫০) নন্দবাগান ব্রাহ্মসমাজ। (৫১) হাঁ, যতীন ঠাকুরের বাড়িতে গিছলেন। (৫২) মহেন্দ্র গোস্বামীর বাড়ি। এখন এই পর্যন্ত থাক। পরে হবে বাকী সব। সবই মহাতীর্থ। তাঁর চরণরজেঃ সব জীবন্ত। এসব কেউ যদি দেখে বেড়ায়, তাতেই তার হয়ে যাবে। কয়েটা স্থান বাদ পড়ে গেছে। পরে বলবো দ্বিতীয় লিস্টে।

অন্তেবাসী বড়বাজারে গেলেন। ডাক্তার কানাই ও ডাক্তার নরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেন। দীনবন্ধুর সঙ্গেও আলাপ করেন। দীনবন্ধু একটি ঘটনা বলিলেন, একটি ভক্ত-পরিবারে পুরুষ কেউ নাই। কিন্তু অপর লোকের ভিতর ভগবান কর্তব্যবুদ্ধি দিয়ে সব কাজ করিয়ে নিয়েছেন — কুমারীদের বিবাহাদি পর্যন্ত। অন্তেবাসী এই ঘটনার কথা শুনিয়া ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া আনন্দে ভাবিতে লাগিলেন, ঈশ্বরের কি করুণা! সব করিয়ে নিচ্ছেন।

শুধু আমরা তাঁকে স্মরণ করে পড়ে থাকতে পারলে বাঁচি। আর ঠাকুরের কথা স্মরণ করিলেন, 'যার কেউ নেই তার হরি আছে।' শ্রীমকেও ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'তুমি এখানে (দক্ষিণেশ্বরে) থেকে যাও। বাড়িতে এমন কিছু দুর্ঘটনা হলে, পাড়ার লোক এসে দেখবে।'

অন্তেবাসী সিন্দুরিয়াপট্টিতে মণি মল্লিকের বাড়ি দেখিতে গিয়া দেখিলেন ঐ বাড়ি ভগবানের মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। জৈন ভক্তগণ খরিদ করিয়া ভগবান পরেশনাথ মহাবীরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বর্তমান নম্বর, ৪২/২ আপার চিৎপুর রোড।

সিন্দুরিয়াপট্টির মোড়ের কাছেই হ্যারিসন রোডে তারপর দর্শন করিলেন সিংহবাহিনী কাশী মল্লিকের ঠাকুর বাড়িতে।

আরও কয়েক স্থান দর্শন করিয়া অন্তেবাসী ঠাকুরবাড়ি ফিরিলেন বেলা সাড়ে এগারটায়। শ্রীম আহার শেষ করিয়া বসিয়া আছেন। কথামৃতের দিনপঞ্জী বলিবেন, আর সতীনাথ লিখিবে। তাহার অপেক্ষা। শ্রীম অন্তেবাসীকে দেখিয়াই বলিলেন, চান কর। এত বেলা হল — কোথায় গিছলে? একলাই ঘুরেছিলে, না কেউ ছিল সঙ্গে।

ফরটি নাইন ইয়ার্স ব্যাকের (পূর্বের) এসব কথা হচ্ছে (দিনপঞ্জীতে)। আমার মনে হচ্ছে যেন কাল হয়ে গেল। কি impression-ই (স্মৃতি) তিনি দিয়ে দিয়েছেন।

অন্তেবাসী ও স্বামী রাঘবানন্দ একসঙ্গে আহার করিলেন। শ্রীম নিজ খাটে বসা। শ্রীম দিনপঞ্জী বলিতেছেন, দক্ষিণের জানালার পাশে দাঁড়াইয়া অন্তেবাসী শুনিতেছেন।

বালক সতুর প্রবেশ। সতু শ্রীম-র দৌহিত্র। হুগলী বাড়ি। সেখান হইতে আসিয়াছে, হাতে মিষ্টি আর আম। উহা রাখিয়া সে অন্তেবাসীর পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। তিনি তাহাকে হাত ধুইতে বলিলেন, পাছে ঐ হাত শ্রীম-র পায়ে লাগে এই ভাবিয়া। শ্রীম শুনিয়া বলিলেন, না ঐ হাত ধুতে হয় না। মাথায় হাত দাও! মাথায় গঙ্গা রয়েছেন।

একজন সাধু ভাবিতেছেন, মহাপুরুষদের আচরণ বিচিত্র! শ্রীম-র পায়ে আমরা হাত দিলে, তখনই তা ধুতে বলেন, কুলকুচো করতে বলেন। কিন্তু সাধুর পায়ে দেওয়া হাত ধুতে বারণ করছেন। কি জীবন্ত

বিশ্বাস, সাধু নারায়ণ!

শ্রীম অন্তেবাসীকে বলিলেন, অনেক ঘুরেছ সকালে। এখন যাও বিশ্রাম কর গে।

বিশ্রামান্তে অন্তেবাসী পুনরায় ঠাকুরের স্থানসমূহ দেখিতে বাহির হইলেন। প্রথমে গেলেন — বাদুড়বাগান বিদ্যাসাগর-ভবনে। এখন আর বাড়ির পূর্বাবস্থা নাই। দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি ছিল পশ্চিমে। সামনে বড় বিলিতি ঝাউ গাছ ছিল। প্রবেশদ্বারাদি সবই বদলাইয়া গিয়াছে, এখন ঐ বাড়িতে একটি স্কুল।

এবার 'কমল কুটীর' (Lily Cottage)। এখানেও মেয়েদের স্কুল হইয়াছে — 'ভিক্টোরিয়া স্কুল'। ইহা ব্রাহ্ম আচার্য কেশব সেন মহাশয়ের বাসগৃহ। বহুবার ঠাকুর এখানে আসিয়াছেন। এখানেই কেশববাবু ঠাকুরের পাদপূজা করিয়াছিলেন — দ্বিতলের স্যাংচুয়ারীতে (Sanctuary)। তাই এই মন্দিরটি আজও এত উদ্দীপনাপূর্ণ!

স্যাংচুয়ারীর ভিতরে বসিয়া অন্তেবাসী প্রার্থনা করিলেন — "ঠাকুর, মা, তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও। আর তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।" আপনা হইতেই ঠাকুরের এই প্রার্থনাটি হৃদয় মন্দির হইতে নির্গত হইল।*

৫

ডক্টার বি. রায়ের বাড়িতে পটলডাঙ্গায় দাঁত সাফ করাইয়া অন্তেবাসী কলুটোলায় প্রবেশ করিলেন। উদ্দেশ্য, চৈতন্যসভার স্থানটি আজ বাহির করিবেন। শ্রীম বলিয়াছিলেন, তিনি খুঁজিয়া পান নাই। রাস্তা এত বদল হইয়াছে। অন্তেবাসী তাই স্থির করিলেন সত্তর বৎসর বয়স্ক লোক কে কে আছেন এ পাড়ায়, প্রথমে তাহা বাহির করিবেন।

২৬ডি, দেবেন্দ্র মল্লিক স্ট্রীটে তিনি প্রবেশ করিলেন। উহা স্কুল অব্ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের বিপরীত দিকে সেন্ট্রাল এভিনিউ-এর অপর পারে।

* এখন দ্বিতলের পূজার ঘর ভাঙ্গা হইয়াছে। নিচের পূজার ঘর রহিয়াছে। দ্বিতলে কেবল কেশববাবুর শয়নঘর রাখা হইয়াছে। সমগ্র প্রাচীন বাড়ি, বৈঠকখানার চিহ্নও নাই। নূতন বাড়িতে ভিক্টোরিয়া গার্লস কলেজ।

ডান হাতে খুব উঁচু ভিত্তিওয়ালা একটি বাড়ি দেখিলেন। সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলেন। একটি যুবক বসা, বয়স পঁয়ত্রিশ, স্থূলকায়। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ পাড়ায় বৃদ্ধ লোক কে কে আছেন? যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন, কি জন্য? অন্তেবাসী বলিলেন, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এখানে এসেছিলেন চৈতন্যসভায়। সেই স্থানটি দর্শন করিবার ইচ্ছা।

গৃহের পশ্চিম দিকে একটি বৃদ্ধ চেয়ারে বসিয়াছিলেন, হাতে হরিনামের মালা, কপালে চন্দনের তিলক। সাদা পাঞ্জাবী গায়ে, গলায় তুলসীর মালা। অন্তেবাসী পূর্বেই লক্ষ্য করিতেছিলেন, বৃদ্ধ সশ্রদ্ধ কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছেন আর তাহার সব কথা শুনিতেছেন। 'পরমহংসদেব' — এই কথাটি শুনামাত্র তিনি ক্ষিপ্রগতিতে আসিয়া অন্তেবাসীকে আলিঙ্গন করিলেন আর বালকের ন্যায় কাঁদিয়া অজস্র প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। উচ্ছ্বসিত ভাব। একটু স্থির হইয়া বলিলেন — বাবা, আমি এক পাপী এখানে রয়েছি। বুড়ো হয়েছি, তবুও বিষয় ছাড়ছে না। আপনি যাঁর নামে এই যৌবনে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন, তাঁর দর্শন পেয়ে, কৃপা পেয়ে, অত ভালবাসা পেয়েও আমার হলো না। বলিয়াই হাউ হাউ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। অন্তেবাসী তাঁহাকে শান্ত করিতে লাগিলেন। কে শুনে তাঁহার কথা। কিছুকাল পর কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে অন্তেবাসী বলিলেন — মশায়, আপনি আমাদের পূজনীয় ব্যক্তি। আপনি সাক্ষাৎ নররূপী ভগবানের চরণস্পর্শে পাকা সোনা হয়ে গেছেন। তাঁর ভালবাসার কথা আমাদের কিছু বলুন।

কুঞ্জ মল্লিক — আগে চলুন চৈতন্যসভা দেখিয়ে আনি। (একটি বাড়ি দেখাইয়া) এ বাড়িতে (৩২/২ দেবেন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট) চৈতন্যসভা ছিল। এখন আর কিছু নাই। কালীধর এ বাড়ির মালিক ছিলেন। এখন পূর্ণবাবু পেয়েছেন। ইনি জ্ঞাতি দৌহিত্র। (বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া) এই উঠান, ঠাকুর দালান, তিন দিকের দালান ও পিলার, সদর দরজা — সবই সেই সময়কার। অদলবদল হয়ে গেছে কিছু শরিকদের ভিতর। উঠানটা আরও বড় ছিল। প্রায় এক তৃতীয়াংশ নষ্ট হয়েছে। উঠানের

এখানটা (পূর্ব প্রান্তে) একটা তক্তাপোশ পাতা হতো। তার উপর আসন। তা'তে বসে চৈতন্যদাস বাবাজী পশ্চিমাস্য ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করতেন। আর এইখানে চৈতন্যদেবের আসন হতো (ঠাকুর দালানের মধ্যস্থলে দক্ষিণাস্য)। পাশেই তুলসী, টবে রাখা হতো। উঠানে সব শ্রোতারা নিচে সতরঞ্চিতে বসতেন। ঠাকুর এই আসনেই বসেছিলেন। অনেক দিনের কথা। সব কথা সঠিক বলা কঠিন। আমার তখন বয়স দশ কি বার বছর।

অন্তেবাসী কুঞ্জবাবুকে ধন্যবাদ দিয়া নমস্কার করিয়া বিদায় লইতেছেন। তিনি যুক্ত করে আর্তির ভাবে বলিলেন — সে কি কথা! ঠাকুর নিজে আচরণ করে যা আমাদের শিখিয়েছেন তা আমায় পালন করতে দিন। এই অনুরোধের অধিকার তিনিই দিয়েছেন। বলতেন, 'গৃহস্থ বাড়িতে সাধু এলে মিষ্টিমুখ করাতে হয়'। একবার দয়া করে চলুন উপরে, পায়ের ধূলো দেবেন।

অন্তেবাসী দেখিলেন প্রকাণ্ড বাড়ি। বড় বড় ঘর ও দালান। সব ঘরেই ঠাকুরদের ছবি। একঘরের দেয়ালে টাঙ্গানো আছে চৈতন্য-সংকীর্তনের বিশাল এক তৈলচিত্র। সাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত। চৈতন্যদেব মধ্যস্থলে। পুরীতে রথাগ্রে নৃত্যরত। দ্বাদশ পুরী, ছয় ভারতী, পঞ্চ তত্ত্ব, ছয় গোস্বামী, চৌষট্টি মহন্তর ছবিও অন্য ঘরের দেয়ালে টাঙ্গানো রহিয়াছে। বাড়িটি যেন একটি আর্ট গ্যালারী। ধন্য গৃহকর্তা! অর্থের কি সদ্ব্যবহার। আর এক ঘরে দেখিলেন, ব্রজের প্রধানা অষ্ট সখী। অষ্ট দল। আবার চৌষট্টি সখী। এগুলি সবই তৈলচিত্র।

কুঞ্জ মল্লিক — এ বাড়িতে বহুকাল ধরে হরিসভা ছিল। এখানে ঠাকুরের সন্তান ত্রিগুণাতীতানন্দ স্বামী আসতেন। লক্ষ্মীদিদি কখনও এসে থাকতেন। চরণদাস বাবাজীর এটা আড্ডা ছিল। তাঁর শিষ্য রামদাস বাবাজীও কখনও থেকেছেন। অত মহাপুরুষসঙ্গ ও কৃপালাভ হয়েছে, তবুও বিষয় ছাড়ছে না! কি দুর্ভাগ্য আমার (হাউ হাউ করিয়া ক্রন্দন)।

অন্তেবাসী (পুনরায় প্রবোধ দিয়া) — আপনাকে কি বলবো বলুন। আমরা তাঁর নাম শুনে এসেছি, তাঁর ভক্তদের দেখে। আমাদের বিশ্বাস তিনি আমাদের পরম কল্যাণ করবেন। তিনি নিজ মুখে বলছেন, 'ভগবান

এই শরীরে অবতীর্ণ হয়েছেন’। আর শ্রীম-র মুখে শুনেছি, ঠাকুর প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন — ‘মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, শান্তি, সুখ, প্রেম, সমাধি — এসব আমার ঐশ্বর্য!’ আরো বলেছেন, ‘চৈতন্যদেব আর আমি এক’। বলেছেন, ‘আমার ধ্যান করলেই হবে। তোদের বেশি কিছু করতে হবে না। আমি কে আর তোরা কে এ জানলেই হবে।’

আপনি নরকলেবরধারী বাক্যমনের অতীত অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছেন, পাদপদ্ম স্পর্শ করেছেন, তাঁর স্নেহ ভালবাসা পেয়েছেন, আপনি যে পাকা সোনা হয়ে গেছেন! যেখানেই তিনি রাখুন আপনারা সৌভাগ্যবান, ভাবনা কি?

তবে বৃন্দাবনে থাকলে বাইরের আনন্দও পাওয়া যায়। সেখানে সর্বদা উৎসব। সৎসঙ্গ, মহাতীর্থ — এসব অনায়াসে হয়। আর তাঁর যদি ইচ্ছা হয় আপনি এখানেই থাকুন, তা’তেই বা কি! যা দেখেছেন, যা শুনেছেন, যা করেছেন তাঁর সঙ্গে, সেই সব কথা বসে ভাবুন। এই মহাসাধনা। তাঁকে প্রার্থনা ছাড়া আর আমরা কি করতে পারি? তাঁকে বলতে পারা যায়, এই মাত্র কাজ। করা না করা তাঁর ইচ্ছা। পূর্বে পঞ্চাশ বছর হলেই গৃহ ছেড়ে বানপ্রস্থ নিতেন লোক। আপনার ছিয়াত্তর।

কুঞ্জবাবু — বাবা, তিনবার গেছি বৃন্দাবনে, তিনবারই বিষয় টেনে এনেছে এখানে। বৃন্দাবনে ঠাকুরবাড়ি ও সেবা আছে, কিন্তু থাকতে দেন না, এমনি প্রারব্ধ! ছেলে দু’টি গেছে। উনপঞ্চাশ বছরে পরিবারও গত হয়েছেন। ভাইপো ছিল, সেও গেছে। এখন একটি বিধবা পুত্রবধূ আছেন। এবার আগামী মাসে, আষাঢ়ে আর একবার শেষ চেষ্টা করবো ভাবছি। তিনি ইচ্ছাময়। তাঁর ইচ্ছা হলেই হবে!

বাড়ির ভিতর হইতে রেকাবে ঘরে-প্রস্তুত উত্তম মিষ্টান্ন আসিল। গ্লাসে জল আর পান। অন্তেবাসী খাইতেছেন আর মল্লিক মহাশয় কথা কহিতেছেন।

কুঞ্জ মল্লিক — আমার বয়েস তখন যোল বছর। সবে পড়া ছেড়েছি। কাজে ঢুক্‌ছি। মণি মল্লিক মশায় একদিন বললেন, চল সাধু দর্শন করে

আসবে, দক্ষিণেশ্বর চল। উনি তিলি, আমরা সুবর্ণ বণিক। তিনি আমার ঠাকুরদার বন্ধু ছিলেন। তাই আমাদের নাতির মত দেখতেন।

আমরা প্রণাম করে মেঝেতে বসলে, তিনি উঠে গিয়ে সিকা থেকে সন্দেশ আনলেন। আমার হাতে আগে দিলেন। বললেন, খেয়ে ফেল। আর একদিন নিজ হাতে মুখে তুলে সন্দেশ খাইয়েছিলেন (হাউ হাউ শব্দে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন)। অত স্নেহ পেয়েও কিছু হল না।

অন্তেবাসী — আপনি স্থির হোন। আপনি কত ভাগ্যবান সেটা স্মরণ করুন। ভগবান নিজ হাতে প্রসাদ দিয়েছেন মুখে তুলে। সন্দেশ নয়, মিষ্টি নয় — এ জ্ঞান-ভক্তির ঢেলা। মুক্তি আপনাদের পেছনে পেছনে চলবে।

কুঞ্জ মল্লিক (শান্ত ভাবে) — তাঁর সম্বন্ধে দু'টি কথা মনে সদা জাগ্রত আছে — একটি বালকবৎ ব্যবহার, কথা ও আনন্দময় ভাব। আর একটি — দুনিয়াছাড়া ভালবাসা। অমন ভালবাসা এ জীবনে কোথাও দেখি নাই।

একদিন বিকেলে গিয়েছি। ঠাকুর গিরিশ ঘোষের চৈতন্যলীলা দেখতে যাবেন। সব প্রস্তুত। আমাকে দেখেই বললেন, 'এসেছিস্, আয় এদিকে আয়। আমি এখনই বেরুব।' এই কথা বলেই তাক থেকে সন্দেশ নিয়ে আমার হাতে দিলেন। আর ওঁর হাতটা আমার মাথায় বুলিয়ে দিলেন। তখন আনন্দে আমি ডুবে গেলাম। অমন আনন্দ আমার জীবনে আর কখনও হয় নাই।

আর একদিন নরেন্দ্র গান শুনাচ্ছেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসা, সমাধিস্থ। সমাধি ভেঙ্গে গেলে ঠাকুর নেমে এলেন আর মেঝেতেই বসে পড়লেন ঠাকুরবাড়ি ঢুকবার দরজার গোড়ায়। নরেন্দ্র তখন ওঁর পায়ে মাথা ঘষতে ঘষতে কাঁদতে লাগলেন। দুই চক্ষু তাঁর জলে ভেসে যাচ্ছে।

এ দু'টি ঘটনা আমার মনে আছে। আমার বিয়ে হয় উনিশ বছরে। আর পঁচিশের সময় ঠাকুরের শরীর যায়। মাঝে মাঝে যেতাম। এখন আমার বয়স ছিয়াত্তর।

(ছলছল চক্ষুতে) আপনারা তাঁর নাম শুনে সব ছেড়েছেন। আমি সাক্ষাৎ দর্শন কৃপা পেয়েও ছাড়তে পারছি না।

অন্তেবাসী প্রায় দুই ঘন্টার পর বিদায় লইলেন। মল্লিক মহাশয় করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, যদি এদিকে আসেন আমায় কৃতার্থ করবেন দর্শন দিয়ে।

অন্তেবাসী প্রায় সাতটায় ঠাকুরবাড়ি আসিলেন। তখন আরতি হইতেছে। শ্রীম ঠাকুরঘরে নামাবলী গায়ে যুক্তকরে দাঁড়াইয়া আছেন। অন্তেবাসী আরতির পর আবার বাহির হইলেন। তাই আজের দর্শনের কথা শ্রীমকে বলিতে পারিলেন না। সাড়ে আটটায় তিনি ঠনঠনে কালীবাড়ি গেলেন শুকলাল ও মনোরঞ্জনের সঙ্গে। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ দর্শন করিয়া জয়গোপাল সেনের বাড়ি গেলেন রতন সরকার স্কোয়ারে, সুখেন্দুর কাছে। সেখান হইতে সুখেন্দুকে লইয়া খিলাত ঘোষ, যদু মল্লিক ও যতীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি দর্শন করিবেন। এই সব স্থানই শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণরজঃসিঞ্চিত।

রাত্রি সাড়ে নয়টায় সুখেন্দু ও অন্তেবাসী ডাক্তার নরেন রায়ের বাড়িতে ভোজন করিলেন। ঠাকুরবাড়ি ফিরিলেন রাত্রি সাড়ে এগারটায়। সকলে নিদ্রিত।

আজ শুক্রবার, ২৭শে মে, ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ।

৬

কলিকাতা। ঠাকুরবাড়ি। প্রভাত চারিটা। শ্রীম আজ একা বেড়াইতে বাহির হইলেন। ফিরিয়া আসিলেন প্রায় ছয়টায়। অন্তেবাসী শ্রীম-র ঘরে ঢুকিয়া প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, একা কেন বেড়াতে গেলেন? শ্রীম উত্তর করিলেন, না বেড়ালে বড়ই nervous হয়ে পড়ি (ঘাবড়িয়ে যাই)। মনে হয় আর বুঝি চলতে পারবো না।

শ্রীম-র মশারি এখনও খাটান রহিয়াছে। অন্তেবাসী খুলিয়া ভাঁজ করিতেছেন। শ্রীম বলিলেন — না, আমায় দাও। তুমি পারবে না। মঠের মত করতে হবে। অন্তেবাসী ভাঁজ করিয়া একখানা ন্যাকড়াতে জড়াইয়া রাখিয়া বলিলেন, মঠে এ ভাবেই রাখি।

শ্রীম — কাল বিকেলে ও রাত্রিতে ঠাকুরের কোন্ কোন্ স্থান দর্শন হলো?

অন্তেবাসী — এ পাড়ার সব হয়েছে। আর রাত্রিতে গিছলাম সুখেন্দুকে নিয়ে জয়গোপাল সেন, খিলাত ঘোষ, যদু মল্লিক ও যতীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি। বিকালে একা অনেক কষ্ট করে চৈতন্যসভা আবিষ্কার করা গেল।

শ্রীম (কৌতূহলানন্দে) — কোথায় সেটি! আমি বার করবার জন্য গিয়েছি, কিন্তু কোন্ জায়গাটা identify (সনাক্ত) করতে পারি নাই। আজকাল রাস্তা সব বদলে গেছে। অন্তেবাসী — ট্রপিকাল স্কুলের opposite-এ (উল্টা দিকে)। এখন নাম সে রাস্তার — দেবেন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট, ৩২/২।

শ্রীম — কি করে বার করলে?

অন্তেবাসী (সহাস্যে) — সত্তর বৎসর বয়স্ক কে কে আছেন কলুটোলায় খুঁজতে বের হয়ে প্রথমেই fortunately (সৌভাগ্যক্রমে) পেলাম কুঞ্জ মল্লিক মশায়কে। তাঁর সাহায্যে বার করলাম।

শ্রীম — হাঁ, তিনি ঠাকুরকে দর্শন করেছেন। এখনো বেঁচে আছেন জানা ছিল না। ওঁর বাড়িতে আমরা গিয়েছি চৈতন্যদেবের সব ছবি দেখতে।

অন্তেবাসী — আমিও দেখে আশ্চর্য হলাম। অতবড় আর দামী ছবি কোথাও দেখি নাই চৈতন্যদেবের।

শ্রীম — ও বাড়িতেও হরিসভা ছিল।

অন্তেবাসী — আজ্ঞা হাঁ, কুঞ্জবাবু বললেন। আর বললেন, ত্রিগুণাতীত স্বামী, লক্ষ্মীদিদি এঁরাও যেতেন। আর চরণদাস বাবাজীও ওখানে থাকতেন।

শ্রীম — ঠাকুরের সম্বন্ধে কি কিছু বলা হল?

অন্তেবাসী — বললেন, ঠাকুরের কথা স্মরণ হলেই দু'টি চিত্র মনে আসে। ঠাকুর যেন সদানন্দ বালক! আর অমন ভালবাসা জগতে কোথাও তিনি দেখেন নাই।

শ্রীম — যাঁরা মিশেছেন সকলেই এ কথা বলেন — সদানন্দ বালক ও মূর্তিমান ভালবাসা। আর কিছু কথা হল?

অন্তেবাসী — দুই দিনের দুইটি ঘটনা বললেন। চৈতন্যলীলা দেখতে যেদিন ঠাকুর এসেছিলেন সেই দিন ওঁকে তাক থেকে সন্দেশ খেতে

দিলেন। তারপর মাথায় সেই হাত বুলিয়ে দিলেন। কুঞ্জবাবু বললেন, অমন আনন্দ আমার জীবনে আর পাই নাই, ঐ হাত মাথায় লাগায়।

শ্রীম — ঠিক, আর একটি কি?

অন্তেবাসী — স্বামীজীর গান শুনে ছোট খাটে ঠাকুর সমাধিস্থ। সমাধিভঙ্গের পর দক্ষিণ-পূর্ব দরজার সামনে এসে ঠাকুর মেঝেতে বসে পড়লেন। আর স্বামীজী ভাবে ঠাকুরের পায়ে মাথা ঘষতে লাগলেন, চক্ষে অজস্র প্রেমাশ্রু।

শ্রীম কিছুকাল স্থির, নীরব। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমসাগরে বুঝি মন বিলীন।

শ্রীম — আর কি বললেন?

অন্তেবাসী — ষোল বছর বয়সে মণি মল্লিকের সঙ্গে প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করেন। উনিশে বিয়ে হয়। ঊনপঞ্চাশে স্ত্রীবিয়োগ। তারপর দু'টি ছেলেও গত হয়। এখন এক বিধবা পুত্রবধূ কেবল ঘরে। কেঁদে আকুল এই বলে, তিনবার বৃন্দাবনে গেছেন কিন্তু বিষয় টেনে আনে। আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদছিলেন এই বলে, আপনারা তাঁর নাম শুনে এসেছেন এই যুবাবস্থায়। আমার এমন দুর্ভাগ্য — তাঁর চরণ স্পর্শ করে, তাঁর এত ভালবাসা পেয়েও কিছুই হলো না। এখন বয়স ছিয়াত্তর।

শ্রীম — আপনি কি বললেন তাতে?

অন্তেবাসী — আমি বললাম, আপনি সাক্ষাৎ ভগবানের ভালবাসা পেয়েছেন, সোনা হয়ে গেছেন! যেখানেই তিনি রাখেন সেখানেই থাকবেন। আপনারা সৌভাগ্যবান্।

শ্রীম — সবই এখন চলবার পথে। আমরা যখন যাই চৈতন্যসভায় তখন কালী ধরের ছেলেরা ছিলেন।

অন্তেবাসী — আচ্ছা, বিদ্যাসাগর-বাটির দক্ষিণ দরজা দিয়ে ঠাকুর গিয়েছিলেন কি?

শ্রীম — না, পশ্চিমের দরজায়। ওসব alteration (পরিবর্তন) করেছে।

অন্তেবাসী — পনের বছর আগেও দেখেছিলাম পশ্চিমের দরজা, সিঁড়ির পাশে ঝাউ গাছ। এখন দেয়ালের গায়ে ক'টা মাত্র ঝাউ গাছ

রয়েছে।

শ্রীম — আর কিছুদিন পরে এসব রূপকথার মত হয়ে যাবে। কেউ আর থাকবে না বলবার।

অন্তেবাসী — 'লিলি কটেজ'ও গার্লস স্কুল হয়েছে।

শ্রীম — এই সব modernised (আধুনিক কালের মত) হয়ে গেছে।

অন্তেবাসী — ও পাড়ায় আর কেউ আছেন (ঠাকুরের দর্শন করেছেন)?

শ্রীম —কোন্ পাড়ায়?

অন্তেবাসী — শোভাবাজার, বেনেটোলায়?

শ্রীম — অধর সেন আর নিতাইবাবু। নিতাইবাবুর বাড়ি ঠাকুর যান নাই। নিতাইবাবু প্রায়ই যেতেন। খিলাত ঘোষের বাড়ি খুব বড় বাড়ি।

অন্তেবাসী — যতীনঠাকুরের বাড়ি কখন গিছলেন?

শ্রীম — শুনেছিলাম গিছলেন। কখন তার ঠিক নাই। যদু মল্লিককে বলেছিলেন, তুমি অত মোসাহেব রাখ কেন (হাস্য)? বলেছিলেন, শালার কাছে কলকে পাবার যো নাই। এই বলেই অন্য ঘরে চলে গেলেন। Within his hearing — শুনতে পায় এমনভাবে বলেছিলেন (হাস্য)।

(সহাস্যে) (যদু মল্লিক) খুব ভালবাসতেন ভিতরে ভিতরে তাঁকে। বিষয়কর্ম নিয়ে থাকায় বোঝা যেতো না।

অন্তেবাসী — তা না হলে তিনি (ঠাকুর) অত যেতেন কেন?

স্বামী রাঘবানন্দ — কাল আমরা গিছলাম মহেন্দ্র গোস্বামীর বাড়ি আর মনমোহনবাবুর বাড়ি, ইনি (অন্তেবাসী) আর আমি।

শ্রীম — মহেন্দ্র গোস্বামীর বাড়ি গৌর-নিতাই আছেন। সেখানে গিছলেন ঠাকুর।

স্বামী রাঘবানন্দ — মনমোহনবাবুর বাড়ি এখন একজন ঢাকার বাঙ্গাল কিনেছেন। উনি বললেন, এখানে বাহ্যে করে ঠাকুর অন্যত্র যেতেন।

শ্রীম — ওখানে বিশ্রাম করে অন্যখানে যেতেন।

সাধু ও ভক্তগণ তিনতলায় গেলেন। ঠাকুরঘরের সামনে বসিয়াছেন।

শ্রীম একটু পরে উপরে আসিয়া ছাদে একা বেড়াইতেছেন। একটু পর আসিয়া বসিলেন 'নাটমন্দিরে' ঠাকুরঘরের দরজার সামনে পশ্চিমাস্য। স্বামী রাঘবানন্দ বসিলেন উত্তরাস্য। আর অন্তেবাসী পশ্চিমাস্য। উভয়েই শ্রীম-র বাম হাতে। শ্রীম-র পরনে লালপেড়ে ধুতি, কোঁচান। গায়ে হাতকাটা সাদা ফতুয়া। তাহার উপর 'হরেকৃষ্ণ' নামাবলী। পোশাক ময়লা বলিলেই হয়।

শ্রীম কথামৃতের প্রুফ দেখিতেছেন, পঞ্চম ভাগের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খণ্ড। শ্রীম-র সামনে চৌকো দোয়াত। হাতে কলম। দক্ষিণ হাঁটুর উপর ফর্মা রাখিয়াছেন। চোখে চশমা নাই। বিরলকেশ শীর্ষদেশ। আর আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রু। সমুখঠেলা উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয়। প্রশস্ত উন্নত ললাট। প্রসন্ন গম্ভীর ভাব। যেন ব্যাস ঋষি বেদ প্রণয়ন করিতেছেন।

একজন সাধু (স্বগত) — এখন একটি ফটো নিলে হয়, শ্রীম কথামৃত লিখছেন।

অন্তেবাসী — এটা যদি প্রিন্ট অর্ডারের জন্য না হয়, তবে আমাদের দিন না। দেখে দেব'খন।

শ্রীম — না। কিছু addition alteration (অদল-বদল) করতে হচ্ছে।

প্রুফ দেখা হইয়া গেলে ফর্মাটা দিলেন স্বামী রাঘবানন্দের হাতে। বাগবাজারের সাহা ভক্তরা আসিয়াছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর নিরাকারের কথা বললেন নানকপন্থী সাধুদের। তাঁরা নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন কিনা! ফরটি এইট এ্যাণ্ড হাফ ইয়ার্স আগে, এইটিন এইটিথ্রীতে। তখন আপনাদের কারও জন্ম হয নাই। ভবনাথকেও বললেন, ভক্তির কথা গান গেয়ে — 'শ্যাম তুমি আমার পরাণের পরাণ'। যার যেমন কলটি তেমনি নাড়া দিয়ে বাজিয়ে দিচ্ছেন।

আবার বেদান্তবাদীদেরও বলতেন, তাঁদের মত করে। তাঁরা 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' বলেন — স্বপ্নবৎ সব।

(মুচকি হাস্যে সাধুদের লক্ষ্য করিয়া) যাদের ভক্তিভাব বেশী তাদের বেশী বেদান্ত শুনতে বারণ করতেন। বেদান্তবাদীরা স্বপ্নবৎ বলে কি না।

তাহলে গুরু উড়ে যাচ্ছে, অবতারও উড়ে যাচ্ছে। তাই ভক্তিচর্চা করতে বলতেন। দ্বৈতভাব থেকে আরম্ভ করতে বলতেন। তারপর যা দাঁড়ায় দাঁড়াক।

শ্রীম — (বালকের মত হাস্যানন্দে ফষ্টিনষ্টি করিয়া ভক্তদের প্রতি) আচ্ছা, আপনাদের পাড়ায় আম উঠেছে?

একজন ভক্ত — পাবনাতে ছিলাম। সেখানে একশ আম দু আনা।

শ্রীম — আচ্ছা, কোথায় আমে পোকা আছে (নয়নে হাস্য)? — ফুস্ করে উড়ে গেল (উচ্চ হাস্য)।

একজন ভক্ত — কুমারখালির আমে।

শ্রীম — (ঠাকুরঘরের দিকে দৃষ্টি করিয়া) — হাঁ সতীনাথবাবু, ফুল সাজানো হলো না?

সতীনাথ (ছাদে বসা, সেখান হইতে) — ও আমার কাজ নয়। জগদীশবাবু করবেন।

শ্রীম — না, জগদীশের আসতে দেরী হবে। তুমি করে ফেল। (শ্রীম-র চক্ষে হাসি, মুখেও ঈষৎ হাসি)। দম নিচ্ছিলে বুঝি? (উচ্চহাস্য)।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — বলরামবাবু গাড়ি করে দিয়েছেন দেড় টাকায়। ঠাকুর বললেন, 'এত কমে হয়?' বলরামবাবু বললেন, 'তা অমন হয়।' ওমা, আধারাস্তায় যেতেই ঘোড়া থেমে দাঁড়াল। (ঠাকুর বললেন) 'কি রে থামলি যে?' না, 'ঘোড়ার পেট কামড়াচ্ছে' - সহিস বললে (হাস্য)। আবার চলছে, আবার থেমে গেল। (আবার ঠাকুর বললেন) কি হলো রে আবার?' 'না, এবার ঘোড়া দম নিচ্ছে' — সহিস বললে (সকলের অতি উচ্চ হাস্য)।

আর একদিন (বলরামবাবু) গাড়ী করে দিলেন। যেতে যেতে গাড়ীর ডানদিকটা খুলে পড়ে গেল সবটা — ঠাকুর গল্প করতেন। 'তখন ত্রৈলোক্য যাচ্ছে জানবাজারে জুড়ি গাড়ী করে। (বাঁ হাতে চোখ ঢেকে) লজ্জায় তখন হাত দিয়ে মুখ ঢাকি।' বলছিল, দম নিচ্ছে (হাস্য)।

শ্রীম (সতীনাথের প্রতি) — হাঁ, সতীনাথবাবু, ফাউটাউ দাও একটু। আবার তো আজ 'নিমাই সন্ন্যাস' দেখে পালাবে।

(ভক্তদের প্রতি) দুই দিন দেখেছে। আবার আজ হয়তো দেখে

পালাবে।

ভক্তগণ — কোথায়?

শ্রীম — উনি মাঝে মাঝে দেশে পালান।

জগদীশ আসিয়া ফল কাটিতেছে।

শ্রীম — জগদীশবাবু, দেখো হাত কেটো না। (ভক্তের প্রতি) আমরা একে মাঝে মাঝে বলি কিনা বড্ড slow (ঢিমে তেতালা), তাই তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে হাত না কেটে ফেলে (হাস্য)।

একজন সাধু (স্বগত) — কি অদ্ভুত way of criticism (সমালোচনার কি বিচিত্র রীতি)! মহাপুরুষদের পথই আলাদা। হাসি ঠাট্টার ভিতর দিয়ে hammering (উপলব্ধি) চলছে। ওরা (সেবকরা) টের পাচ্ছে না। অথচ কাজ ঠিক হয়ে যাচ্ছে!

শ্রীম (স্বগত) — 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যয়া।' ভগবানের পথ ক্ষুরের ধারের মত। একটু এদিক ওদিক হলে অমনিই যাবে।

(বাগবাজারের ভক্তদের প্রতি) — আমি নববাবুকে বলেছিলাম, মেয়েদের এত ঘন ঘন না আনতে। মনে কর, এখানে পুরুষমানুষদের জায়গা। মেয়েদের এত কেন আসা? তবে একমাস পর একবার এলো, ঠাকুর প্রণাম করে যেতে পারে।

আর ছেলেদেরও বারণ করেছি আসতে। তাদের যখন সময় হবে তখন আসবে। এখন তাদের শরীর কিসে ভাল থাকে, আর পড়াশোনা করা। এঁরা এখানে তপস্যা করেন। তপস্যার বিঘ্ন হয় এতে। মেয়েরা দু'একমাস অন্তর এলো। ছেলেরা বেড়াচ্ছিল। তা না করে এখানে বেড়াতে নিয়ে এল। এ ভাল না। তপস্যার বিঘ্ন হয় এঁদের। যা ভগবানের পথের বিঘ্ন তা (দু'হাতে ফেলার অভিনয় করিয়া) এমন করে ফেলে দেবে আর এগুবে।

একজন সাধু (স্বগতঃ) — যা বিঘ্ন, তা' ফেলে দিতে হবে লজ্জা ভয় সঙ্কোচ ছেড়ে নির্মমভাবে। প্রয়োজন হলে সমস্ত সংসার ছাড়তে হবে।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — 'আপনি শুতে স্থান পায় না শঙ্করাকে ডাকে'। নিজের কি হলো এদিকে লক্ষ্য নেই। খালি লেকচার (পত্নী পুত্র কন্যার কাছে)। চাচা আপনি বাঁচা। আগে নিজে বাঁচ, তারপর অন্য।

'Physician, heal thyself' — চিকিৎসক, আগে নিজেকে আরোগ্য কর। তবে যদি তাঁর আদেশ পাও, লেকচার দাও। নচেৎ 'আপনি শুতে স্থান পায় না শঙ্করাকে ডাকে'।

(সতীনাথকে লক্ষ্য করিয়া একজন সাধুর প্রতি) — কেউ খালি ধ্যান করতে চায় (হাস্য)। স্বামী বিবেকানন্দ একজনকে বলেছিলেন বরানগর মঠে, 'ধ্যান করছিস্ কি রে, আগে তামাক সাজ'। এর নাম কর্মযোগ — তামাক সাজা (হাস্য)।

একজন সাধু — ত্রিগুণাতীত স্বামীকে।

শ্রীম — কে একজনকে।

৭

শ্রীম (জগদীশের প্রতি) — আম যা নরম হয়ে গেছে তা দিও ঠাকুরদের। উনি (স্বামী নিত্যাত্মানন্দ) জানেন, সাধুরা পাঠিয়েছেন।

মাদ্রাজের সালেম (Salem) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে শ্রীম-র জন্য এক ঝুড়ি ভাল আম পাঠাইয়াছেন আশ্রমের মহন্ত স্বামী দেশিকানন্দ, আর যাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দান করায় ঐ আশ্রম হইয়াছে, সেই বীর ভক্ত রাঘবন।

শ্রীম — সাধুরা পাঠিয়েছেন, মানে ঠাকুর পাঠিয়েছেন। অমূল্য জিনিস। তাই আমরা ঝুড়ির ভেতরে বড় একটা ন্যাকড়াতে বালিশের মত জড়িয়ে রেখেছি। ঐ দেখুন (নাটমন্দিরের ভিতরের ছাদে)। আমাদের যখন বৈরাগ্য হবে তখন মাথার বালিশ হবে এতে।

শ্রীম উঠিয়া ছাদে গেলেন। কেরোসিনের টিনে একটা বেলগাছ রহিয়াছে। গাছের গোড়ার মাটিতে কাল ডেয়ো পিঁপড়া অনেক গর্ত করিয়াছে। বহু পিঁপড়া গর্তে ঢুকিতেছে আর বাহির হইতেছে। শ্রীম সতীনাথ ও জগদীশকে ডাকিয়া নিয়া দেখাইলেন। বলিলেন, টিন থেকে মাটিশুদ্ধ গাছটা বের করলে হয়। ততক্ষণে অন্তেবাসী ছাদে গিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীম বলিলেন, দেখুন। আমি আর ভাবতে পারছি না। আপনারা চারজন আছেন, ব্যবস্থা করুন। প্রথম, একটি পিঁপড়েও মরবে না। সেকেণ্ড, গাছ রক্ষা হয়।

অন্তেবাসী নারিকেল পাতার কাঠি দিয়া গর্ত হইতে পিঁপড়া বাহির করিতেছেন। এক একটা গর্ত খালি হইতেছে আর অমনি মাটি দিয়া উহার মুখ বন্ধ করিতেছেন। শ্রীম দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। একটু পর শ্রীম গিয়া 'নাটমন্দিরে' বসিলেন। স্বামী রাঘবানন্দের সঙ্গে কথামৃতের ফর্মার সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

অন্তেবাসী কয়েকদিন শ্রীম-র কাছে আছেন। আর ঠাকুরের স্থান সকল দর্শন করিতেছেন। সকালে বাহির হইয়া যান। ফিরেন বেলা বারটায়। শ্রীম উৎসুক চিত্তে বসিয়া থাকেন। উভয়ে আহার করেন। অন্তেবাসী তখন দিনের বিবরণ বলেন। আজের বিবরণ শেষ হইলে অন্তেবাসী শ্রীমকে বলিলেন, আজ মঠে যাইব। আবার কয়েকদিন পরে আসিয়া বাকীগুলি দেখিব।

শ্রীম বলিলেন, সেদিন বাগবাজারের খাল পর্যন্ত সব স্থানের কথা বলা হয়েছে। খালের উত্তর দিকেও অনেকগুলি স্থান আছে। (৫৩) কাশীপুর উদ্যান। (৫৪) সিঁতির বেণীপালের বাগান। (৫৫) সর্বমঙ্গলা। (৫৬) কাশীপুর শ্মশান। (৫৭) বরাহনগরে দশমহাবিদ্যা। (৫৮) 'ঠাকুরদাদার' বাড়ি। (৫৯) জয় মিত্রের ঠাকুর বাড়ি ও গঙ্গার ঘাট। (৬০) হরমোহনদের বাড়ি। (৬১) মণি মল্লিকের বাগান বাড়ি। (৬২) ভাগবত আচার্যের পাটবাড়ি। (৬৩) কাশীপুর বাগানের পাশেই মহিম চক্রবর্তীর বাড়ি — সেখানে গিছলেন কি? (৬৪) আলমবাজারে নটবর পাঁজার তেলের কল। (৬৫) শম্ভু মল্লিকের বাগান। (৬৬) যদু মল্লিকের বাগান। (৬৭) ঠাকুরের লীলাভূমি দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থ। (৬৮) এঁড়েদহে যোগীন স্বামীদের বাড়ি। (৬৯) কৃষ্ণকিশোরের বাড়ি। (৭০) গদাধরের পাটবাড়ি। (৭১) এঁড়েদহের গঙ্গার ঘাট — সাধুদর্শন করতে গিছলেন। (৭২) মতি শীলের ঝিলে নিয়ে গিছলেন একজনকে (শ্রীমকে) দেখাতে বেদান্তের ধ্যান, নিরাকারের ধ্যান কি করে করতে হয়। সেখানে বড় পুকুরে বড় বড় রুই মাছ ছিল। অনন্ত ব্রহ্মসমুদ্রে যেন মীন আনন্দে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে। (৭৩) পেনেটির উৎসবক্ষেত্র ও মণি সেনের ঠাকুরবাড়ি। (৭৪) রাঘব পণ্ডিতের ঠাকুরবাড়ি। সেখানে চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দও এসেছিলেন। (৭৫) দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর বাইরে 'রস্‌কে'র বাড়ীতে গোপনে গিয়েছেন

রসিক কালীবাড়ির মেথর ছিলেন। কিন্তু ঠাকুরের ভক্ত। তার বাড়িতে গিয়ে চুল দিয়ে নর্দমা সাফ করে বলেছিলেন, 'মা, আমার ব্রাহ্মণ অভিমান চূর্ণ কর'। ঠাকুরের কৃপায় রসিক ঋষি। (৭৬) কামারহাটিতে ব্রাহ্মণীর (গোপালের মার) কুটীর। (৭৭) কোন্নগর। (৭৮) অম্বিকা কালনায় ভগবান বাবাজীর আশ্রম। (৭৯) নৈনানের ঠাকুরদের বাগানবাড়ি। এই বাড়িতে আর্য সমাজের প্রবর্তক স্বামী দয়ানন্দ ১৮৭২-৭৩-এর ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের নেতা ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের সঙ্গে দেখা করা ও ভারতের সমাজসংস্কার ও ধর্মবিষয়ক আলোচনা ও কর্মপন্থা নির্ণয় করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই মিলনের। ঐ সময়ে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের মিলনসভাতে উপস্থিত ছিলেন। কার সঙ্গে তিনি এসেছিলেন তা সঠিক বলা কঠিন। তবে আমাদের (শ্রীম-র) নিকট কথাপ্রসঙ্গে ঐ মিলনের কথা ঠাকুর উল্লেখ করেছিলেন। উহা 'কথামৃত'এ বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায়, ঠাকুর হয়তো নেপালের রাজপ্রতিনিধি বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের সঙ্গে এসে থাকবেন। উপাধ্যায় মশায় মাঝে মাঝে ঈশ্বরীয় নাম উচ্চারণ করতেন — শিব, কালী, দুর্গা, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি। স্বামী দয়ানন্দ কৌতুকচ্ছলে বলেছিলেন, 'আ রে সন্দেশ সন্দেশ কহো, কালী কালী না কহা কর।' উপাধ্যায় মহাশয় প্রায়ই ঠাকুরের কাছে আসতেন। খুব ভক্তিমান সেবক। কখনও নিজ বাসভবনে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরকে আদরে ভোজন করাতেন। ইনিই কখনও বলতেন — 'আ রে, বাঙ্গালী মাণিককো (ঠাকুরকে) নহি পয়চানতা!'

ঠাকুর কেশব সেন ও স্বামী দয়ানন্দকে দেখে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। এই অতিমানবীয় সমাধিদৃশ্যের প্রতি স্বামী দয়ানন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উপরোক্ত উপহাসের প্রত্যুত্তরে উপাধ্যায় মশায়ই সম্ভবতঃ স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করে থাকবেন, 'মহারাজ আপকো এইসি অবস্থা প্রাপ্ত হুই কেয়া?' স্বামীজী সহজভাবে উত্তর করলেন, 'নাহি, পাণ্ডিত্যাভিমান হ্যায়।' এই স্পষ্ট উক্তিই প্রতিপন্ন করে স্বামী দয়ানন্দ মহাপুরুষ ছিলেন। সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলা মহাপুরুষের লক্ষণ। (৮০) ঠাকুরের মুখে শুনেছি, কলকাতায় এসে প্রথম লেবুবাগানে বড়দাদা পণ্ডিত রামকুমারের সঙ্গে ছিলেন। তখন বয়স ষোল বছর। এরপর আসেন বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে

খোলার বাড়িতে। পরে সেখানে হেয়ার প্রেস ছিল। (৮১) সুরেশ মিত্রের বাড়িতেও গিয়েছেন। ঐ বাড়িও ভাঙ্গায় পড়েছে বিপদাশঙ্কায়। রামবাবুর বাড়ির কাছে ছিল — অক্সফোর্ড মিশনের পেছনে। (৮২) কলুটোলায় কেশব সেনের বড় ভাই নবীন সেনের বাড়িতে গিছলেন তাঁদের মায়ের নিমন্ত্রণে। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। আমরা risk (বিপদ) নিয়ে ঐ বাড়িতে নিচে বসে দ্বিতলের ঘরে ঠাকুরের নৃত্য দর্শন আর গান শ্রবণ করেছিলাম। ঠাকুর পরের দিন বলেছিলেন, 'গোপনে ভাল'। তিনি জেনেছিলেন, তাঁর অগোচর তো কিছু নাই। (৮৩) নকুড় বোষ্টমের মুদির দোকানে বসতেন, আমাদের ঠাকুরবাড়ির বিপরীত ফুটে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে। নকুড়, ঠাকুরের দেশেরই লোক। বলতো, ও বামুনঠাকুর গান শুনায়। ঠাকুর গানে মগ্ন। ওদিকে গামছায় বাঁধা চাল কলা ও ফল প্রভৃতি লোক সরিয়ে ফেলতো। এই পাড়ায় পূজো করতেন কিনা, সেখান থেকে এনেছেন। ঠাকুর হাসতে হাসতে গামছা ঝেড়ে চলে যেতেন। (৮৪) বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের বাড়িতে প্রায়ই নিয়ে যেতেন। (৮৫) বেলুড়ে নেপালের কাঠের টালে (depot) গিছলেন। গঙ্গায় ভাসিয়ে আনতো কাঠ। বিশ্বনাথ উপাধ্যায় নিয়ে গিছলেন। ঠাকুরের মুখে শোনা এই কথা।

অন্তেবাসী বিদায় লইতেছেন শ্রীমকে প্রণাম করিয়া। এখন বেলা সাড়ে আটটা বাজিয়াছে। শ্রীম বাগবাজারের ভক্তদের বলিলেন, আপনারা kindly (দয়া করে) এটা (কথামৃত পঞ্চম ভাগের ১৩-১৪ ফর্মা) সুধা প্রেসে দিয়ে যাবেন। অন্তেবাসী বলিলেন, আমায় দিন, আমি দিয়ে যাব। শ্রীম বলিলেন, না তোমায় আবার তা' হলে হেঁটে যেতে হবে। এরাই নিক্। অন্তেবাসী বলিলেন, আমি আজ সিমলায় মনমোহনবাবুর বাড়ি আর মহেন্দ্র গোস্বামীর বাড়ি দর্শন করে যাব। তাই ঐ পর্যন্ত হেঁটে যাব। সুধা প্রেস তো রাস্তায় পড়বে। শ্রীম বলিলেন — আচ্ছা, তা' হলে নিয়ে যাও। রসিদের এখনই দরকার নাই। তোমার কাছে রেখে দিবে।

ভক্তরা অন্তেবাসীর সঙ্গে সুধা প্রেসে গেলেন। ফর্মা জমা দিয়া রসিদ লইয়া উহা ভক্তদের হাতে দিলেন, বিকালে তাঁহারা শ্রীমকে ফেরৎ দিবেন। রাস্তায় খুব উত্তম তালশাঁস আর কালজাম দেখিয়া অন্তেবাসী উহা মঠে শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের জন্য খরিদ করিলেন। তিনি পয়সা দিতে গেলে

ভক্তরা অনুরোধ করিয়া পয়সা দিলেন। ভক্তরা চলিয়া গেলেন।

ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত মনমোহন মিত্রের বাড়ি, ৬৪ নম্বর সিমলা স্ট্রীট ও সিমলা লেনের সংযোগস্থলে অবস্থিত। বাড়ির বর্তমান মালিক শ্রীভুবনেশ্বর গুপ্ত। পূর্ববঙ্গের লোক। ইনি কবিরাজ। ছোট দোতলা বাড়ি। গৃহকর্তা অন্তেবাসীকে লইয়া উপরে গেলেন। সিঁড়ির পাশের উপরের ঘরে ঠাকুর বসিয়াছিলেন। বলিলেন, শুনেছি যখনই তিনি আসতেন এই ঘরেই বসতেন। তাই ভাল করে রেখেছি। আরও বলিলেন — সিঁড়ি, উঠোন, নিম্নতলের বৈঠকখানা পুরোনো। বৈঠকখানা দুই ভাগে ছিল। এখন একটা ঘর করা হয়েছে। সিঁড়ির পাশে দেয়াল ভেঙ্গে রেলিং আমরা বানিয়েছি। ঘরে ঘরেই ঠাকুরের ছবি।

৪০।৪১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেনে মহেন্দ্র গোস্বামীর বাড়ি। উহা সিমলা স্ট্রীটের সামনের রাস্তা। এখন অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর বাড়ি। মহেন্দ্র গোস্বামীর নাতি অন্তেবাসীকে ভিতরে লইয়া গেলেন। বাড়িতে রাধাকান্ত মন্দির পশ্চিমমুখী। অন্তেবাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, চৈতন্যদেবের বিগ্রহ কোথায়? নাতি উত্তর করিলেন, এখন সরিকের বাড়িতে গেছেন। এই পাশের ঘরে থাকেন এখানে এসে।

একটি বৃদ্ধা চেয়ারে বসা। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন অন্তেবাসী, হাঁ মা, ঠাকুরকে আপনি দর্শন করেছেন? অতি বিনীতভাবে তিনি উত্তর করিলেন, কি করে বলি বাবা দর্শন করেছি! এখানে আর যদু মল্লিকের বাড়িতে — দুই স্থানে দর্শন হয়েছে। ঠাকুরদালানের একটি পিলার দেখাইয়া বলিলেন, এখানে বসেছিলেন মেঝেতেই আসনে ঠাকুরের সামনে। অষ্টমী তিথিতে এসেছিলেন মনে আছে।

মহেন্দ্র গোস্বামীর নাতি অন্তেবাসীকে লইয়া এইবার ৪৬বি, মানিকতলা স্ট্রীটে নীরদবিহারী গোস্বামীর বাড়িতে গেলেন। এই বাড়িতেই গৌর-নিতাই এখন পালায় আছেন। ঠাকুর এই বিগ্রহ যুগল দর্শন করিতেই আসিয়াছিলেন। অন্তেবাসী ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। গোস্বামী বলিলেন, এই গৌর নিতাই পাঁচশ বছরের প্রাচীন। আমরা নিত্যানন্দ বংশ। খড়দহে আমাদের প্রাচীন বাড়ি। 'পালা'-তে এখানে এসেছেন। নবদ্বীপ গোস্বামী আমাদের বংশধর। তিনিও ঠাকুরকে দর্শন করেছেন।

মহেন্দ্র গোস্বামীর নাতি বেশ উদার সরল লোক। বংশের ছাপ রহিয়াছে মনে। একটু স্থূলকায়। বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশ। গলায় সোনার দড়ি। বক্ষে ললাটে 'রাধাকৃষ্ণ' নাম। গরদবস্ত্র পরিহিত। হাতে মালার আধারী — মুখে বিড়বিড় করিয়া জপ করেন।

গোস্বামীকে ধন্যবাদ দিয়া অন্তেবাসী পুনরায় আসিলেন মনমোহন গৃহে। গুপ্তমহাশয়ের নিকট বিদায় লইয়া বাসে উঠিলেন। কুঠিঘাটায় পার হইয়া এগারটায় মঠে।

আজই অন্তেবাসীর শেষ দর্শন শ্রীমকে। মনমোহন ও মহেন্দ্র গোস্বামীর ভবন দর্শনের বিবরণ শুনিবার জন্য তিনি আর এ শরীরে রহিলেন না। সঙ্কল্প ছিল, অন্তেবাসী আগামী সপ্তাহে আসিয়া এক সপ্তাহ থাকিবেন। কিন্তু শ্রীশ্রী ঠাকুর ইহার পূর্বেই স্বীয় অন্তরঙ্গ পার্ষদ কলির বেদব্যাস 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'কার আচার্য শ্রীমকে টানিয়া আপন কোলে স্থান দিলেন। অন্তেবাসীর নিকট শ্রীম-র এই শেষ বাণী।*

বেলুড় মঠ, কলিকাতার অদূরে।
২৮শে মে, ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার।

---

* শ্রীম কথিত উপরোক্ত দুই লিস্টে বর্ণিত ঠাকুরের শ্রীচরণস্পর্শে পবিত্র অধিকাংশ তীর্থসমূহ অন্তেবাসী একাধিক বার দর্শন করিয়াছেন শ্রীম-র সঙ্গে। এই শেষবার সঙ্কল্প ছিল প্রত্যেক স্থানের (১) প্রাচীন ঠিকানা (২) নূতন ঠিকানা (৩) শ্রীম-র মুখ হইতে ঠাকুরের দর্শনের যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হইবে। কিন্তু অন্তেবাসীর এই সংকল্প পরিপূর্ণ হয় নাই। ইহার পূর্বেই শ্রীম ভক্তগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, 'গুরুদেব, মা কোলে তুলে ন্যাও' — এই মহাবাণী বলিতে বলিতে মহাসমাধিতে প্রবেশ করিলেন। ভক্তদের জন্য রাখিয়া গেলেন ঠাকুরের দিব্য জীবন ও মহাবাণী আর নিজের বিস্ময়কর গৃহস্থ সন্ন্যাসের অলৌকিক সংবাদ। ভক্তগণ এই অভয় ও আনন্দের সংবাদ অনুধ্যান করুন এবং ব্রাহ্মীস্থিতির দিকে অগ্রসর হউন, আর এই জীবন-নাটকের অন্তে ব্রহ্মলীনতা প্রাপ্ত হউন।

পরিশিষ্ট

প্রথম অধ্যায়

শ্রীশ্রীম-র মহাসমাধি*

অন্তেবাসী

১

বেলুড় মঠ। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ঘর। সকাল সাড়ে ছয়টা। ৫ই জুন, রবিবার, ১৯৩২। মহাপুরুষ মহারাজ খাটে বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য।

অন্তেবাসী প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন, আজ আমি মাস্টার মহাশয়ের কাছে যাব মনে করেছি। দিন সাতেক থাকার ইচ্ছা। গত সপ্তাহে পাঁচ দিন ছিলাম। তা'তে ঠাকুরের শ্রীচরণস্পর্শে পবিত্র কলকাতার পুণ্য স্থানসমূহ দর্শন করে একটা লিস্ট করেছি — মাস্টার মহাশয়ের সহায়তায়। আর এক সপ্তাহ চেষ্টা করলেই লিস্ট পূর্ণ হবে। অনেক স্থানে অদল বদল হয়েছে। ঘুরে ঘুরে দেখা। প্রাচীন ঠিকানা আর বর্তমান ঠিকানা ও বিবরণও লিপিবদ্ধ করা। অনেক সাধু, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণের অনুরোধে এ কাজে নেমেছি।

মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় কোথায় গিছিলে? বলিলাম, গত সপ্তাহে পঞ্চাশটা হয়েছে, পঞ্চাশটা বাকী আছে। এর ভিতর শ্রেষ্ঠ স্থান ঐ কলুটোলার হরিসভা — যেখানে ঠাকুর ভাবস্থ হয়ে চৈতন্যদেবের আসনে বসেছিলেন।

খুঁজতে খুঁজতে দৈবক্রমে ঠাকুরের ভক্ত কুঞ্জ মল্লিক মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় কলুটোলা স্ট্রীটের দক্ষিণের গলিতে, মেডিক্যাল কলেজের ট্রপিক্যাল স্কুলের পেছনে। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন। আর বলতে লাগলেন, বাবা আমি হতভাগা। তাঁর এত

২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯ সাল, ৪ঠা জুন ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ।
শনিবার, ফলহারিণী কালিকা পূজার শেষ — অমাবস্যা, রোহিণী নক্ষত্র।

কৃপা পেয়েও সংসার ছাড়তে পারলাম না। কত ভালবাসা তাঁর। নিজহাতে রসগোল্লা মুখে তুলে দিয়েছিলেন। তখন আমার বয়স ষোল। তিন বার সব ছেড়ে বৃন্দাবনে গেলাম। সেখানে ঠাকুরবাড়ি আছে। কিন্তু তিনবারই আমায় বিষয়ে টেনে এনে এখানে ফেলেছে।

তোমাদের দেখে যেমনি আনন্দ হয়, তেমনি আমার দুঃখ হয় নিজের অদৃষ্ট দেখে। তোমরা এই যৌবন বয়সে সব ছেড়ে তাঁর চরণে আশ্রয় নিয়েছ। কত ভাগ্যবান তোমরা! তাঁকে সাক্ষাৎ দর্শন কর নাই — তা'তেই এত ব্যাকুলতা! আমার দর্শন করেও কিছুই হল না।

তারপর আমার ঐ মহল্লায় আসার উদ্দেশ্যের কথা বললাম। তখন তিনি আমাকে হাতে ধরে নিয়ে গেলেন সেই চৈতন্যসভার স্থানে। স্থানটি তখন তাঁর ভাগনে পূর্ণ ধরের অধিকারে ছিল। পার্টিশান হয়ে যাওয়ায় একটু অদল বদল হয়েছে।

মহাপুরুষ শুনিয়া বলিলেন — হাঁ, চৈতন্যের আসনে ঠাকুরের বসা নিয়ে কলকাতার বৈষ্ণব সমাজে হুলুস্থূল হয়েছিল।

আমি বলিলাম, শ্রীম দুই তিন বার চেষ্টা করেছিলেন এই স্থান বের করতে। কিন্তু কৃতকার্য হন নাই। আমার কাছে শুনে তিনি অনেক ভক্তের সঙ্গে গিয়ে ঐ স্থান দর্শন ও প্রণাম করে এসেছিলেন।

শ্রীম আমাকে বলেছিলেন, তখন বৈষ্ণব সমাজের শিরোমণি ছিলেন সিদ্ধ মহাপুরুষ ভগবানদাস বাবাজী। কাটোয়ায় তাঁর আশ্রম। তিনি কলকাতার বৈষ্ণব ভক্তগণকে কঠোর স্বরে তিরস্কার করলেন, কেন তোমরা ঐ আসনে বসতে দিলে? কেন বাধা দেও নাই?

শ্রীম বলেছিলেন, এই সব আন্দোলন একটু শান্ত হয়ে গেলে অন্তর্যামী ভগবান ঠাকুর হৃদয়কে নিয়ে নৌকা করে কাটোয়ায় ভগবানদাস বাবাজীকে দর্শন করতে গেলেন। তিনি নৌকাতে থাকতেই শুনেছি বাবাজী আশ্রমবাসীদের বলেছিলেন, আজ কোনও মহাপুরুষের শুভাগমন হবে এ আশ্রমে। হৃদয় মুখার্জী ঠাকুরকে ধরে নৌকা থেকে নিয়ে আশ্রমে প্রবেশ করলেন।

ঠাকুরের পরনে লালপেড়ে ধুতি, এলোমেলো ভাবে পরা। আর গা মোটা বোম্বাই চাদর দিয়ে ঢাকা ছিল। বাবাজী অতি বৃদ্ধ বলে তখন আসনে

শুয়েছিলেন।

ঠাকুর করজোড়ে তাঁর স্বভাবমত বাবাজীকে প্রণাম করলেন। হৃদয় বললেন, 'ইনি আমার মামা। আপনার দর্শনের জন্য এসেছেন।' ঠাকুরকে নিচে মাদুরে বসালেন। দেখতে দেখতে ঠাকুর ভাবসমাধিতে নিমগ্ন হলেন। চোখ মুখ জ্যোতির্ময়। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ। গায়ের চাদর খসে পড়ল।

বাবাজী ঠাকুরের প্রশস্ত বক্ষঃস্থল লালিমারঞ্জিত দেখে বুঝতে পারলেন ইনিই সেই মহাপুরুষ যাঁর আগমনবার্তা ভগবান তাঁর হৃদয়ে পূর্বাহ্নে সূচিত করেছিলেন। বাবাজী আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি উঠে এসে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলেন, কে এই মহাপুরুষ তা না জেনেই।

পরে হৃদয়ের নিকট থেকে পরিচয় পেলেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরের রাসমণির কালীবাড়ির রামকৃষ্ণ পরমহংস। তখন আনন্দে উল্লসিত হয়ে শ্রদ্ধাপরিপূর্ণ হৃদয়ে বৈষ্ণবোচিত বিনয়ে হাত জোড় করে ঠাকুরকে বলতে লাগলেন, 'প্রভু, আপনি চৈতন্য-আসনে বসবার উপযুক্ত পাত্র। আমাদের কৃতার্থ করলেন। আমি ভক্তমুখে আপনার চৈতন্য-আসনে বসার কথা শুনে অতিশয় ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। এখন আপনাকে দর্শন করে আমার সমস্ত সংশয় মিটেছে। বুঝেছি আপনিই শ্রীচৈতন্যদেব।'

এই কথা পরে বৈষ্ণবসমাজে প্রচারিত হলে তাঁদের শান্তি ও আনন্দ ফিরে এল।

মহাপুরুষ মহারাজ এই কথা শুনিয়া বলিলেন — দেখো, ভগবান নিজেকে নিজেই প্রচার করেন। মানুষ কিছু করতে পারে না। এই এত হুলুস্থূল বৈষ্ণবসমাজে। আর সেই সমাজের প্রধান আচার্যের কি সশ্রদ্ধ মধুর ও দিব্য ব্যবহার! অবতার এলে তখন যথার্থ ভক্তের হৃদয়কুসুম প্রস্ফুটিত হয় আর মৌমাছির ন্যায় সকলে ঐ দিব্য অমৃত পানের জন্য ব্যাকুল হয়।

মহাপুরুষ মহারাজ — বেশ বেশ, ভাল কাজ। মাস্টার মহাশয়কে আমার প্রণাম জানাবে।

অন্তেবাসী প্রণাম করিয়া চলিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন — হাঁ, আর বলবে, বিশ্বানন্দকে জেনেভায় ডেকেছে। উনি শুনলে খুশী হবেন। ওঁকে ভালবাসেন।

অন্তেবাসী পূর্ব দিকের ‘মহারাজের’ ঘরে প্রবেশ করিয়া সবেমাত্র বসিয়াছেন।

মহাপুরুষের অন্যতম সেবক স্বামী বৈরাগ্যানন্দ পূর্বদিকের বারান্দা হইতে বেগে প্রবেশ করিয়া আবেগভরে অন্তেবাসীকে বলিলেন — ও ভাই, সর্বনাশ হয়ে গেছে। অন্তেবাসীর হৃদয় এই কথা শুনিয়া কম্পিত হইল। অন্তরে তিনি বুঝিলেন, শ্রীম-র কিছু হইয়াছে। স্বামী বৈরাগ্যানন্দ আবার বলিলেন, মাস্টারমশায় আজ সকালে চলে গেছেন। অন্তেবাসী ক্ষণকাল হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, বললেন কে? টেলিফোনে এইমাত্র খবর এসেছে, উত্তর করিলেন স্বামী বৈরাগ্যানন্দ।

অন্তেবাসী আফিসে ঢুকিলেন, দেখিলেন টেলিফোনের রিসিভার টেলিফোনের উপর নামান। পাশে বসা স্বামী রঘুবীরানন্দ।

অন্তেবাসী ব্যগ্র হইয়া তাঁহাকে ঐ সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি সংবাদ চাপিয়া বলিলেন, দ্বিজেন মহারাজ জানেন। উনি গেছেন সুধীর মহারাজের কাছে সোনার বাগানে।

অন্তেবাসী নিচে নামিলেন। মঠবাড়ির পশ্চিমের চায়ের বারান্দায় মণীন্দ্র ডাক্তার (স্বামী সদাত্মানন্দ) উপবিষ্ট। তাঁহাকে জিজ্ঞাসায় জানিলেন, এই যাচ্ছেন দ্বিজেন মহারাজ।

সুধীর মহারাজ (স্বামী শুদ্ধানন্দ) থাকেন পাশের সোনার বাগানের দক্ষিণের ঘরে। সে ঘরে তিনি বিছানায় বসা। আশেপাশে বসা স্বামী দয়ানন্দ, অভয়ানন্দ ও আত্মবোধানন্দ। ঘরের দোরগোড়ায় স্বামী গঙ্গেশানন্দ (দ্বিজেন মহারাজ)। অতিশয় ব্যগ্রভাবে অন্তেবাসী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাস্টারমহাশয়ের শরীর গেছে? উনি বলিলেন, যাও এখন যাও। উনি ঘরে ঢুকিলেন।

অন্তেবাসী কম্পিত হৃদয় লইয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে পায়খানার রাস্তায় ফুলবাগানের পাশে স্বামী জিতাত্মানন্দকে দেখিয়া বলিলেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে। মাস্টারমহাশয়ের শরীর গেছে। বলো না এখন কাউকে।

গেস্ট-হাউসে আসিয়া অর্থ ও কাপড় লইয়া বাহির হইলেন অন্তেবাসী। বেলুড় গ্রামের ভিতর দিয়া বাজারে আসিয়া তিনি উঠিলেন হাওড়ার বাসে। তাহাতে বসা ব্রহ্মচারী যতীন। তিনিও যাইতেছেন ঠাকুরবাড়ি। আর

দেখিলেন, ভুবনেশ্বরের মণীন্দ্র মহারাজকে। ইনি যাইতেছেন হাওড়া স্টেশনে পার্সেল আনিতে।

গেস্ট-হাউস ছাড়িবার সময় অন্তেবাসী বিমলকে (পরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ) বলিলেন, তুমি বিকাশ মহারাজকে বলো আমি খাব না। আবার যখন আসবো তখন খাব। বিমল জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাচ্ছেন, মাস্টার-মহাশয়ের ওখানে? অন্তেবাসী উত্তর করিলেন, হাঁ, সজীব নন। গতপ্রাণ মাস্টারমহাশয়ের কাছে বটে।

অন্তেবাসী নামিলেন হাওড়ায়। সেখানে ট্রাম ধরিয়া হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে কৃষ্ণদাস পালের স্ট্যাচুর কাছে নামিলেন। হাঁটিয়া ঠনঠনে কালীবাড়ি হইয়া চলিলেন। গতরাত্রে ফলহারিণী কালীপূজা হইয়া গিয়াছে। এখনও ফুল ও পাতার সাজ রহিয়াছে।

শঙ্কর ঘোষের লেন দিয়া যাইতেছেন। মুড়ির দোকানের সামনে দুইটি স্ত্রীলোক আলাপ করিতেছে। করুণ স্বরে একজন বলিতেছে, বড় বিপদ হয়ে গেল এদের। আর একজন বলিতেছে — আহা, বলতে বিপদ! বছরটা না ঘুরে আসতেই আবার একটা বিপদ হলো। এই তো গেল বছর এই সময়েই ছোট ভাই (কিশোরী গুপ্ত) গেল।

অন্তেবাসীর আর সন্দেহ রহিল না। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে পড়িতেই গলি দিয়া ঢুকিলেন ‘ঠাকুরবাড়ি’ (শ্রীম-র বাড়ি)। নিচে চৌকির নিচে জুতা রাখিয়া দোতলায় উঠিলেন। শ্রীম-র ঘরের সামনে গিয়া তিনি দেখিলেন ঘরে শ্রীম-র চারপাশে সব স্ত্রীলোক। সকলে কাঁদিতেছে। যতীন ঘরে ঢুকিয়া গিয়াছেন। পায়ের কাছে বসিয়া কাঁদিতেছেন।

অন্তেবাসীও লোক ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পদতলে বসিলেন। শ্রীম-র ধর্মপত্নী গিন্নী-মা, পুত্রবধূ, ভগিনী, নাতনী প্রভৃতি বহু আত্মীয়া চীৎকার করিয়া আর্তনাদ করিতেছেন। কেহ বাবা, কেহ দাদা, কেহ ভাই, প্রভৃতি আপন আপন সম্পর্ক ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন, আপনি যে আমায় সকলের চাইতে বেশী ভালবাসতেন! এখন কে আর তেমন ভালবাসবে? সকলের মুখে এই একই কথা — আপনি যে আমায় সকলের চাইতে বেশী ভালবাসতেন!

অন্তেবাসীর মনে একটি প্রশ্নের সঞ্চার হইল। কি করিয়া সকলে

এই একই কথা বলিতে পারে? সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মনে উত্তর আসিল, এতে আর অসম্ভব কি, আর আশ্চর্যই বা কি? শ্রীমকে দেখিয়াছি, তিনি প্রত্যেক মানুষের অন্তরস্থ অন্তর্যামী পুরুষ স্বীয় গুরুদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন ও প্রণাম করিতেন।

মানুষের স্থূল শরীরের ভিতর সূক্ষ্ম শরীর, সূক্ষ্ম শরীরের ভিতর কারণ শরীর। কারণ শরীরের ভিতর মহাকারণ বা অন্তর্যামী পুরুষ। কেহ শ্রীমকে নমস্কার করার পূর্বে তিনি যুক্তকরে মানুষের হৃদয়স্থ ঐ অন্তর্যামী পুরুষকে প্রণাম করিতেন। তাঁহার কাছে অন্তরস্থিত সচ্চিদানন্দই শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই সকলে আর্তনাদের সুরে সমস্বরে বলিতেছেন, আপনি যে আমায় সকলের চাইতে বেশি ভালবাসতেন!

নিজ চক্ষে আমি দেখিয়াছি এই দৈবী অভিনয়! শিশু পৌত্র ও দৌহিত্রদিগের সহিত যখন কথা বলিতেন, কি সশ্রদ্ধ, কি মিষ্ট, কি চিত্তাকর্ষক সেই সব কথা! মনে হইত, তিনি তাহাদের অন্তরমধ্যে অধিষ্ঠিত মহাকারণকে যেন কথা-পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিতেছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও এই কথাই আছে। উত্তম ভক্ত সর্বভূতে নারায়ণের অধিষ্ঠান দেখিতে পান এবং তাঁহাকে অন্তরে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন নমস্কার মুদ্রায়।

শ্রীম মেঝেতে শায়িত। ঘরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে শির, আলমারির গায়ে চরণ, ঘরের পশ্চিমের দেয়ালের পাশে। অন্তেবাসী চরণ ধারণ করিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার চক্ষে জল নাই, প্রবল শোকাগ্নিতে জল শুকাইয়া গিয়াছে।

অন্তেবাসী অনিমেষ নয়নে শ্রীম-র মুখমণ্ডল দর্শন করিতেছেন। মন যেন স্তব্ধ ও স্তম্ভিত। খালি দেখিতেছেন, দেখিতেছেন, আর দেখিতেছেনই ঐ দৈবী মুখকমল। দেখার শেষ নাই। চক্ষু অন্য দিকে নড়িতেছে না — অপলক দৃষ্টি ঐ চিরনিদ্রিত মহাসমাধিগত বদনকমলে। মনে হইতেছে, জীবিতকালে যেমন নিদ্রিতাবস্থায় ছিলেন এখনও তাহাই। নিঃশ্বাস বাধিত হইয়াছে, একথা মনে হয় না।

মুখমণ্ডলে মৃত্যুর কোনও লক্ষণ নাই — অর্ধ নিমিলিত নেত্র। দৈবী শিশু যেন মাতৃক্রোড়ে অক্লান্তভাবে শায়িত। মনের স্তব্ধতা ভেদ করিয়া এক একবার আশা হইতেছে, বুঝি আবার জাগ্রত হইবেন। পরক্ষণেই আত্মীয়গণের করুণ ক্রন্দনে ঐ আশা উন্মূলিত। শ্রীম গতাসু। তখনই সকল

বাঁধ ভাঙ্গিয়া হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ক্রন্দন বাহির হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে উঠিতেছে — হায়, কার কাছে এমন মধুর ঈশগুণগান শুনবো? কে আর অমন অযাচিত স্নেহে ভগবদংশ 'কথামৃত' পান করাবে? আমাদের জুড়াবার স্থান গেল।

এবার মনের সব বাঁধন ভাঙ্গিয়া গেল — বিচারের বাঁধন, লজ্জার বাঁধন, লৌকিকতার বাঁধন। অন্তেবাসী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতেছেন। পরিপূর্ণ জলাশয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া জলরাশি বাহিরে আসিল। সামান্যই বাহিরে আসিল — অন্তরে সঞ্চিত শোকসাগর।

সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরিয়া কথামৃত বর্ষণ করিয়া এই 'শুভ্র জলধর' বিশ্রাম লইল। অথবা নারদ ঋষি যেন বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গান করিতে করিতে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। অথবা রাজহংসের ন্যায় গান গাহিতে গাহিতে এই 'চাপরাশ-ধারী', 'ভাগবতের পণ্ডিত' যবনিকার অন্তরালে প্রয়াণ করিলেন। Certainly a magnificent close — সত্যই যেন মহান্ নাটকীয় পরিসমাপ্তি! 'গুরুদেব, মা, কোলে তুলে ন্যাও' — বলিয়াই একেবারে জগদম্বার ক্রোড়ে আরূঢ়!

চৈতন্যদলের লোক, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ — 'পুত্র' আজ পিতার কাছে চলিলেন, সচ্চিদানন্দধামে প্রয়াণ করিলেন।

নরকলেবরধারী আমাদের এ দৈবী রিসিভারটির অন্তর্ধান হইল। কাহার মুখে আর প্রবোধবাণী শুনিব? প্রকৃতির বিড়ম্বনায় তাপিত মনপ্রাণ কে সুশীতল করিবে সুস্নিগ্ধ হিমবারিসিঞ্চনে?

কি মহাপুরুষ! সংসারের কোন বন্ধনেই লিপ্ত নহেন। বিনির্মুক্ত হইয়া এই প্রায় অশীতি বর্ষ যাপন করিলেন। অসংখ্য তরুণ যুবকগণকে সর্বত্যাগ করাইয়া ঈশ্বরের সাধনায় নিয়োজিত করিলেন — সর্বত্যাগীর ভেক ধারণ করাইলেন। আর অগণিত সৎ গৃহস্থাশ্রমীকে সত্যের পথের, শান্তির পথের সন্ধান বলিয়া দিয়া বাউলের মত অন্তর্ধান হইলেন।

কি বিচিত্র মহাপুরুষ, গৃহস্থাশ্রমী হইয়াও অত্যাশ্রমী! নতুবা তাঁহার প্রেরণায় যুবকগণ বিদ্যা বুদ্ধি ধন মান পরিজন ছাড়িয়া কি করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন?

রাজর্ষি জনকের কথা পড়িয়াছি উপনিষদে। কিন্তু তাঁহার জীবনগতিক

বুঝিয়াছি কথঞ্চিৎ, শ্রীম-র জীবনধারা দেখিয়া।

শ্রীম-র কাছে ছুটিয়া ছুটিয়া আমি আসি। তাহা দেখিয়া মঠের কোনও সাধুবন্ধু বলিতেন — কেন যাও ওখানে, মঠে ধর্ম হয় না? বন্ধুগণ, তোমাদেরও আর বলিতে হইবে না, আমাকেও আর শুনিতে হইবে না।

কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজ সর্বদা শ্রীম-র নিকট যাইতে বলিতেন। কিছুদিন না গেলেই তিরস্কারের স্বরে বলিতে ন, ওখানে তোমার যাওয়া উচিত। ওখানে ঠাকুরের ভাব মূর্ত।

উপনিষদের বালাকীর কথা তখন মনে হইত। জনকের কাছে লোক ছুটিয়া ছুটিয়া যায় জ্ঞান ভক্তি লাভের জন্য। তাহাতে দৃপ্ত ব্রহ্মজ্ঞ-অভিমানী বালাকী হন ঈর্ষান্বিত। তাই বলেন, লোক কেন অত ‘জনকায় জনকায়’ করিতেছে?

ঠাকুর বলিয়াছিলেন, শ্রীমকে তিনি চৈতন্যসংকীর্তনে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীম কে? তিনি কি মুরারী গুপ্ত, যিনি ‘কড়চা’ রাখিয়াছিলেন? কিম্বা শ্রীবাস, যিনি অষ্টপ্রহর অবিরাম হরিনাম করিতেন? যাহার ধ্বনির অখণ্ড লহর আজও শ্রীনবদ্বীপে শ্রীবাস-অঙ্গনে শোনা যায়।

স্কুলের বিষয়ে কিছুদিন শ্রীম-র সঙ্গে আমার বৈষয়িক ব্যাপারেরও সম্পর্ক হইয়াছিল। উনি মর্টন স্কুলের রেক্টর, আমরা শিক্ষক। সে ব্যাপারেও দেখিয়াছি অন্তরে ননীর মত হৃদয় রাখিয়া বাহিরে কর্মের ব্যাপারে, নীতিতে পর্বতের মত অটল, সিংহের মত বীর্যবান ও নির্ভয়!

শ্রীম-র অমানুষিক মেধা, জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিদ্যা বিলীন হইয়া গিয়াছিল তাঁহার অলৌকিক জ্ঞান ও ভক্তির কাছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট একাধারে জ্ঞান ভক্তিই তাঁহার প্রার্থনা ছিল। তাঁহারই কৃপায় একাকাশেই সূর্য, চন্দ্রের উদয় হইয়াছিল একই সময়ে শ্রীম-র জীবনে - প্রহ্লাদের মত।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে শিখাইয়াছিলেন, গৃহস্থাশ্রমে জ্ঞানী হইবে শান্ত নিরভিমান। আর কর্মক্ষেত্রে সিংহতুল্য। সাধু ভক্তের নিকট দাসানুদাস। আমোদ আহ্লাদে রসরাজ রসিক। শ্রীম-তে এইগুলির পূর্ণ বিকাশ দেখিয়াছি। অত গুণবান হইয়াও তাঁহার বাহিরের আচরণ ছিল যেন সাধু ও ভক্তের দাসানুদাস।

বৈষয়িক বিষয়ে মতান্তর হয়। শ্রীম-র সহিত বৈষয়িক বিষয়ে মতান্তর

কখনও থাকিলেও, মনান্তর কখনও হয় নাই। কারণ আমি বুঝিয়াছি, শ্রীম আমার পরম সুহৃদ, বন্ধু, পিতা, মাতা, গুরু, কর্ণধার।

শ্রীম-র আত্মীয়গণ কাঁদিতেছেন স্নেহে, সাংসারিক প্রীতি-সুখদাতা চলিয়া গেলেন বলিয়া, নিরাশ্রয় হইয়া। আমি কাঁদিতেছি কেন? মন তাহার উত্তর দিতেছে — তুমি কাঁদিতেছ তোমার পরমার্থলাভের গুরু আচার্য চলিয়া গেলেন বলিয়া। মানুষজীবনের যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ দান — ভগবানদর্শনের পথপ্রদর্শন — তিনি তোমাকে তাহাই দিয়া গেলেন। কেবল প্রদর্শন নয়, ঐ জ্যোতির সন্ধানপথে তুলিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর করাইয়া দিয়া গেলেন। কৃতজ্ঞতায় ভক্তিতে তোমার রোদন!

পরমপথে তুলিয়াছেন, ঐ পথের শান্ত আনন্দময় পথিকগণের সঙ্গলাভ করাইয়া দিয়াছেন। বলিয়াছেন, এই পথ ধরিয়া চলিতে থাক, সময়ে বাপ-মা আসিয়া কোলে তুলিয়া লইবেন — নিশ্চিন্তে ও আনন্দে চলিতে থাক। যাহা কিছু মঙ্গলকর তাহা সমস্তই তিনি দিয়াছেন। কিন্তু নিজে একটুও দাবি রাখেন নাই। সদা বলিয়াছেন, সকলই ঠাকুরের দয়া, তাঁহার কৃপা!

কি আশ্চর্য, ইহাই কি অহৈতুকী কৃপা? এই স্বার্থহীনতা কি মানুষে সম্ভব?

হায়, আজ তিনি চলিয়া গেলেন — যিনি আমার ধর্মজীবনের পথপ্রদর্শক স্নেহময় পিতা, সন্তানবৎসলা মাতা, বিপদে বন্ধু ও সৎ পরামর্শদাতা। তিনিই আমার জীবনের highest ideal (সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ) ধরাইয়া দিয়াছেন।

বিগত যুগাধিক সময়ের সকল ঘটনা পরম্পরা চলচ্চিত্রের ছবির মত একে একে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত। কি দেখিতেছি শ্রীম-র এই সকল কার্য ও বাণীর ভিতর? কিসে আমরা ভগবানকে, শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরিয়া সংসারে থাকিতে পারি সদা এই চেষ্টা। বিষয়বিৎ পিতা যেমন পুত্রকে সকল বিষয়ের উপদেশ দিয়া শরীর ত্যাগ করেন শান্ত মনে, শ্রীমও সেইরূপ আমাদের সব দান করিয়া চলিয়া গেলেন — তবে এ অপার্থিব সম্পদ, পরমার্থ উপদেশ।

মিহিজামে আমাকে বলিয়াছিলেন, 'ডিমের অত ভাবনা কেন? মা জানেন কখন ফোটাতে হবে।' তাহার অর্থ এখন বুঝিতেছি। মা ডিম

ফুটাইয়া দিয়াছেন। ডিম জানিতেও পারে নাই এ কথা।

অবিরাম সমুদ্রপ্রবাহের মত শত শত শ্রীম-সম্পর্কিত সৎভাবনা আসিয়া মনে হাজির হইতেছে। তাহাদের স্রোত মাঝে মাঝে রুদ্ধ হইতেছে কেবল হৃদয়াবেগের বহিঃপ্রকাশক শোকের উচ্ছ্বাসে। সংযমের বাঁধন ছিন্ন হইতেছে এক একবার।

এই শোকোচ্ছ্বাস অধিকতর বর্ধিত হইতেছে যখনই দেখিতেছি আত্মীয়স্বজন, ভক্ত সাধুগণও রোদন করিতেছেন। তখনই মনে হইতেছে তিনি আর নাই এ জগতে। নচেৎ তাঁহার গুণসাগরে মন সদা নিমগ্ন। তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন এ চিন্তার অবকাশ কোথায়? অতীত জীবনের সহস্র মধুময় স্মৃতিরসে মন নিমজ্জিত।

দলে দলে বেলুড় মঠের সাধু ও ব্রহ্মচারীগণ আসিতেছেন, সংখ্যাতীত কলিকাতা-নিবাসী ভক্তগণ আসিতেছেন, শ্রীমকে দর্শন ও প্রণাম করিতেছেন। অন্তেবাসী তখনই বুঝিতেছেন শ্রীম গতাসু — তখনই তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া ক্রন্দন দেখা দিতেছে।

পাশের ঘরে সাধুগণ অবিরাম কীর্তন করিতেছেন —

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

কখন গাহিতেছেন —

এমন মধুমাখা হরিনাম নিমাই কোথা হ'তে এনেছে।
নাম একবার শুনে হৃদয়বীণে অমনি বেজে উঠেছে॥
বহুদিন শ্রবণে শুনেছি ঐ নাম, কভু ত এমন করেনি পরাণ,
আজ কি যেন কি এক নব ভাবোদয়, হৃদয়মাঝারে হ'তেছে।
কেটে গেছে বিষম নয়নের ঘোর, গলে গেছে কঠিন হৃদয় মোর,
আজ কি যেন কি এক উজল জগতে, আমায় নিয়ে চলেছে॥
আজ হ'তে নিমাই তোর সঙ্গে রব, জ্ঞানের গরব আর না করিব,
আজ সব ছেড়ে দিয়ে হরি হরি বলে, নাচিতে বাসনা হ'তেছে॥
কে যেন কহিছে মোর কানে কানে, পারের উপায় হল এতদিনে,
আজ প্রেমের পসরা ধরি নিজ শিরে, প্রেমের ঠাকুর এসেছে॥

একজন গাহিতেছেন —

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥
জপ যজ্ঞ পূজা হোম আর কিছু না মনে লয়।
মদনের যাগযজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়॥
কালীনামের এত গুণ কেবা জানতে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব যাঁর পঞ্চমুখে গুণ গায়॥

কেহ গাহিলেন —

ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম,
অপূর্ব শোভন ভব-জলধির পারে, জ্যোতির্ময়।
শোক-তাপিত জন সবে চল, সকল দুঃখ হবে মোচন;
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে, প্রেম জাগিবে অন্তরে।
কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ, না জানি কি ধ্যানে মগন,
স্তিমিত লোচন কি অমৃতরস পানে ভুলিল চরাচর;
কি সুধাময় গান গাহিছে সুরগণ, বিমল বিভুগুণ-বন্দন;
কোটি চন্দ্র তারা উলসিত, নৃত্য করিছে অবিরাম॥

২

বেলা এগারটা। স্বামী প্রণবানন্দ নূতন গামছা গঙ্গাজলে ভিজাইয়া শ্রীম-র মুখ মুছিয়া দিলেন। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ একজোড়া গরদের কাপড় ও চাদর পাঠাইয়াছেন বেলুড় মঠ হইতে। উহা পরাইয়া দিলেন শ্রীমকে। তারপর ফুলের মালা চন্দন দিয়া সাজান হইল। পদ্মফুলের স্তূপ পড়িয়াছে। বহু গ'ড়ের মালা উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

স্বামী রাঘবানন্দ পঞ্চপ্রদীপের আরতি করিলেন প্রথম, তারপর কর্পুরের আরতি। সুগন্ধি ধূপ দিয়া স্বামী প্রণবানন্দও আরতি করিলেন।

জার্মান ভক্ত মিস ফেপার ও নিবেদিতা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ব্রহ্মচারিণীগণ পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন, সাধুরাও দিলেন।

বাহিরে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে একটি নূতন শয্যা সাজাইয়া রাখা

হইয়াছে। একটি উত্তম নূতন খাট, তাহাতে চাঁদোয়া খাটান, নূতন তোষকের উপর চাদর, নিচে সতরঞ্জি, দুইটি কোলবালিশ — সকলই নূতন।

এবার নূতন একটি সতরঞ্জিতে শ্রীমকে শোয়ানো হইল। সাধুরা মরদেহ নিচে নামাইয়া আনিয়া ঐ খাটে শয়ন করাইলেন। এবার রাশি রাশি ফুলের মালা, অগুরু চন্দন পড়িতে লাগিল। শ্রীম-র জীবিতাবস্থায় কেহ কখনও তাঁহাকে এইরূপ রাজসিক শয্যায় শয়ন করিতে দেখে নাই।

'জয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকী জয়' বলিয়া সাধু, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ খাট স্কন্ধে তুলিলেন। মাথার উপরে জ্যৈষ্ঠের প্রখর সূর্যকিরণ। কাহারও কোন হুঁশ নাই, সকলে নগ্নপদে চলিতেছেন।

বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটের মোড়ে ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত, আর, মিত্রের বাড়ির কাছে গেলে শ্রীম-র জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভাস বলিলেন, 'মর্টন স্কুল হয়ে চলুন।' এই স্কুলের চারতলার ছাদে সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের উপর শ্রীম অবিরাম শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত বর্ষণ করিয়াছেন, যেন নৈমিষারণ্য। কত ভক্ত তৈয়ারী হইয়াছে। কতজনই তাঁহাদের সর্বস্ব ছাড়িয়া সন্ন্যাস লইয়াছেন।

মর্টন স্কুলের অঙ্গনে খাট নামানো হইল। শ্রীম-র বৃদ্ধা জ্যেষ্ঠা ভগিনী আসিয়া সজল নয়নে ভাইকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রতিবেশীগণও আসিয়া দর্শন করিতেছেন।

খাট আবার সাধু ও ভক্তের স্কন্ধে আরোহণ করিল। আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়া উত্তর দিকে চলিতে লাগিল। যাইতে হইবে কাশীপুর শ্মশান ঘাটে, যেখানে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শরীর অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়।

খাটের পশ্চাতে সহস্র লোক চলিল। মানিকতলা অতিক্রম করিয়া বিডন স্ট্রীট দিয়া এই লোকসঙ্ঘ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে উঠিল। রাস্তার ট্রাম ও অন্যান্য যানবাহন কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হইয়া গেল । শত শত সাধু ব্রহ্মচারী ও গৈরিক বসনের মেলা দেখিয়া জনসাধারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, কথামৃত-রচয়িতা শ্রীম-র শরীর ত্যাগ হইয়াছে। কেহ কেহ এই কথা শুনিয়া এই শোভাযাত্রায় যোগদান করিলেন নিজের কাজ ছাড়িয়া।

আগে শবাধার, তারপর কীর্তনদল, তারপর সাধু ভক্তগণ চলিতেছেন। কাশীপুরে টালার পুল পার হইয়াছে। শোভাযাত্রা একটি ছোট মসজিদের সামনে দিয়া চলিল, খোল করতালের বাদ্য বন্ধ হইল।

এবার উহা চলিয়াছে কাশীপুরের বাগানের পাশ দিয়া। এই বাগানেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসান হয়। ভক্তগণ ও সাধুগণ শ্রীম-র শত স্মৃতির কথা স্মরণ করিতেছেন এই কাশীপুর উদ্যানের সহিত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন শ্রীমকে, 'তোমরা রাস্তায় রাস্তায় কেঁদে বেড়াবে বলে শরীর যাচ্ছে না। বল তো যায়।' আজ অর্থ শতাব্দীরও অধিককাল পর শ্রীমও শ্রীগুরুর অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন কাশীপুর শ্মশানে।

রতনবাবুর গলি দিয়া শোভাযাত্রা প্রবেশ করিল কাশীপুর শ্মশানে। শ্রীশ্রী ঠাকুরের বেদীর পূর্ব পার্শ্বে দক্ষিণ শিয়র করিয়া খাট রাখা হইল। ভক্তগণ হাতপাখার হাওয়া করিতেছেন।

আবার লোকের ভিড়। 'কথামৃত'-রচয়িতা বলিয়া শ্রীম সুপরিচিত। দলে দলে লোক আসিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিল । বরানগর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন অনাথ আশ্রমের বালকগণ সারিবদ্ধ হইয়া পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে। কার্তিক মহারাজ হাতে হাতে পুষ্প দিতেছেন।

একটি সাধু শ্রীমকে দর্শন করিতেছেন খাটের চারিদিকে ঘুরিয়া। কখনও খাটের পূর্বদিকে দাঁড়াইয়া শ্রীম-র চিরনিদ্রায় শায়িত মুখমণ্ডল দর্শন করিতেছেন। কখনও উত্তর-পূর্ব দিকে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন অনিমেষ নয়নে মশারীর চৌকাঠ ধরিয়া। আবার দেখিতেছেন পশ্চিম দিক হইতে খাটের পাশে বসিয়া। এক একবার শ্রীমুখে হাত দিয়া দেখিতেছেন। কখনও মুখমণ্ডলে হাত বুলাইতেছেন সস্নেহে। দুইটা মাছি মুখে বসিতে চেষ্টা করিলে তাহাদের তাড়াইয়া দিতেছেন। শ্রীম-র চক্ষুদ্বয় মহাসমাধিতে অর্ধনিমীলিত। ওষ্ঠদ্বয় সংযুক্ত। কখন ওষ্ঠদ্বয় ফাঁক করিয়া দেখিতেছেন। একবার চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন নিচের দিকে তাহা কিঞ্চিৎ খোলা।

সাধুটি দেখিতেছেন, দেখিতেছেন, দেখিতেছেন — দেখার শেষ নাই। ভাবিতেছেন, আর হয়তো ঘন্টাখানেক এ দেবশরীর দর্শন হইবে। তারপর পঞ্চভূতে মিলাইয়া যাইবে, যেখান হইতে উহা আসিয়াছিল। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের আত্মা জীবিতাবস্থায় মুক্ত। যতদিন শরীর থাকে তাঁহারা জানেন স্থূল সূক্ষ্ম কারণশরীর —ইহার তিনটিই জামার ন্যায়, কোষমাত্র — সম্পূর্ণ পৃথক্। দেহাবসানে এই শরীর তাহাদের মূল প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়।

সাধুটির শরীর রুগ্ন ও ক্লান্ত। তথাপি সব ভুলিয়া ছায়ার মত শ্রীম-র চরণ-প্রান্তে দণ্ডায়মান। হৃদয়ে শোকাবেগ — হায়, আমাদের পরমার্থদাত্রী জননী চলিয়া গেলেন অমূল্য সম্পদ অমৃতের সন্ধান প্রদান করিয়া।

শ্রীম-র উজ্জ্বল, আনন্দময় ও প্রশান্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া মঠের একজন বৃদ্ধ সাধু বলিলেন অপর সাধুদের, 'দেখ, দেখ! মুখের দিকে চেয়ে দেখ না একবার! কি দিব্যকান্তি! কত বড় মহাপুরুষ ইনি! বার ঘন্টা হয়ে গেল তবুও মুখমণ্ডল শিশুর মতন সরস সজীব, আনন্দে পরিপূর্ণ! যেন জীবিতাবস্থা থেকেও মহাসমাধিতে নিমগ্ন এই মহাপুরুষের মুখমণ্ডল অতিশয় প্রসন্ন ও আনন্দময়। মনে হচ্ছে ঠাকুর, মা এসে কোলে তুলেই নিয়েছেন। তাই তাঁদের দর্শনে শ্রীম-র মুখমণ্ডল দৈবী আনন্দে সমুজ্জ্বল।'

৩

শ্মশানের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ লোকাকীর্ণ। সাধু ও ভক্তগণ অনেকেই প্রশস্ত বেদীর উপর — কেহ বসিয়া, কেহ অর্ধশায়িত। কেহ কেহ শোকার্ত হৃদয়ে একাকী আনমনে বিচরণ করিতেছেন। কেহ কেহ পরস্পর বলিতেছেন — হায়, আমাদের আশ্রয়স্থলটি গেল। কেহ পায়ে আলতা মাখাইয়া শ্রীচরণচিহ্ন লইতেছেন কাপড়ে।

বেলা বাড়িয়াই চলিয়াছে। অনেকেরই হুঁশ নাই। তাই কেহ কেহ সাবধান করিতেছেন শ্রীম-র চিতা তৈরী করিতে। সাধুদের মধ্যে কার্যক্রম লইয়া মতভেদ হইতে লাগিল। একবার স্বামী প্রণবানন্দ ও স্বামী কৈবল্যানন্দ (যোগী মহারাজ) বেশ একটু উষ্ণভাব ধারণ করিলেন।

শুদ্ধ গব্যঘৃতে এইবার শ্রীম-র সমস্ত শরীর অবলেপন করা হইল। তারপর কয়েকজন সাধু ও ভক্ত নূতন সতরঞ্জিতে শয়ান করাইয়া শ্রীমকে শেষবারের মত গঙ্গাস্নান করাইতে সিঁড়ি দিয়া নিচে নামাইয়া নিলেন। গঙ্গার জলে বেশ করিয়া স্নান করাইয়া উপরে তুলিতেছেন। এবার উত্তর দিকের দেওয়ালের ফাঁক দিয়া সকলে উঠিলেন। একটি সাধু সর্বদা শ্রীম-র শিরটি সযত্নে রক্ষা করিতেছিলেন।

স্নানের পর গৌরবর্ণ শরীর আরও উজ্জ্বল ও অধিক শ্রীমান হইল। শ্রীম তেল মাখিয়া স্নান করিতে ভালবাসিতেন। মিহিজামে একটি ভক্তকে

জোর করিয়া তেল মাখিয়া স্নান করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। নিজহস্তে ভক্তের হাতে তেল ঢালিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, 'কেশব সেন তেল মাখতেন। স্বামী বিবেকানন্দও তেল মাখতেন।'

শ্রীমকে শেষে কঠিন শয্যায় শায়িত করিলেন। একজন ভক্তের প্রাণ হু হু করিয়া উঠিল। শ্রীম সর্বদা কোমল শয্যায় শয়ন করিতেন। কারণ, শরীর অতি সুকোমল। ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষদের শরীর তুলার মত কোমল। শিয়র উত্তর দিকে — শ্রীশ্রী ঠাকুরের বেদীর গায়ে ঠাকুরের চরণতলে। উপরে নিচে পাশে রাশীকৃত চন্দনকাষ্ঠ রক্ষিত হইল। তারপর প্রচুর ঘৃত ঢালিয়া দেওয়া হইল।

পুরোহিত যথাশাস্ত্র পিণ্ড প্রদান করাইলেন শ্রীম-র জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভাস গুপ্তের হাতে। সাধু ও ভক্তগণ ধূপ ও কর্পূর দিয়া আরতি করিতে লাগিলেন। কাষ্ঠরাশির ভিতর দিয়া আলতায় রঞ্জিত পদযুগল আবার দর্শন করিতেছেন একটি ভক্ত।

প্রভাসপ্রমুখ কুটুম্বগণ প্রদক্ষিণ করিয়া মুখে অগ্নিসংযোগ করিলেন। একটি ক্ষীণ জ্বলন্ত পাটকাষ্ঠ শ্রীম-র দক্ষিণ দিকের সুগুচ্ছ শ্বেত শ্মশ্রু দগ্ধ করিতে লাগিল। ভক্তের কোমল হৃদয় ইহা দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অগ্নি দাউ দাউ করিয়া প্রজ্জ্বলিত। সাধু ভক্তগণ সম্মিলিত কণ্ঠে 'হরি ওঁ রাম রাম' মহামন্ত্র উচ্চকণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন।

একটি ভক্ত দৌড়াইয়া গিয়া বেদীর অপর পার্শ্বে লুক্কায়িত হইলেন। যতক্ষণ শরীর ছিল ততক্ষণ আর এদিকে চক্ষু ফিরাইতে পারেন নাই। শ্রীম-র মহাসমাধির পরের চারিটি দৃশ্য তিনি মনে মনে দেখিতেছেন। প্রথমটি, ঠাকুরবাড়ির মেঝেতে শয়ান ছবি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্মশানে ও খাটে শায়িত। আর একটি, শেষশয্যায়।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ রুদ্রযাগের বৈদিক মন্ত্র বেদধ্বনিতে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন চিতার পাশে দাঁড়াইয়া।

বেলুড় মঠ হইতে দলে দলে সাধু ব্রহ্মচারীরা নৌকা করিয়া আসিতে লাগিলেন। এক নৌকায় আসিলেন স্বামী কৈলাসানন্দ, ঈশানন্দ প্রভৃতি। অপর এক নৌকায় আসিলেন কয়েকজন সাধু ও মঠের ভৃত্যগণ।

গতরাত্রিতে ফলহারিণী কালীপূজা গিয়াছে। সাধুরা তাই উপবাস ও

দারুণ গ্রীষ্মে ক্লান্ত। কেহ বেদীতে শুইয়া আছেন। কেহ কেহ তৃষ্ণানিবারণার্থ জল খাইতেছেন।

বেলা ছয়টা বাজিয়াছে। চিতাগ্নি প্রবল বেগে জ্বলিতেছে। পট্ পট্ শব্দে উপরের অশ্বত্থ বৃক্ষের পত্রসমূহ দগ্ধ হইতেছে। সাধু, ভক্ত ও আত্মীয়গণ মাঝে মাঝে হাতাতে করিয়া ধূপ, অগুরু, গুগ্‌গুল ও চন্দনকাষ্ঠ 'ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা' বলিয়া আহুতি দিতেছেন।

সাধুগণ কেহ কেহ বিদায় লইতেছেন। কেহ বা বেদীর উপর বসিয়া বিরাট অভাবের কথা ভাবিতেছেন। প্রবীণ ভক্ত বড় জিতেন বলিতেছেন — ভাই জগবন্ধু, বড়ই ফাঁকা ঠেকছে। উত্তর আসিল, এই সবে আরম্ভ হল। আরও ফাঁকা ঠেকবে।

কেহ শ্রীম-র গুণগান করিতেছেন। স্বামী কমলেশ্বরানন্দ বলিতেছেন, 'আপনারা সকলে পায়ের ছাপ নিন। অমন মহাপুরুষ হয় না। নখ চুল আছে কি?' অন্তেবাসী বলিলেন, 'ডাক্তারবাবু এসব জানতেন। উনি এসব রেখেছিলেন।'

ভগবান সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ছায়া পৃথিবীতে নামিয়া আসিল। গঙ্গায় গমনাগমনশীল জাহাজ ও নৌকাগুলিতে আলো জ্বলিয়া উঠিল। অপর পাড়ের বৈদ্যুতিক আলোগুলি যেন নিরাশার অন্ধকারে আশার আলোর মত আজ অধিকতর সুমধুর লাগিতেছে।

যোগী মহারাজ হীরেন মহারাজকে বলিলেন, 'এইবার হাত দিন। বাকী কার্যটি সমাপন করে ফেলুন।' বিক্ষিপ্ত অগ্নিসমূহকে একত্রিত করিয়া তাহাতে আরও ঘৃতাদি আহুতি দেওয়া হইল।

রাত্রি আটটা। এবার অগ্নি প্রায় নির্বাপিত হইল। প্রথমে পাঁচটি ডাবের জল উহার উপর সিঞ্চন করিয়া দেওয়া হইল। তারপর প্রচুর দধি দিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন হীরেণ মহারাজ। সাধুরা সমস্বরে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন —

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।

এইবার নূতন কলসী করিয়া একের পর আর গঙ্গাজল আহুতি দেওয়া হইল। চিতাগ্নি প্রশান্ত।

দিবাভাগেই বেলুড় মঠ হইতে মঠাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, অস্থি যেন মঠে লইয়া আসা হয়। তাই দুইটি নূতন তাম্রপাত্র আনা হইয়াছে। বিনয় মহারাজ, হীরেন মহারাজ ও বলাই অস্থির বড় বড় টুকরা সব বাছিয়া লইতেছেন। তারপর গঙ্গামৃত্তিকার একটি ক্ষুদ্র বেদিকা রচনা করিলেন। তাহার চারিদিকে একটি বেড়া দেওয়া হইল। ইতিপূর্বেই ভক্তগণ কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমতি লইয়াছেন এই স্থান রক্ষার জন্য।

বিনয় মহারাজ ও বলাই গঙ্গাজলে সব অস্থিখণ্ডগুলি ধুইয়া আনিলেন। শ্মশানপ্রাঙ্গণের উত্তরাংশের ইষ্টকাসনে বসিয়া অস্থি নূতন বস্ত্রে মুছা হইতেছে। তারপর উহা উক্ত নূতন পাত্রে রাখা হইল।

একজন সাধু ক্ষুদ্র একখণ্ড অস্থি খাইয়া ফেলিলেন। অপর একখণ্ড বিনয়কে দিলেন। উনিও খাইলেন। উহা চীনদেশীয় প্রথা। অতি প্রিয়জনেরাই এইরূপ আচরণ করেন। ঐ সাধুটি শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের (স্বামী শিবানন্দ) মুখে একদিন শুনিয়াছিলেন এইরূপ, 'ঠাকুরের একখণ্ড অস্থি স্বামীজী খেয়ে ফেললেন। আমাকেও দিলেন একখণ্ড। আমিও খেলাম। তারপর দুজনে ধ্যান করতে লাগলাম। স্বামীজীর সমাধি হয়ে গেল।'

সাধুও অস্থির টুকরা খাইয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ধ্যানের পর নিম্নরূপ ভাবলহরী আপনি মনে উঠিল।

অসীম অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সাগর। ঠাকুর তাহাতে সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ। আমরাও, ঠাকুরের সন্তানগণও ঐরূপ সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ। শ্রীমও তাই, সেইরূপ সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ। শ্রীম-র পাঞ্চভৌতিক দেহ শেষ হল আজ। এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট সচ্চিদানন্দঘন দেহে বিরাজমান। এবার সদানন্দে আছেন।

শ্রীম-র স্থূল শরীরটি আমাদের নিকট একটি divine message receiver-এর (দৈববাণীর গ্রাহকযন্ত্র) মতো ছিল এতদিন। আবার ঐ যন্ত্রে দেববাণীর ব্রডকাস্ট হতো সাধু ভক্তগণের নিকট। আজ এটি শেষ হল। স্থূলে আর পাওয়া যাবে না। সূক্ষ্মরূপে অবশ্য সর্বদাই থাকবেন। ভাগ্যবানই কেবল ঐ বাণীর অধিকারী।

এইবার ঠাকুরের সন্তানগণের সূক্ষ্ম ও আমাদের সকলের সূক্ষ্ম জ্যোতির্ময় দেহগুলি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণে একীভূত হল। কেবল দেশহীন কালহীন অনন্ত সচ্চিদানন্দ সাগর। আমি মীন হয়ে ঐ সাগরে মহানন্দে ছুটাছুটি করছি। কোটি কোটি চন্দ্র সূর্যের জন্ম হচ্ছে ঐ সাগরে। আমি চেষ্টা করছি এই সাগরকে প্রশান্ত উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় রূপেই কেবল দর্শন করি। কিন্তু তাতে তরঙ্গ দেখা যাচ্ছে। মনে ভাবছি, এই তরঙ্গ কি আমার মনের বাসনার চঞ্চলতার জ্ঞাপক?

এইরূপ একটি প্রশান্ত উজ্জ্বল ও আনন্দময় ভাবে মনটি আমার ডুবিয়া গেল। ভাবিতেছি, তবে কি করিয়া শ্রীম আমাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইবেন? তাহা হইবার যো নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আমরা সকলেই চিরবিদ্যমান সদানন্দে।

বাহ্য জগতে যেন শ্রীম-র শরীর ত্যাগের পাঁচ দিন পূর্বের অবদান শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাবাক্য সর্বদা স্মরণ থাকে — 'মা, তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও। আর যেন তোমার মহামায়ায় মুগ্ধ না হই।'

সাধু ও ভক্তগণ শ্মশানভূমিকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন। স্বামী জিতাত্মানন্দ, স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, স্বামী ধর্মানন্দ, হীরেন মহারাজ, উপুদা মহারাজ, ভগবান পাখোয়াজী ও সতীনাথ বেলুড় মঠে রওনা হইলেন। কলিকাতায় গেলেন সাধুরা কেহ কেহ, ভক্তগণ আর প্রভাসাদি শ্রীম-র কুটুম্বগণ। শ্রীম-র দ্বিতীয় পুত্র চারু কলিকাতার বাহিরে ছিলেন। তিনিও সংবাদ পাইয়া শ্মশানে আসিয়াছেন, তখন সব শেষ।

সাধুরা নৌকায় বসিয়া গাহিতেছেন, 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ'। নৌকা মধ্যগঙ্গায়। ঘটি দুইটি পূর্ণ হইলে অবশিষ্ট অস্থি অন্তেবাসী ও স্বামী জিতাত্মানন্দ অঞ্জলি করিয়া তিনবার 'ওঁ হ্রীং, শ্রীরামকৃষ্ণায় পরব্রহ্মণে স্বাহা' বলিয়া গঙ্গাজলে বিসর্জন করিলেন।

৪

রাত্রি নয়টা। বেলুড় মঠের ঘাটে নৌকা থামিল। অস্থিপাত্র দুইটি শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের নির্দেশে ঠাকুরঘরে রক্ষিত হইল।

পরের দিন সকালে যথারীতি মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিতে

গেলেন অন্তেবাসী সকলের শেষে। গতকাল সারাদিন কাশীপুর মহাশ্মশানে থাকার পরিশ্রমে শরীরের অসুস্থতা ও শ্রীম-র অন্তর্ধানের শোকের ব্যথায় শরীর মন উভয়ই অবসন্ন ছিল। তাই গেস্টহাউসের উপরের হল হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে মঠবাড়ির দ্বিতলের পশ্চিমোত্তর কোণের মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গেলেন। মনে জোর টানিয়া আনিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার খাটের উত্তরাংশে বসিয়াছিলেন, মন অন্তর্মুখ। শ্রীম-র অন্তর্ধানে তাঁহার মনেও বিরাট আঘাত লাগিয়াছে। ঠাকুরের ভক্তদের দেখিতেছি তাঁহারা ঠাকুরের শ্রীমুখের বাণীর 'কলমীর দল'ই বটে। একখানে টান পড়িলে বিরাট দলেই টান পড়ে। মহাপুরুষ মহারাজ শুনিয়াছি, আজ সকাল হইতে শ্রীম-র গুণগাথা কীর্তন করিতেছেন।

অন্তেবাসী লুকাইয়া প্রণাম করিয়া পূর্ব পাশের 'মহারাজে'র ঘরে প্রবেশ করিলেন অতি তাড়াতাড়ি, যেন মহাপুরুষ না দেখিতে পান। অন্তেবাসীর এইরূপ করিবার কারণ এই ছিল, মহাপুরুষ মহারাজের সামনে শ্রীম-র বিয়োগব্যথার উপর স্থাপিত সংযমের বাঁধ যাহাতে ভাঙ্গিয়া না পড়ে। শেষ অবধি এই প্রচ্ছন্নভাবে প্রণাম প্রকাশ হইয়া পড়িল। মহাপুরুষ মহারাজ সেবক হীরেন মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে গেল? জগবন্ধু মহারাজ, সেবক উত্তর করিলেন। তাঁকে ডাক, শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন।

আসিয়াই অন্তেবাসী পুনরায় প্রণাম করিয়া খাটের পাশেই নিচে মেঝেতে বসিলেন, সংযমের বাঁধ সামলাইয়া। কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইলেন না। নয়ন হইতে অশ্রুবিসর্জন হইতে লাগিল। মহাপুরুষ মহারাজ প্রবোধ দিয়া বলিলেন — বাবা, এ সব ঠাকুরের শরীর। তাঁর কাজের জন্য এসেছিলেন। কাজ ফুরিয়েছে। তিনি আবার কোলে তুলে নিলেন। তাঁর শরীর গেছে বটে। আলমারীর ভিতরের 'কথামৃত'গুলির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, এইগুলি তাঁর অমর কীর্তি ঘোষণা করবে সর্বকাল। যাবৎ চন্দ্র সূর্য উঠবে তাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণের নাম জীবন্ত থাকবে। আর সেই সঙ্গে থাকবে কথামৃতের লেখক শ্রীম-র নাম। শরীর তো আজ আছে, কাল নেই। ঠাকুরই চলে গেলেন! শ্রীম-র যাওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারের ক্ষতি অপূরণীয়। কলকাতার লোকদেরও প্রভূত ক্ষতি হল। বেদব্যাস ও নারদের ন্যায় একটি উজ্জ্বল মণি অন্তর্হিত হল।

এসব কথা ভেবে মনে শান্তি আনতে চেষ্টা কর। তিনি এত দীর্ঘকাল যা শিখিয়েছেন তা পালন করতে চেষ্টা কর। ঠাকুরের চিন্তায় ডুবে যাও। এটাই মানুষজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এটাই থাকবে। আর সব যাবে। শোক পরিহার কর। আনন্দ কর এই ভেবে যে তোমরা অতি সৌভাগ্যবান, যে অবতারের পার্ষদদের ভালবাসা পেয়েছ। ধন্য তোমরা।

মহাপুরুষ মহারাজের কাছে বসিয়াই অন্তেবাসী ভাবিতে লাগিলেন আর একটি কথা, দুই বৎসর পূর্বের। অন্তেবাসী তাঁহার সেবাকর্মস্থল দেওঘরের শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠে যাইতেছেন। মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিতে তিনি তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। তখন বেলা নয়টা। মহাপুরুষ অসুস্থ হাঁফানীর প্রবল আক্রমণে। তাঁহার চরণস্পর্শ করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া অন্তেবাসী বাহির হইতেছেন। তখন তিনি বলিলেন — বাবা, তুমি বাবা বৈদ্যনাথের নিকট প্রার্থনা করে বলবে, এই শরীরটা দিয়ে যদি আরও কাজ করাতে হয় তবে যেন চলনসই রাখেন। বড় যন্ত্রণা রোগের! অসহ্য যন্ত্রণা! যদি চলনসই না রাখেন তবে যেন তাঁর কোলে উঠিয়ে নেন।

অন্তেবাসী আবার রওনা হইয়াছিলেন 'আজ্ঞে আচ্ছা' বলিয়া। মহাপুরুষ মহারাজ পুনরায় বলিয়াছিলেন, যন্ত্রণায় উচ্চারণ অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। যন্ত্রণায় অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, আর ও শরীরটার জন্যও। ইশারায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন শরীরটা? অন্তেবাসী বলিলেন, মাস্টার মশায়ের। হাঁ, হাঁ — এ সবই তাঁর শরীর। কষ্ট না দেন বেশী। বলিয়াছিলেন, তুমি নিত্য বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরে যাবে। আর আমার জন্য আর মাস্টার মশায়ের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করবে বাবা বৈদ্যনাথের চরণে।

অন্তেবাসী পুনরায়, 'আজ্ঞা হাঁ' বলিয়া বিদায় লইলেন। দুই বৎসর পূর্বের এই কথা আজ তাঁহার মনে উদিত হইল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার কল্যাণের জন্যই নিত্য মন্দিরে যাইতে আদেশ করিলেন। নচেৎ তাঁহাকে দিয়া তাঁহাদের শরীরের জন্য প্রার্থনা করার কি প্রয়োজন? বাবা বৈদ্যনাথই তো ঠাকুরের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন জগতের শিক্ষার জন্য। অন্তেবাসী ভাবিতে লাগিলেন, একজন তো কাল চলিয়া গেলেন। তাঁহার জন্য প্রার্থনা করা বন্ধ হইল। মন্দিরে যাইব নিশ্চয়।

মহাপুরুষের জন্য প্রার্থনা করিব।

অন্তেবাসী প্রতিদিন অপরাহ্ন ছয়টা হইতে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত এই মন্দিরে থাকিতেন। জল ঝড় বৃষ্টি যাহাই হউক না কেন, সাপ ও হিংস্র জন্তুসমাকীর্ণ অন্ধকার রাত্রের বাধা না মানিয়া। কোথা হইতে তাঁহার এই মনের বল আসিল? উত্তরে বলিতে হয়, মহাপুরুষ মহারাজেরই আশীর্বাদে, আর তাঁহার উপদেশে। পূর্বে একদিন বলিয়াছিলেন, বৈদ্যনাথ বড় জাগ্রত স্থান! এটা সিদ্ধ যোগপীঠ! একবার বাবা বৈদ্যনাথ কৃপা করে দর্শন দিয়েছিলেন ওখানেই, বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠার সময়। হাঁফানী খুব বেড়ে গিছল। যন্ত্রণায় ছটফট করছি। সেই সময়ে বাবা কৃপা করে দর্শন দেন, আর সব যন্ত্রণা ভুল হয়ে যায়। তাই বলি সেখানে নিত্য যাবে। ওটি জাগ্রত ও জীবন্ত মহাপীঠ! দেবীরও একান্ন পীঠের মধ্যে এটি হৃদয়পীঠ।

পরদিন শ্রীশ্রী ঠাকুরের পূজার সঙ্গে শ্রীম-র অস্থিও পূজিত হইল। তারপর মহাপুরুষ মহারাজেরই আদেশে স্বামীজীর মন্দিরে ঐ অস্থির ভাণ্ডদ্বয় স্বামী নিত্যাত্মানন্দ ও স্বামী জিতাত্মানন্দ কর্তৃক শিরে ধারণ করিয়া নীত হইল। ওখানেই শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ইচ্ছায় এই সাধু দুইজন নিত্য অর্ঘপ্রদান করিতে লাগিলেন। অপরাপর মহাপুরুষ গণের অস্থির সহিত উহাও ঐ মন্দিরে নিত্য পূজিত হয়।*

---

* ইদানীং এসব অস্থি বেলুড় মঠে নূতন মন্দিরের দ্বিতলে স্থাপিত।

পরিশিষ্ট

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীম-র মহাসমাধি — অব্যবহিত পূর্বের ঘটনাবলী

অন্তেবাসী

১

কলিকাতা। মর্টন স্কুল। ৫০ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীটের চারতলার নিজকক্ষেই শ্রীম বাস করিতেছেন। পরিবারবর্গও এই বাড়ির ত্রিতলে। গ্রীষ্মের ছুটিতে স্কুল বন্ধ। মর্টন ইনস্টিটিউশান উঠিয়া গিয়া কয় বছর এই বাড়িতেই শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশান হইয়াছে। গ্রীষ্মের দারুণ গরমে চারতলার ছাদে থাকা কষ্টকর। শ্রীম মাঝে মাঝে দুই একদিন আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ির চারতলাতেও থাকেন, সেখানে রাত্রে প্রচুর হাওয়া মিলে।

পরিজনদের সঙ্গে থাকিলেও হাঙ্গামা পোহাইতে হয়। তাই শ্রীম সারাটা গ্রীষ্মকালই একরকম ঠাকুরবাড়িতে রহিয়াছেন। ‘কথামৃত’ পঞ্চম ভাগ ছাপা হইতেছে। সাধু ও ভক্তগণও কেহ কেহ সঙ্গে থাকেন। অন্তেবাসী কিছুদিন পূর্বে বেলুড় মঠ হইতে আসিয়া শ্রীম-র সঙ্গে ঠাকুরবাড়িতে দিন সাতেক ছিলেন।

কয়দিন পূর্বে অন্তেবাসীকে বলিয়াছিলেন, sights and scenes (স্থান ও দৃশ্যাবলী) যথাসম্ভব change (পরিবর্তন) করা উচিত। ঠাকুরবাড়িতে প্রায় তিন মাস হয়ে গেল। তাই দিনকয়েক মাঝে মাঝে স্কুলবাড়িতে থাকার চেষ্টা। সারাটা গ্রীষ্মই এখানে কেটে গেল। ছোট বাড়ি, হাওয়া কম। গ্রীষ্মে বড় কষ্ট হয়। তা ছাড়া তেমন কষ্ট আর কি?

৩রা জুন শুক্রবার, ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯ সাল। সকালে শ্রীম স্কুলবাড়িতে আসিয়াছেন। নিচের ঘরগুলি ঠাণ্ডা — বিশেষ করিয়া সিঁড়ির পাশের ঘর। ঐ স্থানে থাকিবেন দুপুরে, মনে করিয়াছেন। রাত্রিতে ছাদের ঘরে। ঘরের বেঞ্চিগুলি টানাটানি করিয়া একদিকে সরাইয়া রাখানো হইয়াছে। বেলা প্রায় দশটায় শ্রীম স্নান করিয়া ঠাকুরবাড়িতে যান। আবার বিকালে বেলা চারটার পর আসেন। প্রায় তিন ঘন্টা মর্টন স্কুলে ছিলেন। সন্ধ্যা

সাড়ে সাতটায় ফিরিয়া যান ঠাকুরবাড়ি। ফিরিবার সময় সিটি কলেজের কাছে ক্লান্ত হইয়া রাস্তায় বসিয়া পড়েন। দৌহিত্র হুলো ছিল সঙ্গে। সে রিক্সা আনিতে যাইতেছিল। তাহাকে মানা করিলেন। তারপর ধীরে ধীরে ঠাকুরবাড়ি পৌঁছোন।

ঠাকুরবাড়িতে আরতি হইতেছে। 'খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়' গাওয়া শেষ হইল। রাত্রির শীতল-ভোগের অবকাশ দশ মিনিট। তারপর হয় 'ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেঢ্য' ও 'সর্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে'। তারপর হয় পর পর রামনাম —

ভয়হর মঙ্গল দশরথ রাম।
জয় জয় মঙ্গল সীতারাম॥ ইত্যাদি
কনকাম্বর কমলাসনজনকাখিল ধাম।
সনকাদিক মুনিমানসসদনানঘ ভূম॥ ইত্যাদি
আর্তানামার্তিহন্তারং, ভীতানাং ভয়নাশনম্।
দ্বিষতাং কালদণ্ডং তং, রামচন্দ্রং নমাম্যহম্॥ ইত্যাদি

যখন 'ভয় হর মঙ্গল' হইতেছিল তখন শ্রীম তিনতলায় ঠাকুরঘরে আসিলেন। একটু থাকিয়াই দ্বিতলে নিজকক্ষে চলিয়া গেলেন আর শুইয়া পড়িলেন। আরতি শেষ হইল আটটায়।

রাত্রি ৮ - ৯॥

এখন রাত্রি আটটা। বড় জিতেন অমৃতি পাঠাইয়াছেন ঠাকুরের ভোগের জন্য। ভোগ হইয়া গেলে শ্রীম-র আদেশে সব অমৃতি তাঁহার কাছে আনিতে বলিলেন। সতীনাথ একখানা রাখিয়া বাকী সব দ্বিতলের ঘরে শ্রীম-র কাছে আনিলেন। ঐখানা রাখিয়াছেন স্বামী রাঘবানন্দের জন্য। শ্রীম শুনিয়া বলিলেন — হাঁ, সাধুর জন্য রাখা ঠিক। শ্রীম রসিকতা করিয়া সতীনাথকে বলিলেন, তোমার জন্যও একখানা রাখা হয়েছে।

শ্রীম বলিলেন স্বামী রাঘবানন্দ ও সতীনাথকে, আপনারা গদাধর আশ্রমে যাচ্ছেন তো? ওখানে সারারাত কালীপূজা হবে — ফলহারিণী কালীপূজা। আবার মুক্তিক্ষেত্র কালীঘাট। খুব দিন আজ। ঐ এক রাতে হাজার বছরের তপস্যা হয়ে যায়। আসুন আপনারা এইবার, রাত হয়ে গেছে।

তাঁহারা উভয়ে শ্রীম-র অভিপ্রায়ে ভবানীপুর গদাধর আশ্রমে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে একটু পর আসিলেন অমৃত গুপ্ত। তখন হইবে রাত্রি নয়টা। শ্রীম তিনতলায় উঠিলেন। ঠাকুরঘরের দেয়ালে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন। ঘরে ব্রহ্মচারী বলাই ঠাকুরের শয়ান দিতেছেন। মায়ের মশারি খাটাইতেছেন। শ্রীম প্রণাম করিয়া ছাদে গেলেন। নিকেলের চশমা হাতে। উহা চোখে লাগাইয়া বাহিরে নগরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আকাশের নক্ষত্ররাজি দর্শন করিতেছেন। চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছেন।

শ্রীম তিনতলায় সিঁড়ির কাছে আসিয়া দক্ষিণ দিকের একটি বাড়িতে বিবাহসজ্জা দর্শন করিতেছেন। নানা রঙের বাল্ব দিয়া আলোকিত করিয়াছে ছাদের উপর, হোগলার মণ্ডপের ভিতর। বালকের ন্যায় সব দর্শন করিতেছেন। তাঁহার মনে কি উদিত হইয়াছে চিরবিদায়ের ভাবনা? কে জানে? মাঝে মাঝে অমৃতের সঙ্গে রঙ্গরসও করিতেছেন এই বিবাহোদ্যোগ দেখিয়া। শ্রীম নিজের ঘরে দ্বিতলে নামিয়া আসিলেন। অমৃত বিদায় লইলেন। এখন সাড়ে নয়টা।

২

রাত্রি ৯৷৷—১০৷৷

বলাই ঠাকুরদের শয়ান দিয়া শ্রীম-র কাছে আসিয়াছেন। শ্রীম একটু পূর্বে আহার করিতে বসিয়াছেন। ভোজ্য দ্রব্য যথারীতি — বাজারের দুইখানা পাঞ্জাবী রুটি ও আধসের গাঢ় গরুর দুধ। তরকারিও মাঝে মাঝে একটু চাটনীর মত মুখে দিতেছেন। প্রসাদী ল্যাংড়া আম কখনও এক আধটা খাইতে ভালবাসেন। আহার শেষ করিয়া বাহিরে আসিলেন হাত ধুইতে। বলাই হাতে জল ঢালিয়া দিতেছেন। শ্রীম বলিতেছেন, তুমি আছ জানলে ডাকতাম খাবার সব এগিয়ে দিতে। শ্রীম এরূপ করেন না। আজ হয়তো অতিশয় ক্লান্তি বোধ করিয়াছেন। হাত ধুইয়া ঘরে গিয়া নিজের বিছানার উপর খাটে বসিলেন। বলাই উচ্ছিষ্ট সব পরিষ্কার করিলেন।

শ্রীম বলিলেন, হ্যারিকেনটা দাও, টেবিলে রাখবো — প্রুফ দেখতে হবে। কথামৃতের প্রুফ দেখিতে বসিলেন পঞ্চম ভাগের চতুর্দশ ফর্মা। ঠাকুর

ভগবানকে একটি গান গাহিয়া বলিতেছেন, 'শ্যাম তুমি আমার পরাণের পরাণ'। শ্রীম-র এই শেষ প্রুফ দেখা।

গত বৃহস্পতিবার রাত্রি একটা পর্যন্ত জাগ্রত থাকিয়া কথামৃতের পঞ্চম ভাগের শেষ ফর্মার লেখা শেষ করিয়াছেন। তাহার কোথাও কোথাও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছেন।

রাত্রি এখন পৌনে দশটা। বলাই বাড়িতে যাইতেছেন কালী সিং-এর লেন, মেছুয়াবাজারে। শ্রীম বলিতেছেন, এখন আমায় একলা থাকতে হবে। আবার না গেলে তোমার খাওয়া হয় না। আচ্ছা, বাইরের দরজা বন্ধ করে দাও। না, যদি আমার কিছু বিপদ হয় তবে কি করে লোক আসবে? বলাই বলিলেন, ভিতরের দরজা বন্ধ করে যাব চৌকাঠের উপর চাবি রেখে। ফটক খোলা থাকবে। তা হলে দরকার হলে বাইরে থেকে খুলে লোক আসবে। বলাই বিদায় লইলেন।

বলাই আহার করিয়া ঠনঠনে কালীবাড়িতে ফলহারিণী কালীপূজা দর্শন করিয়া সাড়ে দশটায় ফিরিয়া আসিলেন ঠাকুরবাড়ি।

সাধু ভক্তেরা অনেকেই আজ দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় মঠে গিয়াছেন। মঠ হইতে অন্তেবাসী, যোগী মহারাজ ও বিমলকে (পরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ) সঙ্গে লইয়া আজ অপরাহ্নে খেয়া পার হইয়া কুঠিঘাটে জয় মিত্রের বাড়ি ও ঘাট, মণি মল্লিকের বাড়ি, যদু মল্লিকের বাড়ি প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণরেণুপূত তীর্থসমূহ দর্শন করিয়া দক্ষিণেশ্বর গিয়াছিলেন। রাত্রে যোগী মহারাজ কালীপূজা দর্শনের জন্য ওখানে রহিয়া গেলেন। অন্তেবাসী ও বিমল বালির পুল পার হইয়া মঠে হাঁটিয়া আসিলেন। রাস্তায় বৃষ্টি হইল।

এদিকে ঠাকুরবাড়িতে বলাই আসিয়া দেখিলেন, শ্রীম মশারীর ভিতর নিদ্রিত। একতলায় ভিতরের দরজার কাছে একটা হ্যারিকেন জ্বলিতেছে আর একটা শ্রীম-র ঘরের বাহিরে দেয়ালে। বলাই তিনতলায় নাটমন্দিরে বিছানা করিয়া ছাদে গিয়া বসিয়া আছেন। জপ করিতেছেন। পাঁচ মিনিট পরই শ্রীম-র উচ্চকণ্ঠের ডাক শুনিতে পাইলেন — বলাইবাবু, বলাইবাবু। বলাই আসিয়া অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখিলেন। শ্রীম তাঁহার ঘরের দরজার পাশে বারান্দায় শৌচে বসিয়া আছেন। কঠিন নীতিপরায়ণ শ্রীম-র পক্ষে এ আচরণ অতীব বিপরীত ও স্বভাববিরুদ্ধ।

বলাই বুঝিলেন, শ্রীম-র শরীর আকস্মিক বেদনায় জর্জরিত ও চলচ্ছক্তিহীন। নিরুপায় অবস্থায় এইরূপে মলত্যাগ করিতেছেন। দূর হইতে তাঁহাকে শ্রীম বলিলেন, একটা মাটির ভাঁড় নিয়ে আসুন। বলাই নিচতলা হইতে ভাঁড় লইয়া আসিলে তাঁহার নিকট হইতে উহা চাহিয়া লইয়া নিজেই মল উহাতে উঠাইতে লাগিলেন। বলাই ঐ ভাঁড়টা বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। রাত্রি এখন এগারটা।

রাত্রি ১১—১২টা

শ্রীম নিজের ঘরের দরজার চৌকাঠের বাহিরে বসিয়া আছেন দক্ষিণমুখী বালিশে মাথা রাখিয়া এবং দেওয়াল ও চৌকাঠের উপর হেলান দিয়া। কিছুক্ষণ পরে ঘরের ভিতর মুখ করিয়া উত্তরমুখী হইয়া ঐ ভাবে বসিলেন। পা দুখানি ঘরের ভিতরে পিঁড়ার উপর। বলাইকে হাতে ধরিয়া আছেন। প্রায় একঘন্টা এইরূপ রহিলেন। বলিলেন — বাঁ হাতে সেঁক দাও, খুব বেদনা। বলাই ঐ অবস্থায় শ্রীমকে ধরিয়াই হাতের কাছে যাহা ন্যাকড়া পাইলেন হ্যারিকেনে তাহা গরম করিয়া সেঁক দিতেছেন। শ্রীম বলিতেছেন, ভক্তগণ আজ কোথায়? শ্রীম অসুস্থ হইয়া আশে পাশে অনেক ভক্ত দেখিলে খুশি হন। শরীর অনবরত ঘামে ভিজিয়া যাইতেছে। বলাই মাঝে মাঝে মুছিয়া দিতেছেন। শ্রীম আবার বলিলেন — আচ্ছা, সিদুকে ডাক!

সিদু উত্তর দিকের বাড়িতে থাকেন। বলাই বার বার ডাকিয়াও কোন সাড়া পাইলেন না। ইহা দেখিয়া বলিলেন, আচ্ছা নিশুকে ডাক। নিশুর বয়স পঞ্চাশ হইবে, একটু স্থূলকায়। পাশের বাড়িতেই থাকেন। মাঝে মাঝে ছাদে বসিয়া ধ্যান করেন। নিশু উত্তর দিলেন। বলাই বলিলেন, এঁর অসুখ বেড়েছে, অমিবাবুকে খবর দিন। অমিবাবু আসিলেন। ইনি শ্রীম-র কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত কিশোরীবাবুর পুত্র। গত বৎসর এই দিনে কিশোরীবাবু শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। অমিবাবু একটা সোডা ওয়াটারের বোতল লইয়া আসিলেন। শ্রীম-র গা-বমি গা-বমি করিতেছে। এটা খাইলে যদি উহা বন্ধ হয়, তাই সবটাই খাইয়া ফেলিলেন। বলিলেন, এখন যদি বমি হয় তা হলে শরীর থাকবে না। ঈশ্বরেচ্ছায় বমি হইল না।

অমিবাবু ইতিমধ্যে ৫০ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীটে মর্টন স্কুলে গিয়া শ্রীম-র জ্যেষ্ঠপুত্র প্রভাসবাবুকে সংবাদ দিয়া আসিলেন। বাড়ির ঝি শ্রীমকে শ্রদ্ধা করিত। সে সংবাদ পাইয়া সর্বাগ্রে দৌড়িয়া আসিল। তারপর বোঁচা আর হুলোকে (শ্রীম-র পৌত্র ও দৌহিত্র) সঙ্গে লইয়া আসিলেন প্রভাসবাবু। এবার সকলে মিলিয়া সেবা করিতেছেন। কেহ হাওয়া করিতেছেন, কেহ সেঁক দিতেছেন, কেহ শরীর মুছাইয়া দিতেছেন।

এইবার শ্রীম বলিলেন, আমাকে মেঝেতে শুইয়ে দাও। ঘরের খাট বাহির করিয়া সাদা কম্বল পাতিয়া পূর্বমুখী করিয়া শোয়াইয়া দিলেন। মাথাটি বালিসে ঠেস দিয়া রাখিয়াছেন। বলাইকে পাশে থাকিতে বলিলেন। যন্ত্রণা বাড়িতেছে ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। এখন রাত্রি একটা।

রাত্রি ১- ৩টা

যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন — দুই হাতের কনুইয়ের কাছে দারুণ ব্যথা। এক একবার প্রার্থনা করিতেছেন — মা, অজ্ঞান করে দাও। আর কাজ করবো না, মা। আর কাউকে কিছু বলবোও না, মা। অজ্ঞান করে দাও, মা। মাঝে মাঝে আবার প্রার্থনা করিতেছেন, গুরুদেব, মা কোলে তুলে ন্যাও।

কয়েকদিন পূর্বে অন্তেবাসীকে বলিয়াছিলেন, এখন তিনি (ঠাকুর) বলছেন, বসে বসে তাঁর নাম কর। আর নানান্‌খানা ভাবতে দেবেন না। কিন্তু শ্রীম কর্মবিরত মোটেই হইতেন না। বরং বেশী কাজ করিতেন। পঞ্চম ভাগ শেষ করিবার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে লাগিয়াছেন। ভক্তগণ কেহ কেহ তাঁহার সহিত সহযোগ করিয়া বিরক্ত হইয়া পড়িতেছিলেন।

অন্তেবাসীকে আরও বলিয়াছিলেন, 'একটা কাজ মাথায় ঢুকলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই'। বাড়ির তিনতলায় নর্দমা মেরামত তখন হইতেছিল। উহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'দেখ, রাত একটা দুটো থেকে ঘুম নেই। ভাবছি, ঠিক হলো কিনা।' অন্তেবাসী বলিলেন, তাহলে কেন কাজ করেন? এইরূপ অনুযোগ করিলে শ্রীম বলিয়াছিলেন, 'প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি'। আর দৃঢ়তর ভাবে অনুযোগ করিলে বলিতে লাগিলেন —

'ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে।।' (গীতা ৪:১৪)
আবার —
যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতুঃ কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।। (গীতা ৩:২৩)
আর —
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্মচেদহম্।.. (গীতা ৩:২৪)

বেদনা বুঝি এবার আর থামিবে না, শরীরও থাকিবে না। ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল। আবার ভক্তরাও সব কাছে নাই একজন ছাড়া। শরীর আর থাকিবে না বলিয়াই বুঝি ভক্তদের সকলকে দূরে পাঠাইয়া একা রহিলেন। কয়েকদিন পূর্বেই সুখেন্দুকে ঘরে গিয়া বিশ্রাম লইতে পাঠাইয়া দিলেন। মনোরঞ্জনকেও তাহাই করিলেন। ইঁহারা সর্বদা কাছে থাকিতেন।

আজও স্বামী রাঘবানন্দ, সতীনাথ প্রভৃতিকে অন্যত্র কালীপূজা দেখিতে পাঠাইলেন। শুনিতে পাই মহাপুরুষরা একা একা থাকেন মহাপ্রয়াণের সময়। স্বামীজীও একা ছিলেন, কেবল একটি মাত্র সেবক ছিলেন কাছে। ভক্তের ভালবাসাও বন্ধন। উহা ছিন্ন না হইলে যাইতে পারেন না। তাই সকলকে না বলিয়া যেন একা মহাপ্রস্থান করেন।

ভক্তদের অবোধ মন বলিতেছে, যদি অনেক লোক থাকতো আর সময়ে সেবা হতো তাহলে হয়তো শরীরটা রক্ষা হতো। গত বৎসরও এইসময় বেদনা হয় মর্টন স্কুলে। বহু ভক্ত ও সাধু উপস্থিত থাকায় উপযুক্ত সেবায় শরীর রক্ষা হয়ে গেল। ঠাকুরের ইচ্ছাই প্রবল। তিনি প্রিয় সন্তানকে আর দুঃখক্লিষ্ট ধরাধামে রাখবেন না, তাই এবার কোলে তুলে নেবেন।

শ্রীম মাঝে মাঝে বলিতেছেন, মা অজ্ঞান করে দাও। অজ্ঞান হয় রোগযন্ত্রণায়, ঔষধ প্রয়োগে অথবা মৃত্যুতে, কিংবা মহাসমাধিতে। ঠাকুর রোগযন্ত্রণা নিরোধ করিলেন বটে একটু পরেই, কিন্তু তাহা মহাসমাধিতে। জগতের লোক আর শ্রীমকে দেখিতে পাইল না।

বড়ই যন্ত্রণা। ছট্‌ফট্ করিতেছেন, কখনও উঠিয়া বসিতেছেন, কখনও শুইতেছেন। কখন পাশে ফিরিয়া বালিশে মাথা গুঁজিয়া রাখিতেছেন। কখনও বলাইয়ের কাঁধে মস্তক রক্ষা করিতেছেন। কখনও যোগাসনে বসিতে

চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তীব্র বেদনা বাধা দিতেছে। কখনও সামনে ঝুঁকিতে চাহিতেছেন, তাহাও পারিতেছেন না। হার্ট আক্রমণ করিয়াছে বেদনা। একটা দুর্বিষহ যন্ত্রণায় এক একটি মুহূর্তও যেন সহস্র যুগের মত কাটিতেছে।

হার্টের আক্রমণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই একটু উপু হইয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিলেন। ধীরে ধীরে শরীরের অপরাংশ হইতে বেদনা হৃদয়ে গিয়া পুঞ্জীভূত হইয়াছে। ঘাম হইতেছে অনবরত, আর গায়ে জ্বালা হইতেছে। অমি বলিলেন, একটু চা খান। শ্রীম তাহা খাইবেন না। আবার অমি বলিলেন, তবে গরম মিছরীপানা দি? শ্রীম তাহাতেও রাজী হইলেন না। শুধু গরম জল দিতে বলায় তাহাই খাইলেন। এখন রাত্রি আড়াইটা। সমস্তটা মেঝেতে গড়াগড়ি দিতেছেন যন্ত্রণায়। খালি গা। কিছুক্ষণ পর বলিলেন, 'গা ঢেকে দাও'। একটা কাপড় দিয়া শরীর আবৃত করা হইল।

ভোর রাত্রি এখন চারটা। ডাক্তার ধীরেনবাবু আসিলেন। তিনি আধখানা বড়ি দিলেন। শ্রীম খাইলেন না। অত যন্ত্রণায়ও বাহ্যজ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে। ছেলেমানুষ পৌত্র দৌহিত্রদের নিদ্রাবিষ্ট দেখিয়া শ্রীম বলিলেন, 'যাও তোমরা শোও গে। তোমাদের কষ্ট হচ্ছে।' সারাজীবন শ্রীম কাহারও সেবা লন নাই। অপরের কষ্ট হইতেছে দেখিয়া অত যন্ত্রণার ভিতরও কিন্তু শ্রীম-র মনে যাতনা হইতেছে।

এখন ভোর প্রায় পাঁচটা। গিন্নী-মা স্কুলবাড়ি হইতে আসিয়াছেন তিনি আসিবার পর একবার মাত্র প্রস্রাব করিলেন। ইহার পরই বলিতেছেন, 'বিছানা করে শুইয়ে দাও।' তোষক পাতিয়া বিছানা করিয়া শোয়াইয়া দিলেন। সওয়া পাঁচটার সময় হঠাৎ বমি হইল মেঝেতে, পূর্ব দিকের দরজার কাছে। ইহার পরই শরীর ক্রমশঃ হীনবল হইতে লাগিল। দুইবার সামান্য কফসংযুক্ত থুথুও ফেলিলেন। ছটফটানি কমিয়া আসিতেছে — স্থির শান্ত ভাব ধারণ করিতেছে দেহ ক্রমশঃ। বেশ প্রশান্ত ভাব। মুখশ্রী উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়। উৎক্রমণ করিতেছে প্রাণ। শ্রীম বলিলেন, 'শরীর আর থাকবে না'। বাঁ কাতে শুইলেন।

পাঁচ মিনিট বাকী প্রায় সমাধির। শ্রীম স্পষ্ট স্বরে, প্রশান্তভাবে বলিতে লাগিলেন —

'গুরুদেব, মা, কোলে তুলে ন্যাও।'

ব্যস্, এই শেষ কথা শ্রীম-র মর্ত্যধামে। কথার মত কথা বটে! এই কথাটি অন্তিম সময়ে বলিবার জন্যই অত সাধন ভজন, জপ তপ।

তিন মিনিট মাত্র বাকী। এক একবার ওষ্ঠদ্বয় ফাঁক করিয়া আধ মিনিট অন্তর শ্বাস বাহির করিতেছেন। চক্ষু অর্ধ নিমীলিত, সমাধিতে মগ্ন। ব্যস্, সব শেষ! সব স্থির! এখন সাড়ে পাঁচটা। দিবাকর এখনও উদিত হয় নাই।*

৩

শ্রীম পরব্রহ্মে লীন হইলেন। আমরা আর তাঁহার পার্থিব রূপ দর্শন করিতে পারিব না। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে মহাযন্ত্রটির সহায়ে স্বীয় অবতারলীলা প্রকাশ ও প্রচার করিলেন সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া, আজ সেই যন্ত্রটিকে চিরতরে বিশ্রাম প্রদান করিলেন। শ্রীম বিশ্রাম চাহিতেছিলেন। মহাকার্য অবসানে আজ সেই চির শান্তিময় বিশ্রাম লাভ করিলেন। পার্থিব যন্ত্রণা আর স্পর্শ করিতে পারিবে না। দিব্য ব্রহ্মপুরে এখন পরমানন্দে বিরাজ করিবেন। পরব্রহ্ম শ্রীরামকৃষ্ণের অভয় ক্রোড়ে আরূঢ় শ্রীম। এখন কেবল ব্রহ্মানন্দসম্ভোগ।

ভক্তগণ এইবার শ্রীম-র পবিত্র স্মৃতিকে হৃদয়ে ধারণ করুন। সংসারের শত দুঃখ জ্বালার ভিতরও ঐ দিব্য চরিত্র স্মরণ করুন। আর সদা মনন করুন মহাযাত্রা কালের মহাবাণী — ‘গুরুদেব, মা কোলে তুলে ন্যাও’। ‘গুরুদেব, মা’ — ব্রহ্ম ও শক্তিকে, সদা নিদিধ্যাসন করুন আর জীবন্মুক্তির আনন্দ উপভোগ করুন।

এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া সাধু, তুমি তোমার তপস্যার অভিমান ত্যাগ কর। ভক্ত, তুমি তোমার ভক্তির অভিমানও ত্যাগ কর। ধনী, ত্যাগ কর ধনের অভিমান। পণ্ডিত, ত্যাগ কর পাণ্ডিত্যাভিমান। গুণী, মানী, সকলে সব অভিমান ত্যাগ কর। পার্থিব সকল অভিমান ত্যাগ কর, পৃথিবীবাসী জনগণ। কেবল এই অভিমান গ্রহণ কর, আমি অমৃতের সন্তান — ‘অমৃতস্য পুত্রাঃ’। তাহা হইলে এখানে শত যন্ত্রণার ভিতর থাকিয়াও

* এই সকল বিবরণ অন্তেবাসী কর্তৃক ব্রহ্মচারী বলাই ও শ্রীম-র জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীপ্রভাস গুপ্তের নিকট হইতে শ্রীম-র মহাসমাধির অব্যবহিত পরেই সংগৃহীত।

আনন্দে থাকিবে। শরীর ত্যাগ করিয়া আবার পরমানন্দই লাভ করিবে।

বহুবার কীর্তিত ঠাকুরের এই মহাবাণী এই মাত্র সেদিন আবার শ্রীম আমাদিগকে শুনাইয়া গেলেন — 'একটা ভাব আশ্রয় কর। তা হলে বিপথে যাবার আশঙ্কা কম। যদি কারও সন্তানভাব ভাল লাগে তবে মন সঙ্কুচিত হয়ে যাবে অন্যায় কাজ করতে। বাপের ব্যাটা হতে চাইবে মন। তেমনি দাস, ভক্ত, কিংবা সোঽহং — একটা ভাব ধর।'

একজন সাধু ভাবিতেছিলেন ঐ কথা শুনিয়া, সে দিন আমার মনের গুপ্ত ভাবটি বুঝি আজ ধরিয়া বাহির করিয়া দিলেন শ্রীম — 'পরমপিতার পুত্র আমি'।

অন্তেবাসীর হৃদয়ে বিগত এক যুগের কত কথাই যুগপৎ উদিত হইতে লাগিল বায়স্কোপের ছবির মত মনসাগরে, মৃদু মধুর তরঙ্গের মত নৃত্যানন্দে। অন্তেবাসী ভাবিতেছেন, গত বৎসরও এই দিনে শ্রীম আমাকে স্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া অভয় দিয়াছিলেন, 'ভয় কি, বাপ-মাওয়ালা ছেলের মত থাকবে আনন্দে ও নিশ্চিন্তে'।

অন্তেবাসী আজ অন্তরে মৌন প্রার্থনা করিতেছেন — 'ঠাকুর, গুরুমুখী এই মহাবাণী যেন সর্বদা স্মরণ থাকে। কেবল তোমাকে আশ্রয় করে যেন জীবনযাপন করতে পারি। তাঁর শেষ উপদেশ যেন পালন করতে পারি। আমাদের জীবন যেন তাঁর জীবনের ছায়ারূপ ধারণ করে সদা অনুগত থেকে। ঐ দৈবী ভক্তিবিশ্বাসের কণামাত্রেই আমরা ভরপুর হয়ে যাব। এই প্রার্থনা।'

কিছুকাল পূর্বে অন্তেবাসীর মনে মৃত্যুর একটি সুখময় চিত্র প্রায়ই উদিত হইত বৈদ্যনাথ ধামে। একটি ছেলে সুখে নিদ্রামগ্ন। প্রশান্ত, প্রগাঢ় সুষুপ্তিময়। এই সুখানন্দময় অবস্থায় যদি তাহার সূক্ষ্ম শরীরটি কোলে তুলিয়া লইয়া যান ঠাকুর ও মা — ব্রহ্ম ও শক্তি, তবে তো সে আর মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিবে না। সুষুপ্তিতে নিত্য যে ব্রহ্মানন্দে লীন হয় জীব — ঐ জীবটি আর ঐ মহানন্দ হইতে বিচ্যুত হইবে না। তাহার এই মহানন্দের বহিঃপ্রকাশ হইবে কেবল মুখমণ্ডলে, আনন্দোজ্জ্বল প্রশান্ত মুখশ্রীতে। শ্রীম-র মুখমণ্ডলে মহাসমাধিতে আজ সেই দিব্যোজ্জ্বল ভাবটি অনুরঞ্জিত।

ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তি॥ ওঁ শান্তি॥।

সূচীপত্র

ভূমিকা

শ্রীম মডেল - গৃহস্থসন্ন্যাসের ১

প্রথম অধ্যায়

দোষে গুণে মানুষ, তবুও সাধু প্রণম্য ২২

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৃত্যু পালিয়ে যায় তাঁর দোহাইয়ে ২৫

তৃতীয় অধ্যায়

ঠাকুর জীবন্ত, সত্যই জীবন্ত ৩৪

চতুর্থ অধ্যায়

চিত্রপুঞ্জ ৪৭

পঞ্চম অধ্যায়

কি দেবদৃশ্য সন্ন্যাস ৬৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

বালক তো যোল আনা বালক ৮৮

সপ্তম অধ্যায়

মুক্তার মালা এসব কথা ১১৩

অষ্টম অধ্যায়

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ ১৩৭

নবম অধ্যায়

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ ১৪৯

দশম অধ্যায়

শিবচিত্র ১৭৯

একাদশ অধ্যায়

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ১৯৪

দ্বাদশ অধ্যায়

পুরীর মহিমা ২০৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রোগশয্যায় শ্রীম ২১২

চতুর্দশ অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণময় শ্রীম ২২৪

পঞ্চদশ অধ্যায়

বীর তৈয়ার করতে এসেছেন ঠাকুর ২৪৭

ষোড়শ অধ্যায়

মহাপুরুষ-চিত্র ২৫৭

সপ্তদশ অধ্যায়

চিত্রাবলী ২৭০

অষ্টাদশ অধ্যায়

এই শেষ কথামৃত-পাঠ ২৮৫

উনবিংশ অধ্যায়

কমল কানন ৩০০

বিংশ অধ্যায়

পরীক্ষা ৩১৭

একবিংশ অধ্যায়

মহাযাত্রার পথে ৩২৮

দ্বাবিংশ অধ্যায়

নবীন তীর্থ ৩৬৩

পরিশিষ্ট

প্রথম অধ্যায়

শ্রীশ্রীমর মহাসমাধি* অন্তেবাসী ৩৯৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীম-র মহাসমাধি — অব্যবহিত পূর্বের ঘটনাবলী ৪২০
অন্তেবাসী

* * *

শ্রীম - দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও আত্মজ্ঞানের পথ প্রদর্শক
শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ

শ্রীম-র কথামৃত

(পঞ্চদশ ভাগ)

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

শ্রী ম ট্রাস্ট
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট
৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি, চণ্ডীগড় - ১৬০০১৮

প্রকাশক ঃ
প্রেসিডেন্ট
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট
(শ্রী ম ট্রাস্ট)
৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি
চন্ডীগড় - ১৬০০১৮
ফোন ঃ ০১৭২-২৭২৪৪৬০
Website : http://www.kathamritra.org

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

চতুর্থ সংস্করণ
রাস যাত্রা, ১৫ই কার্ত্তিক, ১৪১৬
(২রা নভেম্বর, ২০০৯)

মুদ্রাক্ষর বিন্যাস ঃ
শ্রীমতী রমা চক্রবর্তী
ডি-৬৩০, চিত্তরঞ্জন পার্ক
নিউ দিল্লি - ১১০০১৯
ফোন ঃ ০১১-৪১৬০৩৯৯৬!৯২১৩১৩৪৪৮৭

মুদ্রক ঃ
শ্রী অরবিন্দ গুপ্ত
প্রিন্ট ল্যান্ড, কাশ্মীরি গেট, দিল্লী
ফোন ঃ ০৯৯১১৩৮৬৭১৬/০৯৮১০০৮৬৭১৬

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা (Subsidised)

ঃ এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থাবলী ঃ

(১) শ্রীম-দর্শন (বাংলা) ১ম হইতে ১৬শ ভাগে সমাপ্ত

(২) শ্রীম-দর্শন (হিন্দী) ১ম হইতে ১৬শ ভাগে সমাপ্ত

(৩) শ্রীম-দর্শন (ইংরাজী) - "M. the Apostle and the Evangelist", ১ম হইতে ১১শ ভাগ

(১৬ ভাগ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ইংরাজীতে প্রকাশিত হইবে)

(৪) Sri Sri Ramakrishna Kathamrita Centenary Memorial

(৫) A Short Life of Sri "M"

(৬) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (হিন্দী), ভাগ ১ম হইতে ৫ম (মূলগ্রন্থের যথাযথ হিন্দী অনুবাদ)

(৭) The Life of M. and Sri Sri Ramakrishna Kathamrita

এই সকল গ্রন্থে আছে —

ভরতীয় সংস্কৃতি - আধ্যাত্মিকতা — আত্মদর্শন, ঈশ্বরদর্শন আর যোগসাধনার বিভিন্ন প্রণালী সম্বন্ধে — বর্তমান কালোপযোগীভাবে সিদ্ধ মহাপুরুষের উপদেশ — যাহা পড়িয়া দেশবিদেশের বহু নরনারী চির শান্তি ও পরমানন্দের অধিকারী হইয়াছেন ও হইতেছেন।

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

1. Sri Ma Trust Office
   579, Sector 18-B, Chandigarh 160018

2. Sri Sri Ramakrishna Kathamrita Peeth
   Sri Ma Trust
   Sector 19-B, Chandigarh - 160019

3. Smt. Padma Gadi
   R-899, New Rajendra Nagar
   New Delhi -110060

নিবেদন

শ্রীম-দর্শন ষোলটি খন্ডে সম্পূর্ণ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপার অনুগ্রহে এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের প্রথম সংস্করণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ১৯৬০) প্রকাশিত হইয়াছিল। তদবধি ভক্তগণের চাহিদাতেই একের পর এক সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হইতেছে।

শ্রীম-দর্শনের মূল আবেদন ঃ গৃহে বাস করিয়া কি প্রকারে দেবভাবে জীবন যাপন করা যায়, কিভাবে বেদবর্ণিত উপায়ে সুখ দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করিয়া সংসারে শান্তিতে বাস করা সম্ভব হয়।

এই পুস্তকে আছে পরমহংসদেবের ও মায়ের কিছু নূতন কথা, আর স্বামীজীপ্রমুখ অন্তরঙ্গ সন্তানদের কথা। আর আছে 'কথামৃত'-কার দ্বারা 'কথামৃত'-র ব্যাখ্যা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, পুরাণ, বাইবেল-আদি শাস্ত্রের আলোচনা।

শ্রীমতি ঈশ্বরদেবী গুপ্তা শ্রীম-দর্শনের পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ শ্রীম-র কথামৃত হইতে স্বর্গীয় আনন্দ ও শান্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং স্বামী নিত্যাত্মানন্দজীকে এই পুস্তক প্রকাশের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বাংলাভাষা শিক্ষা করিয়া এই গ্রন্থ হিন্দীতে অনুবাদ করেন যাহাতে হিন্দী ভাষাভাষী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ এই মহাগ্রন্থের রসাস্বাদন করিতে পারেন। পরে এই গ্রন্থ 'M - the Apostle and the Evangelist' নামে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন শ্রীযুক্ত ধরমপাল গুপ্ত মহাশয়।

পূজ্যপাদ স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজ এই মহাগ্রন্থ প্রকাশ করিবার দায়িত্বভার 'শ্রী ম ট্রাস্ট'-এর উপর অর্পণ করিয়া গিয়াছেন এবং তদবধি ট্রাস্ট এই গ্রন্থরাজি বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

শ্রীম-দর্শন মুদ্রণে এবং প্রকাশনে যে সকল সহকর্মী, অনুরাগীবৃন্দ ও ভক্ত সমাজ অক্লান্ত সহায়তা দান করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেককে আমাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বিনীত

প্রকাশক

গ্রন্থকার

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ দীর্ঘকাল শ্রীম-র সান্নিধ্যে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সঙ্গে ও সাধু ভক্তদের সঙ্গে শ্রীম-র যেসব ঈশ্বরীয় কথা হইত তাহা তিনি নিত্য ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতেন। শ্রীম এই ডায়েরীর পাঠ শুনিয়াছেন, আর স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। আর কিভাবে উত্তমরূপে ডায়েরী রাখিতে হয় তাহাও শিখাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীম-দর্শন এই ডায়েরীর সংকলন। সম্পূর্ণ গ্রন্থ ষোল ভাগে লিখিত।

ইহাতে আছে ঠাকুর, মা, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের কিছু কিছু নূতন কথা। আর কথামৃতকারের দ্বারা কথামৃতের ভাষ্য। অধিকন্তু উপনিষদ, গীতা পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেলাদি শাস্ত্রের শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাবসম্মত অভিনব ব্যাখ্যা।

।। কয়েকটি অভিমত ।।

স্বামী বিরজানন্দ (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট) বলেন, শ্রীম-দর্শন অপূর্ব মনোমুগ্ধকর গ্রন্থ। ইহার লিখনভঙ্গী যেমনি নাটকীয়, বিষয় - বস্তুও তেমনি সুগম ও সুগভীর।

প্রবুদ্ধ ভারত — শ্রীম দর্শন এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক রত্ন।

বিশ্ববাণী — রচনানৈপুণ্যে ও বর্ণনামাধুর্যে শ্রীম-দর্শন পাঠকালে কথামৃতের কোনও নবতর সংস্করণ বলে ভ্রম হয়। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে এক অপূর্ব সংযোজন।

ভবন জারনেল (বম্বে) — প্রতি মানবই শ্রীম-দর্শন থেকে কিছু না কিছু লাভ করবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা — শ্রীম-দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাষ্যকারের...জীবনভাষ্য। গ্রন্থকার গভীর একটি তত্ত্ববোধিনী দৃষ্টি নিয়ে সেই মহাশ্চর্য জীবনকথা আলোচনা করেছেন। ভক্ত বা ধর্মনিরপেক্ষ যে কোন পাঠকের কাছেই এর আবেদন অমোঘ।

শ্রীম

শ্রীম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট স্নাতক। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন, 'এই চক্ষে চৈতন্য-সংকীর্তনে তোমাকেও যেন দেখেছিলাম।' 'তোমার চৈতন্য ভাগবত পড়া শুনে তোমায় চিনেছি।' মাস্টার স্বভাবসিদ্ধের থাক্।' 'তুমি আপনার লোক এক সত্ত্বা যেন পিতা আর পুত্র।' 'তুমি অন্তরঙ্গ।' 'তুমি জহুরীর জাত।' 'তোমাকে জগদম্বার একটু কাজ করতে হবে — লোককে ভাগবত শিখাতে হবে।' 'মা এর চৈতন্য কর। তা না হলে অপরকে কেমন করে চৈতন্য করবে।' 'আমি ছাড়া এ কিছু জানে না।' 'মা ওকে এক কলা শক্তি দিলে? ও বুঝেছি, ওতেই তোর কাজ হবে।'

শ্রীম-র অবিনশ্বর কীর্তি বর্তমান যুগের বেদতুল্য মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীশ্রী মা বলেন, — একদিন তোমার মুখে কথামৃতের পাঠ শুনিয়া বোধ হইল, তিনিই (ঠাকুর) ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন — কথামৃত অপূর্ব। এর রচনাভঙ্গী মৌলিক।.... এই মহাকার্যের জন্য আপনি পূর্ব হইতে চিহ্নিত হইয়া আছেন।

প্রতীচীর মহামনীষী রোমা রোঁলা বলেন — শ্রীম-র লেখা যেন শর্টহ্যান্ড রিপোর্ট।

এলডাস্ হাক্সলী বলেন — কথামৃত জগতে প্রথম ও অদ্বিতীয়, ধর্মাচার্যদের জীবনচরিতের মধ্যে।

ইসারউডের মর্মবাণী — কথামৃত লিখে শ্রীম আমাদের ও ভবিষ্যৎ মানবসমাজের এত উপকার করেছেন যে তা বলে শেষ করা যায় না।

মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট, ঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেলুড় মঠে শ্রীমকে বলেছিলেন, কথামৃতও একটি, তার লেখকও একটি। যতবার পড়ি ততবার নূতন বলে বোধ হয়। আহা, কি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেছেন। মঠের চৌদ্দ আনা লোক সাধু হয়েছে কথামৃত পড়ে আর আপনার সঙ্গে মিশে।

যুগান্তর —'কথামৃত নব বেদান্তের গঙ্গোত্রী।' 'নব যুগের ভগীরথ কথামৃতকার শ্রীম।' 'কলিযুগের নারদ মহেন্দ্রনাথ।' 'নববেদান্তের একটি মূল স্তম্ভ স্বামী বিবেকানন্দ, অন্যটি শ্রীম।' শ্রীম এই তত্ত্বদর্শী, গৃহী মানুষের চাক্ষুষ আদর্শ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পূজ্যপাদ্য স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজ যখন শ্রীম-দর্শন রচনায় হিমালয়ের কোলে হৃষিকেশের ‘তুলসী মঠ’ আশ্রমে সাধনারত ছিলেন, সেই সময় ব্রহ্মলীন পরমারাধ্য স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজও ঐ মঠে অবস্থান করিতেন। শ্রীশ্রী মায়ের আশীর্বাদ পুষ্ট সৌভাগ্যবান তাপস স্বামী সারদেশানন্দজী তাঁকে এই সুমহান ব্রত উদ্‌যাপনে বিশেষ রূপে সহায়তা করেন। স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজের এই অকৃপণ স্নেহপরায়ণ সহায়তায় শ্রীম-দর্শন রচনা সম্ভবপর হয়। শ্রী ম ট্রাস্ট এবং স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজের সেবকগণ আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত এই অপরিশোধ্য ঋণ স্মরণ করেন।

শ্রীম - দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধন

(পঞ্চদশ ভাগ)

শ্রীম - দর্শন ❁ স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

১৫

স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ)

যোগীর চক্ষু

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি) — যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে, — সর্বদাই আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যাল্ ফ্যালে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে — সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে! আচ্ছা আমায় সেই ছবি দেখাতে পার?

মণি — যে আজ্ঞা। আমি চেষ্টা করবো যদি কোথাও পাই।

[দক্ষিণেশ্বর, ২৪শে আগষ্ট, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ]

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৩য় ভাগ - ২য় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)